কবিগান

ইতিহাস ও রূপান্তর

স্বরোচিষ সরকার

কবিগান বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক উদ্ভাবন। বিতর্কমূলক ও প্রতিযোগিতাধর্মী এই গানের মধ্যে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, কবিপ্রতিভা ও সঙ্গীতসাধনার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। আঠারো শতক থেকে এই গান বাংলার লোকায়ত ও ঐতিহ্যিক সাহিত্য-সঙ্গীত ধারার একাধিক অংশকে লালন করে আসছে। একুশ শতকের সূচনাতেও টিকে থাকা ঐতিহ্যবাহী এই সঙ্গীতশাখা সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিরসনের লক্ষ্যে গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও প্রণীত।

কবিগানের সংজ্ঞা ও পরিবেশন-রীতি, কবিগানের আসর, কবিগান পরিবেশনের স্থান-কাল, এই গানের কথা ও সুরের প্রকৃতি, কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশ, সর্বোপরি, গত দুই শতাধিক বছর ধরে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এক কথায় কবিগানের সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর

কবিগান

ইতিহাস ও রূপান্তর

স্বরোচিষ সরকার

বাংলা একাডেমী ঢাকা

কবিগান: ইতিহাস ও রূপান্তর
(কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত)

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১৮/ মে ২০১১

বাএ ৪৯১২
(২০১০-২০১১ গসফো: ফোকলোর ২)

মুদ্রণসংখ্যা: ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
সুভাষ চন্দ্র সূতার

মূল্য
৫০০ টাকা

KABIGAN : ITIHAS O RUPANTAR [Kabigan: Origin and Development] by Swarochish Sarker. Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation and Folklore Department, Bangla Academy, Dhaka 1000 First Published: May 2011. Price: 00

ISBN 984-07-4920-X

উৎসর্গ

আমার পিতা স্বরূপেন্দু সরকারকে
বইটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না, এই আমার দুঃখ

আমি যদি পল্লী-কৃষকের ঘরে জন্মাতাম, কিংবা মাঝি, মালো, কর্মকার বা তন্তুবায়ের ঘরে, আর আমার যদি থাকত সহজাত কবিত্বশক্তি, তাহলে আমি বড়জোর একটা কীর্তনের বা পাঁচালির দল খুলতাম; অথবা কবিয়ালরূপে গ্রামে-গ্রামে গাওনা গেয়ে বেড়াতাম।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা এই কারণে যে, তাঁরা 'কবিগান: ইতিহাস ও রূপান্তর' শীর্ষক এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সহায়তা দান করেছেন।

গ্রন্থটি রচনার পেছনে গবেষকের পিতা কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকারের উৎসাহ গবেষককে সবসময়ে প্রণোদিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর কবিগানের অভিজ্ঞতা, কবিগান বিষয়ে তাঁর অসংখ্য স্মৃতি, মতামত ও সংগ্রহ এই গ্রন্থে অকুণ্ঠভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজটি তাঁর জীবিতাবস্থায় শুরু হয়। ২০০৯ সালের ১৯শে মে মারা যাওয়ার আগেও তিনি কাজটির অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে বাগেরহাট শহরের পুরাতন বাজারে যতীন ডাক্তারের বাড়িতে কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকার কয়েকদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁর সাহচর্য লাভের সুযোগ হয়।

১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে একটি প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্যে গবেষককে অনাদিজ্ঞান সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, দ্বিজবর সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার প্রমুখের বাড়িতে এক বা একাধিক দিন অবস্থান করতে হয়। এবার তথ্য সংগ্রহের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ সরকার, দিগেন্দ্রনাথ সরকার, সরোজিৎ সরকার, সঞ্জয় মলিক, উমা সরকার প্রমুখের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। ঐসব পরিবারে অবস্থানের সময়ে কখনো মনে হয়নি যে, গবেষক ভিন্ন কোনো পরিবারের সদস্য। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ সরকার, রসিকলাল সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নন্দলাল আচারিয়া, দ্বিজবর সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালিদাস সরকার, সন্ধ্যা সরকার প্রমুখ কবিয়াল যখন গবেষকের পৈতৃক বাড়ি কবিকুটিরে এসেছেন, তখন খুব নিকট থেকে তাঁদের স্নেহাশিস লাভের সুযোগ হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গবেষকের পিতার সঙ্গে বেশ কয়েক পালা কবিগান করেন সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২০০৪ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে গবেষকের পুনরায় দেখা হয়, একই সময়ে কবিয়াল অসীম সরকারের সঙ্গেও কথা হয়। এছাড়া ২০০৮ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে বার্ধক্যপীড়িত সুরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বাড়িতে পর্যাপ্ত সময় দেন। একইভাবে ব্যাপক সাহায্য করেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল উমা সরকার ও সম্বিতী সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে যাঁরা কবিগান করছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে গবেষকের সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ের এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূচক। এই কবিয়ালগোষ্ঠীর মধ্যে

যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সরকার (বড়ো), মহাদেব সরকার, গৌর সরকার, নিশিকান্ত সরকার (ছোটো), মণিলাল সরকার, কৃষ্ণকান্ত সরকার, নিখিল সরকার, অমূল্য সরকার, সঞ্জয় মলিক, সঞ্জীব সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার (ছোটো), মণিশঙ্কর (শঙ্কর) সরকার, শ্যামল সরকার, স্বপন সরকার, গোরাচাঁদ সরকার, হরিবর সরকার, গৌতম সরকার, মীরা সরকার, তিমির সরকার, নির্মল সরকার, শঙ্কর সরকার, গৌতম সরকার, দীপঙ্কর সরকার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের নিকট থেকে টেলিফোনের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

ওড়াকান্দির মতুয়াচার্য শ্রীশ্রী পদ্মনাভ ঠাকুর একাধিক বই দিয়ে এবং তারকচন্দ্র সরকারের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে দিয়ে এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। একইভাবে 'অনন্তবিজয়' পত্রিকার সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম বিষ্ণুপদ বাগচী অনেকগুলো কবিগান সংগ্রহ করে ডাকযোগে পাঠিয়েছেন এবং গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন।

বিজয়কৃষ্ণ সরকারের শেষ জীবনের প্রিয় শিষ্য মহসিন হোসাইনের গ্রন্থাদি থেকে যেমন পর্যাপ্ত সহায়তা পাওয়া গেছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও ফোনের মাধ্যমে তিনি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ড. তপন বাগচী, খুলনার একটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মণ্ডল, আইবিএস-এর পিএইচডি গবেষক দিব্যদ্যুতি সরকার, আইবিএস-এর এমফিল গবেষক রঞ্জিত পোদ্দার এবং ফরিদপুরের নগরকান্দার কবিগান-প্রেমিক মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রচ্ছদ অঙ্কন ও আলোকচিত্র সম্পাদনার কাজ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সূতার।

বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কর্মরত মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন গবেষণা-সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে গবেষকের সফরসঙ্গী হয়েছেন, তথ্যসংগ্রহের কাজ করেছেন, সর্বোপরি তাঁর বহু মূল্যবান নিজস্ব ক্যামেরা দিয়ে কবিগানের অসংখ্য ভিডিও ছবি তুলেছেন।

'গণমুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক অনুজপ্রতিম উৎপল বিশ্বাস প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগ্রহে একাধিকবার সফরসঙ্গী হন, একাধিক বই দিয়ে সহায়তা করেন এবং তাঁর 'গণমুক্তি' পত্রিকায় কবিগানের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ক একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

অনুজপ্রতিম আশিসকুমার এদবর পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার একাধিক গ্রামে ও কবিগানের একাধিক আসরে তথ্য সংগ্রহের সময়ে সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তথ্যসংগ্রহের সময়ে অনুরূপ সফরসঙ্গী হয়েছিলেন পরম প্রীতিভাজন নিত্যানন্দ বিশ্বাস।

১৯৮০-এর দশকে বন্ধুবর ড. আবুল হাসান চৌধুরী (বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক) কবিগানের উপরে উচ্চতর গবেষণা করার আগ্রহ পোষণ করেছিলেন। একাধিক কারণে সে পরিকল্পনা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। অভিন্ন লক্ষ্যে তিনি যেসব মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন, সেসব তিনি অকাতরে দান করেন। তাঁর এই মহানুভবতা দুর্লভ।

গ্রন্থ পরিকল্পনায় সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতানের আন্তরিক আগ্রহ বইটির প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করলো। গ্রন্থটির প্রকাশনা পর্বের প্রাসঙ্গিক কাজ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন সমীক্ষক জয়নুল আবেদীন ও পাণ্ডুলিপি সম্পাদক ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী।

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গবেষকের সহধর্মিণী দেবী সরকার নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কবিগানের তথ্যসংগ্রহের কাজেও তিনি সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

স্বরোচিষ সরকার

সূচিপত্র

ভূমিকা

দুই দলের মধ্যে সংঘটিত এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান কবিগান। কবিগান বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি মৌলিক উদ্ভাবন। বিতর্কমূলক ও প্রতিযোগিতাধর্মী এই গানের মধ্যে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, কবিপ্রতিভা ও সঙ্গীতসাধনার যে অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়, আর কোনো ধরনের লোকসঙ্গীতে তা নেই। বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত তথাকথিত জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীত ধারার বিপরীতে এই গান বাংলার লোকায়ত ও ঐতিহ্যিক সাহিত্য-সঙ্গীত ধারার একাধিক অংশকে লালন করার যে গুরুদায়িত্ব পালন করে, তা বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। একুশ শতকের সূচনাতেও টিকে থাকা ঐতিহ্যবাহী এই সঙ্গীতশাখা সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিরসনের লক্ষ্যে গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও প্রণীত।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিগান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা অনেক, এর মধ্যে অনেকগুলো কবিয়ালদের জীবনকথা বিষয়ক। কবিগানে পরিবেশনযোগ্য নানা ধরনের গানের সংকলন অনেকগুলো; নিছক কবিগান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এমন বইয়ের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কবিগানের এসব বই ছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বইয়ের মধ্যে প্রসঙ্গত কবিগানের উল্লেখ থাকে, কখনো কখনো দীর্ঘতর আলোচনা থাকে। কালবিচারে এসব রচনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এক. উনিশ শতকের কবিগান বিষয়ক, এবং দুই. বিশ শতকের কবিগান বিষয়ক। প্রকৃতি বিচারেও এগুলোকে ভাগ করে দেখা যায়, যেমন: ১. কবিয়ালদের জীবনকথা; ২. কবিগানের সংকলন; ৩. কবিগান বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ; এবং ৪. প্রবন্ধ হিসেবে অথবা গ্রন্থের অংশ হিসেবে কবিগানের আলোচনা। তবে রচনাগুলোকে সব সময়ে যে এভাবে বিভক্ত করা যায়, তা নয়। কারণ প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় জীবনকথা আলোচনা করতে গিয়ে বা গানের সংকলন উপস্থাপন করতে গিয়ে কবিগানের আলোচনা হয়, আবার কোনো কোনো রচনা আলোচনা-প্রধান হয়েও তার মধ্যে জীবনকথা ও গানের উদ্ধৃতি পর্যাপ্ত জায়গা দখল করে থাকে। এসব বিবেচনায় প্রধানত কালবিচারের মাধ্যমে কবিগান বিষয়ক সব ধরনের রচনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক।

১৮২০ সালে প্রকাশিত 'করুণানিধানবিলাস' নামের একটি সংকলনগ্রন্থ কবিগানের প্রথম সংকলন। এটি খিদিরপুরের ভূকৈলাসের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে প্রকাশিত হয়। এর অব্যবহিত পরে 'সমাচার দর্পণ' (১৮২৬) ও 'ইংলিশম্যান' (১৮৩৭) পত্রিকায় কবিগান সম্পর্কে অল্পকিছু তথ্য মুদ্রিত হলেও উনিশ শতকের

মাঝামাঝি সময় নাগাদ 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৫৪–৫৫) পত্রিকার মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিগান নিয়ে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনা শুরু করেন। এই পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত অন্তত দশ জন কবিয়ালের জীবনকথা এবং কবিগানে পরিবেশনযোগ্য ২৭০টি গান মুদ্রিত করেছিলেন। এর পরের কয়েক দশকে কবিগানের কয়েকটি সংকলন পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত গানগুলোর উপরে ভিত্তি করে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ', ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ', ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (লুপ্তরত্নোদ্ধার), ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় মনুলাল মিশ্র সম্পাদিত 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান', ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'প্রীতিগীতি', এবং ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান'। এছাড়া ১৮৭৬ সালের 'বান্ধব', ১৯০৪–৫ সালের 'সাহিত্য-সংহিতা', ১৯০৭ সালের 'নব্যভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় বেশ কয়েকজন কবিয়ালের জীবনকথাসহ বেশ কিছু কবিগান মুদ্রিত হয়। এসব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও রচনার উপরে ভিত্তি করে আলোচ্য কালপর্বের কবিগানের উপরে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র পালের 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (১৯৫৮) এবং নিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৮) গ্রন্থ দুটি মূল্যবান।[১] এছাড়া এই পর্যায়ের কবিগান নিয়ে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "কবিসংগীত" (১৮৯৫) প্রবন্ধটি বহু-আলোচিত এবং বহু-বিতর্কিত।[২]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারীদের অনেকে বিস্তারিতভাবে কবিগানের আলোচনা করেন। এসব ঐতিহাসিকের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন, এবং অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩] আয়তন ও গভীরতার দিক দিয়ে এর মধ্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা

---

[১] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮); নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৮)।

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯৪১), পৃ. ৬৩২।

[৩] Dinesh Chandra Sen, *Bengali Language and Literature* (Kolkata: Calcutta University, 1911); Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (2nd ed.; Kolkata: Firma KLM, 1962); সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৪০); অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের দুটি অধ্যায়ে কবিগান নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪]

বিশ শতকের কবিগান বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা চলে: ১. বিশ শতকের কবিগানের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, ২. ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থের অংশ হিসেবে কবিগানের আলোচনা ও সংকলন, ৩. বিশ শতকের কবিয়ালদের জীবন ও অবদান বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এবং ৪. বিশ শতকের কবিগানের সংকলন।

বিশ শতকের কবিগান বিষয়ক আলোচনা প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক। দীনেশচন্দ্র সিংহের 'কবিয়াল কবিগান' (১৯৭৭) ও 'পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' (১৯৯০) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রারম্ভিক দুটি বই। কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের লিখিত 'বঙ্গের কবির লড়াই' (১৯৩১) বইটিও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন সরকার লিখিত 'বাংলাদেশের কবিগান' (১৯৮৫, পুনর্মুদ্রণ ২০১০) বইটি বিশ শতকের কবিগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।[৫]

বাংলাদেশের ফোকলোর বিষয়ক আলোচনায় বিশ শতকের কবিগান গুরুত্ব পায়। তাই ফোকলোর-পরিচিতিমূলক বেশ কয়েকটি গ্রন্থে কবিগানের প্রসঙ্গ থাকে। এর মধ্যে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' ৭ম খণ্ড (১৯৬৪), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি' (১৯৭৩), আবদুল হাফিজের 'লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ' (১৯৯৪), এবং বিরাট বৈরাগ্যের 'মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৯৯) গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'ফোকলোর সংকলন'-এর ৬৪তম খণ্ডে (১৯৯৪) মহেশচন্দ্র কবিভূষণ রচিত "ময়মনসিংহের কবিগান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। এতে বিশ শতকের সূচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিভাবে কবিগান পরিবেশিত হতো, সে সম্পর্কে বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

বিশ শতকের খ্যাতিমান কবিয়ালদের জীবন ও অবদান নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। এই পর্বের প্রারম্ভিক ব্যক্তিত্ব তারকচন্দ্র সরকারের জীবনী রচনা করেছেন বিষ্ণুপদ বাগচী (১৯৯৮)। ভারত থেকে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঠাকুর এবং ননীগোপাল দাসের লেখা তারকচন্দ্র সরকারের আলাদা দুটি জীবনীগ্রন্থ রয়েছে। যতীন সরকার রচনা করেছেন হরিচরণ আচার্যের জীবনী (১৯৮৯)। বিশ শতকে ব্যতিক্রমী ধারার কবিয়াল রমেশ শীলকে (১৮৭৭–১৯৬৭) নিয়ে রচিত হয়েছে অনেকগুলো জীবনীগ্রন্থ। জীবনীকারদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯৬৩), পুলক চন্দ (১৯৭৮), এবং

[৪] অধ্যায় দুটির নাম যথাক্রমে "কবিগান" এবং "কয়েকজন কবিওয়ালা", *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১–২২৯।

[৫] এই অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক বইগুলোর বিস্তারিত প্রকাশনাতথ্য প্রমাণপঞ্জিতে পাওয়া যাবে।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (১৯৮৭)। মহসিন হোসাইন রচনা করেছেন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের উপরে একটি (১৯৭৯) এবং বিজয় সরকারের উপরে দুটি (১৯৮০, ১৯৯৮) জীবনীগ্রন্থ। জীবনীকোষ জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থে এই পর্বের অনেক কবিয়ালের জীবনতথ্য জানা যায়। এ জাতীয় বইগুলোর মধ্যে নূর মহম্মদ টেনার 'খুলনার লোককবি' (১৯৮১), মহসিন হোসাইনের 'বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি' (১৯৯৮), কল্যাণী ঘোষের 'চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান' (১৯৯৮), কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাসের 'বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার' (২০০২), এস এম নূর-উল-আলমের 'চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান' (২০০৩), মাহবুবুল হক ও শিশির দত্ত সম্পাদিত 'সমকালের কবিয়াল' (২০০৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ শতকের কবিগানের নমুনা সংকলনের ক্ষেত্রেও দীনেশচন্দ্র সিংহ অগ্রগামী। তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা' (১৯৯৭) নামে একটি দীর্ঘায়তন (১০১৪ পৃষ্ঠা) সংকলন প্রকাশিত হয়, যা কবিগানের সংকলনের মধ্যে বৃহত্তম। এই সংকলনে বিশ শতকের কবিগানের সংকলন বেশি। ১৯৮৩ সালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত 'হারামণি' (১৯৮৩) গ্রন্থের ১০ম খণ্ডের প্রায় সবগুলো গান হরিচরণ আচার্যের রচিত। এই গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি গান রাজেন্দ্রনাথ সরকারের। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত 'রমেশ শীল রচনাবলী'-র (১৯৯৩) মধ্যে রমেশ শীলের বহু গান মুদ্রিত হয়েছে। বিজয় সরকারের গানের অনেকগুলো সংকলন বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাস সম্পাদিত 'বাংলার লোককবি সরকার বিজয় অধিকারীর গীতিমালা' (১৯৮৩) এবং মহসিন হোসাইনের 'কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সংগীত' (১৯৯৪) গ্রন্থ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন কবিয়াল নিজেদের উদ্যোগে গানের সংকলন প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকারের 'ভাটির নাইয়া' (১৯৬৫) এবং ইয়াকুব আলীর 'কবিগান' (১৯৬৭) বই দুটির নামোল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি (২০১০) বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা ১: কবিগান' শীর্ষক ১৯৬০-এ দশকে সংগৃহীত কবিগানের একটি সংকলন।

কবিগান নিয়ে কথাসাহিত্য এবং নাট্যকর্ম তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' (কলকাতা, ১৯৪২) উপন্যাস, সেলিম আল দীনের 'কীর্তনখোলা' নাটকের একটি দৃশ্য, দেবেশ রায়ের 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১০) উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ, অথবা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' শীর্ষক সিনেমার উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে 'কবি' উপন্যাসের নিতাইকে পুরোপুরি কবিয়াল হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি। সে প্রধানত ঝুমুর দলের কবি। তাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিয়ালের মুখে যেসব গান জুড়ে দেন, তা কবিগানের কোনো অঙ্গ, যথা ডাক-মালশি, সখীসংবাদ, কবি বা জোটের পাল্লার গঠনের সঙ্গে মেলে না। এর তুলনায় 'অ্যান্টনি

ফিরিঙ্গি' চলচ্চিত্রটি অধিক বিশ্বস্ত। সম্প্রতি (২০১০) কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবিগানের কিছু কমপ্যাক্ট ডিস্ক পাওয়া যায়, যাতে নতুন প্রজন্মের বেশ কয়েকজন কবিয়ালের ধুয়া-পাঁচালির ভিডিওচিত্র ধারণ করা আছে। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস বা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' সিনেমার তুলনায় এগুলো নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিত্বশীল। তবে বহুমাত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে এইসব ডিস্কও কবিগানের আংশিক প্রতিফলক মাত্র।

বর্তমান গ্রন্থ রচনার সময়ে উল্লিখিত যাবতীয় রচনা মনোযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যকার অনেক রচনা প্রত্যক্ষভাবে কবিগান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টির সহায়ক। অনেক রচনা প্রাসঙ্গিক ধারণা সৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। আবার অনেক রচনা, বিশেষত গানের সংকলনগুলো যেহেতু একেবারেই প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য, সেহেতু সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ কবিগান সম্পর্কে অনেক নতুন ধারণার জন্ম দেয়।

কবিগান বলতে কী বোঝায়? কবিগানের সংজ্ঞা কী? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবিগান পরিবেশনের রীতিপদ্ধতি কী? কবিগানের আসর কেমন? কতোক্ষণ ধরে কবিগান পরিবেশিত হয়? কবিগানের কথা ও সুর কিভাবে বিন্যস্ত? কবিগানের কতোটা অংশ তাৎক্ষণিক রচিত এবং কতোটা পূর্বরচিত? কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃতি কেমন? বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে কখন কিভাবে কবিগানের উদ্ভব ঘটে? স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কবিগানের গঠন ও বিষয়গত পরিবর্তন বা রূপান্তরের প্রকৃতি কেমন? উনিশ শতকের কবিগানের সঙ্গে বিশ বা একুশ শতকের কবিগানের তফাত কতোটা? কবিগানের মধ্যে কোনো আঞ্চলিক বিভাজন সৃষ্টি হয় কিনা?—কবিগানের উপরে স্বতন্ত্র একটি গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা সম্ভব। তাতে রচিত হতে পারে বাংলাদেশের কবিগানের হালতক ও যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস—যার মধ্যে বাংলাদেশের কবিগানের উদ্ভব, বিকাশ, রূপান্তর, পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত হতে পারে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের লক্ষ্য বস্তুত দুটি: কালানুক্রম বিবেচনায় রেখে কবিগানের স্বরূপ ও প্রকৃতি উপস্থাপন করা; এবং স্থানভেদ ও কালভেদে কবিগানের রূপান্তরসমূহ নির্দেশ করা।

কবিগানের যেমন উজ্জ্বল অতীত রয়েছে, তেমন রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশপর্ব। আবার কবিগানের সমকালীন রূপান্তরও ফোকলোরচর্চায় বিশেষ আগ্রব্যঞ্জকতা লাভ করে। কবিগানের এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিকে প্রস্তাবিত গবেষণার একমাত্র উপায় মনে করা হয়নি। যেমন কবিগানের কালানুগ প্রেক্ষাপট (Diachronic Perspective) উদ্ধারের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির (Historical Method) যাবতীয় কৌশল কাজে লাগাতে হয়েছে। আবার কবিগানের সমকালীন প্রেক্ষাপট (Synchronic Perspective) উদ্ধারের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণমূলক

পদ্ধতিকেও (Empirical Method) গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, এই গবেষণায় তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রধানত পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে এই সুযোগটি ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান গবেষক কবিগানের পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হন। বিশ শতকের শেষার্ধের খ্যাতিমান কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার (১৯৩২–২০০৯) গবেষকের পিতা। বিশ শতকের শেষার্ধের পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত প্রায় সকল কবিয়ালের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকার কবিগান পরিবেশন করেছেন। ছোটবেলা থেকে সেসব গান শোনার সৌভাগ্য গবেষকের হয়েছে। অনেক সময়ে দুই বায়নার মধ্যবর্তী দুই-এক দিনের অবসরে একাধিক কবিয়াল তাঁদের দোহারপত্র নিয়ে গবেষকের পিতার বাড়িতে (কবিকুটির, উমাজুড়ি, বাগেরহাট) অবস্থান করেছেন। সেইসব সরকার, দোহার, ঢুলি, হারমোনিয়ম-বাদক প্রমুখের সঙ্গে গবেষকের সম্পর্ক হয়ে ওঠে আত্মীয়তাসূচক। কোনো কোনো দিন নতুন কোনো গানের মহড়া দেওয়ার সময়ে বর্তমান গবেষক খ্যাতিমান দোহারদের সঙ্গে গলা মেলানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান গবেষক শেষ পর্যন্ত একজন কবিয়াল হতে পারেননি, সে তাঁর ভাগ্যের ফের।

পারিবারিক এই সংশ্লিষ্টতা এবং এই জাতীয় অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষককে বিভিন্ন সময়ে কবিগান বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। এগুলোর নাম যথাক্রমে: "কবিগান : অতীত ও বর্তমান" (১৯৮৫), "বাংলাদেশের কবিগান: উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য" (১৯৯৩), "কবিগানের অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" (১৯৯৫), এবং "কবিগান" (২০০৩)।[৬] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে এবং অনেক সময়ে তাঁদের দেওয়া শিরোনামে কাজ করার জন্য নামগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রথম প্রবন্ধ তিনটির প্রতিটিতে স্বতন্ত্র তথ্যের সমাহার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সঙ্গত কারণে কবিগানের কালানুগ অংশের জন্য মুদ্রিত উপকরণের উপরে অপেক্ষাকৃত বেশি নির্ভর করতে হয়। তবে কবিগানের সমকালীন অংশের জন্য মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের কোনো বিকল্প ছিলো না। একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে শতাধিক কবিগানের দল রয়েছে, তার মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বশীল অনেকগুলো দলের গায়কদের সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের অন্যতম প্রাথমিক উপকরণ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নানা ধরনের প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে, কখনো কখনো অডিও এবং/অথবা ভিডিওতে কবিগান ও অন্যান্য গান রেকর্ড করা হয়েছে।

কবিগানের একটি আঞ্চলিক ভূগোল রয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে বিষয়টি মনে রাখা হয়। উনিশ শতকের কবিগান সম্পর্কে যতোটা জানা

---

[৬] প্রবন্ধগুলোর বিস্তারিত প্রকাশনাতথ্যের জন্য এই গ্রন্থের 'প্রমাণপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।

যায়, তাতে দেখা যায়, সে সময়ে কবিগান ছিলো প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতাকেন্দ্রিক। বিশ শতকে কবিগানের বিস্তার ঘটে মূলত পূর্ববঙ্গে। এ সময়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও যশোর জেলায় কবিগানের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা ক্রমে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। একুশ শতকে কবিগানের ভূগোল মোটামুটি বিশ শতকের ভূগোলের মতো। তবে বিশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় কবিগান দেশবিভাগের কারণে নতুনভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। এসব কারণে কবিগানের প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উল্লিখিত অঞ্চলগুলোকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাসঙ্গিক এলাকাগুলোকেও একইভাবে গবেষণাক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

উদ্ভব কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিগানকে স্পষ্টত কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে বর্ণনা করা চলে। এগুলো যেমন: উদ্ভব পর্ব, কলকাতা পর্ব, পূর্ববঙ্গ পর্ব, এবং অনুবর্তন পর্ব। উনিশ শতকের পূর্বে এক বা একাধিক শতাব্দী কবিগানের উদ্ভবকাল। এ পর্বের কবিগান বাংলাদেশের একাধিক লোকসঙ্গীতকে সমন্বিত করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে শুরু করে। তবে উনিশ শতকের সূচনায় কবিগান যখন থেকে কলকাতার বিত্তবান শ্রোতাদের মনোরঞ্জন শুরু করে, তখন থেকে এর বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট চেহারা পায় এবং এর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য কবিগানের এই উদ্ভব পর্ব ও কলকাতা পর্বকে অভিন্ন অধ্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে কবিগান কলকাতা ত্যাগ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে কলকাতায় এবং মফস্বলে যুগপৎভাবে কবিগান অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন কারণে কয়েক দশকের মধ্যেই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অঞ্চল কবিগানের একটি চমৎকার লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কবিগানের এই পূর্ববঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ সূত্রে (১৯৪৭) এ অঞ্চলে যে যুগান্তর ঘটে, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়, কবিগানের উপরে তার প্রভাব পড়ে। কবিগান তখন একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়, একইভাবে কবিগানের আঙ্গিক ও গঠনকৌশলকে তা প্রভাবিত করে, এমনকি কবিগানের অনুকরণে বেশ কয়েকটি নতুন শিল্পমাধ্যমেরও জন্ম হয়। কবিগানের এই পর্যায়কে চিহ্নিত করা যায় অনুবর্তন পর্ব হিসেবে, যা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য।

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কবিগানের রূপান্তর প্রক্রিয়া। স্থানকালভেদে কবিগানের বিভিন্ন অংশের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে এই পরিবর্তন এতো বেশি মাত্রায় হয় যে, সেটাকে আর কবিগান নামে আখ্যায়িত করা যায় না। এভাবে কবিগানের রূপান্তর ঘটে অন্তত দুই ভাবে—কবিগান শিরোনামের অভ্যন্তরে রূপান্তর এবং কাঠামোগত রূপান্তরের ফলে কবিগানের ভিন্ন নাম গ্রহণ। শেষোক্ত রূপান্তর কিভাবে তরজা, জারি, বিচার, ঘাটু, আলকাপ প্রভৃতি গানের সৃষ্টি করে, অধ্যায়টিতে তা আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েকটি পরিশিষ্টে কবিগানের বিভিন্ন অংশের নমুনা ক্রমানুযায়ী সংকলিত হয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে বিশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের বিভিন্ন অংশ। প্রকাশিত সংকলনগুলোতে মুদ্রিত গানগুলো যাতে পুনর্বার মুদ্রিত না হয়, তা মনে রাখা হয়েছে। তবে কিছু অপরিহার্য ক্ষেত্রে পূর্বে প্রকাশিত কিছু গানও এখানে রাখতে হলো। একই কারণে কলকাতা পর্বের কোনো কবিগান পরিশিষ্টে দেওয়া হলো না। একটি পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে পূর্ববঙ্গ পর্বে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক পালা কবিগান কিভাবে পরিবেশিত হয়, তার ভাষিক পাঠ। এছাড়া কবিগানের সূচনালগ্ন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে যেসব কবিয়ালের পরিচয় জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে, পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে একটি পরিশিষ্টে খুব সংক্ষেপে তা বর্ণানুক্রমে সংকলিত হলো।

প্রথম অধ্যায়

কবিগানের স্বরূপ ও প্রকৃতি

১. সূচনা

একাধিক শতাব্দী বিস্তৃত যে কোনো শিল্পমাধ্যমের স্বরূপ ও প্রকৃতি অভিন্ন হবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কবিগানের ক্ষেত্রে তা অধিকতর সত্য। একই কারণে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিগানের যে রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটান, একুশ শতকের সূচনায় প্রচলিত কবিগান তার চেয়ে অনেক দিক দিয়ে আলাদা হয়ে যায়। কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে এই দুই কালপর্বের কবিগানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিল্পমাধ্যম বলেও মনে হতে পারে। তবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, একাধিক শতাব্দী ধরে প্রচলিত এই গানের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য সব সময়ে মোটামুটি এক রকম। স্থানকালভেদে এর মধ্যকার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য কখনো প্রধান হয়ে ওঠে, আবার কখনো গৌণ হয়ে যায়। প্রধানত এইসব বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে বর্তমান অধ্যায়ে কবিগানের স্বরূপ ও প্রকৃতি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. কবিগানের সংজ্ঞা

কবিগান এমন এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দল গায়ককে প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করতে হয়। কবিগানের একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'কবির লড়াই'। দলের দলপতিকে বলে সরকার বা কবিয়াল। দলের সঙ্গীত-সহযোগীদের নাম দোহার। দলের যন্ত্রসঙ্গতকারীদের মধ্যে ঢুলি প্রধান। অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গতকারীদের মধ্যে রয়েছে কাঁসিবাদক, বাঁশিবাদক, বেহালাবাদক, দোতারাবাদক, হারমোনিয়াম-বাদক প্রমুখ। কমবেশি দশ জন সদস্য নিয়ে এক একটি দল গঠিত হয়।

বিভিন্ন অনুষঙ্গ বিবেচনা করে মনে হয়, বিশ শতকের প্রথম দিকে কবিগান বাংলাভাষী প্রায় সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং কবিগানের একটি সর্ববঙ্গীয় রূপ গড়ে ওঠে। সেই রূপের সঙ্গে পূর্ববর্তী শতাব্দীর রূপের সঙ্গে যেমন, তেমনি পরবর্তী কালের রূপের নানা রকম তফাত তৈরি হয়। তবে বিশেষভাবে যা লক্ষণীয়, তা হলো, এই সর্ববঙ্গীয় কালপর্বে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের কবিগানের প্রায় সকল অঙ্গই অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কবিগানের সংজ্ঞা প্রদান অংশে বিশ শতকের প্রথম দিকে পরিবেশিত কবিগানকে আদর্শ গণ্য করা হলো—তাতে পূর্ববর্তী কালের

কবিগান বুঝতে সুবিধা হবে; আবার একুশ শতকের কবিগান বুঝতেও অসুবিধা হবে না।

আলোচ্য কালপর্বের কবিগানকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। প্রথম ভাগে থাকে প্রতিযোগিতাহীন গান—যার মধ্যে রয়েছে বন্দনা জাতীয় ডাক, মালশি, ভবানীবিষয়, আগমনী, গৌরবন্দনা, দেশবন্দনা প্রভৃতি নামের গান, এবং কালনির্দেশক ভোর, গোষ্ঠ প্রভৃতি নামের গান। দ্বিতীয় ভাগে থাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা—যার মধ্যে রয়েছে সখীসংবাদ, বিরহ, বসন্ত, কবি বা লহর কবি প্রভৃতি শ্রেণির গান। এই দ্বিতীয় ভাগের গানের অভ্যন্তরে প্রশ্ন থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে সেইসব প্রশ্নের জবাব রচনা করে প্রতিপক্ষকে তা পরিবেশন করতে হয়। তৃতীয় ভাগে থাকে মূল পর্ব—এই পর্বে টপ্পা জাতীয় গানের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বপূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রে কবিয়ালদ্বয় নিজেদের আরোপিত করান এবং ধুয়া গান ও ছড়া কাটা বা পাঁচালির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তাঁরা প্রশ্নোত্তর বা বিতর্ক চালিয়ে যান। সবশেষ ভাগটি হলো বিরোধ-মিলনাত্মক জোটের পাল্লা, জোটক বা মিলনগীতি—এই অংশে কবিয়ালদ্বয় সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছড়া কাটার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক চালিয়ে যান।

প্রথমে একটি দল আসরে দাঁড়িয়ে আসর-বন্দনা রূপে পূর্বরচিত একটি 'ডাক' বা সমজাতীয় গান দিয়ে কবিগানের সূচনা করে। এ সময়ে সাধারণত একাধিক দোহার আসরে দাঁড়ান এবং দোহারগণ কমপক্ষে একবার করে প্রত্যেকে প্রতিটি কলি গেয়ে থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই এইসব ডাক গান দোহারদের মুখস্থ থাকে। তাই ডাক গান গাওয়ার সময়ে কবিয়ালকে আসরে না দাঁড়ালে চলে। তবে ডাক গানটি দোহারদের মুখস্থ না থাকলে অথবা একেবারেই নতুন গান হলে কবিয়াল আসরে উঠে পর্যায়ক্রমে দোহারদের পেছনে দাঁড়িয়ে গানের কথা বলে দেন এবং দোহারগণ তাতে সুরসংযোগ করে পরিবেশন করেন।

ডাক গান পরিবেশনের পর প্রায় একই নিয়মে একটি মালশি গান পরিবেশন করা হয়। মালশি গানগুলো ডাক গানের চেয়ে দীর্ঘতর হয়। এই গান পরিবেশনের সময়ে কবিয়ালকে দোহারদের পেছনে দাঁড়াতে হয় এবং গানের কলি বলে দিতে হয়। পূর্বনির্ধারিত সুরে দোহারগণ তা পরিবেশন করেন। তাছাড়া কলিগুলো উচ্চারণের ঝোঁক ও ভঙ্গি থেকে দোহারগণ সংশ্লিষ্ট কলির সুর বুঝে নেন।

প্রথম দলের ডাক গান ও মালশি গান গাওয়া শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয় দল আসরে আসে এবং একইভাবে প্রথমে একটি ডাক গান এবং পরে একটি মালশি গান পরিবেশন করে। কোনো কোনো অঞ্চলে ডাক ও মালশি গান গাওয়ার পর কালনির্দেশক ভোর, গোষ্ঠ প্রভৃতি নামের গান পরিবেশিত হয়। মালশি গানের মতো এগুলো প্রশ্নোত্তরমূলক নয়। তাই প্রথম দল এ ধরনের গান পরিবেশন করলে দ্বিতীয় দলকে প্রায় অনুরূপ গান পরিবেশন না করলেও চলে।

এই ভাগ শেষ হতে না হতেই কবিগানের প্রতিযোগিতামূলক মূল ভাগ শুরু হয়। প্রথম দলের কবিয়াল প্রথমে দোহারদের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সখীসংবাদ পর্যায়ের

একটি চাপান গান পরিবেশন করেন। এই গানের কথাবস্তু এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, যাতে রাধা অথবা কৃষ্ণ সখীদের প্রতি অথবা বিপরীতভাবে সখীরা রাধা বা কৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ বা প্রশ্ন করে। দ্বিতীয় দলের কবিয়ালকে এইসব অভিযোগ বা প্রশ্নের জবাব সংবলিত কথাবস্তু দিয়ে গান রচনা করে পরের আসরে পরিবেশন করতে হয়।

দ্বিতীয় কবিয়াল সখীসংবাদের জবাব পরিবেশন করার পরে সাধারণত প্রথম কবিয়ালের উদ্দেশে আর একটি চাপান গান পরিবেশন করে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই চাপান গানের নাম 'কবি' বা 'লহর কবি', যা পৌরাণিক থেকে শুরু করে সমকালীন যে কোনো দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে রচিত হয়ে থাকে। পরবর্তী আসরে প্রথম কবিয়ালকে এই গানের জবাব-গান পরিবেশন করতে হয়।

সখীসংবাদ ও কবি নামক গান পরিবেশনের পরে শুরু হয় কবির টপ্পা ও পাঁচালি ভাগ। প্রথম কবিয়াল 'কবি' গানের জবাব-গান শেষ করার পরপরই একটি টপ্পা গান পরিবেশন করেন। এই টপ্পা গানের মাধ্যমে কবিয়াল কোনো একটি চরিত্রে নিজেকে এবং দ্বিতীয় কবিয়ালকে তাঁর বিপরীতধর্মী একটি চরিত্রে আরোপ করান। টপ্পা গানের শেষ অংশে থাকে দ্বিতীয় কবিয়ালের প্রতি এক বা একাধিক প্রশ্ন। টপ্পা গানটি গাওয়া শেষ হওয়ামাত্র দোহারগণ আসরে বসে পড়েন। প্রথম কবিয়াল তখন একা দাঁড়িয়ে প্রথমে একটি ধুয়া বা ধুয়া গান পরিবেশন করেন। পরে ধুয়ার সুরে বা ধুয়া গানের চিতানের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছড়ার আকারে প্রথমে আসর-বন্দনা করেন এবং পরে টপ্পায় উপস্থাপিত বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এই জাতীয় ছড়াকাটার নাম পাঁচালি। পাঁচালির মধ্যে আরো এক বা একাধিক ধুয়া গান গেয়ে ছড়ার ছন্দের পরিবর্তন করে উপস্থাপনার সুরে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর যাই হোক না কেন, পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদীই হয় পাঁচালির ছন্দবন্ধ।

প্রথম কবিয়ালের আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কবিয়াল আসরে দাঁড়িয়ে প্রায় অভিন্নভাবে টপ্পা পরিবেশন করেন। টপ্পা শেষ করে তিনিও পূর্ববর্তী কবিয়ালের মতো একটি ধুয়া গান গেয়ে পাঁচালির মধ্যে প্রবেশ করেন। পাঁচালির মাধ্যমেই তিনি পূর্ববর্তী কবিয়ালের প্রশ্নের জবাব দেন, ভিন্নমত থাকলে তা ব্যক্ত করেন, নতুন বিতর্কের অবতারণা করেন, আবার কখনো নতুন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রথম কবিয়ালকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক আসরে পাঁচালি অংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের আসরে পুনরায় কোনো টপ্পার দরকার হয় না। কবিয়ালদ্বয় আসরে এসেই ধুয়া বা ধুয়া গানের সুরে পাঁচালি চালিয়ে যেতে থাকেন। কবিয়ালদের এই আসা-যাওয়ার এক পর্যায়ে যখন গান শেষ করার তাগিদ আসে, তখন যে কবিয়াল আসরে থাকেন তাঁকেই জোটের পাল্লা নামক অন্ত্য ভাগের সূচনা করতে হয়।

সাধারণত একটি ধুয়া বা ধুয়া গান দিয়ে জোটের পাল্লা অংশ সূচিত হয়ে থাকে। ধুয়ার কলি বা কোনো ধুয়া গানের একটি চিতান (স্থায়ী) গাওয়া শেষ হতে না হতেই উভয় কবিয়াল আসরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হন। এক্ষেত্রে প্রথম জন নির্দিষ্ট সুর-তালের পাঁচালির মাধ্যমে দ্বিতীয় সরকারকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, দ্বিতীয় জন

একইভাবে প্রথম জনের প্রশ্নের জবাব দেন এবং/অথবা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। এই পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর ও ছড়াকাটার লয় ক্রমে দ্রুততর হতে থাকে এবং অবশেষে কবিগানের সমাপ্তি ঘটে।

এই পর্যায়বিন্যাসে উল্লেখ-করা কবিগানের অঙ্গসমূহের (ডাক-মালশি থেকে জোটের পাল্লা পর্যন্ত) পরিচয় দান করা দরকার, তাতে কবিগানের সামগ্রিকতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টতা পাবে। এই বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক অঙ্গসমূহকে একে একে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো।

ডাক

কবিগানের সূচনা-সঙ্গীত হলো ডাক গান। এই গান কোথাও কোথাও ডাকসুর, বন্দনা, ও নান্দী নামে পরিচিত। বিশ শতকের সূচনায় কবিগান সাধারণত গভীর রাত বা ভোর রাতে শুরু হতো। ডাক গানের উচ্চ সুর বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের সঙ্গে মিলে যে উচ্চরব সৃষ্টি করে, কবিগানের আসরে তা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। এভাবে ডেকে আনার কাজ করার মধ্য দিয়ে ডাক গান তার নামকরণের সার্থকতা পায়। ডাক গান সাধারণত চিতান এবং অন্তরা—এই দুই তুক দিয়ে তৈরি। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে 'অন্তরা' নামের তুক 'ঝুমুর ' নামে এবং বাগেরহাট অঞ্চলে 'অন্তরা' নামের তুক 'চালক' নামেও চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রতিটি তুকে যে কয়টি চরণ থাকে, তার প্রতিটির শেষ ধ্বনিতে মিল থাকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ গানটির অন্ত্যমিল দুই ধরনের: একজাতীয় মিল চিতানের চরণগুলির শেষের মিল, আর একজাতীয় মিল অন্তরার প্রতিটি চরণের শেষের মিল। উনিশ শতকের দিকে এই গানগুলো স্বল্পপরিসর ছিলো, বিশ শতক নাগাদ তা দীর্ঘতর হয়ে উঠতে থাকে। যেমন উনিশ শতকে রচিত কলকাতার চিন্তামণি ময়রা রচিত এই গানটি:

> জয়ন্তী মঙ্গলা জয়া তুমি গো যোগেশ্বরী যোগাদ্যে।
> ত্রিতাপহারিণী ত্রিগুণধারিণী ত্রিদিবারাধ্যে ॥
>
> তুমি তারা পরাৎপরা কঙ্কালী কালরূপধরা
> অসীতে রূপধারিণী তন্ত্রে মন্ত্রে অধিষ্ঠাত্রী শিবানী।
> বিশ্বজয়ী বিশ্বরূপ দৈত্যদল দুর্গারূপ
> (আবার) কমলে-কামিনী রূপ হও গো জননী ॥[১]

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় বিশ শতকে রচিত বাগেরহাটের কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের এই ডাক গানটি:

> বিভু তুমি সর্বাধার, সাকার নিরাকার যিশু আল্লা বুদ্ধ হরি।

---

[১] সংকলিত, নিরঞ্জন অধিকারী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৮), পৃ. ২৮০।

অনন্ত ভাবেতে ভাবিতে ভাবিতে জন্মিয়া যেন মরি।
আমি ক্ষুদ্র সংস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ করি ॥
তুমি অনাদির আদি অনন্ত উপাধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত ঔষধি।
অনন্ত নদী অনন্ত জলধি, তাতে অনন্ত লহরি।
আমার প্রাণটি লও মিলায়ে অনন্ত নিলয়ে যেন সর্বত্রনেত্র তোমায় হেরি ॥
তুমি শিবলিঙ্গ, শালগ্রামের প্রস্তর, অশ্বত্থ তুলসী বৃক্ষ রূপ ধরো।
কালী কৃষ্ণ রবি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, তুমি গজানন গৌরী।
তুমি সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধু বলবো কেন গৌরহরি ॥

চিন্ময় মৃন্ময় তুমি হিরণ্ময়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার জয় জয় জয়।
তুমি অসীম সসীম এক অনন্ত সর্ব সমন্বয়।
তুমি দেশকালপাত্রভেদে কোরান বাইবেল বেদে ধর্ম প্রচারিছ দয়াময়।
তুমি সকলের সকল, আবার কারো কিছু নয় ॥
তুমি জটিল কুটিল সরল, স্বর্গ-নরক, সুধা-গরল, এই যেন সদা মনে রয়।[২]

ডাক গানের সুর অনেক সময়ে রাগ-রাগিণী নির্ভর হয়। যেমন রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর গানগুলোকে ইমন-কল্যাণী, কল্যাণী, কামোদ, ঝিঁঝিট, ঝিঝিট খাম্বাজ, পঞ্চম, বিভাস, মালসী, লগনী প্রভৃতি রাগিণীতে পরিবেশন করতেন। ডাক গানের তাল চিতান তুকের জন্য এক রকম এবং অন্তরা তুকের জন্য এক রকম। যেমন চিতান যদি আড়খেমটা তালে হয়, অন্তরা হয় কাহারবায়; চিতান যদি হয় কাশ্মীরি তালে, অন্তরা হয় ঠুংরি বা তেলেনায়; চিতান যদি কাওয়ালিতে হয়, অন্তরা হয় তেলেনায়; চিতান যদি কাহারবা বা মাস্টার আড়ায় হয়, অন্তরা হয় তেলেনায়; আবার চিতান যদি আড়খেমটা বা একতালায় হয়, অন্তরা হয় ঠুংরিতে বা কাওয়ালিতে।[৩]

'ডাক' শব্দের অর্থ আহ্বান। এই জাতীয় গানের কথাবস্তুতে আরাধ্যের প্রতি আহ্বানমূলক বা আবাহনমূলক বাক্য থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালী অথবা দুর্গা এই গানের আরাধ্য।[৪] তবে বিশ শতকের সূচনায় অন্যান্য আরাধ্য দেবদেবীকে নিয়ে এবং কখনো কখনো ঈশ্বরকে নিয়েও ডাক গান রচিত হয়। উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় ডাক গানটি এর উদাহরণ।

---

[২] সংকলিত, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৪৬।

[৩] রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ডাক গানগুলোর রাগ এবং তালের নাম নির্দেশ করতেন। দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ২৫–৩৮।

[৪] নমুনা অংশে উদ্ধৃত গানগুলোর অধিকাংশই কালীবন্দনা বিষয়ক।

মালশি

মালশি গান কবিগানের আর এক ধরনের সূচনা সঙ্গীত। ডাক গানের পর এই গান পরিবেশিত হয়। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের ভবানীবিষয় এবং বিজয়া নামের গানগুলো ক্রমে মালশি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। 'মালশি' শব্দটি মালব বা মালবশ্রী শব্দের অপভ্রংশ হওয়া সম্ভব। তাই এমন অনুমান করা চলে যে, উনিশ শতকের কোনো এক পর্যায়ে এই শ্রেণির গান ব্যাপকভাবে মালব বা মালবশ্রী রাগে গীত হতো এবং তার ফলে রাগটির নামের অনুসরণে গানগুলো মালশি নামে পরিচিতি পায়। নিম্নে গোপালগঞ্জের কবিয়াল মনোহর সরকারের একটি মালশি উদ্ধৃত করা হলো:

চিতান	তারা জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে মা তোর কোলে পেলাম কতো সুখ।
পাড়ন	কতো সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, শান্তির কুটির পেয়েছি মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ ॥
১ম ফুকার	মাগো বাল্য আর যৌবনারম্ভে ছিলাম মা তোর কোলে শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে কোলছাড়া করিলে। আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে বসবো মা তোর কোলের পরে আধো আধো মধুর স্বরে আর কি ডাকবো মা বোল বলে ॥
মিশ	আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপানেত্রে এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ভুলে গেলি পুত্রস্নেহ।
মুখ	এতো ভালোবাসি তারা তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণ জরা করলি আমার দেহ ॥
প্যাঁচ	আমার ভোলা পিতার মন ভুলায়ে রাখলি ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে করলি আমায় সৃষ্টি মা তোর বুকের দুগ্ধ পান করালি করে শুভদৃষ্টি। যখনেতে প্রসবিলে আকাশের চাঁদ হাতে পেলে এমন মমতা দূরে ফেলে জ্বেলে দিলে ত্রিতাপ দাহ ॥
মুখ	এতো ভালোবাসি তারা তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণ জরা করলি আমার দেহ।
খোচ	মা বিনে সন্তানের মায়া আর কি বোঝে কেহ ॥
২য় ফুকার	আমায় যখন যেভাবে রাখিস তাতেই থাকি রাজি আমার আর কোনো ধন নাই মা সম্বল, চরণমাত্র পুঁজি। তোমার মোহমায়ায় পড়ে ধরা, বাহ্যচিন্তায় আত্মহারা এখন দেখি সবই তারা তোরই ভোজের বাজি ॥

মিশ	আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপানেত্রে এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ভুলে গেলি পুত্রস্নেহ।
মুখ	এতো ভালোবাসি তারা তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণ জরা করলি আমার দেহ ॥
অন্তরা	পুত্রের প্রতি বাদানুবাদ, এই বিসম্বাদ তারা তোর অন্তরে। যদি এতো ছিলো মনে প্রসবের দিনে মারলি না কেন সূতিকাগারে। ভেক ভুজঙ্গের মাতা যেমন প্রসবিয়া করে গ্রহণ সেই স্বভাব করেছিস ধারণ এতো দিনের পরে। থাকতে মাতা বর্তমানে, পুত্র মরলো প্রাণে মা বলে কে ডাকবে তোরে ॥
পরচিতান পরপাড়ন	আমার সংসারের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত। এখন কি খেলা মা খেলেছিস, পূর্বের মায়া ভুলেছিস সেজেছিস মা বিমাতার মতো ॥
শেষ ফুকার	ও তুই পাষাণীর কন্যা ঈশানী পাষাণীর জঠরে ও তোর পাষাণ প্রাণে পুত্রের মায়া বুঝবে কেমন করে। করে পঞ্চভূতে ভূতের কাণ্ড দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড বাপকে দিলি ছাগের মুণ্ড, তুই আর খাতির করবি কারে ॥
ছুট্টি	আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপানেত্রে এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ভুলে গেলি পুত্রস্নেহ ॥[৫]

সাধারণত ডাক গান পরিবেশনের পরপরই মালশি গান পরিবেশিত হয় বলে এবং অভিন্ন আসরে অভিন্ন দোহারগণ একটা শেষ হওয়ামাত্র অন্যটা শুরু করেন বলে, কবিগানের শ্রোতাদের নিকটে গান দুটো একত্রে ডাক-মালশি নামে পরিচিত হতে শুরু করে। ডাক ও মালশি গানের মধ্যে বিষয় ও উপস্থাপনগত একাধিক সাদৃশ্য তার কারণ। প্রথমত, উভয় গানই সাধারণত আদ্যাশক্তিকে নিয়ে এবং তাঁর উদ্দেশে গাওয়া হয়; দ্বিতীয়ত, এইসব গানের কোনো চাপান-উতোর হয় না। উভয় দলকেই ডাক ও মালশি পরিবেশন করতে হয়। কোন দল কী ধরনের ডাক ও কী ধরনের মালশি পরিবেশন করবে, দলপ্রধান বা দলের সরকার তা নির্ধারণ করে থাকেন।

---

[৫] সংকলিত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*, পৃ. ১০৬। স্বরূপেন্দু সরকারের সংগ্রহ থেকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তুক-নামগুলোতে স্বরূপেন্দু সরকারের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

মালশি গানের তুক বা স্তবকসংখ্যা কমবেশি ১২টি। সাধারণত এগুলোর ক্রম নিম্নরূপ : চিতান (ধরন ও পাড়ন), ফুকার, মিল বা মিশ, মুখ, প্যাঁচ বা ডাইনা, খোচ বা খাদ, ২য় ফুকার, ২য় মিশ বা মিল, অন্তরা, পরচিতান, ৩য় ফুকার, শেষ মিশ বা ছুট্টি। কোথাও কোথাও ছুট্টির পরেও মুখ গাওয়ার রীতি রয়েছে। ডাক গান ও ধুয়া গান ছাড়া মালশি গানের এই গঠন কবিগানের অন্য সব গানের স্তবক-বিন্যাসের অনুরূপ।

কালী বা দুর্গা উভয় দেবীর উদ্দেশে মালশি গান রচিত হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে কখনো কখনো শুধু কালীবিষয়ক গানকে মালশি গান এবং দুর্গাবিষয়ক গানকে ভবানীবিষয় গান বলা হলেও বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ উভয় ধরনের গান মালশি গান নামে পরিচিতি পায়। এ সময় থেকে দুর্গাপূজার ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বা বিজয়া উপলক্ষে রচিত গানকে বলা হতে থাকে যথাক্রমে ষষ্ঠী পূজার মালশি, সপ্তমী পূজার মালশি, অষ্টমী পূজার মালশি, নবমী পূজার মালশি, বা বিজয়ার মালশি। এক সময়ে দুর্গা বা ভবানীবিষয়ক এই গানগুলো প্রধানত আগমনী ও বিজয়া—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো।

কালী বা দুর্গাতে নিবেদিত হলেও এই গানগুলোর মূল বক্তব্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। আঠারো-উনিশ শতকে এই শ্রেণির গানে আদ্যাশক্তির প্রতি গায়কের নানা ধরনের প্রার্থনা ও আকুতি, অভিযোগ ও অভিমান, মহিমা ও গুণকীর্তন স্থান পেতো। কিন্তু বিশ শতক নাগাদ গানগুলোর কথাবস্তুতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে। কখনো কখনো দুর্গা বা কালীর একটু-আধটু উল্লেখ থাকলেও দেখা যায় সমকালীন রাজনীতি, আর্থসামাজিক অবস্থা, দৈব-দুর্বিপাক, ঘটনা-দুর্ঘটনা, জনপ্রিয় ব্যক্তির কীর্তি বা অপকীর্তি প্রভৃতি বিষয় গানগুলোর কথাবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

কবিয়ালগণ তাঁদের অভিন্ন মালশি গান একাধিক আসরে পরিবেশনের সুযোগ পান বলে এবং অনেক মালশি গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণে মালশি গানগুলোর অলিখিত কিছু শিরোনাম সৃষ্টি হয়ে যায়। এ পর্যন্ত কবিগানের যতোগুলো সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, অভিন্ন কারণে শিরোনামসহ সেগুলো মুদ্রিত হতে দেখা যায়। যেমন—সমাজচিত্রের মালশি, বার্ধক্যের মালশি, দুর্ভিক্ষের মালশি, যুদ্ধের মালশি, ভাওয়াল কুমারের মালশি, ইংরেজি শিক্ষার মালশি, কলির মালশি, বিপ্লবের মালশি, সাম্যবাদের মালশি, রকেটের মালশি, আগমনীর মালশি, বিজয়ার মালশি, প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মালশি, দেহতত্ত্বের মালশি, অন্নকষ্টের মালশি, বঙ্গমাতার মালশি ইত্যাদি।

দুর্গাপূজা বিষয়ক মালশি গানগুলোতে প্রায়ই মানবিক একটি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে, তা হলো: বৎসরান্তে কন্যার পিতৃগৃহে আগমন এবং পিতৃগৃহ থেকে কন্যার প্রস্থানের আনন্দ ও বেদনা।[৬]

---

[৬] বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বগুড়া অঞ্চলে এক ধরনের মালশি গান চালু ছিলো। তবে সেই গানের গঠনের সঙ্গে কবিগানের মালশি গানের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভোর-গোষ্ঠ

গঠন ও উপস্থাপনগত দিক দিয়ে ভোর ও গোষ্ঠ নামাঙ্কিত গানগুলো মালশি গানের অনুরূপ। মালশি গানের মতো এগুলোও একতরফা গান। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এ ধরনের কোনো গান পরিবেশন করলেও দ্বিতীয় পক্ষকে তার পাল্টা গান গাওয়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না। একমাত্র বিষয়বস্তুগত তফাত থাকার কারণে গানগুলো মালশি গানের থেকে আলাদা নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। মালশি গানের বিষয় যেমন শাক্ত, তেমনি ভোর ও গোষ্ঠ গানের বিষয় বৈষ্ণবীয়। ভোর নামে পরিচিত গানগুলোতে সাধারণত রাধাকৃষ্ণের মিলন, বিরহ, বিলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থান পায়; অন্যদিকে গোষ্ঠ নামে পরিচিত গানগুলোতে সাধারণত রাখালদের সঙ্গে কৃষ্ণের গোচারণ এবং কৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার স্নেহের বিষয় প্রাধান্য পায়। কোনো কোনো ভোর-গোষ্ঠ গান চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে, আবার কখনো তা রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। বিশ শতকের একাধিক কবিয়াল পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে সমকালীন বিষয় নিয়ে ভোর নামের গান পরিবেশন করেন। উদাহরণ হিসেবে নরসিংদীর হরিচরণ আচার্যের 'স্বদেশি ভোর' নামের গানটির কথা স্মরণ করা যায়। সঙ্গত কারণে সেখানে পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর বিরহ-মিলনের পরিবর্তে ব্রিটিশ-বিরোধিতা ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা মুখ্য হয়ে ওঠে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

চিতান	গেলো ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায়।
পাড়ন	ঘোর বিলাসী শশী, শশী মুখে মেখে মসী নিশি অন্তে অস্তাচলে যায় ॥
১ম ফুকার	উষা ভক্তি নবশক্তি ভারতে উদিল, অসার আমোদ কুমুদ মুদিল ছুটল জ্ঞান সরোজের কি সুগন্ধ উঠল সূর্য সদানন্দ যতো ভারতের পাপ-পেচক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা লুকালো ॥
মিশ	তোমরা জন্মেছ স্বর্গতুল্য ভারতভূমে কুম্ভকর্ণের ন্যায় এতো ঘুমে বলো কতো রবে।
মুখ	জাগো ভারতবাসী, স্মরণ করো আর্য ঋষি, কার্যক্ষেত্রে চলো সবে ॥
প্যাঁচ	ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভ্রাতৃবর্গ শিখ ধ্যানের নিয়ম জপো অন্তরে মূল মন্ত্র—বন্দে মাতরম্ ফুল তুলে নানা জাতি জ্বালো ধূপ ও ঘৃতের বাতি ভারতমাতার মঙ্গল আরতি করো ভক্তিভাবে।
খোচ	যতো কর্মী সব কর্ম করো ধর্ম লোভে ॥
২য় ফুকার	পড়ো ছাত্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড়ো স্মৃতি বেদ ছাড়ো অন্য বিদ্যা অসার ক্লেদ ছাড়ো এন্ট্রান্স এলএ বিএ এমএ, প্রণাম দাও গোলামির নামে।

	আছে গীতা ভাগবত ভারতভূমে, জ্যোতির্বেদের অঙ্গ আয়ুর্বেদ ॥
মিশ	কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ করো সংস্কৃত টৌল অলকৃত করো অকৈতবে।
খোচ	যতো কর্মী সব কর্ম করো ধর্ম লোভে ॥
অন্তরা	জাগো পৃথিবীর যতো কর্মবীর, স্থির করো নন-কোপারেশন। প্রাতঃস্নান করে দেশি বস্ত্র পরে পবিত্র করো অন্তঃকরণ। ভোরে পড়ো নিতাইগৌরাঙ্গচরিত কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করলো দেশের হিত। যৌবনে যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী স্মরো সেসব কুললক্ষ্মীগণ ॥
পরচিতান	ছাড়ো অলসতা বিলাসিতা উঠো ভ্রাতৃগণ।
পরপাড়ন	মাতৃস্নেহ পাবে কর্ম করো ধর্ম ভেবে আর কতোকাল রবে অচেতন ॥
শেষ ফুকার	ছাড়ো হিংসা দ্বেষ জাগাও নিজের দেশ দেশের দেশিগণ। হবে দুর্দিনের পরিবর্তন। ছেড়ে প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা সত্যধর্মে রাখো নিষ্ঠা কিন্তু সকল ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম নামসংকীর্তন ॥
ছুট্টি	পাবে সদাত্মা মহাত্মাদের সৎ সাহায্য অসার ভোগ ত্যেজে ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চলো সবে ॥[৭]

সখীসংবাদ

কবিগানের অন্যতম প্রধান অংশ সখীসংবাদ। এর গঠন কাঠামো মালশি গানের অনুরূপ। কবিগানের এই অংশ থেকে কবিগানের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এক দল আসরে এসে এই ধরনের একটি গান পরিবেশন করলে অন্য দলকে আসরে এসে তার জবাব রচনা করে গাইতে হয়। পুরোপুরিভাবে রাধাকৃষ্ণভিত্তিক এই গানে প্রায় ক্ষেত্রে রাধা বা কৃষ্ণ তার সখীদের নিকটে অথবা সখীদের মাধ্যমে রাধা বা কৃষ্ণ পরস্পরের নিকট ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে বলে গানগুলোর নাম হয়তো এমন হয়েছে। বৈষ্ণবীয় আবহের এই গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ের অনুসরণে সখীসংবাদ গানের বিভিন্ন রকম নাম হয়, যেমন—পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপ, কলহান্তরণ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ, মাথুর, মিলন প্রভৃতি। সুবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ, বসন্ত প্রভৃতি নামের গানকেও সখীসংবাদ গানের

---

[৭] হরিচরণ আচার্য, *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড (নরসিংদী: জিতেন্দ্র কিশোর মৌলিক, ১৯২৯), পৃ. ৩০।

অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়, যদিও এসব গানে সখীর পরিবর্তে সখার উপস্থিতি স্পষ্টত লক্ষণীয়। অর্থাৎ লিঙ্গভেদ নয়, কবিগানের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলোই সখীসংবাদ নামে পরিচিত। এগুলোর মধ্যে 'বসন্ত' গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সরস্বতী পূজার আগে এই গান গাওয়ার রীতি নেই। সাধারণত বসন্ত রাগিণীতে বসন্ত গান গাইতে হয়। খুব প্রতিভাবান কবিয়াল ছাড়া এই ধরনের গান রচনা করা বা জবাব রচনা করা এবং এই গান পরিবেশন করা খুব কঠিন কাজ। রাধাকৃষ্ণের কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক না থেকেও অনেক গান সখীসংবাদ হিসেবে পরিচিতি পায়। রাজেন্দ্রনাথ সরকারসহ একাধিক কবিয়ালের 'জানকীর ফুলসজ্জা' নামের সখীসংবাদ এর উজ্জ্বল উদাহরণ। শেষোক্ত সখীসংবাদটি মতুয়া সম্প্রদায়ের মিথ অনুযায়ী রচিত। নিম্নে নিশিকান্ত সরকারের একটি সখীসংবাদ এবং তার জবাব উদ্ধৃত করা হলো:

নিশিকান্ত সরকারের 'মানযোগী' শীর্ষক সখীসংবাদ

চিতান করে চন্দ্রার বাড়ি লীলাসাঙ্গ যোগী সেজে শ্যাম ত্রিভঙ্গ
প্রভাতে মানকুঞ্জে উদয়।
পাড়ন দেখে নূতন যোগী বিষয়ত্যাগী লম্পট গোবিন্দে
দুঃখে দূতী বৃন্দে ব্যঙ্গ করি কয় ॥

১ম ফুকার তোমার ভিতর কালা বাইরে রাঙা ঠিক যেন দেখিতে মাকাল।
যেমন ধুলা মেখে সাজে সাধু মাঠের গো-রাখাল।
দেশগাঁয়ে সাধু কোলায়, না বাঁচলে পেটের জ্বালায়
যেমন দায়ে ঠেকিলে চিঁড়ের ছালায় পাছে হয় বৈরাগী নাকাল ॥

মিশ সাধুর কোন দেশে ধাম, ধরো কী নাম, কী মনে ক'রে
এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশি ভোরে কও দেখি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে।
মুখ আজি পূর্ণিমার নিশি কোন আশ্রমে উপবাসী রজনী কাটে ॥

প্যাঁচ ভবে যোগীগণের শুদ্ধমতি, যোগবলে মুখে ফোটে ব্রহ্মজ্যোতি
তোমার সে চিহ্ন নাই মোটে।
কতো ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে লক্ষ পক্ব বিম্ব ঠোঁটে।
ভালে নাই চন্দনের ফোঁটা, সিন্দূরের তিলক কাটা
একি রুচি সাধুর রূপের ছটা, কলঙ্কী চাঁদ লোটায় মাথা কুটে।
মিশ দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে ॥

২য় ফুকার পরে যোগীগণে গৈরিক বস্ত্র তোমার তো দেখি না তেমন
তুমি কোন আশ্রমের নীলকাপুড়ে সাধু মহাজন।
করেতে নাই কোদণ্ড, আছে এক বাঁশের খণ্ড
পেয়ে দুর্দিনে কোন দুর্দণ্ড করেছে সর্বস্ব হরণ ॥

মিশ তোমার দশা দেখে কষাঘাতে অন্তরে জাগে

	বুঝি পড়েছো কি কর্মভোগে, করিলে মাথামুণ্ডন দোষ কাটে।
মুখ	আজি পূর্ণিমার নিশি কোন আশ্রমে উপবাসী রজনী কাটে ॥
অন্তরা	থাকিতে ভোগবিলাস ভক্তদাস, কি আশে সন্ন্যাসে দিয়েছো মন। কিসের অপরাধে বেড়াও কেঁদে গো হয়েছে সুধাহীন বিধুবদন। দিয়ে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান ঘোরো দেশবিদেশ যেমন আঠা-মাখা জটাধারী ঈশান ব্যোমকেশ। তোমায় মানায়েছে বেশ। তোমার এই বৈরাগ্যের বিধিনির্দেশ গো আছে কি পুনর্বার গৃহে গমন ॥
পরচিতান	যেন বিষের কুম্ভ দুগ্ধে ঘেরা তেমনি তোমার এই চেহারা। ঠিক যেন বিষামৃতময়।
পরপাড়ন	কেন ভোজের বাজি দেখাও আজ ব্রজগোপীকে এসব দৃশ্য দেখে ঘোচে না সংশয় ॥
শেষ ফুকার	তাকাও আড় নয়নে সবার পানে, মনে হয় তোমাকে দেখিলে। যেমন উপবাসী বকতপস্বী সরসী সলিলে। ঠারো চোখের আড়াল থেকে সাজিয়ে ময়ূর পাখে যদি কাক পড়ে স্বজাতির ঝাঁকে, ঠোকর আর নখের আঁচড় মিলে ॥
ছুট্টি	সাধুর কোন দেশে ধাম, ধরো কী নাম, কী মনে ক'রে এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশি ভোরে কও দেখি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে ॥

নিশিকান্ত সরকারের এই 'মানযোগী' শীর্ষক সখীসংবাদের নকুলেশ্বর সরকার কৃত জবাব নিম্নরূপ:

চিতান	তখন বৃন্দার মুখে নিন্দা শুনে রাগে রাগে শীগোবিন্দ কয়।
পাড়ন	ও তুই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলি তক্ষকের মতো অযুক্তি যতো করলি অভিনয় ॥
১ম ফুকার	যেদিন শ্রীরাধিকার দুর্জয় মানে পায় না শ্যাম মানসাগরে কুল। বৃন্দা ভেলা সমতুল। যোগী সাজায়ে তারে আনিলেন কুঞ্জের দ্বারে এখন সেই বৃন্দা চিনে না তারে, কবির এই কল্পনাই ভুল ॥
২য় ফুকার	ও তুই রাধার মন ভাঙ্গিবার ছলে আমাকে যোগী সাজালি কতো সান্ত্বনা দিলি। রাইকে কও মান করিতে আমায় কও পায়ে ধরিতে যেমন আগুন দিয়ে খড়কুটাতে পেতনি তুই সরে দাঁড়ালি।

মিশ ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগীর সাজ
সাজের ভালো মন্দ বেশকারীর কাজ
আমি কি নিজের হাতে সেজেছি।
মুখ বৃন্দা তুই করে ছলা দিলি আচলাঝোলা হাড়ের মালা
তাইতো পরেছি ॥

প্যাঁচ বললে কাইল গিয়েছে পৌর্ণমাসী, কার কুঞ্জে ছিলাম উপবাসী
এ কথা বলো অকারণ।
আমি উপবাসী থাকবো কেন থাকতে আয়োজন।
আমি শেষ করে গোষ্ঠখেলা আসিতে সন্ধ্যাবেলা
দেখা চন্দ্রার বাড়ি সাধুর মেলা সেখানে মহাপ্রসাদ পেয়েছি।
মিশ দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে ॥

৩য় ফুকার বললে, দায় ঠেকে বৈরাগী নাছাড়, স্বীকার হই বৃন্দে রূপসী।
ঠেকে হলেম সন্ন্যাসী।
তুই পারো দায় ঠেকাতে, তুই পারো দায় মেটাতে
এসব কুটিল বিদ্যায় এ জগতে বৃন্দা তুই নারদের মাসী ॥

৪র্থ ফুকার বললে, নাই তোমার করঙ্গ দণ্ড, কোন ভণ্ডে নিয়েছে লুটি
তুই এই কুচক্রের ঘুঁটি।
তুই যখন নিজের করে যোগী সাজালি মোরে
যদি সাজে কোনো অভাব পড়ে, সেটা তো বেশকারীর ত্রুটি ॥

৫ম ফুকার দিলে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, তাই শুনে হয়েছি অবাক।
ও তুই বক সাজালি কাক।
দুর্জয় মান করলো রাধে, ধরা দেই সাধে সাধে
দিয়ে শ্রীরাধার চরণ গারদে এই চোরকে বন্দী করে রাখ ॥

ছুট্টি ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগীর সাজ
সাজের ভালো মন্দ বেশকারীর কাজ
আমি কি নিজের হাতে সেজেছি ॥[৮]

সূচনা পর্ব থেকে সখীসংবাদ কবিগানের জনপ্রিয় একটি অংশ। এই জনপ্রিয়তার কারণে অনেক সময়ে শুধু সখীসংবাদ গানই সাধারণের নিকট স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এর একটি বড়ো প্রমাণ উনিশ শতকে শেষ দিকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে

[৮] নিশিকান্ত সরকার এবং নকুলেশ্বর সরকারের গান দুটি দীনেশচন্দ্র সিংহের সংকলন থেকে নেওয়া, তবে অন্যান্য গানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে তুকনামে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*, পৃ. ৪৮২–৮৩।

প্রচলিত একটি প্রবাদ। প্রবাদটি হলো: "ঘোমটার মধ্যে সখীসংবাদ"। লম্পটের সতীপনা বোঝাতে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হতো। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর একটি রচনায় প্রবাদটি উদ্ধৃত করেন।[৯] প্রবাদটির তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এতে অন্তত এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, সখীসংবাদ নামের গানগুলো সমকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলো এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সকলে অবগত ছিলো।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো সখীসংবাদকে নির্দ্বিধায় বৈষ্ণব সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। একইভাবে অন্যান্য শ্রেণির বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকভাবে যেমন লেখকদের জীবনবোধ রাধাকৃষ্ণের উপরে আরোপিত হয়, সখীসংবাদকে তার থেকে আলাদা ভাবার কোনো কারণ নেই।

কবি বা লহর-কবি

এই শ্রেণির গান থেকে কবিগানের নামকরণ, নাকি এক সময়ে এটি কবিগানের মূল অংশ ছিলো বলে এই শ্রেণির গানের নাম কবি, তা বলা মুশকিল। সাধারণত সমকালীন বা পৌরাণিক কোনো কাহিনির উপর নির্ভর করে এই জাতীয় গান রচনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি এমনকি জড়পদার্থ পর্যন্ত এই শ্রেণির গানের বিষয় হয়ে থাকে। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, এই গানের কথা, উপস্থাপন ও সুর সবকিছুই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়।

কবিগানের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও স্থূলরুচির যেসব অভিযোগ রয়েছে, এই জাতীয় গানের বিষয়বস্তু তার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হয়। বিশেষভাবে কলকাতা পর্বে এই জাতীয় গানের চাপান ও উতোরের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আদিরসের আগমন ঘটতো। প্রসঙ্গত উনিশ শতকের কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের কবিগানের উল্লেখ করা যেতে পারে। জানা যায়, তিনি জমিদার নবকৃষ্ণ রায়ের অনুরোধে যেসব কবি রচনা করতেন, তার অধিকাংশই ছিলো জমিদার-গৃহিণীদের নিয়ে নানা ধরনের আদিরসাত্মক উক্তি ও ইঙ্গিতমূলক।[১০] পূর্ববঙ্গ পর্বে তা খানিকটা হ্রাস পেলেও, একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। জবাবসহ একটি কবি উদ্ধৃত করা হলো, মূল গানটি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের এবং এর জবাব গানটি স্বরূপেন্দু সরকারের:

বিজয়কৃষ্ণ সরকার রচিত 'বেয়াইর বিয়ের কবি'

চিতান একজন গরিব মানুষ কেশব ভুঁইয়ে
সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়ে দীনতায় হীনতায় পূর্ণ মন।

---

[৯] মীর মশাররফ হোসেন, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী,' *মশাররফ রচনা সম্ভার*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪২।

[১০] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃ. ১৬০।

পাড়ন অনেক চিন্তার পরে বুড়ো বরে কন্যা দিতে চায়
সংসারের দায় নয়শো টাকা পণ ॥

১ম ফুকার ও সেই খবর পেয়ে বর জুটলো এক কজ্জল বর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত।
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে বউ মরছে হঠাৎ।
বয়স প্রায় ষাটের উর্ধ্বে হার মেনেছে সংসার যুদ্ধে
ভোগে আম-বাত রোগে মধ্যে মধ্যে পড়ে গেছে নীচের পাটির দাঁত ॥

মিশ সেই মেয়ের বয়স চোদ্দো বছর সংবাদ পেয়ে তাই।
নিমাই বালা বরের বেয়াই বরকে দেয় মিঠেকড়া সান্ত্বনা।
মুখ বেয়াই হে করি মানা
এমন শরিকনাশা জরিমানা দিতে যেয়ো না ॥

প্যাঁচ তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক
বন্ধুবান্ধব নিন্দে তোমায় করবে অনেক
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়।
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাতো তোমায়।
ভাবে থাকিলে সমতা প্রাণে আসে মমতা
বেয়াই তোমার নাই কোনো ক্ষমতা
না বুঝে ভাবছাড়া লাফ দিয়ো না ॥
খোচ আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিয়ো না ॥

২য় ফুকার বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই।
হবে যোগে যুক্ত বিষয়মুক্ত স্বভাবে কালজয়ী।
দিনে দিনে দিন ফুরালো কাল পেয়ে কাল ঘনালো
তোমার চুল পাকিলো দাঁত পড়িলো
বেহাই তোমার তা পাকিলো কই।
মিশ মোহের উন্মাদনায় সেজেছো ভাই উন্মত্ত বারণ।
তোমায় বারে বারে করি বারণ
মরণপথে চরণ আর বাড়াইয়ো না ॥

অন্তরা তোমার এই সখের জাল সাপের মাল সাধ করে গলেতে পরিয়ো না।
তুমি যন্ত্রহারা মন্ত্রহারা গো, ভুল করে এই মরণ মরিয়ো না।
তোমার পাক চুলেতে কলপ দিয়ে কালো করলে ভাই
টাক বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থা তো নাই।
তার তো ঔষধ মেলে না।
তুমি বাহিরে যতো সাজ পরো গো
মন্ত্রের কাজ চোখ ঘুল্লিতে সারে না।
নারীর চক্র ভীষণ চক্র বোঝা খুব মুশকিল

তোমায় মুখে যেটুক ভালোবাসবে দিয়ে গোজামিল
তাতো তুমি বুঝবে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের দশা যেমন গো
পরে খায় ঘরের সব মাখন-ছানা ॥

পরচিতান যতো জ্ঞানী মানুষ ধরাতলে দেশকালপাত্র ভেদে চলে।
বেদে কয় সুপণ্ডিত তারে।

পরপাড়ন কতো বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান
তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে ॥

শেষ ফুকার কেন বার্ধক্যে ষোড়শী এনে বড়শি গলে বিঁধতে চাও।
তোমার বড়ো ছেলের বিয়ের বয়স তারে বিয়ে দাও।
সংসারের বিষম বিষে এ জ্বালা জুড়াবে কিসে
নিয়ে সৎ গুরুর সৎ পরামিশে দেশের মানুষ দেশে চলে যাও ॥

বিজয়কৃষ্ণ সরকারের এই 'বেয়াইর বিয়ের কবি'-র স্বরূপেন্দু সরকার রচিত জবাব:

চিতান বেয়াই নিমাই বালা বুদ্ধির ঢেঁকি, বল দেখি বিয়ের বুঝিস কী।

পরপাড়ন আমার টাকাপয়সা যাবে না সাথে, তাই বিয়েতে সুখ করে রাখি ॥

ফুকার তুমি বুড়া মানুষ দেখে কেন করতেছ তামাশা এতো
জানো না শক্তি মোর কতো।
শিখেছি বাণের ভজন, যৌবনশক্তি রসায়ন
বেয়াই তারও খেয়ে তিন চার ডজন
হয়েছি ঠিক যুবকের মতো ॥

মিশ বেয়াই বৃদ্ধ মানুষ দেখে কেন করছো উপহাস।
আমার গায়ে লেগে বসন্তের বাতাস
যৌবনের মৌবনে নিয়েছি ঠাঁই।
বেয়াই হে করি মানা, আমার বিয়েতে বাদ সাধিও না
বেয়ানের দোহাই ॥

প্যাঁচ আছে ইতিহাসে পুরাকালে অনেকে বিয়ে করতো বুড়াকালে
তাহাতে কম পড়তো না বল।
হতো প্রাণায়ামে আয়ু বৃদ্ধি যৌগিক ক্রিয়ার ফল।
দেখো হক সাহেব বরিশালে আশি বছরের কালে
ও তার দিব্য ছেলে জন্ম নিলে
ঈশ্বর কি আমাকে করবে না তাই ॥

খোচ	তোমার কথা শুনে আমার দুঃখের সীমা নাই ॥
২য় ফুকার	দেখো আরবে মাবিয়া ছিলো বয়স তার সাড়ে চার কুড়ি। বউ ছিলো আশি বছরের বুড়ি। তার কাছে একদিন গিয়ে এজিদকে জন্মাইয়ে দিলো এমাম বংশের মাথা খেয়ে, তার সাথে দেবো আজ আড়ি ॥
৩য় ফুকার	বললে বেয়াইর নাই কোনো ক্ষমতা, এ কথায় বড়ো ব্যথা পাই। ক্ষমতা কোনখানে দেখাই। বেয়াই মোর কথা নিয়ো আর বুঝি এসব কইয়ো। আমার বেয়ানকে পাঠায়ে দিয়ো শক্তির পরীক্ষা দিতে চাই ॥
৪র্থ ফুকার	বললে বড়ো ছেলের বিয়ের বয়স, বেয়াই তুমি তারে বিয়ে দাও। বেয়াই, এ কেমন কথা কও। ছেলে পাস করুক বিএ, তারপরে দেবো বিয়ে তারে বিএ-র আগে বিয়ে দিয়ে ছেলের কি মাথা খেতে চাও ॥
৫ম ফুকার	নীচের পাটির দাঁত পড়েছে, এ কথায় বাধালে জঞ্জাল খুলনা কি গিয়ে বরিশাল গিয়ে ডেন্টিস্টের ধারে, নতুন দাঁত দেবো জুড়ে শেষে বেয়ান যদি দর্শন করে, শেষকালে পুড়বে তোমার কপাল ॥[১১]

লহর কবি এবং কবির লহরে বিশেষ তফাত রয়েছে বলে মনে হয়। লহর কবি বলতে সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক গান বোঝানো হয়। যখন কোনো মালশির জবাবে প্রতিপক্ষের মালশি গাওয়ার প্রয়োজন হতো, তখন তাও লহর মালশি নামে পরিচিত হতো। অন্যদিকে কবির লহর মানে হলো জোটের পাল্লা, যেখানে উভয় কবিয়াল সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছড়া কেটে বিতর্ক করে থাকেন। আসলে লহর শব্দটি লড়াইয়ের সমার্থক। তাই উনিশ শতক থেকে কবিগানের একাধিক অঙ্গের সঙ্গে লহর শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে।

টপ্পা

টপ্পা বা কবির টপ্পা গানের আয়তন মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি গানের তুলনায় হ্রস্বতর। এই গানগুলো সাধারণত চারটি স্তবক বা তুকে বিন্যস্ত থাকে। স্তবকগুলো যথাক্রমে: চিতান, অন্তরা, প্যাঁচ ও মুখ। উনিশ শতকের ময়মনসিংহে স্তবকগুলোর নাম ছিলো যথাক্রমে চিতান, পারান, মিল, মহড়া, অন্তরা ও মিল। উনিশ শতকের

---

[১১] উদ্ধৃত, স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান: অতীত ও বর্তমান," *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ২১৩–১৭।

কলকাতায় টপ্পা গান নামে আলাদা এক ধরনের গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো, নামের দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন হলেও এই গানগুলো তার থেকে আলাদা। তবে কবিগানের টপ্পা অংশের নামকরণে ঐ টপ্পার প্রভাব থাকাটা বিচিত্র নয়। এমনিতেই টপ্পা শব্দের অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত।[১২] রাগসঙ্গীতে ধ্রুপদ এবং খেয়ালের থেকে সংক্ষিপ্ত বলে ঐ শ্রেণির গানকে এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাগসঙ্গীত টপ্পার তুক মাত্র দুটি: একটি স্থায়ী এবং একটি অন্তরা। কবিগানের ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতির তুলনায় কবির টপ্পাও সংক্ষিপ্ততর। এই সংক্ষিপ্ততার কারণে কবিগানের এই অংশের নাম হয়তো টপ্পা করা হয়েছে। তবে বিষয়ের দিক দিয়েও টপ্পার সঙ্গে কবির টপ্পার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। টপ্পা গানের মূল মেজাজ ছিলো 'লঘু আনন্দ ও শৃঙ্গার রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত'।[১৩] অন্যদিকে কবির টপ্পা রচিত হয় কবিয়ালদ্বয়ের তর্কযুদ্ধের সূচনাকারী বক্তব্য দিয়ে, স্বাভাবিক কারণেই যা হালকা মেজাজের হয়ে থাকে। সুরের দিক দিয়েও উভয় টপ্পার মধ্যে কমবেশি মিল থাকাটা বিচিত্র নয়। বিশ শতকের শেষার্ধে দক্ষিণবঙ্গের কবিগানগুলোতে টপ্পা গানের গঠন কেমন ছিলো, তা নিম্নোদ্ধৃত টপ্পা থেকে বোঝা যাবে। এখানে একজন কবিয়াল শোভা দেবীর ভূমিকায় এবং অন্যজন গৌরাঙ্গের ভূমিকায় পাল্লা করতে মনস্থ করলে তখন তাঁদের এভাবে টপ্পা রচনা করতে হয়:

শোভা দেবী (প্রশ্ন বা চাপান)

আমি উপেন্দ্র মিশ্রের ঘরনী শোভা দেবী নাম
বললে স্বপন মাঝে গোপীনাথ, তোমার ঘরে হবে মোর সাক্ষাৎ
ফিরিবে তোমার বরাত, পূরবে মনস্কাম ॥
ব্রজে গোপী নিয়ে যাহার খেলা, সেই নন্দলালা যদি তুমি হও
বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাকে কাঁদাইয়া কি-বা শান্তি পাও।
হাতে পড়ে শুক সারী, পড়িল যে শ্লোক চারি, এই চার শ্লোকের তাৎপর্য দেখাও।
যদি নারীরা সব নরকের দ্বার, শেষের শ্লোকে মাথায় কেন ঝাঁকি দাও।
বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাকে কাঁদাইয়া কিবা শান্তি পাও ॥

গৌরাঙ্গ (জবাব বা উতোর)

আমি শোভা দেবীর কল্পনাতে হই শচীর নন্দন।
কতো বুদ্ধি মোর ঠাকুর মাতার, যুক্তি তর্কে যেন ক্ষুরধার।
মনে হয় ঠিক ব্যারিস্টার, আইনে বিচক্ষণ।
দেখ বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাতাকে, কও দেখি কাঁদাইব কী কারণ

---

[১২] করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫). পৃ. ২৮৭।
[১৩] তদেব।

স্বকর্মের ফলে কাঁদে, প্রারব্ধ কর্ম হয় না তা খণ্ডন।
হাতে পড়ে শুক সারী পড়িল যে শ্লোক চারি বাস্তবতায় বিরুদ্ধাচরণ
আমি করতে তা পারি না বলে, মস্তকে ঝুল হয়েছে সে কারণ
স্বকর্মের ফলে কাঁদে প্রারব্ধ কর্ম হয় না তা খণ্ডন ॥[১৪]

টপ্পা বা কবির টপ্পা দিয়ে কবিগানের মূল লড়াই সূচিত হয়। ছড়া কেটে তর্কবিতর্ক করার যে দীর্ঘস্থায়ী আসরগুলো কবিগানের প্রধান অংশ, সেখানে এই ধরনের গানের মাধ্যমে কবিয়ালদ্বয় নিজেরা কোন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, তার ঘোষণা দেন। প্রায় ক্ষেত্রেই এই গানের এক বা একাধিক তুকে মূল প্রশ্ন ও জবাবের সারাংশ স্থান পায়।

সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি গানের বেড় বা চাপান অংশ পরিবেশনের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম কবিয়ালের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় বলে, সেগুলো পূর্বরচিত হতে বিশেষ কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু টপ্পাজাতীয় গানের চাপান অংশ সেই সুবিধা সব সময়ে পায় না। কারণ কবিয়ালগণ কে কার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তা আয়োজকদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কবিয়ালদের সৃজনশীলতার উপরে টপ্পার কথা অংশের মান নির্ভর করে, তা বলাই বাহুল্য। তবে কথা যাই থাক, টপ্পা গানের সুর সবক্ষেত্রে কমবেশি এক রকম।

গঠনগত কারণে টপ্পা গানের মধ্যে দুটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যে চরিত্র দুটিতে কবিয়ালদ্বয় অভিনয় ও তর্কবিতর্ক করেন। স্বাভাবিকভাবেই স্থান, কাল ও কবিয়ালভেদে এই দ্বান্দ্বিক পটভূমি ও চরিত্র বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে।

মালফুকার

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলাদেশের কোনো কোনো আসরে কমবেশি আক্রমণাত্মক অথবা ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত গান পরিবেশিত হতো, যা গঠনের দিক দিয়ে টপ্পা গানের মতো হলেও টপ্পার মতো তাতে কোনো প্রশ্ন থাকতো না। সমকালীন কোনো বিষয় বা ঘটনাকে বিদ্রূপ করতে অথবা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে এই ধরনের টপ্পা রচিত হতো। এসব টপ্পা মালফুকার, রংফুকার, লালীগান প্রভৃতি নামে পরিচিত। সাধারণত মালশি, সংখীসংবাদ বা টপ্পা-পাঁচালির প্রথমে বা শেষ দিকে এই ধরনের টপ্পা গাওয়ার রীতি ছিলো। কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে বিশেযত পদ্মার উত্তর অঞ্চলের কবিয়ালগণ উভয় ধরনের মালফুকার পরিবেশনে পটু ছিলেন। তাঁরা এটিকে 'কবির দাঁড়া'ও বলতেন। তবে দক্ষিণবঙ্গের কবিগানেও আক্রমণাত্মক মালফুকার লক্ষ করা যায়। কলকাতা পর্বের কবিগানে এই ধরনের মালফুকার 'খেউড়' বা লাল্ নামে পরিচিত ছিলো। সমকালের শ্রোতাদের একাংশ এই ধরনের গান শোনার জন্য কী ধরনের আগ্রহ

---

[১৪] উভয় অংশের রচয়িতা স্বরূপেন্দু সরকার।

প্রকাশ করতেন, সে ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতযোগ্য। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন: "বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্বক কহিল, 'হ্যাদ দেখ লেতাই, ফ্যার যদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড় গা'। নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।"[১৫] কলকাতা পর্বে আদিরসাত্মক এই 'খেউড়' গানের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে পূর্ববঙ্গ পর্বে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক (হয়তো কখনো কখনো আদিরসাত্মকও) এইসব গানে সাধারণত একটি চিতান বা একটি ফুকার বা একটিমাত্র অন্তরা গাইতে হতো। কোথাও কোথাও এইসব ফুকার জোটক বা জোটের পাল্লার কায়দায়ও পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[১৬] নিম্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি বিদ্রূপাত্মক মালফুকার এবং দক্ষিণবঙ্গের একটি আক্রমণাত্মক মালফুকার উদ্ধৃত হলো।

রামগতি শীলের বিদ্রূপাত্মক মালফুকার:

আজগবি এক কাব্যকথা, মন দিয়া শুনো সে সকল। মরি হায় রে।
আষাঢ়ে নূতন ঢলে, সিং মাগুর কৈ কাতলে বেঁধেছে একদল ॥

ঘন্যা, পুঁটা, খাদে দুটা, গজার আর ঘাগটে গায় মুলতানে।
চান্দা, চেলা, ইচা, ঘুঙ্গিয়া, মলা, খৈলা আর চিতল চিতানে।
বোয়াল, লাড়ি, বাইম, লেডি পাব্যা, এই কয়টা মৈল ভাব্যা, ধরবে কোন স্থানে।
দলের নটুয়া, কড়ি কাটুয়া, মড়ার চাটুয়া কাছিম মাঝখানে ॥[১৭]

মনোহর সরকারের আক্রমণাত্মক মালফুকার ও নকুলেশ্বর সরকারের জবাব:

মনোহর সরকার—
কুঞ্জবাবুর দল এসেছে তিনটি মেয়ে সভায় নাচে,
রূপে করে ঝলমল, ওরা মেয়ের বলে করে বল।
যে কয়েকটা পুরুষ আছে, থেকে মেয়ের পাছে পাছে

---

[১৫] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, ভবতোষ দত্ত সম্পা. (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮), পৃ. ১৮২।

[১৬] এই ধরনের একটি ঘটনার সাক্ষ্য দিয়েছেন হরিচরণ আচার্য। হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই* (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী: দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬), পৃ. ১৫–১৬।

[১৭] উদ্ধৃত, বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃ. ৫০।

ওদের পুরুষত্ব ঘুচে গেছে, সবাই বলে মেয়ে-দল।

নকুলেশ্বর সরকার—
বললি মোদের দলে মেয়ে আছে, আমরা থাকি মেয়ের পাছে
চিরদিনই মেয়ের জয়, বিশ্ব মেয়ের গুণে সৃষ্টি হয়।
গৃহ হয় গৃহিণীর জন্য, একা সেই গৃহিণী ভিন্ন
থাকতে ধনেরত্নে গৃহ পূর্ণ, তবু গৃহ শূন্য রয় ॥

বললে মেয়ে আছে মোদের দলে, আমরা চলি মেয়ের বলে
জ্ঞানের কর্তা মৃত্যুঞ্জয়, সে মেয়ের পদে শরণ লয়
শতস্কন্ধ বধের কালে, রাম চলেছেন মেয়ের বলে
সেদিন সিতা না অসিতা হলে, শতস্কন্ধ হয় না ক্ষয় ॥

বললি মোদের দলে মেয়ে আছে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচে
তাই দেখি আজ করে রোষ, বুঝি দেখালি আজ মেয়ের দোষ।
মেয়ের পেটে জন্ম পেলি, মেয়ের দুগ্ধে প্রাণ বাঁচালি
নইলে তুই কি বড়ো হয়েছিলি, চুষে বাপের ... ॥[১৮]

ধুয়া ও ধুয়া গান

কবিগানের টপ্পা গানের পরে এবং ছড়াকাটামূলক পাঁচালি অংশের মধ্যে এক ধরনের গান উভয়ের অংশের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে, এই গানের নাম ধুয়া গান। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষ কোনো সুরে একটিমাত্র কলি গেয়ে সেই কলির সুর ও তাল অনুসরণ করে কবিয়ালগণ পাঁচালি বলতেন। বিশেষ ঐ কলিটিকে তখন বলা হতো ধুয়া বা ডাক-ধুয়া বা দিশা। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পুরো একটি গান ধুয়ার জায়গা দখল করে এবং এভাবে ধুয়া তখন ধুয়া গান হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে। পাঁচালি অংশে কবিয়ালগণ যেহেতু দীর্ঘক্ষণ ধরে ছড়া কাটতে থাকেন, সেহেতু সুর-তালের একঘেয়েমি দূর করতে কবিয়ালকে মাঝে মাঝে নতুন নতুন ধুয়া গান গাইতে হয়। পাঁচালির ছড়ার ছন্দশৈলী পরিবর্তন করতেও এই ধরনের ধুয়া গান সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

আঙ্গিকগত দিক দিয়ে গানগুলো সাধারণত বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের মতো। চিতান (ধরন ও পাড়ন) বা স্থায়ী এবং একাধিক অন্তরা দিয়ে গানগুলো রচিত হয়ে থাকে। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই এর অন্তরার সংখ্যা তিনের অধিক।

---

[১৮] উদ্ধৃত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কলকাতা: সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃ. ২৩৪–৩৫। চরণের শেষ শব্দটির বদলে দীনেশচন্দ্র সিংহ একটি ত্রিবিন্দু দিয়ে রেখেছেন। শব্দটি 'লজেঞ্চুস' বা 'লজেঞ্চোস' হওয়া সম্ভব।

ধুয়া গানগুলোর বিষয় সাধারণত চাপান-উতোরের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এমনকি ধুয়া, দিশা বা ডাক-ধুয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রশ্নকারী কবিয়াল তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো একটি ধুয়া গান করেন। এই সঙ্গতিকে আরো জোরালো করার জন্য ধুয়া গানের কিছু কিছু অন্তরা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হতে দেখা যায়। জবাব দানকারী কবিয়ালও একই ভাবে এমন ধুয়া গান করেন, যে গানের মধ্যে জবাবের উপাদান থাকে। জবাবের উপাদান কম থাকলে তিনিও ধুয়া গানের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তরা সংযোজন করে থাকেন। বিশেষভাবে স্মরণীয় অধিকাংশ কবিয়াল তাঁদের পাঁচালির আসরগুলোতে এইসব ধুয়া গানের তাল অনুযায়ী ছড়া কেটে থাকেন। ধুয়া গানের অন্তরাকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সময়ে ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে কবিয়ালকে ছড়া কাটতে হয় এবং স্থায়ী বা চিতানের অন্ত্যমিলের সঙ্গে সেসব ছড়ার মিল রক্ষা করতে হয়। ধুয়া গান গাওয়ার পরে কবিয়ালগণ যে ছড়া কাটেন, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সেটাকে পাঁচালি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পাঁচালির সুর যাতে ধুয়া গানের সুরকে অনুসরণ করতে পারে, সেজন্য যন্ত্রসঙ্গতকারীগণ তাঁদের যন্ত্রে ধুয়া গানের সুর ধরে রাখেন এবং ছড়া কাটার মধ্যে মধ্যে সেই সুর শুনে ধুয়ার স্থায়ীকে মনে পড়ে।

কবিগানের অন্য যাবতীয় গান, যেমন ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা প্রভৃতি প্রধানত দোহারদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। কিন্তু ধুয়া গান কবিগানের এমন অংশ যা শুধু কবিয়ালকে গাইতে হয়। মাঝে মাঝে ধুয়া টানা ছাড়া দোহারদের এখানে কিছু করার থাকে না। ধুয়া টানার মানে হলো মূল গানটি কবিয়াল কর্তৃক গাওয়ার সময়ে প্রথমবার স্থায়ীর শেষে এবং পরে অন্তরার শেষে স্থায়ীর সর্বশেষ কলি সমস্বরে গেয়ে ওঠা। এই গানের এমন ধুয়া-টানা বৈশিষ্ট্য থেকেই সম্ভবত গানগুলোর নাম ধুয়া গান।

ধুয়া গানের বিষয় ও সুর উভয়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের যতোগুলো শাখা আছে, তার প্রতিটি শাখার গানই কবিগানের ধুয়া গান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আধুনিক গান, যা লঘুসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত, সেগুলোও যেমন ধুয়া গান হিসেবে পরিবেশনযোগ্য, আবার রাগসঙ্গীতের সঙ্গতিপূর্ণ শৈলীগুলোও এই অংশে ব্যবহার্য। অর্থাৎ সুরের দিক দিয়ে ধুয়া গানের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সাধারণত বিভিন্ন এলাকার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, প্রভৃতি সুরের গান ধুয়া গান হিসেবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বিষয়ের দিক দিয়েও ধুয়া গান সর্বভুক। কোনো গানে পাওয়া যায় দেহতত্ত্বের কথা, কোথাও পাওয়া যায় গুরুভক্তির নমুনা, কোথাও ঘটে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতিফলন, আবার কোনো গানের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা। গানগুলো পূর্বরচিত থাকার জন্য, এর গুণগত মান তাৎক্ষণিক রচিত গান ও ছড়া থেকে অনেকটা ভালো হয়। তাছাড়া বিশ শতকের শেষার্ধে কবিগানের এই অংশে যে কবিয়াল যতো বেশি দক্ষ ছিলেন, সেই কবিয়াল ততোটা জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন।

নিম্নে দুটি ডাক-ধুয়া বা দিশা এবং একটি ধুয়া গান উদ্ধৃত করা হলো:

ক. ডাক-ধুয়া বা দিশা—

১. মন মাঝি মোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না।

২. গোঁসাইরে নি দেখছো খাজুর গাছতলায়, গোঁসাই খাজুর খায় আর লেজ নাড়ায়।

খ. রসিকলাল সরকারের ধুয়া গান—

ননদী লো যা ফিরে যা ঘরে।
বলিস ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ॥

ঘুচলো তোদের সকল জ্বালা মুছলো কুলের কালি
কলঙ্কিনী রাই বলে আর কেউ দেবে না গালি।
ব্রজে আর হবে কৃষ্ণকালি গোপন বাসরে ॥

ঝুলন দোল আর নৌকাবিলাস সবই হলো শেষ
প্রবাসে চলেছি আমি যেথায় বন্ধুর দেশ।
যেন দয়া করে শ্যাম হৃষীকেশ এই আশিস দিস মোরে ॥

ভুলে যা লো রাধা তোদের ছিলো কুলের বউ
শ্যাম বিনে জীবনে মরণে আপন নাই আর কেউ।
যার প্রাণে ওঠে অকূলের ঢেউ, কুলে তার কী করে ॥

বিদায় বেলায় ননদী গো শেষ মিনতি নিয়ো
আমার হয়ে শ্যামের কুঞ্জে সাঁঝের প্রদীপ দিয়ো।
এ দীন রসিক বলে আমায় রাখিয়ো চরণসেবার তরে ॥

পাঁচালি

কবিগান পরিবেশন কালের প্রায় অর্ধেকটা অংশ জুড়েই কবিয়ালগণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দবন্ধে তর্কবিতর্ক করে থাকেন। ছন্দিত এই বিতর্কের অপর নাম পাঁচালি। তবে উনিশ শতকে 'পাঁচালি' নামে আলাদা এক ধরনের গান ছিলো। ধুয়া গানের মতো গান এবং ছড়ার মাধ্যমে তখন কাহিনি বর্ণনা করা হতো। সে সময়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালি এর উদাহরণ। কবিগানের পাঁচালি নামের অংশটি উনিশ শতকের ঐ 'পাঁচালি' গান থেকে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।

উদ্ভব যাই হোক উনিশ শতকের পাঁচালি এবং কবিগানের পাঁচালি এক নয়। কবিগানের পাঁচালির জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'পাল্লা' বা 'কবির পাল্লা'। কোথাও কোথাও এই অংশ 'আলোচনা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। আবার অনেকে এই অংশকে ছড়াকাটা নামে চিহ্নিত করে থাকেন। টপ্পা গানের মাধ্যমে কবিয়ালগণ তাঁদের চরিত্র ও বিতর্কের বিষয় ঠিক করে নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয় এই ছন্দিত পাঁচালি। আলোচনা বা তর্কবিতর্কের পরম্পরা অক্ষুণ্ন রেখে পাঁচালিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে মাঝে

মাঝে ডাক-ধুয়া (দিশা) বা ধুয়া গান পরিবেশিত হয়। এভাবে কবিগানের পাঁচালি অংশের সঙ্গে টপ্পা ও ধুয়া গান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে থাকে।

বস্তুত টপ্পাকে বিবেচনা করা যেতে পারে পাঁচালির ভূমিকা হিসেবে, একইভাবে ধুয়া গানকে বিবেচনা করা যায় পাঁচালির অলঙ্কার হিসেবে। ছন্দের বিচারে পাঁচালি অংশকে অন্তত তিন ভাগে বিভাগ করা চলে, যথা: পয়ার পাঁচালি, ত্রিপদী পাঁচালি, এবং চৌপদী পাঁচালি। এগুলোর আবার বহু ধরনের রকমফের রয়েছে। যেমন পয়ারের রকমফের: লঘু পয়ার, দীর্ঘ পয়ার; ত্রিপদীর রকমফের: লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, ভগ্ন ত্রিপদী; এবং চৌপদীর রকমফের: চৌপদী ও ভগ্ন চৌপদী।

পয়ার বাংলার জনপ্রিয় একটি ছন্দ। তবে আপাতদৃষ্টে পয়ারকে খুব সহজ ছন্দ মনে হলেও খুব অল্প পরিসরে উক্তি সম্পূর্ণ করতে হয় বলে, পয়ারের বন্ধনে বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘ পয়ারে কিছুটা স্বাধীনতা হয়তো থাকে, কিন্তু লঘু পয়ারের আঁটসাঁট বন্ধনে বক্তব্য উপস্থাপন করা, এবং একই সঙ্গে ঢোলের তালের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শব্দচয়ন করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত বক্তব্যের শেষ দিকে কবিয়ালগণ পয়ার ব্যবহার করে থাকেন। ঢোলের দ্রুত টোকার সঙ্গে মিলিয়ে কবিয়ালগণ যখন এই ছন্দে কথা বলেন, তখন তাঁদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা শ্রোতাদের বিস্মিত না করে পারে না। একটি লঘু পয়ারের উদাহরণ :

যাক তবে বেশি বলে নাহি প্রয়োজন।
অল্পে অল্পে আসর আমি করি সমাপন ॥
কী বলিব নন্দী তোরে আমার কথা নিস।
কোনো দিন না শুনিবি কারো পরামিশ ॥
নারদের মতো ধূর্ত নাহি এ ত্রিলোকে।
পথভ্রষ্ট করিবারে চাহিয়াছে তোকে ॥
আমার দোষত্রুটি তোরে দেখাইতে চায়।
যাতে তোর গুরুভক্তি নষ্ট হয়ে যায় ॥

কবিগানের পরিভাষায় ত্রিপদী পাঁচালির একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'ডাক-ছড়া'। কবিয়ালগণ এই ধরনের ছড়া কাটতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যদিও এ কথা ঠিক যে ত্রিপদীর জটিলতা পয়ারের থেকে কিছুটা বেশি। সেখানে প্রতিটি চরণ একাধিক উপচরণে বিভক্ত থাকে, সেই উপচরণের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য সমান হতে হয়, সর্বোপরি রক্ষা করতে হয় মধ্যমিল। তাৎক্ষণিকভাবে কবিয়ালদের রচিত ত্রিপদী কেমন হয়, তা বোঝাতে একটি লঘু ত্রিপদী, একটি দীর্ঘ ত্রিপদী এবং একটি ভগ্ন ত্রিপদীর উদাহরণ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

লঘু ত্রিপদী—

কমলদাস বৈরাগী   কৃষ্ণপ্রেমে অনুরাগী   মনে বাঞ্ছা যাবে বৃন্দাবন।
কালামৃধায় জন্মস্থান   কৃষ্ণ বলে কাঁদে প্রাণ   বৃন্দাবনে চলেছে যখন ॥

কলিকাতা পৌঁছাইতে ওড়াকান্দি পড়ে পথে বিলের ভিতর দিয়া চলে।
বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হঠাৎ পড়ে নজর আলের উপর কিবা জ্বলে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—

আবার বললে দেখতে পাই খাদ্যাদিতে বিচার নাই
নির্বিচারে মতুয়া সব খায়।
এ কথা মোটে সত্য নয় সকল কিছু খাওয়া কি যায়
খড় কুটা ঘাস খায় না মতুয়ায় ॥
ভালো করে আছে জানা মতুয়ারা বিষও খায় না
তবে দোষ দাও অকারণ।
বলতে পারো মাছ মাংস খায় এগুলি তো অখাদ্য নয়
সারা বিশ্বে ইহার সমর্থন ॥

ভগ্ন ত্রিপদী—

দাদু তুমি আমার কথা নিও।
এই কলঙ্কের কথা শুনে কতো ব্যথা মায়ের প্রাণে
ইহার সঠিক জবাব আমায় দিও ॥
মুখে তুমি যা করো বর্ণনা।
একি কর্ম তোমার হলো যা বলো তার উলটা চলো
তোমার পক্ষে ইহা সম্ভবে না ॥

কিছু কিছু ধুয়া গানে চৌপদী ছন্দের অন্তরা থাকে। তখন সেই ধুয়া গানকে অনুসরণ করতে গিয়ে কবিয়ালকে চৌপদী ছন্দের ছড়া কাটতে হয়। এই ধরনের একটি চৌপদীর উদাহরণ:

বন্দনার কথা দিলেম ছেড়ে
পাল্লার কথা নিলেম ধরে
জিজ্ঞাস করি শ্রীরামেরে
জানিতে মনের বাসনা।
যজ্ঞ করো কী কারণে
মা সীতা আজ নাই গো কেনে
আমি চিন্তা করে হনুমানে
নিজ জ্ঞানে কিছুই বুঝি না ॥[১৯]

---

[১৯] পাঁচালির পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে প্রথম চারটি বাগেরহাটের স্বরূপেন্দু সরকারের পাঁচালি থেকে নেওয়া, যা এই বইয়ের পরিশিষ্ট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চমটি নেত্রকোনার

৩—

পাঁচালির মধ্যে কখনো কখনো গদ্যের দেখা পাওয়া যায়। যুক্তির খাতিরে অনেক কবিয়াল ছোটো আকারের হাস্যরসাত্মক গল্প বা চুটকি গল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এইসব গল্পের অনেকগুলো ছন্দিত আকারে উপস্থাপিত হলেও ছোটো আকারের অনেক গল্প কবিয়ালগণ গদ্যে বর্ণনা করে থাকেন। তবে সেই গদ্যও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উপস্থাপিত হওয়ায় সাধারণ গদ্যবাক্যের থেকে তা আলাদা হয়ে থাকে। পাঁচালির মধ্যে পরিবেশিত এই ধরনের গদ্যকে তুলনা করা যায় গদ্যকবিতার সঙ্গে, অথবা একে বলা চলে এক ধরনের ছন্দিত গদ্য। এই গদ্যে সাধারণত হাস্যরসাত্মক কাহিনি বর্ণিত হওয়ায়, সাধারণ শ্রোতাগণ প্রায়ই ভুলে থাকেন যে, পাঁচালির এই বিশেষ অংশটি ছন্দমিল ছাড়াই উপস্থাপিত হলো।

জোটের পাল্লা

জোটের পাল্লা হলো কবিগানের পাঁচালি অংশের উপসংহার। উনিশ শতকে কলকাতা পর্বে এর নাম ছিলো কবির লহর। দক্ষিণবঙ্গে এর একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ মিলনগোষ্ঠ বা মিলনগীতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই অংশের নাম জোটক। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে এটি বোল কাটাকাটি নামে পরিচিত।[২০] টাঙ্গাইল অঞ্চলে কবিগানের এই অংশ আলাদাভাবে 'মালজুড়ি' বা 'মালজোড়া' নাম গ্রহণ করে।[২১] এটি পাঁচালি অংশ থেকে যথেষ্ট আলাদা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই অংশে পাঁচালি অংশের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে পাঁচালি অংশ থেকে এই অংশের তফাত উপস্থাপন-কৌশলে। পাঁচালির আসরগুলোতে কবিয়াল বা সরকারগণ পালাক্রমে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। এক কবিয়ালের পালা শেষ হওয়ার পর অন্য কবিয়াল আসরে আসেন। কিন্তু জোটের পাল্লায় প্রথমে একজন কবিয়াল এসে একটি ধুয়া গান বা ডাক-ধুয়া গাওয়ার পরে সেই ধুয়া গানের সুরে পয়ার বা ত্রিপদীতে ছড়া কাটতে শুরু করার এক পর্যায়ে প্রথম কবিয়ালের আহ্বানে বিপক্ষের কবিয়াল আসরে দাঁড়ান এবং উভয় কবিয়াল সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রথম দিকে এই ছড়ার লয় খানিকটা ধীর থাকলেও উভয়ের যুক্তির তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াকাটার লয় দ্রুততর হতে শুরু করে। এই দ্রুত ছড়া কাটার মধ্যে অনেক সময়ে আদিরসাত্মক প্রসঙ্গের অবতারণা হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে উভয় কবিয়াল শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিতর্কিত বিষয়ের উপসংহারে পৌছতে সক্ষম হন, এবং সঙ্গত কারণে তা

মদন সরকারের, যা যতীন সরকারের 'বাংলাদেশের কবিগান' গ্রন্থে উদ্ধৃত। যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৭–৩৮।

[২০] দীপক বিশ্বাস, *কবিগান* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃ. ১০।

[২১] মামুন তরফদার, *টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য* (ঢাকা: ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ. ১৭৯।

মিলনাত্মক হয়ে থাকে। তাই সাধারণত কবিয়ালগণ পরস্পরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে কবিগান শেষ করেন। কবিয়াল মদন আচার্য রচিত একটি চমৎকার জোটের পাল্লা উদ্ধৃত করেছেন যতীন সরকার। সেটি নিম্নরূপ:

ধুয়া মান ছেড়ে দে ওগো রাধে আমি তোমার পায়ে পড়ি।
একবার ফিরে চাও না কিশোরী ॥

কৃষ্ণঃ সরকার হে মনোরঙ্গে তোমার সঙ্গে গাইবো আজ মানের জুড়ি।
কর্তাপক্ষের আদেশ হইলে সেই ভাবেতেই কাজ করি।
রাধে বা কৃষ্ণ হবে যাও না সে রাস্তা ধরি।
বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট তাতে কষ্ট হয় ভারি ॥

রাধা গত নিশি কষ্ট করে পোহাই শর্বরী।
তুমি সত্য বলো চিকন কালা কল্য ছিলে কার বাড়ি ॥

কৃষ্ণঃ একটি নবীন বাছুর হারাইয়া আমি রাইতভর ঘোরাঘুরি।
এই কারণে কুঞ্জে আসতে আজ হইয়াছে কিছু দেরি ॥

রাধা তোমার বেণুর রবে ধেনু ফিরে তবে কি জন্য ঘোরাঘুরি।
আবার কপালেতে সিন্দূরের বিন্দু পরনেতে নীল শাড়ি।

কৃষ্ণঃ বনে বনদুর্গা পূজা করছিলো কয়জন নাগরী।
আমায় কুঙ্কুম দিয়া আশীর্বাদ দিল সত্য আজ স্বীকার করি।

রাধা বুঝলাম তোমার সব চাতুরী পরনে কেন নীল শাড়ি।
বাদুরচোষা আমের দশা কিজন্য তোমায় হেরি ॥

কৃষ্ণঃ আসবার সময় তোমার কুঞ্জে হঠাৎ কূপেতে পড়ি।
ভিজা কাপড় বদলাইতে গিয়াছি ধোপার বাড়ি ॥

রাধা শাড়ির অঞ্চলে আজ চন্দ্রাবলীর নাম হেরি।
কোথায় পাইলে এমন শাড়ি কেমন কেমন আজ হেরি ॥

কৃষ্ণঃ রাধে গো, বললে নাকি অঞ্চলেতে চন্দ্রাবলির নাম হেরি।
চন্দ্রা নামে একটা কোম্পানি খুলছে, দেখছো না চিন্তা করি।
আসলে কুঞ্জে আসতাম পারি, দাও না, প্রতিজ্ঞা করি ॥

রাধা চন্দ্রারে আজ মা ডাকিলে কুঞ্জেতে আসতে পারি।
তা না হলে যাও না চলে তুমি সে চন্দ্রার বাড়ি ॥

কৃষ্ণঃ বললে নাকি মা ডাকিতেম, কিছুটা রক্ষা করি।
ষোলো আনা মা না ডাইক্যা মাসিমা ডাকতাম পারি ॥

রাধা আরেক কথায় মরি ব্যথায় কোথায় যাই আর কি করি।

তোমার কপালে কঙ্কনের চিহ্ন কিজন্য আমি হেরি ॥

কৃষ্ণঃ দ্রুত বেগে আসবার সময়ে রাস্তাতে গেলাম পড়ি।
একটা কলসের কান্ধার দাগ লাইগ্যাছে ভাবেতে বুঝতাম পারি ॥
রাধে গো তুমি আমার আমি তোমার এক রাজ্যেতে বসত করি।
মানটা আজি ছাইড়্যা দিলে কুঞ্জেতে ঢুকতাম পারি ॥

রাধা নাথ গো, কতো কষ্ট দিলে আমায় কি করে আজ মান ছাড়ি।
পিরিতের বাক্সে জঙ্কার পড়ছে, বলো উপায় কি করি ॥

কৃষ্ণঃ পিরিতের বাক্সে জং পইড়াছে বললে তুমি কিশোরী।
একটু প্রেম নারানের তৈল লাগাইয়া বাক্সটারে ঠিক করি ॥

রাধা আয়ান ঘোষের খাশের বাড়ি কেমনে নেও দখল করি।
মামা থাকতে ভাইগ্না কভু হয় না তার অধিকারী ॥

কৃষ্ণঃ ষোলো আনা চাই না আমি দুই আনা পাইতাম পারি।
মামা মরলে ষোলো আনার আমি তো হই অধিকারী ॥

রাধা প্রতিজ্ঞা করো অদ্যাবধি যাইবে না অন্যের বাড়ি।
উপরোধে মনের খেদে আইজের মান দিলাম ছাড়ি।
হলো রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন পূর্ব স্মৃতি নেই ধরি ॥

কৃষ্ণঃ জীবন থাকতে এ জীবনে যাইবো না অন্যের বাড়ি ॥[২২]

৩. কবিগানের স্তবক ও সুর

মালশি থেকে লহর কবি পর্যন্ত কবিগানের গঠন সব অঞ্চলে প্রায় এক রকম। কিন্তু গানগুলোর স্তবক-নাম বা তুক-নামগুলো এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। এর মধ্যে কলকাতা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে তুকনামের সংখ্যা কম। কিন্তু উভয় অঞ্চলের তুকনাম ও তুকের বিন্যাস আলাদা। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গ (বৃহত্তর যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর) এবং ঢাকা অঞ্চলের তুকনামের সংখ্যা বেশি। এই দুই অঞ্চলের তুকনামের মধ্যে সাদৃশ্যও বেশি। বস্তুত ঢাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের কবিগানের প্রায় প্রতিটি চরণ আলাদা নামে চিহ্নিত। তবে এ কথাও স্মরণীয় যে, হরিচরণ আচার্য যখন তাঁর 'কবির ঝঙ্কার' বই প্রকাশ করেছিলেন, তখন এইসব তুককে তিনি মোট চারটি তুক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। পরের পৃষ্ঠার সারণিতে তুকনামগুলোর এই বৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে। (তুকনামের বৈচিত্র্য সারণি দ্রষ্টব্য)

---

[২২] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৪৫–৪৯। উদ্ধৃতি দেওয়ার সময়ে ধুয়ার পুনরুক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অঞ্চলভেদে তুকনাম কম-বেশি হলেও গানের দৈর্ঘ্য সব অঞ্চলে প্রায় সমান। তাই ইচ্ছা করলে কলকাতা পর্বের কবিগান যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও ঢাকা অঞ্চলের তুকনাম দিয়ে প্রকাশ করা যায়, একইভাবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানও কলকাতার তুকনাম দিয়ে উপস্থাপন করা সম্ভব।

তুকনামের বৈচিত্র্য সারণি

কলকাতা	ঢাকা	দক্ষিণবঙ্গ	ময়মনসিংহ
১. চিতান	১. চিতান	১. ধরন	১. চিতান
২. পরচিতান	২. পাড়ন	২. পাড়ন	২. পরচিতান
৩. ফুকা	৩. ফুকার	৩. ফুকার	৩. মিল
৪. মেলতা	৪. মিল	৪. মিশ	৪. মহড়া
৫. মহড়া	৫. ধুয়া	৫. মুখ	৫. ধুয়া
৬. শাওয়ারি	৬. ডাইনা	৬. প্যাঁচ	৬. খাদ
৭. খাদ	৭. খাদ	৭. মিশ	৭. লহর
৮. দ্বিতীয় ফুকা	৮. দ্বিতীয় ফুকার	৮. মুখ	৮. ঝুমুর
৯. দ্বিতীয় মেলতা	৯. মিল	৯. খোচ	
১০. অন্তরা	১০. অন্তরা	১০. দ্বিতীয় ফুকার	
	১১. পরচিতান	১১. মিশ	
	১২. পরপাড়ন	১২. মুখ	
	১৩. শেষ ফুকার	১৩. অন্তরা	
		১৪. পরচিতান	
		১৫. শেষ ফুকার	
		১৬. শেষ মিশ বা ছুট্টি	

সূত্রঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮); স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান: উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য," *বাংলা একাডেমী বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩); দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭)।

তুকনামের সংখ্যা এতোগুলো হলেও সুরের বিবেচনায় গানের স্তবকসংখ্যা সর্বোচ্চ সাতটি পর্যন্ত হয়, যথা:

১ চিতান (কলকাতা)
চিতান/ পরচিতান (ঢাকা)
ধরন/ পরচিতানের প্রথম অংশ (দক্ষিণবঙ্গ)
চিতান (ময়মনসিংহ)

২ পরচিতান (কলকাতা)
পাড়ন/ পরপাড়ন (ঢাকা)
পাড়ন/ পরচিতানের দ্বিতীয় অংশ (দক্ষিণবঙ্গ)
পরচিতান (ময়মনসিংহ)

৩ ফুকা+মেলতা (কলকাতা)
ফুকার+মিল (ঢাকা)
ফুকার+মিল (দক্ষিণবঙ্গ)
মিল (ময়মনসিংহ)

৪ মহড়া+শাওয়ারি (কলকাতা)
ধুয়া+ডাইনা (ঢাকা)
মুখ+প্যাঁচ+মিশ/ছুট্টি (দক্ষিণবঙ্গ)
ধুয়া (ময়মনসিংহ)

৫ শাওয়ারি (কলকাতা)
ডাইনা (ঢাকা)
প্যাঁচ+মিশ/ছুট্টি (দক্ষিণবঙ্গ)
ধুয়ার শেষাংশ (ময়মনসিংহ)

৬ খাদ (কলকাতা)
খাদ (ঢাকা)
খোচ (দক্ষিণবঙ্গ)
খাদ (ময়মনসিংহ)

৭ অন্তরা (কলকাতা)
অন্তরা (ঢাকা)
অন্তরা (দক্ষিণবঙ্গ)
ঝুমুর (ময়মনসিংহ)

কবিগানের এই স্তবকগুলোর সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেন প্রফুল্লচন্দ্র পাল। তাঁর ধারণা 'চিতেন' শব্দটি 'চিত্র' এবং 'তেন' সহযোগে তৈরি। চিতেনের পরবর্তী 'আভোগ' অংশকে চিতেনের সাদৃশ্যে 'পরচিতেন' বলা হয়। উদগ্রাহকের নামান্তর 'মহড়া'। ধ্রুবপদের নামান্তর 'ধুয়া'। মেলাপক থেকে 'মেলতা' শব্দের উদ্ভব। অন্তরার পরিবর্তিত নাম 'খাদ' ও 'ফুকা'। এছাড়া পাঠ থেকে 'পাড়ন' এবং তাল থেকে 'দোলন' শব্দের জন্ম হওয়া সম্ভব।[২৩] বস্তুত উদগ্রাহক, মেলাপক, আভোগ, ধ্রুবপদ ও অন্তরা—গানের এই পঞ্চাঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কবিগানে কী কী নাম ধারণ করে, সে সম্পর্কে তাঁর মতামত পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ছেষট্টি–সাতষট্টি।

পালের এই অনুমানে কিছু কষ্টকল্পনা লক্ষণীয়। তাছাড়া তিনি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের তুকগুলো নিয়ে ভেবেছিলেন, পূর্ববঙ্গ পর্বের তুকনামগুলো সেভাবে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। তবে কবিগানের তুকগুলোর সঙ্গে গানের পঞ্চাঙ্গ বিভাজনের সম্পর্ক নিয়ে তিনিই প্রথম চিন্তা করেন।

কবিগানের পঞ্চাঙ্গ সারণি

পঞ্চাঙ্গের নাম	কলকাতা পর্বের রূপ	পূর্ববঙ্গের রূপ
উদগ্রাহক	চিতান বা মহড়া পরচিতান	চিতান/ ধরন পাড়ন
মেলাপক	খাদ/ফুকা	প্রথম ফুকার
আভোগ	মেলতা চিতেন/পড়তা/দোলন/সওয়ারি	মুখ প্যাঁচ খোচ
ধ্রুবপদ	ধুয়া	দ্বিতীয় ফুকার পরখোচ পরচিতান
অন্তরা	অন্তরা/খাদ/ফুকা	অন্তরা

উৎস: প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. বাষট্টি, ছেষট্টি–সাতষট্টি।

সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর ধারণা বিশুদ্ধ কবিগান 'কেঁকি' রাগিণীতে গীত হতো।[২৪] কিন্তু এই নামের কোনো রাগিণী সংগীতশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তাছাড়া বিশুদ্ধ কবিগান বলতে কী বোঝায়, সেটাও স্পষ্ট নয়। বাস্তবে কবিগানের সুর মিশ্র সুর। এর মধ্যে কীর্তনের সুর রয়েছে, রয়েছে শ্যামাসঙ্গীতের সুর, রয়েছে বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের সুর। তাছাড়া কবিগানের ডাকগান এবং ধুয়া গান কখনো কখনো রাগিণী-নির্ভর হলেও মূল কবিগান মিশ্র রাগিণীর। উনিশ শতকের পাঁচালি গান ও টপ্পা গান সাধারণত আড়ানা বাহার, আলেয়া, আশা ভৈরবী, ইমন, ইমন কল্যাণী, ইমন ঝিঁঝিট, ইমন ভূপালী, এলাইয়া, কল্যাণী, কানেড়া, কামোদ, কামোদ খাম্বাজ, কামোদ গৌড়া, কামোদ গৌড়, কালাংড়া, কেদারা, কেদারা কামোদ, কেদারা খাম্বাজ, খট, খটভৈরবী, গারা ঝিঁঝিট, গুর্জরী টোড়ী, গৌরী, ছায়ানট, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঝিঁঝিট পিলু, জয়জয়ন্তী, টোড়ী, দরবারী কানাড়া, দরবারী টোড়ী, ধানেশ্রী পুরিয়া, পঞ্চম, পরজ, পাহাড়ী ঝিঁঝিট, পূরবী, বাগেশ্রী, বাগেশ্রী কানাড়া, বাগেশ্রী মুলতানী, বারোয়াঁ, বাহার,

[২৪] সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৩৪।

বিভাস, বিভাস কল্যাণ, বেহাগ, বেহাগ ঝিঁঝিট, বেহাগ সরফরদা, ভীমপলাশি বাহার, ভৈরবী, মালকোষ, মালসী, মুলতান, মুলতানী, মোহিনী, রামকেলী ললিত, লগনী, ললিত, ললিত বিভাস, শ্যাম, শ্যাম পূরবী, সরফরদা, সরফরদা কালাংড়া, সিন্ধু, সিন্ধু কাফী, সিন্ধু খাম্বাজ, সিন্ধু ভৈরবী, সুরট, সুরট মল্লার, সোখরাই বাহার, সোহিনী, সোহিনী কানাড়া, হাম্বির, হিন্দোল প্রভৃতি রাগে পরিবেশিত হতো।[২৫] সমকালীন কবিগানের পাঁচালি অংশ এবং ডাক, টপ্পা ও ধুয়া গানগুলোতে এসব রাগিণীর প্রয়োগ ঘটা সম্ভব। যেমনটা পূর্বে দেখা গেছে, রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ডাকগানগুলোতে এর মধ্যকার অনেকগুলো রাগের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

কবিগানের তাল বিভিন্ন রকমের হয়। অনেক সময়ে স্তবকান্তরে তালের পরিবর্তন করা হয়। ব্যবহৃত তালগুলোর মধ্যে আড়খেমটা, আড়া, একতালা, কাওয়ালি, কাশ্মীরি, কাহারবা, খেমটা, ঝাঁপতাল, ঠুংরি, তেওট, তেতালা, তেলেনা, ধামার, পোস্তা, মধ্যমান, যৎ, হরি প্রভৃতি তাল অধিক জনপ্রিয়। নির্দিষ্ট কোনো গানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো তাল নেই। অনেক সময়ে ঢুলির ইচ্ছা অনুযায়ী এসব তালের পরিবর্তন ঘটতে পারে অথবা লয় দ্রুত (জলদ) বা ঢিমে হতে পারে।

৪. কবিগানের বিষয়

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনিকে কবিগানের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। উনিশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত 'করুণানিধানবিলাস' গ্রন্থে কবিগানের যে মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায়, সেটিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবচেয়ে প্রাচীন কবিগানের পাঠ। এর বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলির প্রেম। যে ঝুমুর গানকে কবিগানের প্রধান উৎস হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে, সেটির আলোচ্যবিষয়ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় যেসব গান সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোরও বড়ো একটি অংশ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি উনিশ ও বিশ শতকের কবিগানের অন্যতম আলোচ্য হলেও আরো নানা ধরনের বিষয় কবিগানের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়। কবিগানের শুধুমাত্র সখীসংবাদ নামক অংশ এ পর্যায়ে সরাসরি রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক। এছাড়া ভোর, গোষ্ঠ, বসন্ত, বিরহ, প্রভাস, জোটের পাল্লা প্রভৃতি অংশের মধ্যেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি ব্যক্ত হয়ে থাকে। এছাড়া কবিগানের কবি, টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া প্রভৃতি অংশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে ইহজাগতিক-পৌরাণিক নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই সেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ দুর্লভ হয় না। রাধাকৃষ্ণ তথা কৃষ্ণলীলা বিষয় এভাবে কবিগানের প্রধান ও মূল বিষয়ে পরিণত হয়।

---

[২৫] দাশরথি রায়ের পাঁচালি এবং নিধুবাবুর টপ্পায় এসব রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দাশরথি রায়ের পাঁচালির জন্য দ্রষ্টব্য, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, *রসভাণ্ডার* (কলকাতা: বসুমতী, ১৮৯৯); নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্তের টপ্পার জন্য দ্রষ্টব্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৯৪–৩৩৫।

কবিগানের আলোচ্য হিসেবে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কালী ও দুর্গাদেবী তথা চণ্ডী-কেন্দ্রিক। কবিগানের ডাক, মালশি, ভবানীবিষয় প্রভৃতি অংশ এই কালী, দুর্গা বা চণ্ডীকে নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। বিশ শতকের সূচনা থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্মমত প্রবল হয়ে ওঠার পর থেকে মতুয়া বিষয় নিয়ে এই শ্রেণির গান রচিত ও গীত হতে শুরু করে। তবে গানগুলো যেহেতু মাহাত্ম্য বর্ণনা ও স্তুতিনির্ভর হয়, সেহেতু শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এই গানের প্রভাব খুব একটা প্রবল হয় না, একই কারণে তা পর্যাপ্ত মনোযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

কবিগানের কবি, টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া প্রভৃতি অংশ মোটামুটি ইহজাগতিকতা কেন্দ্রিক। তবে হিন্দু পুরাণ প্রসঙ্গ এখানে ব্যাপক জায়গা দখল করে থাকে। বিশেষত কবি অংশে কোনো একজন কবিয়াল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক কোনো কাহিনির পটভূমিতে দু-একটি প্রশ্নের অবতারণা করেন। সেই প্রশ্নের জবাব প্রতি-জবাব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিগান অগ্রসর হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু হলেও আলোচনা শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়ে গিয়ে থামবে, আগে থেকে সে সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময়ে শ্রোতাদের অভিরুচি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কবি অংশের বিষয় নির্ভর করে। টপ্পা-পাঁচালি প্রসঙ্গেও একই মন্তব্য করা যায়। টপ্পাতে কবিয়ালদ্বয় যেহেতু দ্বান্দ্বিক সম্ভাবনাপূর্ণ দুটি চরিত্রে নিজেদের আরোপ করে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকেন, সেখানেও তাই বিষয় নির্ভর করে আয়োজক ও শ্রোতাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী। আসরভেদে কবিগানের এই কবি ও টপ্পা অংশ আলাদা হয়ে থাকে বলে এখানে বৈচিত্র্যের অবকাশ খানিকটা বেশি থাকে। কয়েকটি কবিগানের শিরোনাম এবং কয়েকটি টপ্পার চরিত্রদ্বয়ের উল্লেখ করা হলে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব হবে।

কবিগানের মধ্যকার কবি অংশের সাধারণ কিছু শিরোনাম, যেমন : রামু সরকারের 'শরাঘাতের কবি,' তারকচন্দ্র সরকারের 'পাশাখেলার কবি,' হরিচরণ আচার্যের 'কাক-কোকিলের কবি,' রাজেন্দ্রনাথ সরকারের 'গাঁজার কবি,' নকুলেশ্বর সরকারের 'জল ও কুম্ভের কবি,' বিজয়কৃষ্ণ সরকারের 'পঞ্চ পাণ্ডবের কবি,' অনাদিজ্ঞান সরকারের 'যোগতত্ত্বের কবি,' স্বরূপেন্দু সরকারের 'নারী স্বাধীনতার কবি,' নারায়ণ সরকারের 'যৌতুকের কবি,' নিখিলচন্দ্র সরকারের 'পরিবার পরিকল্পনার কবি' প্রভৃতি।[২৬] এই শিরোনামগুলো থেকেও দেখা যাচ্ছে বিষয় কখনো পৌরাণিক, কখনো কাল্পনিক, কখনো সামাজিক, আবার কখনো একেবারেই সমকালীন সমস্যানির্ভর।

কবিগানের টপ্পা ও পাঁচালি অংশের জন্য তুলনামূলক বেশি সময়ের দরকার হয়। কেননা এই অংশে কবিয়ালদ্বয় সত্যিকারের বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। বিতর্কের বিষয় নির্ভর করে কবিয়ালদ্বয় কে কোন চরিত্রে নিজেদের আরোপ করেন, তার উপরে। কয়েকটি টপ্পার বিষয় উল্লেখ করলেও কবিগানের এই অংশের বিষয় সম্পর্কে আন্দাজ

---

[২৬] উল্লিখিত কবিগুলোর জন্য পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য।

করা সম্ভব। যেমন: রূপ ও সনাতন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, হনুমান ও রাম, পদ্মাবতী ও জয়দেব, মীরা বাঈ ও জীব গোস্বামী, বালি ও রামচন্দ্র, বৈশাম্পায়ন ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, শুক্রাচার্য ও কৃষ্ণ, নারদ ও নারায়ণ, জটায়ু ও রাবণ, যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য ও সাত্যকি, গান্ধারী ও কৃষ্ণ, নন্দী ও শিব, হরিদাস ও নিত্যানন্দ, চৈতন্যবালা ও তারকচাঁদ, আবুল কালাম ও জহরলাল; ধনঞ্জয় টিকাদার ও লুৎফর রহমান, চাষী ও বৈষ্ণব, ধন ও বিজ্ঞান, যুদ্ধ ও শান্তি, চাষী ও মজুতদার, কৃষক ও জমিদার, মহাজন ও খাতক, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি।[২৭]

৫. কবিগানের শিল্পী

কবিগানের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: কণ্ঠশিল্পী এবং যন্ত্রশিল্পী। কণ্ঠশিল্পীদের নাম দোহার এবং যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে রয়েছে ঢুলি, জুরিদার, কাঁসিবাদক, বংশীবাদক, সরোদবাদক, বেহালাবাদক, হারমোনিয়ামবাদক প্রভৃতি। কবিগানের মূল শিল্পীর নাম কবিয়াল বা সরকার। কবিয়াল বা সরকার একাধারে সঙ্গীতরচয়িতা, কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী—সকল কিছু। অনেক সময়ে এক শ্রেণির সংগীতরচয়িতা কবিয়ালদের সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁদের নাম বাঁধনদার। কবিগানের সঙ্গে যুক্ত এই শিল্পীদের কর্মপরিধি সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যাক।

কবিয়াল বা সরকার

উনিশ শতকে কবিগানের দলনেতা পরিচিত ছিলেন কবিয়াল, কবিওয়ালা বা কবিতাওয়ালা নামে। বিশ শতক নাগাদ কবিয়ালদের নাম হয় সরকার। এই কবিয়াল বা সরকার হলেন কবিগানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। দলের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের তিনি নিয়ন্ত্রক। তিনিই হলেন কবিগানের কবি। তিনি গান রচনা করেন, তাতে সুরারোপ করেন, স্বকণ্ঠে এবং দোহারদের মাধ্যমে তা পরিবেশন করেন, সর্বোপরি তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দ, মিল, সুর ও তাল সহযোগে ছড়া কেটে কোনো বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক চালিয়ে যান। কবিগান সংক্রান্ত এইসব দায়িত্ব পালন করাকে বলা হয় সরকারি করা। অসাধারণ সৃজনশীলতা, প্রখর যুক্তিশীলতা, প্রচুর পঠন-পাঠন, সুললিত কণ্ঠ, সুরবোধ, তালবোধ এবং দলব্যবস্থাপনায় দক্ষতার সমন্বয় যাঁর মধ্যে যতো বেশি ঘটে, সরকারি পেশায় তিনি ততো যশ লাভ করে থাকেন।

---

[২৭] এইসব টপ্পার অনেকগুলো দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন, কয়েকটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে, কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায় সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত *রমেশ শীল রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) গ্রন্থের ভূমিকা অংশে।

কখনো কখনো কবিয়ালদের গুরুদায়িত্বের এক বা একাধিক অংশ ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে পালন করতে দেখা যায়। যেমন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় ছাতুবাবু ও লাতুবাবুরা কবিগানের দল গঠন করেছিলেন। কবিয়াল মহেশ কানা ছিলেন তাঁদের দলের একজন চাকুরে কবিয়াল। অর্থাৎ কবিয়ালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি ছাতুবাবু ও লাতুবাবু পালন করতেন আর বাকি কাজগুলো মহেশ কানাকে করতে হতো। একইভাবে উনিশ শতকের শেষ দিকে ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণেরও একটি কবির দল ছিলো। রামকুমার সরকার ছিলেন তাঁর দলের কবিয়াল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঝালোকাঠিতে অধরমণি, রাঙা যামিনী, মনোমোহিনী, কালা যামিনী প্রমুখ নারী উদ্যোক্তা কবিগানের দল গঠন করেছিলেন। এই নারী উদ্যোক্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ দলে দোহারের কাজ করতেন। এই কালপর্বের অনেক খ্যাতিমান কবিয়াল তাঁদের দলে কবিয়াল বা সরকার হিসেবে কাজ করেছেন।

ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রায় সকল সম্প্রদায় থেকে কবিয়ালদের আবির্ভাব ঘটে। এমনকি উনিশ শতকে একজন পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিও (অ্যান্টনি) কবিয়ালের পেশায় বিশেষ নাম করেছিলেন। আঠারো উনিশ শতকের কবিয়ালদের কুলপদবি দেখেও বোঝা যায়, কতো বিচিত্র বংশপেশার লোক কবিগানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ শতক নাগাদ কবিয়ালদের একটি সাধারণ পদবি তৈরি হয়ে যায়। কবিয়ালের প্রতিশব্দ হিসেবে যে 'সরকার' অভিধাটি তখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কবিয়ালগণ সেই 'সরকার' অভিধাকে তাঁদের কুলপদবির পরিবর্তে ব্যবহার করতে থাকেন। এর ফলে অনেক সময়ে কবিয়ালদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বংশপেশা সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন হয়। একই প্রক্রিয়ায় অনেক মুসলমান কবিয়ালও সরকার পদবি ধারণ করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় ব্রাহ্মণ কুলজাত কবিয়ালদের ক্ষেত্রে। সকল কালপর্বে শুধু এঁদেরই পূর্বপুরুষের কুলপদবি বজায় রাখতে দেখা যায়।

সরকার অভিধার সূচনা কিভাবে হলো, সে সম্পর্কে যতীন সরকারের অনুমানটি বিবেচনাযোগ্য। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ বিশ্বাস অনুযায়ী লেখাপড়া জানা লোকই সরকার। এমনকি 'মহাজনের গদিতে হিসাবের খাতা কিংবা জমি বিক্রির দলিল লেখে যারা, তারাও সরকার।' তাই 'নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম, পুরাণ কাহিনি ও ধর্মের নানা কথা তাঁরা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আসরে উঠে তাৎক্ষণিক পদ্য ও গান রচনা করেন, উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে বাকযুদ্ধে ঘায়েল করতে পারেন—এসবই গ্রামের লোকদের কবিয়ালদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে বলে কৌলিক পদবী নির্বিশেষে সকল কবিয়ালই "সরকার" আখ্যায় ভূষিত।'[২৮]

---

[২৮] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৩৪।

'কবিয়াল' অভিধা নিয়ে অনেক কবিয়ালের এবং কবিগান-অনুরাগীর আপত্তি জানা যায়।[২৯] তাঁরা মনে করেন, এই অভিধা দিয়ে কবিগান-গায়কের কবিত্বকে খাটো করা হয়ে থাকে। 'কবিয়াল' শব্দকে তাঁরা মনে করেন 'কবিওয়ালা' শব্দের অপভ্রংশ, যা ফেরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। বিকল্প হিসেবে তাঁরা 'কবিগায়ক', 'লোককবি', 'চারণকবি', 'কবিরসরকার' বা 'সরকার' প্রভৃতি অভিধা প্রস্তাব করেন।

বিশ শতকের শেষার্ধে অনেক জারিগায়ক মাঝে-মধ্যে কবির সরকারদের বিপক্ষে কবিগান পরিবেশন করতেন, কিন্তু সেই গান পরিবেশন করার সময়ে তাঁদের কবিয়াল বা সরকার বলা হতো না। কবিগান গাইলেও তাঁরা বয়াতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেমন—খোরশেদ আলী বয়াতি, আসমত আলী বয়াতি, মোসলেম বয়াতি বা সাইদুর রহমান বয়াতি। সম্ভবত এঁদের কথা ভেবেই সেলিম আল দীন এক সময়ে বলেছিলেন যে, যাঁরা কবিগান করেন, তাঁরা বয়াতি নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত তিনি আজহার বয়াতি এবং মফেজ বয়াতির কবির লড়াইয়ের উল্লেখ করেন এবং ১৯৯২ সালে তিনি তাঁদের গান শুনেছেন বলে জানান।[৩০]

বাঁধনদার

উনিশ শতকে এমনকি বিশ শতকের প্রথমার্ধে কোনো কোনো কবির দলে বাঁধনদার নামে এক শ্রেণির লোক থাকতেন। এঁরা কবিগানের কোনো কোনো অংশে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশিতব্য গান রচনার দায়িত্ব পালন করতেন। কবিগানের সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা প্রভৃতি শ্রেণির গানে পূর্বরচিত চাপান পরিবেশনের সুযোগ থাকলেও, ঐ গানের কাটান বা জবাব গানটি আসরে বসেই কবিয়ালদের রচনা করতে হতো। বাঁধনদারগণ কবিয়ালদের পক্ষে এই গুরুদায়িত্বটি পালন করে থাকতেন। বাঁধনদারের কাজ দিয়ে শুরু করলেও অনেকে পরবর্তী কালে কবিয়াল বা সরকারে পরিণত হয়ে কবিগানের দল গঠন করেছেন, এমন নজির আছে। এর বিপরীত নজিরও রয়েছে। যেমন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ। কোনো কারণে

---

[২৯] কবিগান-অনুরাগী গোপাল বিশ্বাস তাঁর একটি রচনায় লেখেন: "যে গানের নাম কবিগান তার রচয়িতা এবং গায়কদের নাম 'কবিয়াল বা কবিওয়ালা'। বাবুকৃষ্টির লোকসংস্কৃতিবিদগণ প্রদত্ত এই অভিধা আমাদের কাছে বড় বেদনার।" গোপাল বিশ্বাস, "বঙ্গের কবিগান পর্যালোচনা: ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিকতা," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ১৯৬।

[৩০] সেলিম আল দীন, "আলোচনা," *বাংলা একাডেমী বৈশাখী লোক উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৮৫।

গোরক্ষনাথের সঙ্গে অ্যান্টনির মতবিরোধ সৃষ্টি হলে অ্যান্টনি নিজেই কবিগান রচনা করতে শুরু করেছিলেন।[৩১]

দোহার

কবিগানের সঙ্গীত সহযোগী কণ্ঠশিল্পীগণ দোহার নামে পরিচিত। সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা প্রভৃতি অংশে কমবেশি চার জন দোহার আসরের চার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর নিয়ম। পেছন থেকে সরকার এক এক জনের পেছনে কানের কাছে গিয়ে গানের কলি বলে দেন, দোহারগণের কাজ হলো নির্ধারিত সুর আরোপ করে সেই কলিগুলোকে পরিবেশন করা। এছাড়া কবিয়াল বা সরকার যখন ধুয়া গান পরিবেশন করেন, দোহারগণ তখন স্থায়ীর বিশেষ কলি সমস্বরে গাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বিশ শতকের সূচনায় কোনো একটি দলের দোহারদের মধ্যে যিনি প্রধান থাকতেন, তাঁকে ধরতা দোহার বলা হতো। তিনি অন্য দোহারদের সঙ্গে নিয়ে বন্দনামূলক গান, যেমন ডাক, মালশি প্রভৃতি পরিবেশন করতেন। বিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ কবিগানের সখীসংবাদ ও কবি অংশ হ্রাস পেতে থাকলে দোহারদের কাজ কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

কবিগানের বিভিন্ন অংশের গানগুলোর সুর সম্পর্কে দোহারগণকে খুব সচেতন থাকতে হয়। এছাড়া দোহার হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হলো ভালো কণ্ঠের অধিকারী হওয়া। অনেক ক্ষেত্রে কবিয়ালের কণ্ঠ থেকে দোহারদের কণ্ঠ শ্রুতিমধুর হতো। বিশ শতকের প্রথম দিকে তেমন ক্ষেত্রে কবিয়াল যদি চাকুরে হতেন, তাহলে ঐ জাতীয় দোহারের থেকে তাঁর বেতন খুব একটা বেশি হতো না।

কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের পর্বের বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ ছাড়া কবিগানের প্রায় সকল দোহার পুরুষ। তবে নারী দোহারদের নাম যেমন জানা যায়, সেই তুলনায় পুরুষ দোহারদের নাম জানা যায় না। কবিয়ালদের প্রতিপত্তির আড়ালে কবিগানের এইসব গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠশিল্পীগণ বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যান। তা সত্ত্বেও দু-চারজন দোহারের নাম কোনো না কোনো সূত্রে পাওয়া যায়। যেমন তারকচন্দ্র সরকার এবং তাঁর পিতা কাশীনাথ সরকারের দলে যাঁরা দোহারি করতেন, তাঁদের মধ্যে সূর্যনারায়ণ শিকদার, কাঙ্গালীচরণ, কালীচরণ, ভোলানাথ, মধুসূদন সরকার, নবীনচন্দ্র বসু প্রমুখের নাম জানা যায়।[৩২] হরিচরণ আচার্যের দলের প্রখ্যাত দোহার ছিলেন মনোমোহন আচার্য, সুবল, বিহারী, গোবিন্দ সাহা, রাধাচরণ, মদন প্রমুখ।[৩৩] রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিখ্যাত দোহার ছিলেন শশধর মাস্টার, হরি, মনা, মনোহর, সুধন্য প্রমুখ।[৩৪] নিশিকান্ত

---

[৩১] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. পঁচাশি।

[৩২] বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২৮।

[৩৩] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৭০।

[৩৪] গবেষকের পিতা স্বরূপেন্দু সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

সরকারের দোহারদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন ওস্তাদ সতীশ শীল, দিঘিরজানের সতীশ মণ্ডল, হরিপাগলার ক্ষীরোদ মজুমদার, হরিপাগলার মনোহর বৈরাগী, বাবলার মহেন্দ্র মিস্ত্রি, বাবলার নিতাই মিস্ত্রি, শাঁখারীকাঠির মনোহর ভূঁইমালী প্রমুখ। নিশিকান্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হলে তাঁর শিষ্য স্বরূপেন্দু সরকারের দলে এঁরা কাজ করেছেন।[৩৫] বিজয়কৃষ্ণ সরকারের দলের বিখ্যাত দোহার ছিলেন নগেন মাস্টার, সদানন্দ মল্লিক, রসিক সানদার, ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।[৩৬] বিশ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বুধই বৈরাগী, মনীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, শক্তি বিশ্বাস, সুশীল, অমল মণ্ডল, অনন্ত মাস্টার, নিরঞ্জন মাস্টার, হরিদাস মাস্টার, প্রদীপ, আশুতোষ বাছাড়, শঙ্কর বাগচী, শ্যামল মজুমদার, অশোক মণ্ডল প্রমুখ দোহার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ২০১০ সালে মাদারীপুরের একটি আসরে ছোটো নিশি সরকারের দল এবং স্বপন সরকারের দলে দীপ্তিশ্বর সরকার এবং নরোত্তম বাড়ই নামে দুজন শিক্ষার্থী কবিয়ালকেও দোহারের কাজ করতে দেখা গেছে।[৩৭]

উনিশ শতকের কলকাতায় এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধের পূর্ববঙ্গে অনেক কবির দলে মহিলা দোহার থাকতেন। মহিলা দোহার থাকার উপরে যেহেতু অনেক দলের নাম-ডাক নির্ভর করতো, সেহেতু মহিলা দোহারদের পারিশ্রমিক পুরুষ দোহারদের তুলনায় বেশি হতো। অনেক সময়ে কবিয়াল বা সরকারের থেকেও এইসব মহিলা দোহার বেশি পেতেন। বিষয়টি হরিচরণ আচার্য তাঁর একটি ডাক গানে স্বীকারও করেছেন। লিখেছেন: "দেখি সরকারদিগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয় না/ মেয়ের মাইনা হলো ষাট টাকা পর্যন্ত।"[৩৮] হরিচরণ আচার্য তাঁর এই গানে ঢাকা অঞ্চলের স্বর্ণমণি, পরশমণি, বিধুকামিনী, আদরমণি প্রমুখ দোহারের নামোল্লেখ করেন। ঝালোকাঠি অঞ্চলের দোহার প্রিয়বালাও এক সময়ে তাঁর দলে দোহারি করেছেন। এঁদের মধ্যে আদরমণি ছিলেন তাঁর দলের প্রধান দোহার। এই অতিমূল্য মহিলা দোহারদের অনেকের নামের শেষে বৈষ্ণবী পদবি দেখে মনে হয়, এঁরা সাধারণ পরিবারের সদস্য ছিলেন না। অনেকে বারবনিতার অবস্থান থেকে উঠে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এই মহিলা দোহারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ পর্বের ঝালোকাঠি কেন্দ্রের কয়েকজন দোহার। এই দোহারদের মধ্যে বড়ো মনোমোহিনী, অধরমণি, কালা যামিনী, রাঙা যামিনী, সত্যভামা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালি, রাধি, মানদা, শরৎবালা, প্রিয়বালা, সরলা, তরঙ্গিণী, কুমুদিনী, ছোটো গিরিবালা, সুভাষিণী

---

[৩৫] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল জীবন ও তাঁর গান," *স্থানীয় ইতিহাস*, জুন ২০০৯, পৃ. ১৬০।

[৩৬] মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২৩।

[৩৭] ক্ষেত্রসমীক্ষা: কদমবাড়ি, মাদারীপুর, তারিখ—২০ জানুয়ারি ২০০৮।

[৩৮] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ১।

প্রমুখ কয়েকজন দোহারের নাম দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর 'পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' বইয়ে উল্লেখ করেছেন।[৩৯] এছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে গোলোকমণি, কামিনী, সুরধুনী বা বোঁচা, হরিদাসী, কালা সুখদা, লাভি, অনন্তবালা, সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা, লক্ষ্মী বৈষ্ণবী, রাধালক্ষ্মী, দক্ষবালা, মনোহরা, গৌরী, হিরণবালা প্রভৃতি নামের দোহারদের নামও জানা যায়।[৪০] এইসব দোহারের অনেকে বিশেষ বিশেষ সরকারের রক্ষিতা হয়ে যেতেন। যেমন প্রিয়বালা বা ঢেরা বোঁচা ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের এবং সরলা বা শেখ সরলা ছিলেন নকুলেশ্বর সরকারের। ঝালোকাঠি পর্বে কবিগানের দলের অধিকারী যামিনীকান্ত নট্টের কন্যা হিরণবালাও সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে নকুলেশ্বর সরকারের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। দোহার হয়েও এঁদের অনেকে কবিগানের দলের মালিক হয়েছিলেন, যেমন মনোমোহিনী, অধরমণি, কালা যামিনী, রাঙা যামিনী। অনেক সরকার নিয়মিত বেতনের চুক্তিতে এই মহিলা দোহারদের অধীনে কাজ করতেন।

যন্ত্রশিল্পী

কবিগানের দলে দোহারদের পরেই যন্ত্রশিল্পীদের অবস্থান। তবে যন্ত্রসঙ্গতকারীদের মধ্যে ঢুলির অবস্থান সবার উপরে। ঢুলিরা প্রায় ক্ষেত্রে দোহারদের থেকে অধিক পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। এমনকি অনেক সময়ে তা প্রধান দোহারের থেকেও বেশি।

কলকাতা পর্বের কবিগানে ঢুলিদের কৃতিত্বের বিষয়টি বিশেষ আলোচনার বিষয় হতো। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় (১৮৬২) কবিগানের ঢুলিদের বোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন: "এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হলো, ভালকোর জগা ও নিমতের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব' 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেটকিমাছের তিনখানা কাটা' 'অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ' 'যাবি তো যা ছুটে ছুটে যা' প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চারগুণ উঁচু) গান ধল্লেন।"[৪১] উনিশ শতকে হুগলির চন্দননগরে (ফরাসডাঙায়) বিখ্যাত ঢুলি ছিলেন রাম বাইতি এবং তাঁর পুত্র মোহন বাইতি। এঁরা নিত্যানন্দ বৈরাগীর দলে ঢোল বাজাতেন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বরিশাল অঞ্চলে যজ্ঞেশ্বর ঢুলি, বনমালী ঢুলি, বৈকুণ্ঠ ঢুলি, রজনী ঢুলি, হরিচরণ নট্ট, বসন্ত নট্ট, অশ্বিনী নট্ট প্রমুখ বিশেষ নাম করেছিলেন। এছাড়া

---

[৩৯] দীনেশ চন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত*, পৃ. ২০২।

[৪০] যেমন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "ভূমিকা," *হারামণি*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. চুয়াত্তর–আটাত্তর।

[৪১] কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৩৯।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের দলের অক্ষয় ঢুলি, রমেশ শীলের দলের বিনয়বাঁশী জলদাস, বিজয় সরকারের দলের পরান ঢুলি, স্বরূপেন্দু সরকারের দলের শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য খ্যাতিমান ঢুলিদের মধ্যে খুলনার ডুমুরিয়ার মধু ঢুলি, যশোর জেলার অভয়নগরের লেন্টু ওরফে শিবু ঢুলি, গোপালগঞ্জ জেলার গান্ধিয়াসুরের সুষেণ রায়, খুলনার বাজুয়া-ধোপাদির অমূল্য ঢুলি, কমল ঢুলি, খুলনার ডুমুরিয়ার নিরঞ্জন ঢুলি প্রমুখ একুশ শতকের সূচনায়ও কবিগানের সঙ্গত করেন। কবিগানের ঢুলিদের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনয়বাঁশী জলদাসের ঢোলবাদন কিংবদন্তীতুল্য হয়ে আছে।

উনিশ শতকের কবিগানে হারমোনিয়মের দেখা পাওয়া না গেলেও বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের কবিগানে তা অনেকটা অপরিহার্য যন্ত্রে পরিণত হয়। কবিগানের তাল রক্ষার জন্য ঢোলের সঙ্গে আরো এক বা একাধিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এর মধ্যে কাঁসি এবং জুরির নাম সর্বাগ্রস্মরণীয়। দলের গুরুত্ব ও সঙ্গতি অনুযায়ী শুষীর ও তত জাতীয় আরো অনেক যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেগুলোর মধ্যে জুড়ি বা করতাল, খঞ্জনি, নূপুর, দোতারা, সরোদ, বেহালা, সানাই, আড়বাঁশি, খিলবাঁশি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকে শখ করেও কবিগানের দলে বাঁশি বাজাতেন। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান। কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বেশ কয়েকটি আসরে তিনি বাঁশি বাজিয়ে আসর মাতিয়েছিলেন। একুশ শতকের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো আসরে প্রচলিত যন্ত্রাদির অতিরিক্ত হিসেবে সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহারও দেখা যায়।

৬. কবিগানের আসর

কবিগানের আসর সাধারণত চতুষ্কোণ হয়ে থাকে। সামিয়ানা টাঙানো বিরাট প্যান্ডেলের মাঝখানে মাটি বা কাঠের মঞ্চ করে অপেক্ষাকৃত উঁচু সমতলের উপরে কবিগানের জন্য আসর তৈরি করা হয়ে থাকে। এই আসর তৈরি করা হয় কখনো উন্মুক্ত জায়গায়, কখনো শ্মশানখোলায়, কখনো বড়ো গাছের নীচে, কখনো বাড়ির আঙ্গিনায়, কখনো বারোয়ারি মন্দিরের সামনে, কখনো মেলার মাঠে, কখনো খেলার মাঠে, কখনো হলঘরে, আবার কখনো অডিটোরিয়ামে। উন্মুক্ত জায়গায় মঞ্চ তৈরি করার সময়ে আয়তনের অন্তত একটা দিকে করা এবং সেই দিকটা থেকে কবিয়াল এবং তাঁর সহযোগীগণ মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করেন। অপেক্ষাকৃত কম হলেও সেই দিকটাতেও অবশ্য শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। চতুষ্কোণ এই মঞ্চের একদিকে একটি দল এবং অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলের সদস্যগণ আসন গ্রহণ করেন। পালাক্রমে দল দুটিকে গান পরিবেশন করতে হয় বলে এবং গানের অনেক অংশ প্রশ্নোত্তরমূলক থাকায় গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলের অধিকাংশ সদস্যকে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করতে হয়।

আসরের এই বর্ণনা বিশ শতকের শেষার্ধের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ অঞ্চলের। উনিশ শতকে সূচনায় কবিগানের আসর ঠিক কেমন ছিলো, সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন কারণে মনে হয়, তখনকার আসরও এর থেকে আলাদা কিছু ছিলো না। প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো, ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্র ছাড়া এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রোতার মনোরঞ্জন করা সম্ভব। চিত্র ১-এ এমন একটি আদর্শ মঞ্চের নকশা দেখানো হলো।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালকে মঞ্চ এবং আসন ছাড়াই কবিগান পরিবেশন করতে হতো বলে সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী এবং যতীন সরকার উল্লেখ করেছেন। যেমন সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর বর্ণনা: "বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবিগানের আসরে (এতদঞ্চলে) বিছানার কোন ব্যবস্থা ছিল না; ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইত। কবির সরকার মাঠের দূর্বা ঘাসের উপর, সামিয়ানার নীচে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেন। গায়ক-বাদকগণ মাটিতে ছন-বনের উপর বসিয়াই ছড়া-পাঁচালীর দোহারী করিত।"[৪২] প্রায় অভিন্ন মন্তব্য করেছেন যতীন সরকার। তিনি লিখেছেন, "পূর্ব ময়মনসিংহের জমিদারদের বাড়িতে বা কাছারিতে কবিগানের আসরে বিছানার ব্যবস্থা ছিলো না। উপরে সামিয়ানা থাকতো ঠিকই, কিন্তু কবিয়ালগণ গান গাইতেন দূর্বা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে। তাঁদের সহকারী গায়ক-বাদকদের বসার জন্য কিছু খড় বিছিয়ে দেওয়া হতো মাত্র।"[৪৩] এঁরা দুজনেই মূলত চন্দ্রকুমার দে-র বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চন্দ্রকুমার দে-ও 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রায় অভিন্ন মন্তব্য করেন।[৪৪] যতীন সরকারের ধারণা, কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের প্রতিবাদের মুখে এই অবস্থার অবসান ঘটে।[৪৫]

একাধিক কারণে কবিগানের মঞ্চগত এই দুরবস্থাকে একান্তই আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয়। অন্যতম কারণ উনিশ শতকের কলকাতায় এমনকি পূর্ববঙ্গেও বেশ কয়েকজন জমিদার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন জমিদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিষয়টি স্মরণে রাখলে মনে হয় না যে, তাঁদের এবং তাঁদের সহযোগীদের বসার জন্য ভালো আসনের খুব একটা অভাব হতো। তবে দরিদ্র পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা উঠতি ও অখ্যাত কবিয়ালদের দিয়ে গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুর্বল ব্যবস্থাপনাকে কমবেশি স্বীকার করা গেলেও এই ব্যবস্থাকে সার্বজনিক মনে করার কোনো হেতু নেই।

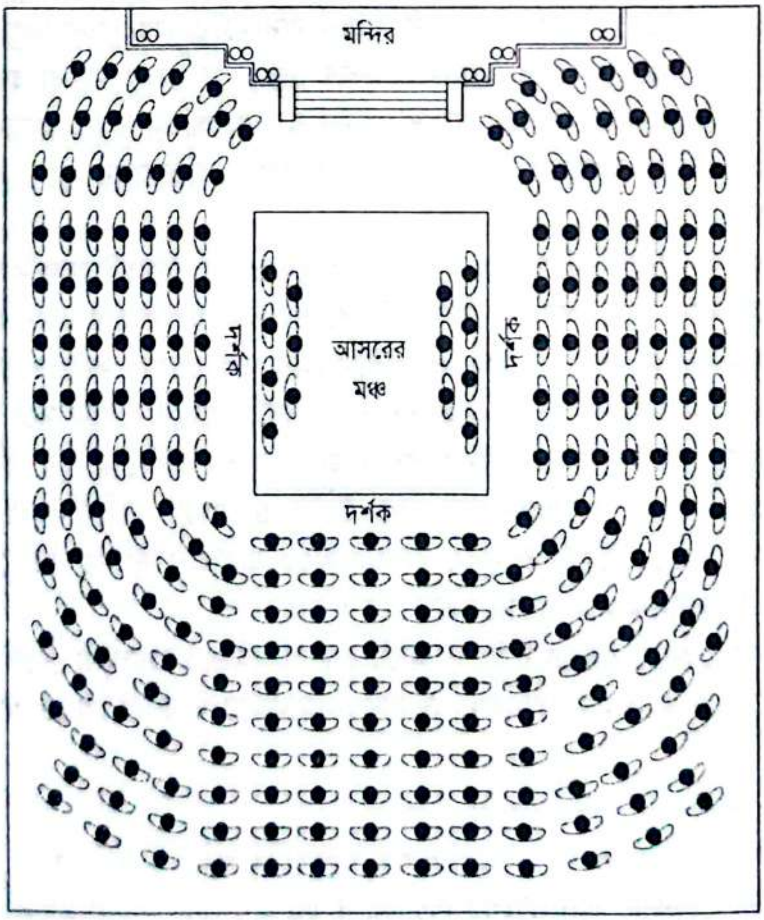
কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু আয়োজকগণ সহজাত জাতঘৃণা থেকে তথাকথিত অ-বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান কবিয়াল ও সঙ্গীতসহযোগীদের বসার ক্ষেত্রে অসম্মানজনক

---

[৪২] সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, পৃ. ২৩৫।
[৪৩] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৫৫।
[৪৪] চন্দ্রকুমার দে, "মালীর যোগান," *সৌরভ*, এপ্রিল ১৯১৪, পৃ. ২১৩।
[৪৫] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৫৫।

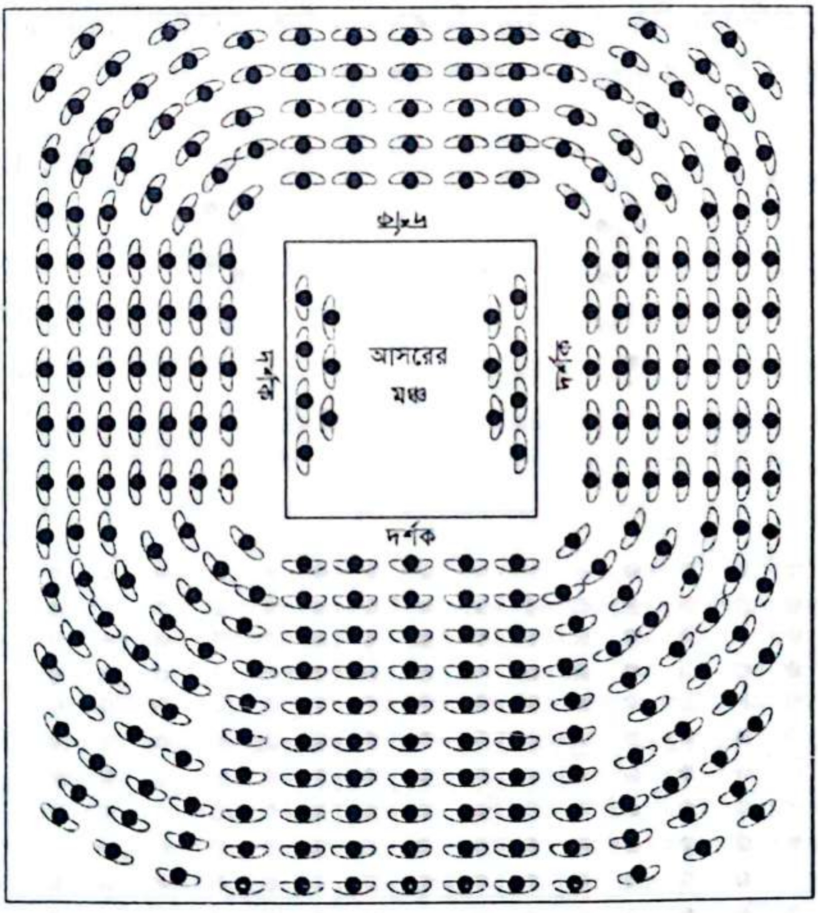
ব্যবস্থা করতেই পারেন। তবে যে বর্ণেরই হোন না কেন, কবিয়াল যদি খ্যাতিমান হয়ে থাকেন, সেসব ক্ষেত্রে উঁচু মঞ্চবিশিষ্ট আসর না থাকাটা কবিগান পরিবেশনে নিঃসন্দেহে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিশেষত বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বিস্তৃত কবিগান পরিবেশনকালের দৈর্ঘ্য, কুড়ি-বাইশ জন সদস্য বিশিষ্ট দুই দলের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, কমবেশি একশত কর্মঘণ্টার পারিশ্রমিকবিশিষ্ট কবিগানের দুই দলকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, এবং শ্রোতাদের আনুমানিক সর্বনিম্ন সহস্রাধিক সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রাখলে বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে, উনিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ পূর্ববঙ্গের কবিগান শুধু ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে পরিবেশিত হতে পারতো।

বিশ শতকের দক্ষিণবঙ্গে কবিগানের সঙ্গে কালীপূজার সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। অনেক জায়গায় কবিগান ছাড়া কালীপূজার কথা ভাবাই যেতো না। এসব ক্ষেত্রে বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপের সামনে কবিগানের আসর বসতো। সেইসব আসরের মানের সঙ্গে আয়োজকদের মান-সম্মান জড়িত থাকতো বলে প্রায় ক্ষেত্রেই কবিগানের মঞ্চ সুন্দরভাবে সাজানো হতো। এসব মঞ্চ সাধারণত দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট, প্রস্থে ১২ ফুট, এবং উচ্চতায় ২/৩ ফুট হতো। এই মাপের একটি মঞ্চের নকশা নিম্নরূপ:



চিত্র ১: বারোয়ারি মন্দিরের সামনের খোলা জায়গায় কবিগানের আসরের নকশা

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বিশেষভাবে একুশ শতকের সূচনায় কবিগানের মঞ্চে বরং নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একুশ শতকের প্রথম দশকে বর্তমান গবেষক বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েক জায়গায় কবিগান শোনেন। এর মধ্যে ২০০৪ সালে কলকাতার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কমপ্লেক্সের তারিণী মাঝির ঘাটে কবিগান করেন অসীম সরকার ও তাঁর সঙ্গী। সেই মঞ্চটি করা হয়েছিলো আনুমানিক দুই ফুট উচ্চতার। শ্রোতাদের জন্য সেখানে চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অনেক শ্রোতা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে কবিগান শোনেন। চিত্র ২-এ কবিগানের সেই মঞ্চের (দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট) নকশা উপস্থাপন করা হলোঃ

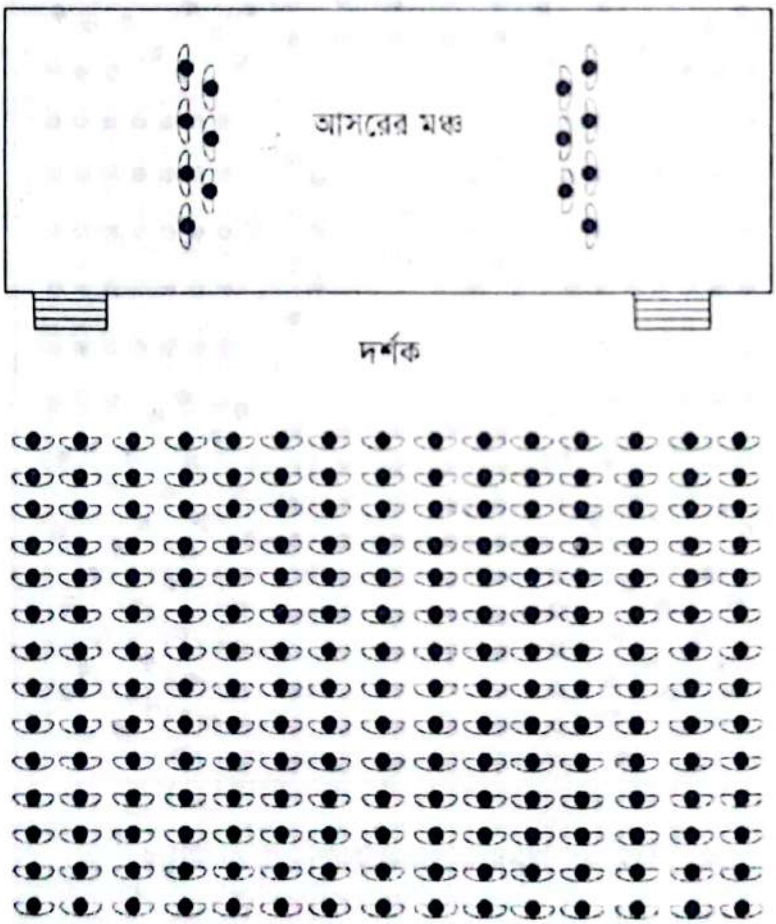


চিত্র ২: খোলা জায়গায় কার্পেট পাতা আসর

২ নং চিত্র অনুযায়ী আসর আজকাল বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষভাবে কবিগান যখন থেকে চণ্ডীমণ্ডপের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ হতে শুরু করেছে, তখন থেকে এই ধরনের মঞ্চ দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে যেখানে কবিগানের স্থায়ী আসর রয়েছে, সেখানে হয়তো ১ নং চিত্র অনুযায়ী আসর-মঞ্চ পাওয়া যাবে, কিন্তু বিভিন্ন প্রদর্শনীতে, মেলায় বা বিশেষ কোনো সংগঠনের উদ্যোগে যখন

কবিগানের আয়োজন হয়, তখন ২ নং নকশা অনুযায়ী আসর-মঞ্চ অধিক দেখা যায়। তবে প্রদর্শনীগুলোতে যখন কবিগানের মঞ্চ তৈরি করা হয়, শ্রোতাদের সুবিধার কথা ভেবে সেসব মঞ্চ এক, দুই, তিন বা চার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় নির্মিত হয়।

১৯৯৩ সালে বাংলা একাডেমীর একুশের মঞ্চে কবিগান করেন স্বরূপেন্দু সরকারের দল এবং ছোটো রবীন্দ্রনাথ সরকারের দল। এই মঞ্চটির আকার বেশ বড়ো ছিলো, আনুমানিক ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২০ ফুট প্রস্থ।[৪৬] সামনে বসার জন্য চেয়ারের সারি ছিলো মঞ্চ থেকে অন্তত পাঁচ ফুট উচ্চতায়। কবিগান অনেক সময়ে অডিটরিয়ম বা স্থায়ী মঞ্চেও পরিবেশিত হয়। এসব ক্ষেত্রে অডিটরিয়ম বা স্থায়ী মঞ্চের আকারের উপরে আসর-মঞ্চের মাপ নির্ভর করে। এসব ক্ষেত্রে কবিয়ালগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আসনবিন্যাস ঠিক করে নেন। বিশেষভাবে বিশ শতকের শেষ দিক থেকে এই ধরনের মঞ্চে কবিগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।



চিত্র ৩: স্থায়ী মঞ্চের আসর

[৪৬] গবেষক তখন বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে কর্মরত ছিলেন।

শ্রোতাদের সংখ্যা কম হলে কার্পেট বা ম্যাট বা অনুরূপ কোনো বিছানা পেতে যে কবিগানের আসর হতে পারে না, তাও নয়। যেমনটা দেখা যায় কমপ্যাক্ট ডিস্কে রেকর্ডকৃত কবিগানে। সেখানে কার্পেটের উপরে কবিয়াল, দোহার, ও যন্ত্রীদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যায়। শ্রোতারাও তাদের চারদিকে ঘিরে বসে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে কবিগানের আসর-মঞ্চ হয় অনেকটা বৃত্তাকার।

কবিয়াল এবং তাঁর সহযোগীদের পোশাক এবং সাজসজ্জাকেও আসরের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবিয়ালগণের ঐতিহ্যিক পোশাক পাঞ্জাবি ও ধুতি। একুশ শতকের সূচনাতেও এই পোশাকে তাঁরা আসরে আসেন। তবে উনিশ শতকের অনেক কবিয়াল একমাত্র ধুতি পরে কবিগান পরিবেশন করতেন, এমন অনুমান করা যায়। বিশ শতকের সূচনায় কর্মরত পূর্ববঙ্গের দুজন বিখ্যাত কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার এবং হরিচরণ আচার্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তাঁদের উর্ধ্বাঙ্গে কোনো পোশাক নেই। যাঁরা এভাবে ছবি তুলতে পছন্দ করেন, কবিগানের আসরেও তাঁরা এভাবে উপস্থিত হবেন, তা স্বাভাবিক। তবে বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ধুতি ও পাঞ্জাবিকে কবিয়ালগণ আদর্শ পোশাক হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন। তখন থেকে অনেকে কবিয়ালদের এই পোশাককে কবিগানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বলে ভাবতে শুরু করেন। উদাহরণ হিসেবে কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকার এবং অনাদিজ্ঞান সরকারের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে কবিগান গাইতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধুতি পরতে নিষেধ করা হলে কবিয়ালদ্বয় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর কিছুকাল পরে অনাদিজ্ঞান সরকার বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে অভিবাসী হন। তাঁর দেশত্যাগের পেছনে তিনি যেসব কারণ উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে সরকারি প্রচারযন্ত্রে পোশাক পরিবর্তন করার নির্দেশ প্রধান।[৪৭] অবশ্য একুশ শতকের সূচনায় এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রযোজকগণ এমন উদ্ভট মানসিকতা ধারণ করেন না। তার ফলে শিল্পীরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কখনো ধুতি-পাঞ্জাবি কখনো পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে পারেন। তবে একুশ শতকের সূচনা নাগাদ অধিকাংশ কবিয়ালই পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেছেন। এমনকি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এ সময়ের পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালগণও ধুতি-পাঞ্জাবির পরিবর্তে পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন।

কবিয়ালদের শরীরের অন্য কোথাও বিশেষ কোনো অলঙ্কার পরা বা অস্বাভাবিক কোনো সাজসজ্জা করার কথা জানা যায় না। তবে উনিশ ও বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে কবিয়ালগণ পায়ে নূপুর পরতেন। চাঁদপুর জেলার

---

[৪৭] বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* (নদীয়াঃ পরিমল বৈরাগ্য, ১৯৯৯), পৃ. ৬২২–২৩।

এনায়েতপুরের কবিয়াল কালোশশী চক্রবর্তী বিশ শতকের শেষার্ধেও ঢাকা শহরে পায়ে নূপুর পরে কবিগান করেছিলেন।[৪৮]

কবিয়ালদের মতো দোহার ও বাদকদের পোশাকও ঐতিহ্যিকভাবে ধুতি-পাঞ্জাবি। তবে যুগের পরিবর্তনে বিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ এই পোশাকে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষত অহিন্দু শিল্পীগণ ধুতির বদলে পাজামা ব্যবহার করতে শুরু করেন। মহিলা কবিয়াল ও সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের পোশাক অভিন্ন: শাড়ি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব মহিলা দোহার কবিগানে কাজ করতেন, তাঁরা অলঙ্কৃত শাড়িসহ নানা ধরনের চোখধাঁধানো অলঙ্কার পরতেন।

৭. কবিগানের কাল ও উপলক্ষ

সাধারণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কবিগানের জন্য প্রশস্ত সময়। এই সময় বাঙালির যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, এমনকি বাঙালি হিন্দুদের পূজাপার্বণেরও সময়। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এর মূল কারণ। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত চার মাসে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। এর ফলে এই সময়ে গ্রামীণ অনুষ্ঠানসমূহ নির্ঝঞ্ঝাট হয় না। কবিগানের মতো সঙ্গীতানুষ্ঠান যাঁরা উপভোগ করে থাকেন, সেই শ্রোতামণ্ডলীর সিংহভাগ অংশ এই কালপর্বে কৃষিকাজের সঙ্গে এতোটা নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকেন যে, কোনো ধরনের বিনোদনের সুযোগ তাঁদের থাকে না। কবিগানের এই কালপর্ব বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র এক রকম। তবে শহর এলাকার পরিবেশ, সুযোগ ও শ্রোতাদের কর্মসময় ভিন্ন থাকার কারণে অনেক সময়ে উল্লিখিত বর্ষাকালেও কবিগানের আয়োজন হয়ে থাকে।[৪৯]

কবিগানের নির্দিষ্ট কোনো আসরের কালপরিধি পালা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ধারণা করা হয় যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো একটি পালা পরিবেশিত হতে কমবেশি ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই হিসেবে ভোররাত চারটার সময়ে কোনো গান শুরু হলে সাধারণত বিকেল চারটার দিকে তা শেষ হয়। কবিগানের অনেকগুলো পর্যায় আছে, সেগুলোর কালপরিধিও কমবেশি আন্দাজ করা সম্ভব। টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া, ও জোটের পাল্লার জন্য কমবেশি ছয় ঘণ্টা সময়ের দরকার হয়। বাকি ছয় ঘণ্টার মধ্যে কমবেশি এক ঘণ্টা ব্যয় হয় দুই দলের ডাক ও মালশি গানের জন্য, কমবেশি দুই ঘণ্টা ব্যয় হয় দুই দলের সখীসংবাদের জন্য, এবং কমবেশি তিন ঘণ্টা ব্যয় হয় কবি বা লহর কবির জন্য।

---

[৪৮] স্বরোচিষ সরকার, "কবিগানের অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৩৯তম খণ্ড ১ম সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৮।

[৪৯] যেমন বিশ শতকের ত্রিশের দশকে রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পানসি নৌকায় করে কলকাতায় যেতেন। দ্রষ্টব্য, জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১২৫।

বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কবিগানের এই কালপরিধিতে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। কবিগানের আসর যেহেতু আর একমাত্র চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত থাকে না, সেহেতু কবিগান পরিবেশনের সময়ও পূজার সময়ের থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। তখন এক এক অঞ্চলে দেখা যায় এক এক রকম সময়ক্রম। একুশ শতকের সূচনায় তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি আসর শুরু হয়েছিলো দুপুর তিনটায়, বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের সাতপাড়ে একটি আসর শুরু হয় সন্ধ্যা নাগাদ, ঢাকা শহরের জেলেপাড়ার কবিগানের আসর শুরু হয় বিকেল চারটায়, আবার একটি অডিটরিয়মে অন্য একটি অনুষ্ঠানের শেষে রাত দশটায় কবিগান শুরু হয়। উল্লিখিত আসরগুলোর মূল আকর্ষণ ছিলো ধুয়া ও পাঁচালি। সাতপাড় এবং ঢাকার জেলেপাড়ার আসরে ডাক-মালশি, সখীসংবাদ ও টপ্পা শোনা গেলেও অধিকাংশ আসর শুধু ধুয়া ও পাঁচালিতে সীমাবদ্ধ ছিলো। শেষোক্ত আসরগুলোর কালপরিধি কোনোটা দুই ঘণ্টার, এবং সবচেয়ে দীর্ঘটা পাঁচ ঘণ্টার।

সূচনালগ্ন থেকে কবিগানে উপস্থাপিত বিষয়ের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় ধারণার মিশ্রণ এবং সহাবস্থান লক্ষণীয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কবিগানের উদ্ভবকালে বাঙালি হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে এই দুই ধারা বিশেষভাবে প্রবল ছিলো। তবে উল্লিখিত মিশ্রণ ও সহাবস্থান যেমন সমকালীন শ্রোতাদের মানস-গঠনকে প্রতিনিধিত্ব করে, একইভাবে এটাও প্রমাণ করে যে, এই দুই ধারার কোনোটার সঙ্গে কবিগান অনুগত ছিলো না। কেননা সাধারণত যেমনটা দেখা যায়, বিশেষ কোনো ধর্মের অনুষঙ্গী সঙ্গীতে কখনোই ভিন্ন মতাদর্শের কোনো স্থান থাকে না। অন্যদিকে কবিগানে শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুগপৎ সমান গুরুত্বের সঙ্গে থাকায়, এবং পরবর্তী কালে আরো অনেক আদর্শ ও ধারণা এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সূচনালগ্ন থেকে কবিগানের গঠন বারোয়ারি প্রকৃতির।

কবিগানের এই বারোয়ারি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে যে কোনো ধরনের গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠানে কবিগান একটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য বিনোদনের উপায়ে পরিণত হয়। একই কারণে বিভিন্ন ধরনের বারোয়ারি পূজা-অনুষ্ঠান ও তৎসংশ্লিষ্ট মেলায় কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসযাত্রা, মকর সংক্রান্তি, সরস্বতী পূজা, মাঘী পূর্ণিমা, দোলযাত্রা, বারুণী স্নান, চৈত্র সংক্রান্তি, নববর্ষ প্রভৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এক দিন থেকে শুরু করে দুই সপ্তাহব্যাপী যেসব মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে, কবিগান থাকে তার মধ্যে প্রধান একটি আকর্ষণ। আজকাল রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও লোক-সমাগম বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল কবিগানকে তাঁদের প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে একাধিক কবিয়ালকে তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। এর

ফলে রমেশ শীল প্রমুখ কবিয়াল কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সভা-সমাবেশ উপলক্ষে কবিগান পরিবেশন করতে শুরু করেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগান অনুষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারি কর্মসূচিই উপলক্ষ, তার সময়কালও সুনির্দিষ্ট। বিশ শতকের শেষার্ধে রেডিও এবং টেলিভিশনে কবিগান অনুষ্ঠান প্রচার হতে শুরু করে। সেসব অনুষ্ঠানের জন্যও বিশেষ কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না।

কবিগানের এই রাজনৈতিক ব্যবহার একুশ শতকের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় অব্যাহত দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা কবিয়াল উমা সরকার যেমনটা জানান, ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে তাঁকে সেখানে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কবিগানে অংশ নিতে যেতে হয়।[৫০] ত্রিপুরা রাজ্যের একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত খ্যাতিমান মন্ত্রী কবি অনিল সরকারও তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এই কৌশলের কথা এবং এই কৌশলে কাজ হওয়ার কথা স্বীকার করেন।[৫১] তিনি জানান, নির্বাচনের পূর্বে অন্য নেতাদের মতো গতানুগতিক জনসভা তিনি করেন না। তাঁর জনসভায় নানা ধরনের লোকসঙ্গীতের আয়োজন থাকে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ কোনো সংলাপ রসোত্তীর্ণ হতে পারলে, তা সাধারণ প্রচারণার চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেয়। শিল্পী যখন 'খারে খা বক্কিলারে খা' বলে গান ধরে, সাধারণ মানুষ তখন বুঝে নেয়, বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।[৫২]

৮. পৃষ্ঠপোষক ও শ্রোতা

সূচনা পর্বের কবিগান সম্পর্কে যতোটা জানা যায়, তাতে দেখা যায়, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর তৎকালীন জমিদার ও বিত্তবান লোকজন এই জাতীয় গানের আয়োজন করতেন। কলকাতায় তখন যাঁরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জমিদার নবকৃষ্ণ দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্রগণ ও রামদুলাল সরকারের পুত্রগণ, দরজিপাড়ার মিত্ররা, হাটখোলার দত্তরা, বাগবাজারের বসুরা, কলুটোলার শীলেরা, পাইকপাড়ারজমিদারবৃন্দ, কাশিমবাজারের হরিনাথ কুমার বাহাদুর, পাথুরেঘাটার ঠাকুররা, জোড়াসাঁকোর সিংহরা, গরানহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ, পটলডাঙার রূপনারায়ণ ঘোষাল, দয়েহাটার

---

[৫০] সাক্ষাৎকার: উমা সরকার, মুক্তিপাড়া, বামুনগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: মুক্তিপাড়া, ২৬ মে ২০০৮।

[৫১] সাক্ষাৎকার: অনিল সরকার, মন্ত্রী, প্রদেশ সরকার, ত্রিপুরা, ভারত। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ত্রিপুরা ভবন, কলকাতা, ২০শে মে ২০০৮।

[৫২] তদেব।

গুরুচরণ মল্লিক, বড়বাজারের মল্লিকরা, এবং বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবু ও লাটুবাবু। এছাড়া তখন বর্ধমান, চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরের রাজারাও কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন।[৫৩]

পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্পর্কে যতোটা জানা যায়, সেখানেও দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জমিদারশ্রেণিই কবিগানের আয়োজন করেছেন। জমিদারি প্রথার অবসানের পরে প্রধানত বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ বা সংস্থা-সংগঠনের উদ্যোগে কবিগান চর্চা অব্যাহত থাকে। আর্থিক সচ্ছলতা থাকার কারণে জমিদারদের পক্ষে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা খুব একটা কঠিন ছিলো না। একই কারণে অনেক জমিদার প্রতিবেশী ও প্রতিপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার পরে গ্রাম ও শহরের বিত্তবান ব্যক্তি বা সংগঠন-সংস্থা আয়োজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একই প্রক্রিয়ায় এই ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন-সংস্থা নিজ নিজ এলাকার আঞ্চলিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে কবিগান আয়োজন অব্যাহত রাখেন। বিশ শতকের শেষ দিকে সরকারি উদ্যোগে নানা ধরনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে কবিগানের আয়োজন করা হয়। শহর ও নগরের প্রদশর্নীকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতেও কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদি কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে।

আর্থিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক থাক বা না থাক; শ্রোতারাই যে কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রোতাদের আগ্রহ, তাদের প্রাসঙ্গিক অনুরোধ-উপরোধ, সর্বোপরি শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কবিয়ালদের সৃজনশীলতা উৎসাহিত করে। শ্রোতাদের সঙ্গে এই চমৎকার মিথস্ক্রিয়ায় রচিত হতে পারে এমন সব গানের কলি, যা হয়তো অন্য কোনো সময়ে ঐ কবিয়ালের পক্ষে রচনা করাই সম্ভব নয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ববঙ্গের কবিগানের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন দীনেশচন্দ্র সিংহ, এ প্রসঙ্গে যা উদ্ধৃতিযোগ্য : "গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব প্রকাশ এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষ কবিয়াল কর্তৃক বক্তার বক্তব্যের ভাবরস বজায় রেখে বিপরীতধর্মী জবাব দান—পূর্ববঙ্গের কবিগানের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। যাঁরা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তাঁরা গানগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্র মনে শ্রবণ করে ভাষান্তরালে লুক্কায়িত উত্তরদানযোগ্য ভাবগুলি স্মরণে রাখেন, এবং বিপক্ষ সরকারের কাছে ঐ জাতীয় পদগুলির সরস জবাব শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন যাঁরা গানের জবাবে এমন আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে, সরকার

---

[৫৩] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌরবঙ্গ-সংস্কৃতি* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭২), পৃ. ১৩২; প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. এগারো।

মহাশয়েরা জবাবের ফুকারের ত্রিপদীটি বলবার সময়ে দুটি পদ বলতেই তাঁরা শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। একি সামান্য অনুভূতি! কবির মনের ভাব গ্রহণ করে সে ভাবের অভিব্যক্তি যাদের মুখে বক্তার বক্তব্য প্রকাশের পূর্বেই ব্যক্ত হয়, তাঁদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না।"[৫৪]

৯. কবিগানের ভূগোল

বিশেষ কোনো লোকসঙ্গীত বিশেষ কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এমনকি তার বিকাশও ঘটে নির্দিষ্ট কোনো এলাকাকে ঘিরে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক ভূগোলের উল্লেখ করা যায়: যেমন উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গ বাউল এবং পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালি গানের অঞ্চল। কবিগানের ভৌগোলিকতা এমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলকে কবিগান চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। কবিগানের উদ্ভবপর্বে বিশেষভাবে আঠারো শতকে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন বলে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের অধিকাংশের জন্মস্থান বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে।[৫৫] এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে রাঢ় অঞ্চলকে ঘিরেই কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিলো। এর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রায় পুরোটা জুড়ে কলকাতাই হয়ে উঠেছিলো কবিগানের লালন ও চর্চার কেন্দ্রভূমি। সমকালীন জমিদারদের কল্যাণে এ সময়ের কবিগান বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বিশ শতক নাগাদ দেখা যায় কবিগান কলকাতা থেকে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসছে এবং প্রধানত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে এর চর্চা সীমাবদ্ধ থাকছে। আবার বিশ শতকের শেষ দিকে এসে গঠনগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কবিগানকে পাওয়া যায় বাংলাভাষী প্রায় সব অঞ্চলে। এভাবে কালপরিক্রমায় কবিগানের ভূগোলে বেশ বড়ো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলার অন্য কোনো লোকসঙ্গীতের ভূগোল ঠিক এতোটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় না।

কবিগানের এই ভূগোলকে কাল ও স্থানসাপেক্ষে বড়ো ধরনের মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যায়। প্রথমত রাঢ় অঞ্চল, দ্বিতীয়ত কলকাতা অঞ্চল, তৃতীয়ত পূর্ববঙ্গ অঞ্চল, এবং চতুর্থত অনুবর্তন কালীন সম্পূর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চল।

রাঢ় অঞ্চলে উদ্ভূত এই কবিগানের গুণগত মান উনিশ শতকের সমৃদ্ধ কলকাতার শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে থাকবে। শ্রোতাদের সমৃদ্ধি গায়কের সমৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলার

---

[৫৪] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত*, পৃ. ২৯১।

[৫৫] যেমন গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর প্রধান তিন শিষ্য লালু নন্দলাল, রামজী দাস ও রঘুনাথ দাসের জন্মস্থানের জন্য পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

কারণে কলকাতা এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেকে কবিগানের পেশায় আসতে শুরু করেছিলেন। এ সময়ে এই পেশার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের জড়িত করেছিলেন, তাঁদের বেশ বড়ো একটি অংশ আর্থিকভাবে বিত্তবান, এমনকি সামাজিকভাবেও মর্যাদাবান ছিলেন। গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর প্রধান শিষ্যের পদবি দেখে বোঝা যায়, তাঁরা কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবিগান কলকাতায় স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদের বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটে। অনেক ভূস্বামী শখের দল গঠন করেন, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান এই পেশায় এগিয়ে আসেন, এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার একাধিক ফিরিঙ্গিকেও এই পেশা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকে কলকাতার যেসব এলাকায় কবিগানের আসর বসতো তার মধ্যে শোভাবাজার, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, বউবাজার, তারকেশ্বর, বরানগর, কাশিমবাজার প্রভৃতি এলাকার নাম বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। এ সময়ে চন্দননগর (ফরাসডাঙা), চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম, বীরভূম জেলার সিউড়ি, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলেও কবিগান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৫৬] পাশাপাশি কলকাতার জমিদারদের মফস্বলের জমিদারি এলাকাগুলোতেও কবিগান পরিবেশিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম খ্যাতিমান কবিয়াল ভোলা ময়রা এই সূত্রে প্রায় নিয়মিতভাবেই চব্বিশ পরগনা, হুগলি, মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় কবিগান পরিবেশন করতেন।[৫৭] কবিগানে আবশ্যিকভাবেই যেহেতু দুইজন কবিয়াল ও দুইটি কবির দলের প্রয়োজন, সেহেতু এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণকেও ঐসব অঞ্চলে গিয়ে গান পরিবেশন করতে হয়েছে। কলকাতার এই কবিয়ালদের গ্রামবাংলায় নিয়মিত আগমনের ফলে যে শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরি হয়, সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর ক্রমবর্ধমান চাহিদাই গ্রামবাংলায় নতুন নতুন কবিয়ালের জন্ম হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ কবিগান এভাবে সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খোদ কলকাতা থেকে কবিগান লোপ পেতে শুরু করে।[৫৮] সঙ্গত কারণে মফস্বলে তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের সব অঞ্চল থেকে লুপ্ত হতে শুরু করলেও ঠিক এই সময়ে পূর্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে কবিগান নতুনভাবে উজ্জীবিত হয় এবং পুরো বিশ শতক জুড়ে পূর্ববঙ্গে কবিগানের চর্চা অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে হতে থাকে।

---

[৫৬] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. নয়।

[৫৭] ধর্মানন্দ মহাভারতী, "ভোলা ময়রা," *সাহিত্য সংহিতা* (কলকাতা), মার্চ-এপ্রিল ১৯০৫, পৃ. ৬৫৮।

[৫৮] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১।

কবিগানের এই বিশ শতক পর্ব প্রধানত পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক। বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর জেলায় এ সময়ে কবিগানের চর্চা অব্যাহত থাকে এবং অনেক প্রতিভাবান কবিয়ালের জন্ম হয়। বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের এই কবিগানেও একাধিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে খুলনা-বরিশাল অঞ্চলের কবিগানের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের যেসব অঞ্চলে কবিগান সর্বাধিক চর্চিত হয়, তার মধ্যে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, জয়দেবপুর (গাজিপুর), চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জ), বরিশাল, ঝালোকাঠি, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, নড়াইল প্রভৃতি অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে কবিগানের অন্তত দুটি কেন্দ্রের নাম আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। একটি হলো ঝালোকাঠি। এখানে অনেকগুলো কবিগানের দল ছিলো, কবিয়াল এবং দোহারগণ কবিগানের মৌসুম শুরু হওয়ার সূচনায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে জড়ো হতেন। অন্যটি ঢাকার সদরঘাট এলাকা। দুর্গা পূজা শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পানসি নৌকা করে কবিয়ালগণ তাঁদের দলবলসহ এখানে এসে জড় হতেন।

১০. উপসংহার

কবিগানের আসরে কবিয়াল এবং দোহারগণ মিলে যা পরিবেশন করে থাকেন, তাকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : এক. গান; এবং দুই. ছড়া। আকারের দিক দিয়ে গানগুলোকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তবে সুরের দিক দিয়ে গানগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রভৃতি নানা শাখার গান যেমন কবিগানে এসে মিশেছে, তেমনি বাংলাদেশের লোকযাত্রা ও লৌকিক ধরনের কথকতার এক ধরনের সমন্বয় কবিগানে ঘটেছে। এই মিশ্রণ ও সমন্বয় কোনো একজনের হাতে বা কোনো এক বিশেষ এলাকায় বা কোনো নির্দিষ্ট কালপর্বে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছিলো, এমন মনে হয় না। হয়তো ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকার কবিয়ালদের আলাদা আলাদা উদ্যোগের মাধ্যমে কবিগান তার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিক ও প্রকরণ অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে এ কথা হয়তো বলা যায় যে, কবিগান নামের যে কাঠামো আঠারো শতকের নিকটবর্তী সময়ে উদ্ভূত হয়েছিলো, প্রথম থেকেই তার মধ্যে যাবতীয় লোকসঙ্গীত ও লোকনাট্যিক উপাদান ধারণ করার মতো চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়েই সে জন্মেছিলো। এ জাতীয় গানের কোনো উদাহরণ বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, আঠারো শতকে কলকাতার অভূতপূর্ব পরিবেশই কবিগানের মতো এমন জটিল একটি সঙ্গীতশৈলী উদ্ভবের সবচেয়ে বড়ো কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিগানের উদ্ভব ও কলকাতা পর্ব

১. সূচনা

ঠিক কোন সময়ে, বাংলার কোন অঞ্চলে, কোন পটভূমিতে, কী কী লোকসঙ্গীতের সমন্বয়ে, কোন শ্রেণির লোকশিল্পীদের দ্বারা কবিগানের উদ্ভব ঘটে—সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উনিশ শতকের কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে কবিগান যে জনপ্রিয় একটি বিনোদনমাধ্যমে পরিণত হয়েছিলো, একাধিক উৎস থেকে সে সম্পর্কে জানা যায়। সেইসব উৎস থেকে এটাও জানা যায় যে, আঠারো শতক থেকে কলকাতার অদূরবর্তী অঞ্চলসমূহে কবিগান অন্যতম একটি বিনোদন-মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এরও পূর্ববর্তী কোনো শতকে কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিলো কিনা, নাকি আঠারো শতকেই এর জন্ম, এ নিয়ে আলোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে হুগলি জেলার হুগলি, চুঁচুড়া ও চন্দননগর, এবং বীরভূম জেলার সিউড়িতে কবিগান চর্চার ছোটোখাটো কেন্দ্র গড়ে উঠলেও কলকাতাই ছিলো কবিগান চর্চার মূল কেন্দ্র। আলোচ্য কালপর্বে কলকাতার এই গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচকগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। বর্তমান অধ্যায়ে কবিগানের উদ্ভবপর্ব এবং এর অব্যবহিত পরে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বিকাশপর্বের উপরে আলোকপাত করা হবে।

২. কবিগানের উদ্ভব

উদ্ভবকাল

কবিগানের উদ্ভবকাল সংক্রান্ত তথ্যাদি লিখিতভাবে না পাওয়ার কারণে গবেষকগণকে অনুমানের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়, তাতে নানা মতের জন্ম হয়। এইসব মত বিশ্লেষণ করে আসল সত্যে পৌঁছানো হয়তো কঠিন, তবে এর কোনো বিকল্পও নেই। কবিগানের উদ্ভবকাল সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীনত্বের দাবিদার ময়মনসিংহের কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্য। বিশ শতকের প্রথম দিকে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় তিনি দাবি করেছিলেন যে, নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' রচনার সময় থেকে পূর্ববঙ্গে কবিগান চালু ছিলো।[১] নারায়ণদেবের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ষোলো

---

[১] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহের কবিগান," *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৭, পৃ. ২৬৬।

শতক।[২] এই দাবি অনুযায়ী কবিগানের উদ্ভব ষোলো শতকেরও পূর্বে মনে করতে হয়। কিন্তু ঐ সময়ের সাহিত্যকর্ম বা অন্য কোনো উৎসে কবিগানের উল্লেখ নেই।

রাজা সীতারাম রায়ের জীবনীকার যদুনাথ ভট্টাচার্য দাবি করেন যে, সীতারাম রায়ের রাজধানীতে (মাগুরা অঞ্চলে) অন্যান্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে কবিগানেরও আয়োজন করা হতো।[৩] সীতারাম রায় আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই দাবি মেনে নিলে আঠারো শতকের সূচনায় যশোর অঞ্চলে কবিগানের অস্তিত্ব ছিলো বলতে হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে এসব দাবি মেনে নেওয়া কঠিন।

'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য দাবি করেন যে, ১৪৬৪ সালে রথযাত্রার সময়ে (জুলাই মাসের দিকে) যশোর জেলার ভাটকলাগাছি গ্রামে হরিদাস ঠাকুর তথা যবন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ কোঠী তাঁদের নিজ নিজ দল নিয়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর এইগান শান্তিপুর হয়ে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয় এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যের দলের গান সংস্কার করে দেন। গঙ্গাচরণের ধারণা নবদ্বীপ থেকে চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় গিয়ে এই গান ক্রমে কবিগান বা কবির লড়াইয়ে পরিণত হয়।[৪] গঙ্গাচরণের এই মত প্রত্যাখ্যান করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বৈষ্ণব ভক্তগণ কৃষ্ণকথা নিয়ে সংগীতসংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন, হোক তা 'সখ্যসংগ্রাম'—এবং গানের আখড়া স্থাপনের জন্য গ্রামে-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াবেন একথা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[৫]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ প্রায় সকলেই কবিগান সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গত এর উদ্ভবকাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এঁদের অধিকাংশের মত ঈশ্বর গুপ্ত প্রদত্ত তথ্যের উপরে নির্ভরশীল এবং তার ফলে সঙ্গত কারণেই তাঁরা কবিগানের জন্ম আঠারো শতকের পেছনে নিয়ে যেতে চান না। যাঁরাও বা একটু যেতে রাজি থাকেন, তাঁরাও কোনোক্রমে সতেরো শতকের শেষার্ধের পূর্বে যেতে রাজি হন না। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে-র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "কবিসঙ্গীতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে আঠারো শতকের সূচনায় অথবা বড়ো জোর সতেরো শতক পর্যন্ত, তবে ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সময়ই কবিয়ালদের চূড়ান্ত বিকাশের কাল।"[৬] নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে

---

[২] *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), "মঙ্গলকাব্য" ভুক্তি।

[৩] নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৮), পৃ. ৩০।

[৪] নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৯।

[৫] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃ. ২৩৯।

[৬] "The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th, but the most flourshing period of the

এই মত সমর্থন করেন এবং সেই অনুযায়ী কলকাতাকেন্দ্রিক কবিগানকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। তাঁর মতে কবিগানের প্রথম স্তর হলো সূচনা কাল থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত কালপর্ব, দ্বিতীয় স্তর হলো ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কালপর্ব, এবং তৃতীয় স্তর হলো ১৮৩০ থেকে পরবর্তী কাল পর্যন্ত।[৭]

আঠারো শতক থেকে কবিগান পরিবেশন করে আসছিলেন, এমন কয়েকজন কবিয়ালের জীবনকথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৮] এটিই কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য। আঠারো শতকের সূচনায় অর্থাৎ ১৭০০ সালের নিকটবর্তী সময়ে গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাবের কথা ঈশ্বরচন্দ্র উল্লেখ করেন। তাঁর ধারণা, গোঁজলা গুঁই পেশাদার কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।[৯] ঈশ্বর গুপ্তসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল আলোচক গোঁজলা গুঁইকে আদিতম কবিয়াল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া কবিয়ালগণও তাঁদের টপ্পা-পাঁচালির প্রাসঙ্গিক অংশে গোঁজলা গুঁইকে কবিগানের প্রবর্তক হিসেবে বর্ণনা করেন।[১০] কবিগানে যেহেতু বিপক্ষ কবিয়ালের উপস্থিতি অপরিহার্য, তাই যৌক্তিকভাবে ধরে নিতে হয় যে গোঁজলা গুঁইকে তাঁর শিষ্যদের বিপক্ষে কবিগান করতে হয়েছিলো। তাঁর শিষ্যদের প্রায় সকলেরই আবির্ভাবকাল ১৭২৫ সালের কাছাকাছি। তাই এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, ১৭৫০ সালের দিকে গোঁজলা গুঁই এবং সহযোগীগণ কবিগানের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন।[১১]

উদ্ভবস্থল

গোঁজলা গুঁইকে যদি কবিগানের আদিকবি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গোঁজলা গুঁইয়ের কর্মক্ষেত্রই কবিগানের উদ্ভবস্থল। কিন্তু সমস্যা হলো, গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য

Kabiwalas was between 1760 and 1830." Suhsil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (2n ed.; Kolkata: Firma K L Mukhopadhyay. 1962). p. 277.

[৭] নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩১।

[৮] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই রচনাগুলো পরে 'কবিজীবনী' নামের স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে স্থান পায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, ভবতোষ দত্ত সম্পা. (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮), পৃ. ১৩৫–৩৬৫।

[৯] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ৩৪৫–৪৬।

[১০] বর্তমান গ্রন্থের ৮ নং পরিশিষ্টে কবিগানের নমুনা অংশে টপ্প-পাঁচালি দ্রষ্টব্য।

[১১] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণাও এই মতের অনুকূল। তিনি সমকালীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার পরে মনে করেন, "১৬৯৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল-ব্যাপী এই অশান্তির মধ্যে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কবির গানের উদ্ভব হইয়াছিল।" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭২), পৃ. ১১৯।

পাওয়া যায় না। তবে সুনিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য থেকে কবিগানের উদ্ভবস্থল সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। যেমন গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মস্থান ও বংশপরিচয় সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ কোনো তথ্য প্রদান করতে না পারলেও তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যদের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহ করেছেন। গোঁজলা গুঁই যদি আদিকবি হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে তাঁর শিষ্যদের বিপরীতে গান করতে হয়েছে। অতএব তাঁর শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রই পুরোপুরিভাবে তাঁরও কর্মক্ষেত্র ছিলো। এই যুক্তিতে গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রকে নিঃসন্দেহে কবিগানের উদ্ভবস্থল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গোঁজলা গুঁইয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিন জন। এঁদের জন্মস্থান নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র লালু নন্দলালের জন্মস্থান নির্দেশ করেন হুগলি জেলার চুঁচুড়া অঞ্চলকে।[১২] কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র পালের ধারণা লালু নন্দলালের জন্মস্থান বীরভূম।[১৩] একইভাবে গোঁজলা গুঁইয়ের অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস তাঁর একটি গানে নিজেকে কলকাতার শিমুলিয়াবাসী বলে দাবি করলেও ঈশ্বর গুপ্তের মতে তাঁর জন্মস্থান ছিলো হুগলির চন্দননগর (ফরাসডাঙা)।[১৪] অন্যদিকে গবেষক নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে তাঁর জন্মস্থান ছিলো হুগলি জেলার চুঁচুড়া। গোঁজলা গুঁইয়ের অন্য এক শিষ্য রামজী দাসের জন্মস্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করতেন তিনি বীরভূম অঞ্চলের কবিয়াল, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত অনুযায়ী তিনি হুগলি জেলার অধিবাসী ছিলেন।[১৫] গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যত্রয়ের জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সকলে অন্তত দুটি অঞ্চলের মধ্যে তাঁদের জন্ম হয়েছিলো বলে মনে করেন: একটি হুগলি, অন্যটি বীরভূম। এই তথ্য বিবেচনায় রাখলে গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মস্থানও এই দুটি জেলার মধ্যে অথবা এর নিকটবর্তী কোনো জেলায় হওয়ার কথা।

গোঁজলা গুঁইয়ের নাম এবং পদবি খানিকটা ব্যতিক্রমধর্মী। নাম-পদবির এই ধরন দেখে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তিনি আঠারো শতকের লোক, যখন বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া জোরালোভাবে শুরু হয়নি। এছাড়া গুঁই পদবি থেকে মনে হয় তিনি আগুরি বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১৬] আগুরি সম্প্রদায়ের বাস প্রধানত বর্ধমান অঞ্চলে। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, গোঁজলা গুঁই আঠারো শতকের সূচনায় বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

---

[১২] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. উনসত্তর।

[১৩] তদেব, পৃ. সত্তর।

[১৪] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ৩৪৬।

[১৫] নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪৫; প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. একাত্তর-বাহাত্তর।

[১৬] লোকেশ্বর বসু, *আমাদের পদবীর ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১), পৃ. ৮১।

তিন প্রধান কবিয়ালের শিষ্যবর্গকেও নিকটবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। সমকালের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় রাখলে এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, প্রথম দিকে গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর অনুসারীদের চারণক্ষেত্র বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। অঞ্চলটিকে এক কথায় রাঢ় অঞ্চল নামে অভিহিত করা যায়। এই রাঢ় অঞ্চলে তখন এমন কিছু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠা সম্ভব, যা কবিগান নামক সঙ্গীতশাখার উদ্ভবের কারণ হয়।

এ প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের দাবি একটি দিক দিয়ে বিবেচনাযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, কবিগান যশোরের ভাটকলাগাছিতে উদ্ভূত হয়ে পরে শান্তিপুরে যায়, সেখান থেকে চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় পৌছায়।[১৭] উদ্ভব সংক্রান্ত গঙ্গাচরণের দাবি হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তিনি স্থানানুক্রমের ভাটকলাগাছি-শান্তিপুর-চুঁচুড়া-কলকাতার যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেন এবং তাতে চুঁচুড়াকে যেভাবে গুরুত্ব দান করা হয়, তাতে মনে হয়, আঠারো শতক নাগাদ চুঁচুড়া অঞ্চলটি কবিগান বা এই জাতীয় সঙ্গীত-সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

হুগলি এবং বীরভূমের মধ্যে মাঝখানে বর্ধমান জেলা। একদিকে হুগলি একেবারে কলকাতার নিকটে, অন্যদিকে বীরভূম বাংলার প্রত্যন্ত পশ্চিমে। কোনো এক ব্যক্তির জন্মস্থান নিয়ে যখন উভয় স্থানের দাবি ওঠে, তখন এমন মনে করা হয়তো স্বাভাবিক যে, একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও অন্য অঞ্চলের কর্মব্যাপদেশ ক্রমে তাঁকে অন্য অঞ্চলে স্থায়ী হতে বাধ্য করে। কালক্রমে সেই অঞ্চলই তাঁর জন্মভূমি হিসেবে মানুষের নিকট ধারণা সৃষ্টি করে। লালু নন্দলালের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে যে, কবিগান প্রথমে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বর্ধমান ও বীরভূম থেকে খ্যাতিমান কবিয়ালগণ হুগলি অঞ্চলে অভিবাসিত হতে শুরু করেছিলেন এবং হুগলি অঞ্চলের শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটেছিলো। সমকালীন যাতায়াত ব্যবস্থার দুরবস্থার বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে এই ধরনের অভিবাসনকে অস্বাভাবিক মনে হবে না।

উদ্ভাবক

প্রাসঙ্গিক প্রায় সকল আলোচকই গোঁজলা গুঁইকে কবিগানের আদিকবি বা উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকার করেন। কবিগানের পরিবেশনের রীতি বিবেচনায় রাখলে বিশেষ কোনো একজনকে কবিগানের উদ্ভাবক বলাটা খানিকটা অসঙ্গতিপূর্ণ; বিশেষভাবে যে গানে অন্তত দুজন কবিয়ালকে পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এই যুক্তিতে গোঁজলা গুঁইয়ের ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তী তিন শিষ্যকেও কবিগানের উদ্ভাবকের

---

[১৭] নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৯।

সারিতে নিয়ে আসা যায়। বিভিন্ন উৎস থেকে এঁদের সম্পর্কে যতোটুকু জানা যায়, তা নিম্নরূপ।

১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আদি কবিয়াল হিসেবে গোঁজলা গুঁইয়ের নাম সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। তিনি জানান, "১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল 'গোঁজলা গুঁই' নামক এক ব্যক্তি পেসাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।"[১৮] ঠিক কোন অঞ্চলে তিনি কবিগান করতেন, ঈশ্বর গুপ্ত তা উল্লেখ করেননি। তবে জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন, হুগলি জেলার বর্ধিষ্ণু অঞ্চলগুলিতে তিনি কবিগান পরিবেশন করতেন বলে মনে হয়। ঈশ্বরগুপ্ত গুঁইয়ের রচিত দুটি গানের অংশবিশেষ, গান পরিবেশনের রীতি এবং তাঁর প্রধান তিন শিষ্য সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন, গুঁই সম্পর্কে এর বেশি জানা যায় না।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় গোঁজলা গুঁইয়ের দুটি গান উদ্ধৃত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম গানটিকে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়। সেটি নিম্নরূপ :

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥[১৯]

আপাত দৃষ্টিতে উনিশ-বিশ শতকে কবিগানের প্রথমে পরিবেশনযোগ্য ডাক জাতীয় গানের গঠনের সঙ্গে প্রথম গানটির খানিকটা মিল পাওয়া যায়, যদিও বিষয়ের কথা বিবেচনা করলে এটিকে সখীসংবাদ ধরনের মনে হতে পারে। কিন্তু সখীসংবাদ জাতীয় গানে এক ধরনের প্রশ্ন থাকে, যা চাপান বা উতোর নামে পরিচিত, তা এখানে অনুপস্থিত।

গোঁজলা গুঁইকে আদি কবিয়াল বললেও প্রমাণের এই অভাব স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তকেও ভাবিত করেছিলো বলে মনে হয়। কেননা টপ্পার মতো এই গানের প্রথমে মহড়া এবং পরে চিতেন অংশ রয়েছে। এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জানান যে,

---

[১৮] উদ্ধৃত, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪১।
[১৯] উদ্ধৃত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ৩৪৭–৪৮।

গোঁজলা গুঁইয়ের সমকালে 'অগ্রে চিতেন ধরিয়া গাহনার প্রথা ছিল না, টপ্পার নিয়মানুসারে প্রথমে মহড়া ধরিয়া পরে পরে চিতেন ও অন্তরা গাহিত।'[২০]

মহড়া এবং চিতেনের এই স্থানবদলের বিষয়টি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। আবার এমনও হতে পারে যে, কবিয়াল নিজেই মহড়া এবং চিতেনকে অদল-বদল করে লিখেছিলেন কিনা। বিশ শতকের কবিগান সংগ্রহ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সিংহকে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, "কবিয়ালদের গানের খাতায় এসব গান লিখবার বেলায় এক অদ্ভুত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে—যার সঙ্গে গাইবার ধারার কোন মিল নেই। গান লিখবার ক্ষেত্রে এ রকম কিম্ভূত ধারা অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, গানের খাতা হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে, অন্য দল যাতে গানের আদ্য মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ বুঝতে না পারে, তাই তারা গানটিকে তিন অংশে বিভাজন করে উল্টেপাল্টে লিখে থাকেন।"[২১] আবার এক এক ধরনের গানের তুকবিন্যাস এক এক রকমের হয়ে থাকে। টপ্পা গানে যেটা মহড়া, কবিগানে সেটা চিতেন; অথবা টপ্পা গানে যেটা চিতেন, কবিগানে সেটা মহড়া নামে পরিচিত ছিলো কিনা, সে সম্পর্কেও সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কবিগানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর এমন কৈফিয়ত দিতে দেখে সন্দেহ হয়, গোঁজলা গুঁইয়ের নামে প্রচলিত গান দুটি আদৌ কবিগান কিনা।

৩. কবিগানের পৃষ্ঠপোষক

'একাকী গায়কের নহে তো গান'—রবীন্দ্রনাথের এই চরণটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত কোনো গান তৈরি হয় তখন, যখন সেই গান শোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও শ্রোতার জন্ম হয়। কবিগানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর শিষ্যদের আবির্ভাবকাল বিবেচনা করে মনে করা যেতে পারে যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় কবিগানের উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে কলকাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বোঝা যাবে, কবিগানে তখন কারা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তখনকার সামাজিক পটভূমিই বা কেমন ছিলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব চার্নক ১৬৯০ সালে কলকাতায় তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলে। এর পর থেকে কলকাতা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ তখন বাংলার রাজধানী হলেও বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্যিক নগর হিসেবে কলকাতা বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯১০ সাল নাগাদ কলকাতার জনসংখ্যা ছিলো বারো হাজারের মতো, ১৮৬০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা

---

[২০] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ৩৪৮।

[২১] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ঞ।

বেড়ে হয় দুই লক্ষ দশ হাজার, এবং আরো পঞ্চাশ বছর পরে (১৮১৪ সালে) তা হয় সাত লক্ষের বেশি।[২২] অর্থাৎ একশো বছরের মধ্যে কলকাতা শহরের জনসংখ্যা প্রায় একশো গুণ বৃদ্ধি পায়। এই একটিমাত্র তথ্য থেকে কলকাতার দ্রুত বিকাশের বিষয়টি আঁচ করা যাবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলায় মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে (১৭১৭–১৭২৭) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি করে, কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপরে তার প্রভাব পড়ে। এই সময়ে কলকাতায় আগত বিদেশি জাহাজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। জাহাজের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরে দেশীয় ব্যবসায়ী, দালাল ও কুলি-মজুরদের আগমন বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭–১৭৩৯) বাংলার ক্ষমতায় আরোহণ করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বাড়ে। আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৮৪০–১৭৫৩) সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়। এভাবে ১৭১৭ সালে দিল্লির সম্রাট ফররুখ সিয়ার কর্তৃক কলকাতার নিকটবর্তী যে ৩৮টি গ্রামের উপরে কোম্পানি জমিদারি অর্জন করে, শতাব্দী কালের মধ্যেই তা কলকাতা মহানগরীতে পরিণত হয়।[২৩]

বিকাশমান এই কলকাতায় ইংরেজ বণিক শ্রেণির পাশাপাশি ভিড় করতে থাকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যস্বত্বভোগীগণ, বিভিন্ন মাত্রার জমিদারি যাদের আয়ের উৎস। এভাবে ভিড় করার পিছনে একাধিক কারণ কাজ করে থাকবে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি (১৭৪০ ও ১৭৫০-এর দশক) মারাঠা দস্যুদের বাংলা আক্রমণের সময়ে কলকাতা নিরাপদ ছিলো। প্রথম দিকে তাই নিরাপত্তাবোধ থেকে অনেকে কলকাতায় বসবাস করাটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকবেন। এরপর আঠারো শতকের শেষ নাগাদ বাংলার শাসনভার পুরোপুরি কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ায় কলকাতার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে প্রথমে বার্ষিক বন্দোবস্ত এবং শেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রভৃতির মাধ্যমে কলকাতার উঠতি ধনিক শ্রেণির মধ্য থেকে বড়ো একটি অংশ রাতারাতি জমিদারে পরিণত হয়। তার ফলে কলকাতায় বসবাসকারী বিত্তবানদের মধ্যে জমিদার শ্রেণির বিত্তবানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

আঠারো শতকের কলকাতায় নতুন এই বিত্তবান শ্রেণি প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষায় কমবেশি শিক্ষিত ছিলেন, তা অনুমান করা যায়। কারণ সমকালীন হিন্দু সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী বিশেষ কিছু জাত, যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য কিছু সৎ শূদ্র জাতের মধ্যে লেখাপড়ার অধিকার সীমিত ছিলো। আবার এইসব জাতের লোকজনই মুসলিম শাসনামলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে ক্ষমতাবলয়ের কাছাকাছি বাস করতো। অর্থাৎ সামাজিকভাবে যারা মর্যাদা ভোগ করতো, অর্থনৈতিকভাবেও

---

[২২] বিনয় ঘোষের বরাতে তথ্যটি প্রদান করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫।

[২৩] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" ভুক্তি।

তাদের উন্নতি করার সুযোগ থাকতো। সেই সুযোগ যে যথাযথভাবে কাজে লাগে, তা বোঝা যায়, সমকালে কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের পদবি দেখে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে এরা সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণির। কয়েক শতাব্দী ধরে এই জাতগুলো এমন একটি সামজিক বলয় সৃষ্টি করে রাখে, যাতে এরা ছাড়া আর কারো পক্ষে ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসা সম্ভব হয় না। তাই আঠারো শতকের জমিদারদের সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে, এবং বলা হয়েছে এর ফলে অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোকজন হঠাৎ জমিদার হয়ে ক্ষমতার বলয়ে প্রবেশ করেছে, তা আদপে সত্য নয়।[২৪] বস্তুত শাসকের বদল হলেও জমিদার শ্রেণির সামাজিক পরিচয়ে বিশেষ কোনো হেরফের ঘটেনি। নতুন কিছু জমিদারের সৃষ্টি হলেও আসলে তা অভিন্ন সামাজিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা। ফলে মুসলিম শাসনামলের জমিদারদের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত যেসব বৈশিষ্ট্য ছিলো, আঠারো শতকের জমিদারদের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার থেকে আলাদা কিছু হয় না।

আঠারো শতকে উদ্ভূত কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নতুন এই জমিদার শ্রেণির রুচিকে কটাক্ষ করা তাই অমূলক। কারণ মুসলিম শাসনামলের জমিদারগণও অভিন্ন রুচির অধিকারী ছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদারদের তুলনায় তাঁদের রুচি ও জীবনবোধ অনুন্নত ছিলো, তা বোধগম্য; কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ আমলে নতুন জমিদার তৈরি না হলে জমিদারদের রুচি ও সংস্কৃতি উন্নততর থাকতো, এমন কল্পনা অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত নবদ্বীপের কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০–১৭৮৩) উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কলকাতা থেকে বেশ দূরে বাস করতেন। কিন্তু রুচির দিক দিয়ে কলকাতার জমিদারদের চেয়ে তিনি খুব ভিন্ন ছিলেন না। জানা যায়, তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার নবমীর দিনে নবমী কীর্তন উপলক্ষে মহিষ বলিদানের পর

---

[২৪] প্রসঙ্গত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য: "অনেকের জমিদারি বিকিয়ে গেল। ফলে যে-অভিজাত সম্প্রদায় শিক্ষা-সংস্কৃতির গোষ্ঠিপতি ছিলেন তাঁদের স্থানে কোম্পানীর অনভিজাত প্রায়-মূর্খ গোমস্তা মুৎসুদ্দীর দল উৎকোচের টাকার বিনিময়ে রাতারাতি জমিদার বনে গেল। এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্বোক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল।" *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭। অসিতকুমারের এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করে মনে হয়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম শাসনামলের জমিদারগণ অভিজাত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং ইংরেজ আমলের জমিদারগণ অনভিজাত, 'প্রায়-মূর্খ' ও অমার্জিত-রুচির ছিলেন। বলেছেন, ইংরেজ আমলে টাকার বিনিময়ে জমিদার হওয়া যেতো। মুসলিম আমলের জন্যও যে সে কথা সত্য, সেটি তিনি বিবেচনা করেননি। তাছাড়া, রাজস্ব-সংগ্রাহক (গোমস্তা) পদের জন্য যথেষ্ট বিদ্যার দরকার এবং দপ্তরের বড়ো-বাবু (মুৎসুদ্দী) পদটির জন্যও ভালো লেখাপড়া জানতে হয়; এমনকি প্রায় ক্ষেত্রে জমিদারদের থেকেও তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বেশি থাকে, তা সকলের জানা। তাই বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এদের 'প্রায়-মূর্খ' বলেন, তখন তিনি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন।

উপলক্ষে কাদাখেউড় নামে একটি অনুষ্ঠান হতো। এই অনুষ্ঠানে তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্ররা অশ্লীল গান রচনা করতেন এবং গাইতেন।[২৫]

আঠারো শতকে কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে, তাঁরা স্থূল রুচির, তাঁরা হৈ-হল্লা করে জীবন কাটাতে পছন্দ করে, তাঁরা বারাঙ্গনাবিলাসী, তাঁরা ঘুড়ি ও কবুতর ওড়ানোর প্রতিযোগিতা করে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু যখন অভিযোগ করা হয়, তাঁরা গানের আসর বসায়, সারারাত ধরে গান শোনে, তখন সেই অভিযোগ প্রশংসার মতো শোনায়। বস্তুত আঠারো শতকের কলকাতায় বসবাসকারী এইসব জমিদারই ছিলেন কবিগানের মূল উদ্ভাবক। তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এই ধরনের একটি সঙ্গীত-মাধ্যমের জন্ম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি যে-কবিগানের জন্ম হলো, তা এই সময়ের জমিদারদের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার ফল। বস্তুত কবিগানের জন্ম সফল করতে তাঁরা অর্থ ব্যয় করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন। তার ফলে জন্ম হয়েছে বহু সফল কবিয়ালের, যাদের হাতে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে কবিগান। অর্থাৎ প্রথম দিকে শুরু হওয়া কবিগান এই জমিদারদের আগ্রহ অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে, সংশোধিত হয়েছে, পরিমার্জিত হয়েছে এবং ক্রমে কবিগান হয়ে উঠেছে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো কোনো জমিদার এর পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, অনেকে নিজেদের উদ্যোগে কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।

কবিগানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী জমিদারদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর এবং তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ দেববাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করেন:

> কবি।. রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনি কবিগাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন।[২৬]

সমকালের জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণি বিভিন্নভাবে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। কেউ শখের দল করেছিলেন, কেউ বিভিন্ন উপলক্ষে কবিগানের

---

[২৫] নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পা., *বিশ্বকোষ*, "কবি" ভুক্তি।

[২৬] কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (পুনর্মুদ্রণ: কলকাতা: মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৩৮।

আয়োজন করেছিলেন, আবার খিদিরপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের মতো কেউ কবিগান সংকলনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। যাঁরা কবিগানের দল গঠন করে কবিগানের বিকাশে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশীয় জমিদারগণ, জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশীয় জমিদারগণ, গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক ও বাবুমোহন বসাক, শোভাবাজার কালীশঙ্কর ঘোষের উত্তরাধিকারীগণ, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যাঁরা কবিগানের আয়োজন করে কবিগানের বিকাশে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাগণ, নবদ্বীপের মহারাজাগণ, মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারস্থ রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুর, পটলডাঙার রূপনারায়ণ ঘোষাল, কলকাতা দয়েহাটার গুরুচরণ মল্লিক, ফরাসডাঙার শাসনকর্তা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বড়বাজারের রামসেবক মল্লিক প্রমুখ প্রধান।

৪. সাংস্কৃতিক পটভূমি

কবিগানের মধ্যে সমকালীন ও পূর্ববর্তী একাধিক সাহিত্য ও সঙ্গীতশাখার সমন্বয় ঘটে। এইসব সাহিত্য ও সঙ্গীত শাখার প্রশ্নোত্তর প্রবণতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, অভিনয়-ধর্মিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কবিগানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয় বিবেচনায় এমন অনুমান করা যায়। বস্তুত কবিগানের তাৎক্ষণিক ছড়াকাটার প্রসঙ্গ ছাড়া অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলো সমকালীন সংস্কৃতি মাধ্যমগুলোর মধ্যে কমবেশি লক্ষ করা যাবে।

কবিগানের সখীসংবাদ জাতীয় গানে যে ধরনের প্রশ্নোত্তর প্রবণতা লক্ষণীয়, তার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নামের সংস্কৃত কাব্যের। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাশৈলীও অনেকটা অনুরূপ। কাব্য দুটির মধ্যে পাশাপাশি গানে রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের যেসব প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়, তার ধরন, বিষয়বস্তু ও রুচি কবিগানের কাছাকাছি।

ষোড়শ শতকে রচিত রূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' গ্রন্থেও কৃষ্ণ এবং তার সখাসখীদের প্রশ্নোত্তর সন্নিবেশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণদাস বিরচিত 'আত্মজিজ্ঞাসা' নামক গদ্যগ্রন্থেও প্রায় একই ধরনের উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। 'আত্মজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির ধরন সম্পর্কে আঁচ করা যায় : "তুমি কে। আমি জীব। কোন জীব। তটস্থ জীব। থাক কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হৈল। তত্ত্ববস্তুতে হৈল। কি তত্ত্ববস্তু। পঞ্চভূতাত্মা একাদস ইন্দ্রে। ছয় রিপু ইচ্ছা জ্ঞান। এক যোগে হৈল। পঞ্চভূত কাকে বলি। আকাশঃ বাউঃ অন্নঃ? জলঃ পৃথিবি। এই পঞ্চ।"[২৭] কবিগানের টপ্পা-পাঁচালিতে এবং বিশেষভাবে জোটের পাল্লায় যেসব প্রশ্নোত্তর ব্যবহৃত হয়, তার ধরনকে এর থেকে খুব একটা আলাদা মনে করা যায় না।

---

[২৭] উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ২৬।

কবিগানের সঙ্গে সমকালের একাধিক সঙ্গীত ঐতিহ্যের সাযুজ্য থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি মাধ্যম বিবর্তিত হয়ে ক্রমে কবিগান নামে পরিচিতি পেয়েছে। এর মধ্যে যেসব গানকে কবিগানের পূর্বসূরি হিসেবে অনুমান করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে আখড়াই, হাফ-আখড়াই, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, পাঁচালি, ঝুমুর, টপ্পা, যাত্রা প্রভৃতি। এর মধ্যে টপ্পা ও যাত্রাকে কবিগানের থেকে খানিকটা অর্বাচীন বলে মনে হয়। তাই এগুলো বাদ দিয়ে অন্য মাধ্যমগুলোর সম্পর্কে কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

আখড়াই

খেড়ু বা খেউড় গানের অন্য নাম আখড়াই গান। প্রফুল্লচন্দ্র পালের ধারণা 'খেতুর' শব্দের অপভ্রংশ 'খেউড়', সেখানে থেকে 'খেড়ু', অন্যদিকে 'আখড়া' থেকে 'আখড়াই' শব্দের উদ্ভব।[২৮] ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২–১৭৬০) 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা থেকে জানা যায়, তাঁর সময়ে নদীয়া ও শান্তিপুর অঞ্চলে খেড়ু গান জনপ্রিয় ছিলো। এই রচনার নায়িকা বিদ্যা তাঁর স্বামীকে খেড়ু গান শোনানোর প্রলোভন দেখায়, তাতে এর জনপ্রিয়তার বিষয়টি বোঝা যায়। বিদ্যা বলে,

> আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
> কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
> নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
> নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥[২৯]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫০ সালের দিকে যখন জানান যে, তাঁর সময় থেকে দেড় শত বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৭০০ সালের দিকে শান্তিপুরের ভদ্রসন্তানেরা খেঁড়ু গানের উদ্ভব ঘটান, তখন তা পণ্ডিতমহলের স্বীকৃতি পায়। তাঁর মতে এই গানের উদ্ভাবক শ্রেণিতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর সহ বহু ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীরা ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধারণা অনুযায়ী এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে' আখড়াই গান রচনা করতেন।[৩০] শান্তিপুর অঞ্চলে পরিবেশনের সময় খেড়ু গানে আদিরসের যে মাত্রা ছিলো, ক্রমে তা হ্রাস পায়। বিশেষভাবে তা যখন হুগলি-চুঁচড়া

---

[২৮] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. চুয়াল্লিশ। অন্যত্র লিখেছেন: "খেতুরের স্মৃতিপূত খেউড় গান শুরু হইয়াছিল একদিন শাশ্বত পুরুষপ্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে কেন্দ্র করিয়া। কালক্রমে ইহার অলৌকিক স্বভাব লৌকিক স্বভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল।" তদেব, পৃ. তিপ্পান্ন।

[২৯] ভারতচন্দ্র রায়, 'অন্নদামঙ্গল,' *ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের গ্রন্থসঙ্কলনপুস্তিকা* (কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৭৮), পৃ. ৪০৬। বইটির পাদটীকায় খেড়ু শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে: 'ইতর কবিতা যাহাকে কবি বলে'।

[৩০] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ১২৭।

অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়, তখন তা আখড়াই নাম গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় বিষয় প্রবেশ করতে থাকে। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যাও বাড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত জানান যে, চুঁচুড়া অঞ্চলের আখড়াই গায়কেরা বাইশ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন বলে, কলকাতায় তাঁদের দল 'বাইসেরা' নামে পরিচিতি পান। ক্রমে আখড়াই গানের আদিরসের অংশ মার্জিত রুচি দ্বারা শোধিত হয়। এই কাজ করার জন্য চুঁচুড়ার একটি আখড়াই দল সমকালে বিশেষ সুনাম অর্জন করে। এভাবে আঠারো শতকের শেষ নাগাদ কলকাতায় খেড়ু বা আখড়াই গানের যেসব প্রতিযোগিতা হতে থাকে, সেখান থেকে আদিরসাত্মক অংশ নিঃশেষিত হয়। বিশেষভাবে শোভাবাজারের রাজোদ্যান, কাশীনাথের উদ্যান, হালসি বাগান প্রভৃতি এলাকায় এই ধরনের আখড়াই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

প্রথম দিককার আখড়াই শিল্পীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে আঠারো শতকের শেষার্ধের দুজন আখড়াই শিল্পীর নাম জানা যায়। এঁদের একজন কুলুইচন্দ্র সেন এবং অপরজন টপ্পাখ্যাত নিধুবাবু ওরফে রামনিধি গুপ্ত। দুজনের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। কুলুইচন্দ্র সেন সম্পর্কে নিধুবাবুর মাতুল অথবা মাতুলপুত্র ছিলেন। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের (১৭৩৩–১৭৯৭) পৃষ্ঠপোষকতায় এঁরা এই গানের বিশেষ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খেড়ু বা আখড়াই গানের বৈশিষ্ট্য হলো, এই গান একাধিক দল দ্বারা পরিবেশিত হতো এবং উভয় দলের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা হতো। সঙ্গীত পরিবেশনের মানের উপরে কোনো দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। এক্ষেত্রে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের পারদর্শিতাও বিবেচনার বিষয় হতো। এই গানের ফাঁকে ফাঁকে কনসার্টের মতো যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার ছিলো। এই কনসার্টের বিভিন্ন অংশ দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েনবন্দি, মোড় প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতো। বৈষ্ণবদাস নামের একজন যন্ত্রশিল্পী এ ব্যাপারে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তখন রামজয় সেন, রসিকচাঁদ গোস্বামী, ন্যাটা বলাই প্রমুখও বিশেষ নাম করেছিলেন।

আখড়াই গানের আয়তন খুব হ্রস্ব। তিনটি ভাগে বিভক্ত মাত্র কয়েক লাইনের গান। প্রথম ভাগে রয়েছে ভবানী বিষয়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে খেউড়। তৃতীয় ভাগে রয়েছে প্রভাতি। প্রতিটি ভাগের তুক প্রায় একই রকম: প্রথমে মহড়া, তারপর চিতেন, তারপরে পাড়ঙ্গ বা অন্তরা। কোনো কোনো ভাগে একাধিক পাড়ন থাকতে দেখা যেতো। আসরে দুই দল সামনা-সামনি বসতো। একদল এক ভাগ গান করার পরে অন্য দলও একই ভাগের গান করতো। তবে এই গানের প্রতিটি ভাগের মহড়ার পরে 'দেওরা ওরে' বাক্যাংশ ধুয়া হিসেবে গাওয়ার নিয়ম ছিলো। এই ধুয়া নিঃসন্দেহে এই গানের উদ্ভবকালের আদিরসাত্মক ইঙ্গিত।

আখড়াই গানের ধরন ও তুক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নিধুবাবুর রচিত একটি আখড়াই গান উদ্ধৃত করা হলো:

ভবানী বিষয় (বাগেশ্বরী)

মহড়া। ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী সদাশিবে শুভঙ্করী নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।
চিতেন। নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞানবোধ সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী ॥ (মা)

পাড়ঙ্গ। প্রাণেতে প্রসন্ন ভব ভীমতর ভবার্ণব ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
২য় পাড়ঙ্গ। কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি পদতরি দেহ গো তারিনি ॥

খেউড় (বেহাগ)
মহড়া। মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল। (দেওরা ওরে)
চিতেন। তোমার সাধনা করি সাধ না পুরিল ॥

পাড়ঙ্গ। সাধিয়ে আপন কাজ এখন বাড়িল লাজ
আমার গেল যে লাজ বিষাদ হইল ॥

প্রভাতি (ললিত)
মহড়া। জামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। (দেওরা ওরে)
চিতেন। হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন ॥

পাড়ঙ্গ। নলেনী হাসিবে কেন কুমদী বিরসানন
এ সুখে অসুখ কবে করে কি অরুণ ॥[৩১]

এই গানের ভবানী বিষয়ের সঙ্গে বিশ শতকের কবিগানের ডাক গানের মিল চোখে পড়ে। এমনকি ডাক গানের তুক বিন্যাসও এই ভবানী বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলযুক্ত।

আখড়াই গানের সঙ্গে কবিগানের মিল এমন দূরবর্তী হলেও উনিশ শতক নাগাদ আখড়াই গানের উপর ভিত্তি করে হাফ-আখড়াই নামের যে গান তৈরি হয়, তার সঙ্গে কবিগানের মিল অনেক বেশি। বিশেষত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি গানের কথায় প্রশ্ন-উত্তরের বিষয়টি হাফ-আখড়াই গানের মধ্যে দেখা যায়। কবিগান দ্বারাও এটি প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু এই ধারার সূচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৩২ সালের ১৮ই জানুয়ারি জমিদার রামমোহন মল্লিকের বাড়িতে মোহনচাঁদ বসু ও কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আখড়াই গানের আয়োজন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ভবানী বিষয় গাওয়ার পর খেউড় গান করার কথা। কিন্তু মোহনচাঁদ বসু খেউড় গানের আগেই একটি সখীসংবাদ ধরে দেন। এভাবেই কবিগানের বিষয় মিশে গিয়ে আখড়াই গান হাফ-আখড়াই গানে পরিণত হয়। শোনা যায়, আখড়াই গানের মধ্যে এভাবে কবিগানের মিশ্রণ ঘটানোর জন্য মোহনচাঁদের গুরু

---

[৩১] উদ্ধৃত, সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৪০), পৃ. ১০৪৯–৫০।

নিধুবাবু বিশেষ রুষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনোমোহন বসুর বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য, তাতে কবিগানের সঙ্গে হাফ-আখড়াই গানের সম্পর্ক বুঝতে সুবিধা হতে পারে। মনোমোহন লিখেছেন: "শারদাবিষয় উভয়পক্ষে একরকম তো হইয়া গেল। সখীসম্বাদের সময় গানবাজনার পর স্বয়ং মোহনচাঁদ প্রমুখ বাগবাজারের দল যেই মাত্র চিতানের প্রথম চরণ গাহিয়া ছাড়িয়া দিল, অমনি বাহবার চোটে বোধ হইল বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে! ক্রমে পরচিতান, ফুকা, ডবল ফুকা (এই ডবল ফুকা কবিগানের মধ্যে পূর্বে মোটে ছিল না), মেলতা, মহড়া ইত্যাদি পর পর যত গাওয়া হইতে লাগিল, ততই অভূতপূর্ব গগনস্পর্শী প্রশংসার ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইল।"[৩২]

বাংলা আখড়াই গান যিনি জনপ্রিয় করেছিলেন, সেই নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১–১৮৩৯) বাংলা টপ্পা গানেরও উদ্ভাবক। টপ্পা গান মূলত হিন্দুস্তানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আঠারো শতকের সূচনায় পাঞ্জাবি গায়ক গোলাম নবী এই গানশৈলীর উদ্ভাবক ছিলেন। টপ্পা শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত। তবে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে গেয় যে-গান ধ্রুপদ ও খেয়ালের থেকে সংক্ষিপ্ত তার নাম টপ্পা। এই গানের তুক মাত্র দুটি: স্থায়ী এবং অন্তরা। বিষয়ের দিক দিয়ে টপ্পা ভালোবাসার গান—ইহজাগতিক ভালোবাসার গান। তবে সম্ভবত চটুলতা গুণের কারণে কবিগানের কবির লহরও এক সময়ে কবির টপ্পা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পায়।

শ্যামাসঙ্গীত

কালী দেবীর এক নাম শ্যামা। শ্যামাসঙ্গীত অর্থ হলো কালী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা সঙ্গীত। বাংলাদেশে কালীপূজার প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। ষোড়শ শতকের দিকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই পূজার প্রচলন করেন বলে জানা যায়। তবে বাংলাদেশে আড়ম্বরের সঙ্গে কালীপূজা প্রচলন করেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০–১৭৮৩)। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রামপ্রসাদ সেন (১৭২০–১৭৮১) কালীকে নিয়ে যেসব গান রচনা করেন, সেগুলো শ্যামাসঙ্গীতের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা।

রামপ্রসাদের রচিত গানগুলোর সুর ছিলো অভিনব। ধারণা করা হয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে বাউল গানের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি শ্যামাসঙ্গীতের জন্য বিশেষ একটি সুর সৃষ্টি করেছিলেন। সুরটি 'রামপ্রসাদী' সুর নামে পরিচিত। সুরটি তাঁর সমকালে এবং পরবর্তী কালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবিগানের একাধিক অঙ্গের গানের সুরে রামপ্রসাদী সুরের অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। শ্যামাসঙ্গীত ভবানী বিষয় নামেও পরিচিত। বিশেষত এই নামে তা কবিগানের সূচনা সঙ্গীত।

কবিগানের ডাক ও মালশি গান নিঃসন্দেহে শ্যামাসঙ্গীত। শুধু গঠনগত দিক দিয়ে এগুলো আলাদা; বিষয়ের দিক দিয়ে এগুলোকে মোটেই আলাদা করা যায় না।

---

[৩২] উদ্ধৃত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

অস্বাভাবিক নয় যে, সমকালীন শ্রোতাদের মধ্যে কালীভক্তের সংখ্যা অধিক হওয়ায় অথবা প্রথম দিকে যাঁরা কবিগানের আয়োজন করতেন, তাঁরা কালীর ভক্ত ছিলেন বলে, কবিগানের সূচনা-সঙ্গীত শ্যামাসঙ্গীত; এমনকি দ্বিতীয় পর্যায়ের গানটিও শ্যামাসঙ্গীত। এ থেকে শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে কবিগানের সম্পর্ক অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, রামপ্রসাদী গানের তুক সংখ্যা দুইটি; একইভাবে কবিগানের মধ্যকার ডাক গানের তুক সংখ্যাও দুইটি। নিম্নে রামপ্রসাদ সেনের একটি শ্যামাসঙ্গীত উদ্ধৃত করা হলো। পরিশিষ্টে সংকলিত যে কোনো ডাক গানের সঙ্গে এটি তুলনীয়। রামপ্রসাদী গানটি নিম্নরূপ:

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধা পানে সদা সুখী
তনূ তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, রামা রণে কে?
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুরাধরা;
প্রাণ ধরা, ভার ধরা, আলো করিয়াছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর, দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কার ঝলকে।

রামা অগ্রগন্যা, কার কন্যা, কিবা অন্বেষণে রণে বিবসনা।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখকুলা দন্তখুলা
আলোচুলা গায় ধূলা, ভয় কর হে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে;
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বল্যাছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা;
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে ॥[৩৩]

কীর্তন

কীর্তন গান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে উদ্ভূত ও স্বীকৃত। ধারণা করা হয়, চৈতন্যদেবের (১৪৮৬–১৫৩৩) আবির্ভাবের পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের কাহিনি সংবলিত গান চালু ছিলো। তবে চৈতন্যদেব এই গানকে ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে প্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। তাঁদের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কীর্তন গান প্রধানত লীলাকীর্তন ও

---

[৩৩] উদ্ধৃত, "কবিরঞ্জন প্রসাদ সেন," *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা (১৯৫৮), পৃ. ৬৮।

নামকীর্তন—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে নামকীর্তন হলো বহু রাগরাগিণীতে গেয় 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' চরণদ্বয়ের বহু ধরনের অনুবর্তন। অন্যদিকে লীলাকীর্তন গান হলো রাধা, কৃষ্ণ এবং তার সখা-সখীদের কাহিনি নিয়ে রচিত এক ধরনের যাত্রাগান বা পালাগান। এক পর্যায়ে চৈতন্যদেবের জীবনকথা ভিত্তিক পালাও রচিত হতে থাকে। কীর্তন গানের উভয় ধরনই রাগনির্ভর।

লীলাকীর্তন গানের বিষয়বস্তু ভাগবত, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত। লীলাকীর্তনের প্রাচীনতম পাঠ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থকে গণ্য করা যায়। তবে চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ প্রাসঙ্গিক কাহিনিকে নানা ভাবে পুষ্ট করে তোলেন, লীলাকীর্তন গানের মধ্যে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। কাহিনিতে তফাত থাকার জন্য এইসব লীলাকীর্তন নানা নামে পরিচিতি পায়, যেমন গোষ্ঠ, মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি। লীলাকীর্তন পদাবলি কীর্তন নামেও পরিচিত। এই গানে কৃষ্ণলীলা কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখের পদ পরিবেশন করা হয়।

চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ লীলাকীর্তন বা পদাবলিতে পাঁচটি ঘরানায় বিভক্ত করেছিলেন, এগুলোর নাম গড়ানহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। এগুলোর মধ্যে কোনো ঘরানা ধ্রুপদ সঙ্গীতের কাছাকাছি (যেমন রাজশাহীর গরানহাটির নরোত্তম ঠাকুরের গরানহাটি ঘরানা), কোনোটা খেয়াল সঙ্গীতের কাছাকাছি, কোনোটা ঠুংরির কাছাকাছি, আবার কোনোটা টপ্পার কাছাকাছি। টপ্পার প্রভাবে প্রভাবিত কীর্তন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ঘরানা।

বিশেষভাবে পদাবলি কীর্তনের সঙ্গেই কবিগানের নিকট-সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। পদাবলি কীর্তনে সাধারণত তিনটির বেশি তুক থাকে। কবিগানের বৈষ্ণবীয় অংশ, যেমন সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর প্রভৃতি গানেও অনেকগুলো করে তুক থাকে। সুরেও কখনো কখনো তা পদাবলি কীর্তনের নিকটবর্তী হয়। পরিবেশনের দিক দিয়েও পদাবলি কীর্তনের সঙ্গে কবিগানের বৈষ্ণবীয় অঙ্গগুলোর মিল রয়েছে। সাধারণত দাঁড়িয়ে অথবা নৃত্যরত ভঙ্গিমায় পদাবলি পরিবেশিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে কবিগানের প্রাসঙ্গিক অঙ্গগুলো দোহারগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করে থাকেন। কীর্তন গানের গঠন-প্রকৃতিতে রয়েছে কথা, আখর, ছুট, তুক প্রভৃতি। এগুলোর প্রায় সবগুলোই কবিগানের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষত কীর্তন গানের 'আখর' বা গানের মাঝখানে দু-এক বাক্যের ব্যাখ্যা, কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি অংশে হুবহু প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। কীর্তন গানে তোড়ী, কামোদ, শ্রীরাগ, পাহাড়ী, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগরাগিণীর ব্যবহার প্রায়ই লক্ষণীয়। আবার তালের দিক দিয়ে কীর্তনের মধ্যে ছোটো লোফা, বড়ো লোফা, রূপক, যতি, তেওট, দোঠুকি, দশকোশী, দাশপেড়ে, শশীশেখর, বীরবিক্রম প্রভৃতি তালের ব্যবহার হয়। এসব সুর ও তাল কবিগানের মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়।

পাঁচালি

পাঁচালি গানের সঙ্গে কবিগানের পাঁচালির গাঠনিক সাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রফুল্লচন্দ্র পাল মনে করেন, পাঁচালি গান হলো কবিগানের আদি রূপ।[৩৪] 'পাঁচালি' শব্দটি 'পঞ্চাবলি' শব্দের অপভ্রংশ। পঞ্চাঙ্গ গীতের অপর নাম পঞ্চাবলি। পঞ্চাঙ্গগুলো হলো: উদগ্রাহক, মেলাপক, অন্তরা, ধ্রুবপদ, ও আভোগ। পাঁচালি বলতে বোঝায় ধুয়াগান সহযোগে ছড়া। পাঁচালি গানের যে আঙ্গিক দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে দেখা যায়, তা কবিগানের পাঁচালি অংশের গঠনের সঙ্গে মেলে। বিষয় এবং ভঙ্গিতেই যা তফাত। পাঁচালি গানে গান ও ছড়ার মাধ্যমে পৌরাণিক কোনো কাহিনিকে বিবৃত করা হয়। অন্যদিকে কবিগানের পাঁচালিতে গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে কবিয়াল নিজের যুক্তি তুলে ধরেন এবং বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেন। পাঁচালি গান থাকে পূর্বরচিত, তাই পাঁচালি গানে তাৎক্ষণিক রচনার সুযোগ কম, অন্যদিকে কবিগানের পাঁচালির প্রায় সবটাই তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করতে হয়। এছাড়া পাঁচালি প্রতিপক্ষ থাকে না, অন্যদিকে কবিগানের পাঁচালিতে প্রতিপক্ষ থাকে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাঁচালি গান গ্রামবাংলার অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হিসেবে সুপরিচিত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য তো পাঁচালি গানেরই রূপান্তর। অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি, বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যকার কাহিনিকে গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা পাঁচালির কাজ। এই কাজে পাঁচালি গায়কগণ কাহিনি অনুযায়ী পালা রচনা করতেন। কাহিনির প্রকৃতি অনুযায়ী পালার নাম হতো, যেমন—দাতা কর্ণের পালা, অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পালা, জটায়ুর মৃত্যুর পালা, সীতাহরণের পালা, সীতা নির্বাসনের পালা, সীতার পাতাল প্রবেশের পালা, রাবণ বধের পালা, বিষহরির পালা, চণ্ডীর ছলনার পালা, বেহুলার পালা, কালকেতুর পালা প্রভৃতি। পাঁচালি গানের গঠনের কথা বিবেচনা করলে অবশ্য উনিশ-বিশ শতকের জারি-গান পাঁচালি গানের সবচেয়ে নিকটবর্তী একটি লোকমাধ্যম।

পাঁচালি গানের জনপ্রিয়তা এতো ব্যাপক যে, এর ফলে 'পাঁচালি' নামে এক ধরনের ধর্মসাহিত্য রচিত হতে দেখা যায়। যেমন—শনির পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, হরিঠাকুরের পাঁচালি, শান্তিমাতার পাঁচালি, সত্যপীরের পাঁচালি, দক্ষিণারায়ের পাঁচালি প্রভৃতি।

কবিগানের পাঁচালির সঙ্গে পাঁচালি গানের নিকট-সাদৃশ্য বোঝানোর লক্ষ্যে নিম্নে দাশরথি রায়ের 'কর্তাভজা' শীর্ষক পাঁচালির প্রথম দিককার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

কর্তাভজা

শ্রবণে সুশ্রাব্য অতি রসজ্ঞ পাঁচালি।
প্রণিধান কর কিছু কাব্যকথা বলি ॥

---

[৩৪] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. বারো।

নূতন উঠেছে কর্তাভজা শুন কিঞ্চিৎ তার মজা
সকল হতে শ্রবণ বড় মিষ্ট।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা রমণী নিষেধ মানে না যায় অমনি
অন্ধকারে পথ না হয় দৃষ্ট ॥
ইহার ঘোষপাড়াতে পূর্বসূত্র গোপাল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র
সেই উহাদের কর্তার প্রধান।
চারিজন তার আছে চেলা মদন সুবল গোপাল ভোলা
তারা এখন বড় মান্যমান ॥
সেই চারিজন চারি আখড়াধারী মন্ত্রণা দিয়ে পুরুষ নারী
ভুলায়ে আনে বুলিয়ে মাথায় হাত।
ওদের ভোজের ভেল্কি ধনি সেজে চল্লেন ঘরের গিন্নি
সিন্নি দিয়ে করেন প্রণিপাত ॥
কি নীচ ও কি ভদ্র সকলেতে হয় একত্র
ঐক্য করে এক গোত্র শপথ করে বলে।
আর যাব না কোন পথে সবে রব এক সাথে
যা করেন কর্তা কপালে ॥

ভৈরবী—রূপক
নূতন উঠেছে কর্তাভজা রে, বড় মজা বড় মজা রে।
কুলবতী যায় তাতে, না রয় কেহ ঘরে রে ॥

মরি কি মানবলীলে হরে জ্ঞান তা হেরিলে
হরিভক্তি মুক্তিপথ দূরে যায়, ভেঙ্গে বলা নয়, ভেঙ্গে বলা নয়
কালে কালে সকল ঘটে বড় দুঃখ মনে রে ॥

বলো কে বুঝিবে তাদের অন্ত সকলে এক ধর্মাক্রান্ত
আর নাহি রয় ঘরে।
যত্নে নানা উপহার দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন আর
লয়ে যায় প্রতি শুক্রবারে ॥
কোথা বা ভজন কোথা বা কুজন লাগিয়ে দেয় শিবের গাজন
কতগুলো এক জায়গায় জুটে।
জেতের বিচার আচার শূন্য একত্রে যুটে ছত্রিশ বর্ণ
ধোবা কলু মুচি মুটে ॥
বাগ্দী হাড়ি বামুন কায়স্থ ডোম কোটাল আদি সমস্ত
মনে ভাবেন জগন্নাথ ক্ষেত্র ভক্তির নাই ক্রটি।
ভগবানের নাম মুখে বলে না প্রেমভক্তির মতে চলে না
সার কেবল ডালিমতলার মাটি ॥

পরে না কপ্নী বহির্বেশ   না বৈরাগী না দরবেশ
        না কোন ভেকধারী।
ওরা পুরাণ মানে   কি কোরান মানে
        তার কিছু বুঝিতে নারি ॥
ওরা নয় সাধু নয় পাষণ্ড   দুয়ের বাহির যেমন ভণ্ড
        নয় যুগী নয় জোলা।
নয় পশু নয় জানোয়ার   নয় তার নয় পালোয়ার
        নয় ডোঙ্গা নয় ভেলা ॥
ওরা নয় যে দৈত্য নয় যে দানা   কি গতিক ভাব যায় না জানা
        উল্টো সব হিন্দুয়ানী ধর্ম।
দেবতা বামুন করে না মান্য   অঘোর পণ্ডিত অগ্রগণ্য
        শুনতে নাই ওদের যেসব কর্ম ॥
পরস্পর দেয় মুখে অন্ন   সাবাস ওদের রুচিকে ধন্য
        মহাপ্রসাদ বলে করে মান্য।
কুড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভাত   খেয়ে মাথায় বুলায় হাত
        আচমনের বিষয়েতে শূন্য ॥
বিধবার নাই একাদশী   বিশেষ শুক্রবারের নিশি
        হয় ভোজন যার যে ইচ্ছামত।
মৎস্য মাংস ছানা মাখন   উপস্থিত হয় যেটা যখন
        তখন তাই তেই হয় রত ॥
আবার কেহ সখী কেহ কিশোরী   কর্তা বাজান বাঁশরী
        কখন হন নিকুঞ্জবিহারী।
কখন হয় কৃষ্ণকালী   কখন হয় বনমালী
        কখন বা হয় গিরিধারী ॥
কখন গোষ্ঠে চরায় ধেনু   মধুস্বরে বাজায় বেণু
        মুগ্ধ সকলে বাঁশের বাঁশীর রবে।
লীলা করে নানা রকম   করে না কেবল কালিয় দমন
        তাহলে শমন ভবন গমন কর্তে হবে ॥[৩৫]

ঝুমুর

কবিগানের পূর্বে প্রচলিত যেসব গানে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা প্রধান উপজীব্য, তার মধ্যে ঝুমুর গানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৬] ঝুমুর গানের অঙ্গবিভাজনও কবিগানের

---

[৩৫] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, *রস-ভাণ্ডার* (কলকাতা: বসুমতী, ১৮৯৯), পৃ. ৫৮–৫৯।
[৩৬] *বিশ্বকোষ*, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পা., "কবিগান," ভুক্তি।

অঙ্গবিভাজনের নিকটবর্তী। অনুমান করা হয় সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার ধরনেও তা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের ছিলো। 'ঝুমুর' শব্দটি হিন্দি। এর মূল অর্থ দ্রুত তালের নৃত্য।[৩৭]

ঝুমুর গান মূলত রাঢ় অঞ্চলের লোকগীতি। এই অঞ্চলে ঝুমুর গানের চারটি ভাগ ছিলো: ১. সখীসংবাদ—যেখানে রাধা ও তার সখীদের বাদ-প্রতিবাদ থাকতো, ২. আগম—যা শ্যামাসঙ্গীত জাতীয় গান, ৩. লহর—যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করতো, এবং ৪. খেউড়—অশ্লীল ও আদিরসাত্মক গান।[৩৮] ঝুমুর গানের বড়ো বৈশিষ্ট্য এতে দুটি দল থাকে। পালাক্রমে দল দুটি গান পরিবেশন করে থাকে। প্রতিটি দলে একজন মূল গায়ক থাকে, সেই সঙ্গে থাকে নর্তক-নর্তকী, বাদ্যকর ও দোহার।

ঝুমুর গানে সাধারণত কীর্তনের মতো খোল, জুড়ি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তবে উনিশ শতক নাগাদ বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের ঝুমুর গানে খোলের বদলে মাদল ব্যবহৃত হতো।[৩৯]

ঝুমুর গান মধ্যযুগেও চালু ছিলো বলে জানা যায়। মনে করা হয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানা ঝুমুর গানের উদাহরণ। তখন এই গানে একদল কৃষ্ণপক্ষ এবং একদল রাধাপক্ষ হয়ে গান গাইত। কেউ কৃষ্ণ হয়ে গাইতো, কেউ রাধা হয়ে তার জবাব দিতো।

মধ্যযুগের ঝুমুর গানে আদিরস থাকলেও তা নাট্যধর্মী ও নৃত্যধর্মী ছিলো কিনা, সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে আঠারো শতক নাগাদ এই গানের মধ্যে নাট্যধর্মিতা ও অভিনয়ধর্মিতার সংযোজন ঘটে। প্রথম দিককার ঝুমুর গানে গান শুরু হওয়ার পূর্বে একদল বালক পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঘুরে ঘুরে নাচতো। ঘুঙুরের সেই ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ থেকে ঝুমুর গান নাম হয়েছে।[৪০] এক সময়ে লীলাকীর্তন শেষ হওয়ার আগে ঝুমুর গান গাওয়ার রীতি সৃষ্টি হয়েছিলো বলে জানা যায়। আবার বিভিন্ন ধরনের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রা গানের সূচনাতেও ঝুমুর গান পরিবেশনের রীতি সৃষ্টি হয়। এইসব যাত্রা শুরু হওয়ার আগে একদল বালক ঐকতানে ঝুমুর গান করতো। ক্রমে কোনো কোনো অঞ্চলে এই গান নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে গাইতে শুরু করে এবং তা খানিকটা কবিগানের আদল লাভ করে। যেমন বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের ঝুমুর গান সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষের মন্তব্য: "স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলা-ঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় লহরাদি গান করিয়া থাকে। কবি গানের মত ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তরও আছে।"[৪১]

---

[৩৭] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. সাতষট্টি।
[৩৮] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬।
[৩৯] *বিশ্বকোষ*, "কবি" ভুক্তি।
[৪০] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩।
[৪১] *বিশ্বকোষ*, "কবি" ভুক্তি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের ধারা বাংলার চিরন্তন ধারা। কবিগানের মতো ঝুমুর গানের মধ্যেও তা স্বভাবতই প্রবেশ করে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, "প্রাচীন বাংলায় গ্রামীণ সমাজে আদিরসঘটিত হালকা ধরনের এবং শিথিল ছন্দের একপ্রকার গান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং কালক্রমে সেই ঝুমুর, কখনও কীর্তনে, কখনও-বা লোকাভিনয়ে অর্থাৎ যাত্রাগানে অনুপ্রবেশ করেছিল। তখনও ঝুমুর ছিল কৃষ্ণলীলার গান, তার মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা চাপান-উতোরের রীতি প্রবেশ করেনি। কিন্তু কবিগানের মতো ঝুমুরের মধ্যেও উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রবেশ করল।"[৪২]

নিম্নে প্রথমে একপাক্ষিক ঝুমুর (এক) এবং পরে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ঝুমুরের (দুই) দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পরমানন্দ অধিকারীর দলে পরিবেশিত হতো।

একপাক্ষিক ঝুমুরের অংশ:
ও যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণও তার শোন গো বিধুমুখী।
ও মন চুরি করে বাঁশির স্বরে, ও তা জানে গো জগৎ-জনে,
তার সঙ্গে রাই প্রেম কর সে কি প্রেমের মরম জানে ॥

উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ঝুমুরের অংশ:
উক্তি—
নন্দঘোষ বলে ও কুতূহলে
আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমণ্ডলে।
প্রত্যুক্তি—
কেঁদে যশোমতী কয়, নন্দ মহাশয়
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে বল কংশালয়।[৪৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবি' উপন্যাসে ঝুমুর গানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হয়তো বিশ শতকের প্রথম দিককার ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। তাতে দেখা যায়, নৃত্যশিল্পীরাই ঝুমুর গানের প্রধান, ঝুমুর গান তাদের দেহব্যবসার উপলক্ষ, দলের পুরুষগুলো ঐসব নৃত্যশিল্পী-কাম-দেহব্যবসায়ীদের স্থায়ী খদ্দের—এমনকি প্রধান গায়ক তথা কবিয়াল পর্যন্ত, অন্যদিকে দলের মালিক একজন অবসরপ্রাপ্ত যৌনকর্মী।[৪৪] বিশ শতকের সূচনায় ঝুমুর গানের এই বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়ে থাকবে,

---

৪২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৪৩ *বিশ্বকোষ*, "কবি" ভুক্তি।
৪৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি* (ঢাকা: স্টান্ডার্স পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৬১), যত্রতত্র।

তারাশঙ্কর হয়তো সেখান থেকে এই উপন্যাসের প্রাথমিক উপকরণ পেয়েছিলেন। তবে ঝুমুর গান সম্পর্কে অন্য যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তারাশঙ্করের বর্ণনার সঙ্গে তার অমিল যথেষ্ট। একটি দিক দিয়ে অবশ্য ঘনিষ্ঠ মিল পাওয়া যায়, তা হলোঃ এই গান প্রতিযোগিতামূলক—একদল এক গানের চাপান দিলে অন্য দলকে সেই গানের উতোর দিতে হয়। আবার উভয় দলের মধ্যে জয়-পরাজয়ের ব্যাপার থাকে, এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে জবাব তৈরি করার জন্য কবিয়ালের দরকার হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ঘেঁটু গান, পূর্ববঙ্গের ঘাটু গান, উত্তরবঙ্গের ধামালি ও জাগের গান, আসামের কুশল গান প্রভৃতি গানের আদলও অনেকটা ঝুমুর গানের মতো। এসব গানেও আদিরসাত্মক বিষয় নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। কবিগানের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য এসব গানের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কমবেশি মেলে।

৫. কলকাতা পর্বে কবিগানের বিন্যাস ও উপস্থাপন

আঠারো শতকে কিভাবে কবিগান পরিবেশিত হতো, সে সম্পর্কে সরাসরি জানা না গেলেও উনিশ শতকের সূচনায় কবিগান কিভাবে পরিবেশিত হতো, কবিগানের কী কী অংশ ছিলো, সে সম্পর্কে একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়। এর মধ্যে প্রাচীনতম সূত্র হলো একটি গানের সংকলন। বইটির নাম 'করুণানিধানবিলাস'। সংকলক জয়নারায়ণ ঘোষাল। এটি ১৮২০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৩৭ সালে কলকাতার 'ইংলিশম্যান' নামের একটি ইংরেজি পত্রিকায় কবিগান পরিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় ১৮৫৪ সালে ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণ।

জানা যায়, করুণানিধানবিলাস-এর সংকলন-কাল ১৮১৩ ও ১৮১৪ সাল। সংকলন-কাল বিবেচনা করলে মনে হয়, এ গান আঠারো শতকে পরিবেশিত গানের নমুনা। এদিক দিয়ে করুণানিধানবিলাসে সংকলিত কবিগানের নমুনা থেকে আঠারো শতকের কবিগান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর পর তিন রাত ধরে কবিগানের আয়োজন করা হতো, পালাক্রমে দুইটি দল এই গান পরিবেশন করতো। রচনার পারিপাট্য ও গানের গুণাগুণ বিচার করার পর কোনো একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। দুই দলের এক দল পরিচিত থাকতো চন্দ্রাবলীর সখীর দল, অন্য দল পরিচিত থাকতো কামকলার সখীর দল নামে। উভয় দলকে মোট চার ধরনের গান পরিবেশন করতে হতো। প্রথমে গুরুদেবের গীত, তারপরে সখীসংবাদ, তারপরে বিরহ এবং সবশেষে খেউড়। একদল আসরে দাঁড়িয়ে এক ধরনের গান পরিবেশন করার পর বসতেন, তারপর অন্যদলকে দাঁড়িয়ে সেই একই ধরনের গান পরিবেশন করতে হতো। এভাবে পালাক্রমে উভয় দলকে গান পরিবেশন অব্যাহত রাখতে হতো। তিন দিন ধরে গান গাইতে হতো মানে প্রতিদিনই তাঁদের আলাদা আলাদা গান পরিবেশনের প্রয়োজন হতো। সব ধরনের গানের গঠন তখন প্রায় অভিন্ন ছিলো বলে মনে হয়; যেমন প্রথম

অংশের নাম চিতান এবং শেষ অংশের নাম টপ্পা। তবে চিতান অংশে কলির সংখ্যা টপ্পা অংশের কলির থেকে অনেক বেশি ছিলো।

বইটিতে কবিগানের যে নমুনা ছাপা হয়, সেটিই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবিগানের প্রথম নমুনা। মনে করা যেতে পারে, আঠারো শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের এই রূপটাই কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো। নমুনাটি নিম্নরূপঃ

১

গুরুদেবের গীত চন্দ্রাবলীর দলের

মন মজিল না রে কেনে গুরুর চরণে ॥ ধুয়া
দশ শতদল কমলেতে যার বসতি অতি গোপনে।
জনম সফল কর একবার নিরখ শ্রীনাথ জ্ঞাননয়নে ॥

চিতান অজ্ঞান অন্ধের সুজ্ঞান অঞ্জন কে হেন এ তিন ভুবনে।
প্রভু দয়াময় করে বরাভয় বিতরে করুণা কাতর জনে ॥
ভবজলনিধি নিস্তারেন বিধি গুরু কৃপানিধি আপনে।
চতুর্বর্গ ফল ফলে শ্রীচরণে বাঞ্ছা কর‍্যা লও যার যেমনে ॥
বাম উরু স্থিত শক্তিসুশোভিত বল্যাছেন মুক্তি প্রদানে।
খেদ কর দূর মানসতিমির বিনাশে মায়ের ও রূপ ধ্যানে ॥ ...

টপ্পা দিন গেল রে অসাধনে ॥ ধুয়া
আর মূঢ় মন ভ্রমিছ কি কারণে।
শরণ মনন না করিলে ধ্যান শ্রীনাথের চরণে ॥ টপ্পা সাঙ্গ

গুরুদেবের গীত চন্দ্রাবলীর দলের
রাগ তাল কবির ॥ আগের গীতের উত্তর

ঐ দেখ গুরু বসিয়াছে রমণী বামে করিয়া ॥ ধুয়া
পঞ্চ পঞ্চ শত কমল আসন বৃন্দাবন অতি বিপিনে
যে কৃষ্ণ সে রাধা পূরায় মনের সাধা দেখহে যুগল নয়ন ভরিয়া ॥

চিতান অবলা অক্ষম তারে জ্ঞানদান করে দেখ ঐ বসিয়া।
ছাড়িয়া মুরলী বরাভয় ধরি দিতে করুণা করিয়া হাসিয়া ॥
প্রেম ভক্তি ফল ফলিবে যে পদে আশা পুরি লও যাচিয়া ॥ ...

টপ্পা ঘুচিল সকল মনের জ্বালা অভয়পদ হেরিয়া।
আমার হরি কল্পতরু গুরুরূপ ধরিয়া ॥

২

চন্দ্রাবলীর দলের সখীসংবাদ
রাগ তাল কবির।

দেখ দেখ সখি কেমন সাজাইয়াছি যুগলে নিকুঞ্জে আনিয়া ॥ ধুয়া
জগতমহিমা বাসন্তীপ্রতিমা
সেরূপ দেখ না চিনিতে পার কি না পার ভাবিয়া।

চিতান আর সখী কহে চিনা নাহি যায় হরগৌরী দেখি বসিয়া।
জয় সখী কয় বহুরূপী জয় আমি জানি ভাল করিয়া ॥
হইলে দশমী চিনে লও তুমি ছাড়িবে এ-বেশ মুরলী লাগিয়া।
লুকাব রাধায় দেখাব তোমায় রাধা রাধা বলি বেড়াইবে শ্যাম ডাকিয়া ॥

টপ্পা বদাবদে কাম নাই ঐ ব্রজের কানাই
ও ধরিতে পারে অনেক রূপ বলিহারী যাই ॥

কামকলার দলের উত্তর সখীসংবাদ
রাগ তাল কবির ॥

সখী রে ও লুকাইতে নারে বাঁকা নয়ন ॥ ধুয়া
কোথা যোগীহর লম্পট নাগর দেখনা চাহনি খানি ভুরু কামান
কষিয়া গোপিনীর প্রাণ বধিছে নয়নবান ॥

চিতান নীল অঙ্গ ছটা নাহি যায় ঢাকা কি করে আর চন্দন।
পদতল চিহ্ন দেখ ভিন্ন ভিন্ন আগে দেখ্যাছ কেমন ॥
শ্যামা সখী কয় শ্যাম ইচ্ছাময় নিতি রূপ নূতন।
নিত্য বৃন্দাবনে যুগল লইয়া সদা কর কালযাপন ॥

টপ্পা যত রূপ পারুক ধরুক নাহি তাহে ভাবনা।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা খানি কভু মনে ছেড়ো না ॥

৩
চন্দ্রাবলীর উক্তি বিরহ
রাগিণী বেহাগ। তাল কবির।

গোপিনীর প্রাণ মমের সমান গলাইল সই বিরহ আগুন ॥ ধুয়া
কোথা বাতিকর অন্বেষণ কর মনসৃত দিয়া করিবে গঠন ॥

চিতান দ্বিতীয় বিরহ দেহ করে দাহ না মানে শীতল কি নীর কি চন্দন।
আর দিতে দিতে হয় দ্বিগুণ ॥

টপ্পা রাগিণী বেহাগ ॥ তাল পশতো ॥
বুঝি কামকলা সতী হইল বাঁশের মোতি লাগিল
যাইয়া যোড়া হইয়া সতীর পতি।

কামকলার উক্তি আগের বিরহের উত্তর
রাগিণী ঝিঝট ॥ তাল কবির ॥

পরধন পাইয়া সেধন হারাইয়া কেনে কর এত খেদ ॥ ধুয়া
ওহে চন্দ্রাবলী পরধনে কেলি।
ইহার নিশ্চয় হয় একে দিনে সে ধনেতে বিচ্ছেদ ॥

চিতেন তপে নিজ ধন কর উপার্জ্জন সে ধনে বঞ্চিত না হবে
কিন্তু মধুকর যদি হও আসক কলির আসবে
দিবানিশি যত ভৃঙ্গ যাতায়াত বিরহ মিলনে এ ভেদ ॥

টপ্পা রাগিণী ঝিঝট ॥ তাল কবির ॥
সব কমলিনী প্রফুল্ল ধৈরযে থাক।
একে একে মধু ভ্রমরে খাইবে গুঞ্জরিয়া আসিতেছে ঐ চায়্যা দেখ ॥

৪

চন্দ্রাবলীর দলের খেউড়
রাগ-তাল দক্ষিণি।

চন্দ্রবংশে জন্ম যার কলঙ্কে কি করে তার
ভোজন গোয়ালা ঘরে জাতি পাতি অতি ॥ ধুয়া
কুমারী সহিত পুন যে করে পিরীত কামকলা করে তারে পতি।
সাবাস সাবাস ওলো সতি ॥

চিতান প্রতি অঙ্গে কুটিলতা কুটিল বরণ ধাতা
হারে অষ্টাবক্র মুনি যবে করে গতি।
কাগা বগা পাখী মারি ভুলায় পরের নারী
তার সনে বিহার করে কামুকী যুবতী ॥

টপ্পা রাগতাল ঐ ॥
কামের কামিনী কাছে মানীর মান থাকে না।
জগৎ মালিক হয় তবু তারে করে জয় ব্রজের সেই তামাসা দেখ না ॥

কামকলার সখীর উক্তি আগের কবির উত্তর
রাগতাল কবির

গরজে সকলি সহিতে হয় কুলটার বাণী ॥ ধুয়া
যাবৎ না জানে লোকে সতী বলে তাকে কে বা জানে ছিনাল কাহিনী ॥

চিতান অধোদেশ বাকী কার রাখিয়াছে ব্রজের নীলমণি
একে একে বল দেখি সত্য কথা ধনী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া এখন কর ঠেস্বা খানি ॥[৪৫]

---

[৪৫] উদ্ধৃত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০–৬২।

কবিগানের এই নমুনা দেখে মনে হয়, এটি একটি দাঁড়াকবিগানের নমুনা। কেননা, দাঁড়াকবির সঙ্গে কবিগানের মূল পার্থক্য ছিলো, কবিগান তাৎক্ষণিকভাবে রচনা প্রত্যাশা করতো, অন্যদিকে দাঁড়াকবিতে চাপান ও উতোর উভয়ই পূর্বরচিত থাকতো। ঈশ্বর গুপ্তও এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে বলেন, "হাফ আখড়াই, দাঁড়া সখের কবি ও পেসাদারি কবিতার গাহনার প্রণালী একপ্রকার। কিছুমাত্রই ভেদ নাই।"[৪৬] ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কবিগানের বিভিন্ন অংশ রচনা করতে পারতেন বলে, এ ব্যাপারে তাঁর অভিমতের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

এই গানটি আঠারো শতকের শেষ দিককার কবিগানের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আঁচ করা যায়। প্রথমত, সে সময়ের কবিগান সম্পর্কে অশ্লীলতার যে অভিযোগ করা হয়, তা ততোটা প্রবল ছিলো না। দ্বিতীয়ত, এই কবিগানের মধ্যে ভবানীবিষয় গান অনুপ্রবেশ করেনি। এই গানের রাগ ও তাল সুনির্দিষ্ট ছিলো। দেখা যাচ্ছে ঝিঁঝিট, বেহাগ, দক্ষিণি প্রভৃতি রাগে সে সময়ের কবিগান গীত হতো। কবিয়ালগণ ইচ্ছা করলে যে এইসব রাগের ব্যতিক্রম করতে পারতেন; একাধিক গানের শুরুতে 'রাগ-তাল কবির' লেখা দেখে তা বোঝা যায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই কবিগান কিভাবে পরিবেশিত হতো, সে সম্পর্কে ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত ইংরেজি সাময়িকী 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার "হিন্দু" নামের একটি প্রবন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। সেই ধারণা অনুযায়ী তৎকালে পরিবেশিত কবিগানের বর্ণনা দিয়েছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪৭] বর্ণনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

সাধারণত বিত্তবান কোনো ব্যক্তির প্রাঙ্গণে বিশেষ কোনো পূজা উপলক্ষে কবিগানের আয়োজন করা হতো। গান শুরু হতো রাত নয়টা-দশটার দিকে। এই গান শোনার জন্য মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যেতো। গান শুরুর আগে সেই ভিড় সামাল দিতে অনেক সময়ে অবাঙালি দারোয়ানদের বেপরোয়া চাবুক চালানোর প্রয়োজন হতো। তবে গান শুরুর পূর্বে ঢুলিরা ঢোলের শব্দ করতে না করতেই সমস্ত কোলাহলের অবসান হতো। দুই দলে লোকসংখ্যা হতো তেরো-চোদ্দো জন। স্বাভাবিকভাবে এই তেরো-চোদ্দো জনের মধ্যে দুজন থাকতেন কবিয়াল, দুজন থাকতেন ঢুলি, কমবেশি আটজন থাকতেন দোহার, এবং অন্তত দুজন থাকতেন তাল-সঙ্গতকারী। এদের সকলের পোশাক থাকতো স্বল্প। একখানা লাল কাপড় কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতো। উর্ধ্বাঙ্গে কোনো কাপড় থাকতো না। দোহারদের মাথায় থাকতো পাখির পালকযুক্ত তেকোনা টুপি এবং পায়ে থাকতো ঘুঙুর। গানের তালে তালে তারা নাচতো। আসরে প্রবেশ করার পর যন্ত্রসঙ্গতকারী ও দোহারদের নিয়ে কবিয়ালদ্বয় ঠাকুরদালানে স্থাপিত দেবদেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। তারপর উভয় দল আসরে আসন গ্রহণ করতেন। এরপর প্রথমে একদল এসে কালী বা

---

[৪৬] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. একশত তিন।
[৪৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩–৬৪।

দুর্গাকে বন্দনা করে গান গাইতো। এগুলো তখন 'সপ্তমী' বা 'ঠাকরুণবিষয়' নামে পরিচিত ছিলো। এই গানে তিনটি বা চারটি অন্তরা থাকতো। এই তথ্য থেকে মনে হয়, উনিশ শতকের শেষ দিকে ডাকগান নামে যে ধরনের গান কবিগানের সূচনাসঙ্গীত হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলো আঠারোশো ত্রিশের দশক থেকেই তা চালু হয়। উভয় দলের দোহাররা এই গান গাইতেন আর মাঝে মাঝে নাচতেন। প্রথম দলের দোহারদের গান শেষ হলে দ্বিতীয় দলের দোহারগণ আরো জোরে জোরে গান করে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করতেন। বন্দনা জাতীয় গান পরিবেশনের পর কোনো একটি দলকে চাপান হিসেবে সখীসংবাদ গাইতে হতো। এই সখীসংবাদের গানের কথায় এমন কিছু প্রশ্ন থাকতো, দ্বিতীয় দলকে তার উপযুক্ত জবাব দিতে হতো। দ্বিতীয় দলের কবিয়াল যদি প্রথম দলের সখীসংবাদের যথোপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে দ্বিতীয় দলের কবিয়ালের বদনাম হতো এবং যদি ভালো জবাব দিতে পারতেন, তাহলে শ্রোতাদের নিকট থেকে নানা ধরনের পুরস্কার পেতেন।

সখীসংবাদ গানের পরে উভয় দল আরো একাধিক অঙ্গের গান পরিবেশন করতেন বলে বর্ণনা থেকে জানা যায়। এর মধ্যে এক জাতীয় গানের নাম 'বিরহ'। 'করুণানিধানবিলাস' থেকে বিরহ জাতীয় গানের উদাহরণ পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় উনিশশো তিরিশের দশকেও বিরহ গান চালু ছিলো। 'করুণানিধানবিলাস'-এ খেউড় গানের উল্লেখ আছে। পত্রিকাটিতে 'কাহুক' (kahoocs) নামের একটি অঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং বলা হয়, এই গানের ভাষা অতি জঘন্য, যা শুনতেও ঘৃণা হয়। এতে মনে হয় 'কাহুক' হয়তো মুদ্রণপ্রমাদ—খেউড় গানই হয়তো তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই গানের প্রতি সমকালের ভদ্রলোকদের খুব আগ্রহ ছিলো, তাঁরা বাহবা দিতেন, তার ফলে দলের সদস্যরা নেচে নেচে এই গান পরিবেশনে উৎসাহ পেতো। বলা হয়েছে, যে দল যতো কদর্য ভাষায় জঘন্য ভাবের খেউড় গাইতে পারতো, তারাই জয়মাল্য পেতো এবং পুরস্কৃত হতো। এই প্রতিযোগিতায় অনেক শখের দলও অংশগ্রহণ করতো। কোনো প্রতিযোগিতায় যদি এমন কোনো শখের দল জয়ী হতো, তাহলে তারা সকাল বেলায় বড়ো রাস্তা দিয়ে মিছিল করতো এবং প্রভাতী গান গাইতো। প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়, সে সময়ে মহিলা কবির দলও ছিলো, এরা সাধারণত জমিদারদের রক্ষিতা শ্রেণির লোক হতেন।

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সালে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে কবিগানের যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তা উপরের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়ের গানগুলো প্রায় অভিন্ন রীতিতে রচিত। তখন যেসব অঙ্গবিভাজন বা তুক থাকতো, সেগুলো হলো: চিতেন, মহড়া এবং অন্তরা। প্রসঙ্গত এ কথাও জানা যায় যে, গাওয়ার সময়ে এভাবে গাওয়া হলেও গানগুলো লেখার সময়ে প্রথমে মহড়া, তারপরে চিতান এবং শেষ দিকে অন্তরা গাইতে হতো। খেউড় গানের আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ ও ইঙ্গিত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, এর মধ্যে প্রায় সবগুলোই 'অপবিত্র শব্দে বিন্যস্ত'। একই কারণে তিনি খেউড় গান সম্পর্কিত তথ্যাদি যথাসম্ভব কম লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কলকাতা পর্বের কবিগানের স্তবক বা তুক বিন্যাসে কমবেশি পরিবর্তন হয়। তখন কিছু কিছু অঙ্গের গানের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। যেমন এ সময়ে রাম বসুর বিরহ গানের তুক হয় যথাক্রমে: চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ, ফুকা, মেলতা, অন্তরা, চিতান, পরচিতান, ফুকা, এবং মেলতা।[৪৮]

এইসব নাম কবিগানের বিভিন্ন তুক বা স্তবকের আলাদা সুর নির্দেশক। কিছু কিছু তুকনাম হিন্দুস্তানি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত থেকে মনে হয়, এইসব পরিভাষা তৈরিতে তৎকালে কলকাতায় বসবাসরত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের হাত ছিলো। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি, কবিগানে তেমন এইসব তুক-নাম। কবিগানের তুকনামগুলোর এই অ-সংস্কৃত ও লৌকিক নাম ভেবে দেখার মতো। পরবর্তী কালের বাংলা গানের তুকনাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সংস্কৃত পরিভাষা গ্রহণ করায়, এই তুকনামগুলো তার তাৎপর্য হারিয়েছে। অভিধানে ভুক্তির মর্যাদা না পাওয়ায়, এর অর্থও আর স্পষ্ট নয়। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতায় যাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন, তাঁরা তো বটেই, যাঁরা এইসব গান উপভোগ করতেন, তাঁদের নিকটে এর অর্থ অস্পষ্ট ছিলো না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় পরিবেশিত কবিগানের জনপ্রিয় কয়েকটি অংশ (বন্দনা, ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, কবির লহর) নিম্নে উদ্ধৃত হলো, যাতে সে সময়কার গানের গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এখানে শুধু এক দলের গান (চাপান) উপস্থাপিত হলো।

এক: বন্দনা (লালু নন্দলাল)

মা জগদ্ধাত্রী শব-শিবে যত অবতার, যত দেখি সকলি মা মহিমা তোমার।
দেখে এলাম দশটা রমণী! তাদের দেহতে ওমা নাইক গো তুমি,
আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করী দেখে লাগে ভয়।
বল মা তারা দুঃখহরা, দেগো পরিচয়,
সেই দশটা মেয়ে বসে আছে ন'টা কোন হয় ॥

তোমার যত মহিমা আগম-তন্ত্রে কয়,
যদি এই কথাটা আমায় না বলবে, দুর্গা নামেতে তোমার কলঙ্ক হবে,
আমি পদ্মা সখী সদাই থাকি নিয়ে তোমার পদাশ্রয় ॥

মা আমি তোমার দাসী তেঁই সব কথা জিজ্ঞাসি—
এই নিগূঢ় কথা বলগো ভবানী, আমি ভাবছি দিবা-নিশি
তাদের রঙ্গ দেখে আমার লাগলো চমৎকার,
ওগো আমার মনের ভাবনা ঘুচাও মা এইবার।
তুমি দুঃখহরা পুরাণে শুনি, হরের ঘরণী তুমি ভবের তরণী,

[৪৮] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. ১৬১–২৭০।

কবি লালু ভণে তোমার রণে কত অসুর হলো ক্ষয় ॥[৪৯]

দুই: ভবানীবিষয় (অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি)

মহড়া জয়া যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে তোমায়
তুমি করো তায় ভবসিন্ধু পার ॥

মা তাই শুনে এ ভবের কূলে দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে বিপদকালে ডাকি
দুর্গা কোথায় মা দুর্গা কোথায় মা তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা।
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা ॥

খাদ অতি কুমতি পুত্র বলে আপনিও কুমাতা হলে আমার কপালে
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণকুলে ধর্ম তেমনি রেখেছ ॥

ফুকা দয়াময়ী আজ আমায় দয়া করবে কি মা
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছো ॥

মেলতা জানি তোমার চরণ সাধন করি ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী
দেখো সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি
আবার শূন্য করে সোনার কাশী ও মা শ্যামা সর্বনাশী
শিবকে করে শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছো ॥

চিতেন নাম কেবল করুণাময়ী করুণাশূন্য হয়েছো ॥
মা তুমি দক্ষ রাজকুমারী
দক্ষযজ্ঞে গমন করি যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে
শিব বিহনে শিব অপমানে মা সেই অভিমানে
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি দক্ষরাজায় নিদয় হলি—
আপনি মলি তারেও মেলি পিতার দুঃখ ভাবলি নে ॥

পাড়ন তখন তার অপমান শুনে কানে
প্রাণ ত্যেজেছো বিষাদমনে দক্ষভবনে
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে তার বুকে পা দিয়েছো ॥

ফুকা তুমি তারো তারো তারো না তারো
না তারো আপনার গুণে তরবো।
দুর্গা নাম তরী মস্তকেতে করি যতন করিয়ে রাখবো।
আমার অন্তে শমন এলে অজপা ফুরালে

[৪৯] সংকলিত, প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. ৩৪।

মেলতা দুর্গা দুর্গা বলে ডাকবো ॥

চিতেন মা অসাধ্য তোমার সাধন
করলে সাধন কেবল তায় নিধন হতে হয়।
পাড়ন একবার তারা বলে যে ডেকেছে সেই ডুবেছে
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয় ॥

ফুকা মা রাবণরাজা অন্তিমকালে রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা বলে ডেকেছিলো বদনে
মেলতা তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তবু দুঃখ ভাবলি নে
তারে ধ্বংস করে ভগবতী নিদয় হলি ভক্তের প্রতি
শেষ কালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে ॥

অন্তরা আগে ছিলো না কোনো শঙ্কা
বাজাতো জয়কালীর ডঙ্কা অতি তেজ ডঙ্কা
আবার ছল করে তার সোনার লঙ্কা দগ্ধ করে এসেছো ॥

মেলতা দয়াময়ী আজ আমায় দয়া করবে কি মা
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছো ॥[৫০]

তিন: সখীসংবাদ (হরু ঠাকুর)

মহড়া কদম্বতলে কে গো বাঁশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনাজলে
আমি এমনো মোহনো মূরতি কখনো দেখিনি এসে হেথায় ॥

চিতেন অঙ্গ অগুরুচন্দন-চর্চিত বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায় ॥

অন্তরা সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ এই রসিক শেষ ॥

চিতেন চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো সঁপিব ও রাঙ্গা পায় ॥

অন্তরা হায় অনুপম রূপমাধুরী সখী, হেরিলাম কি ক্ষণে।
প্রাণ নিলো হরে, ঈষৎ হেসে বঙ্কিম নয়নে ॥

চিতেন মন্দ মধুরো মুচকি হাসি চপলা চমকায়।

---

[৫০] সংকলিত, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৬০–৬২।

কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো মন্ মজিলো হেরে উহায় ॥

অন্তরা সই, অলক আবৃত বদন, তাহে মৃগমদো তিলকো
মনোহরো সাজো নাসাগ্রে গজোমুকুতার ঝলকো।
চিতেন বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়
কিবে সুন্দর সুঠামো ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমো রূপে ভুবন ভুলায় ॥

অন্তরা সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে, কি শোভা আমরি হায়।
গগনেতে তারাগণমাঝে, চাঁদ যেন শোভা পায় ॥
সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি
রঘু কহে একি দায় ॥[৫১]

চার: টপ্পা (মাধব ময়রা)

ও দশরথ মূর্খ মহারাজ, আর তোর মত কাজ করে কে কোথায়।
তুমি অযোধ্যায় অজ রাজার ছেলে, ভাল ধনুর্বিদ্যা শিখেছিলে
বধ করলে ব্রাহ্মণের সন্তান।
এক সিন্ধু শোকে অন্ধ অন্ধির যায় দুজনার প্রাণ।
তুই এম্নি ধারা বাসি মড়া হবি পুত্রশোকের দায়।
রাজার সুখে অরণ্যে কাল প্রজা কাটায় ॥

বল কোন রাজাতে রাত্রি যোগে মৃগ বধে কাননে।
মারলে বাণ শব্দভেদী, করলি কেন অবধি,
আমার সোনার পুত্র সিন্ধুনিধি, বধলি একবাণে ॥[৫২]

কবিগান পরিবেশনের সময়ে 'জিল' দেওয়ার জন্য এক দল বালক নিয়োজিত থাকতো। তারা বেশ সুকণ্ঠের অধিকারী হতো। জিল দেওয়ার মানে হলো, সুরের বিশেষ ওঠানামার সময়ে 'আহাহা' বা 'বেশ বেশ' জাতীয় কিছু ধ্বনির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ। এতে গানের শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে হয়তো তখন মনে করা হতো।

উনিশ শতকের সূচনায় কবিগানের উপস্থাপনে লৈঙ্গিক পরিবর্তনও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে এ সময়ে দু-এক মহিলা কবিয়াল ও বাঁধনদারের আবির্ভাব এবং আসরে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে কবিগানে নারীসমাজের অংশগ্রহণ স্পষ্ট হয়। এর পূর্বে কবিগানের কোনো কোনো ছোকরা দোহার মেয়েদের বেশ পরে গান

---

[৫১] সংকলিত, প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. ৮০–৮১।

[৫২] সংকলিত, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৮৮–৮৯।

পরিবেশন করতো বলে জানা যায়। কিন্তু রাম বসুর সঙ্গিনী কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরী নিজেই আসরে দাঁড়িয়ে কবিগান পরিবেশন করতে শুরু করায়, কবিয়ালদের শ্রেণিচরিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। যজ্ঞেশ্বরীর অনুসরণে মোহিনী দাসী নামে আর একজন কবিয়ালের আবির্ভাব হয়। নারী কবিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে নারী দোহারের আমদানিও সেই সময়ে হতে শুরু করবে, তা স্বাভাবিক। জানা যায় সেই সময়ে সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের নিয়ে গঠিত মেয়ে-কবির দলও গঠিত হতো। এরা সাধারণত বিত্তবান বাড়ির অন্তঃপুরে নানা ধরনের পূজা ও মেয়েলি অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করতো।[৫৩] কিন্তু দলগুলো কি দাঁড়াকবি জাতীয় কবিগান পরিবেশন করতো, নাকি লহর জাতীয় কবিগান পরিবেশন করতো, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না। কলকাতার বাইরেও এইসব নারীকবির দল গান পরিবেশন করতে যেতো, এমন খবর পাওয়া যায়। এ ধরনের একটি খবর পরিবেশিত হয়েছে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে:

> ... ঐ [কৈকালা] গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতাহইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণিপ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল ... ।[৫৪]

খবরটি থেকে বোঝা যায়, তখন এইসব নারীকবির দল বৈষ্ণবীদের নিয়ে গঠিত ছিলো। নেড়িকবি বলতে হয়তো তাদের বোঝানো হয়েছে। এই নেড়ি পরিচয়ের আড়ালে অনেক যৌনকর্মীও কবিগানের দলে যুক্ত হয়েছিলেন। উনিশ শতক, এমনকি বিশ শতকের বহু দৃষ্টান্তে তেমনটা মনে হয়। এসব খবর থেকে মনে হয়, প্রতিভা বিকাশের উপায় হিসেবে কবিগানের মতো একটি উল্লেখযোগ্য পেশা যৌনকর্মীদের নিকট একটি অসাধারণ সুযোগ এনে দিয়েছিলো, অনেকে সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৬. কলকাতা পর্বে কবিগানের বিষয়

'করুণানিধানবিলাস' থেকে আঠারো শতকের কবিগানের যে নমুনা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, সেই গানের বিষয় ছিলো মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তবে সূচনায় 'গুরুদেবের

---

[৫৩] যেসব মেয়েলি অনুষ্ঠানে মেয়েকবির দল কবিগান পরিবেশন করতো, তার মধ্যে সাধভক্ষণ ও দ্বিতীয় বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরনো সংস্কার অনুযায়ী কোনো নারীর ঋতুমতী হওয়ার ঘটনা যদি বিবাহের পরে ঘটতো, তাহলে সেই নারীকে তার স্বামীর সঙ্গে পুনর্বার বিবাহের অনুষ্ঠান করতে হতো, সেটাই দ্বিতীয় বিবাহ। মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানই এতে প্রাধান্য পেতো।

[৫৪] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪৯), পৃ. ১৪৩।

গীত' নামে তখন যে অংশটি চালু ছিলো, তার মধ্যে কখনো কখনো শাক্তবিশ্বাসও প্রতিফলিত হয়। যেমন 'করুণানিধানবিলাসে'-র পূর্বে উদ্ধৃত কবিগানটিতে প্রথম কবিয়ালের গানে শাক্ত ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে। সেখানে গুরু বন্দনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বাম উরুতে স্থিত শক্তির উল্লেখ এবং মায়ের ধ্যান প্রভৃতি শাক্ত সাধনার ইঙ্গিতবাহী। তবে দ্বিতীয় কবিয়ালের গুরুবন্দনা বৈষ্ণবীয় ভাবের। যদিও তিনি এক পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণকে হরগৌরীর সঙ্গে তুলনা করেন। এছাড়া অবশিষ্ট সব গানই বৈষ্ণবীয় তথা রাধাকৃষ্ণ প্রেম নির্দেশক।

উনিশ শতকের সূচনা নাগাদ কবিগানের মধ্যে উক্ত শাক্ত প্রসঙ্গ ব্যাপক জায়গা দখল করে ফেলে। কবিগানের সূচনা হিসেবে গুরুবন্দনা একেবারেই বর্জিত হয়। এর বদলে চালু হয় কালীবন্দনা ও দুর্গাবন্দনা। এই রীতি বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কবিগানের এই সূচনাসঙ্গীত তখন পরিচিতি পেতে শুরু করে ভবানীবিষয়, আগমনী, সপ্তমী, ঠাকরুনবিষয় প্রভৃতি নামে। এর মধ্যে ভবানীবিষয় ছিলো রামপ্রসাদী গানের অনুরূপ।[৫৫] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ যেসব গান সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে অনেকগুলো ভবানীবিষয় নামের গান ছিলো, এমনকি তিনি যখন হরু ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, তখনও তিনি তাঁর ভবানীবিষয় গানের উল্লেখ করেছেন।[৫৬]

কোনো কোনো আসরে গৌরাঙ্গের স্তব-স্তুতিমূলক গান দিয়েও কবিগান শুরু হতো। এই গানগুলোকে বলা হতো গৌরচন্দ্রী। সূচনাসঙ্গীত হিসেবে ভবানীবিষয়ের বিকল্প হিসেবে এগুলো গাওয়া হতো। তবে এক পর্যায়ে গৌরচন্দ্রীর চেয়ে ভবানীবিষয় অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং কবিগানের সূচনাসঙ্গীত হিসেবে ভবানীবিষয় অবিকল্পভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

ভবানীবিষয় গান রামপ্রসাদী গানের অনুরূপ, অর্থাৎ এতে শুধু চিতান এবং অন্তরা ছিলো। বিশ শতকের কবিগানেও 'ডাক' নামক যে অংশ কবিগানের সূচনাসঙ্গীত, তার গঠনও প্রায় অভিন্ন। এ থেকে মনে হয় কবিগানের সূচনাসঙ্গীত হিসেবে কালীবন্দনা বিষয়ক গানের সূচনা হয় উনিশ শতকের সূচনায়। এর পেছনে পৃষ্ঠপোষক বিত্তবান শ্রেণির শাক্ত পরিচয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে ভবানীবিষয় গানের এই সংক্ষিপ্ত রূপের পাশাপাশি উনিশ শতকেই এই নামের এমন গানও পাওয়া যায়, যা রামপ্রসাদী গানের থেকে দীর্ঘ এবং কবিগানের অন্যান্য অংশের অনুরূপ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই শেষোক্ত শ্রেণির গান 'মালশি' গান নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে।

---

[৫৫] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬

[৫৬] "কি 'ভবানী বিষয় কি 'সখী সংবাদ' কি 'বিরহ' কি 'খেউড়, কি 'লহর' হরু সকল প্রকার গান রচনা করণেই নিপুণ ছিলেন।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ১৪৬।

ভবানীবিষয় গানেরই অন্য নাম 'আগমনী', 'সপ্তমী' বা 'ঠাকরুনবিষয়'। তবে শেষোক্ত গানে দুর্গাপূজার অনুষঙ্গ প্রাধান্য পায়। 'আগমনী' ও 'সপ্তমী' নামের গান অভিন্ন বিষয়ক। দুর্গা পূজার সূচনায় গীত হওয়ার জন্য এই গান রচিত। এসব গানের বিষয় উমা-মেনকা সংক্রান্ত কাহিনি। সেই কাহিনিতে মা ও মেয়ের সম্পর্ক প্রাধান্য পায়, স্বর্গের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে কবিয়ালগণ এক পর্যায়ে মর্ত্যের সাধারণ মা ও মেয়ের জীবনকে ফুটিয়ে তোলেন। কালী ও দুর্গা দেবীকে নিয়ে রচিত হতে থাকে নানা ধরনের ঠাকরুনবিষয়।

কবিগানের শাক্তবিষয়ক এই গানগুলো সূচনাসঙ্গীত হিসেবে গীত হতো বলে এগুলোর গঠনে উক্তি-প্রত্যুক্তি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না। কবিগানের উক্তি-প্রত্যুক্তি শুরু হয় সখীসংবাদ বিষয়ক গান দিয়ে। সখীসংবাদ মানেই হলো রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক কাহিনি নিয়ে রচিত গান। বৈষ্ণব পদাবলিতে যেসব প্রসঙ্গ জনপ্রিয় তার প্রায় সবগুলো প্রসঙ্গ নিয়েই এসব গান রচিত হয়। সখীসংবাদে যেসব গান চাপান হিসেবে রচিত, তাতে কোনো একজন সখী রাধার পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করে, উতোর হিসেবে পরিবেশিত গানে কৃষ্ণ হয়ে তার জবাব দিতে হয়। আবার বিপরীতভাবেও চাপান-উতোর হতে পারে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনির বিভিন্ন পর্যায় তখন এতোটা জনপ্রিয় ছিলো যে, সেই পর্যায় অনুযায়ী কবিগানের সখীসংবাদও চিহ্নিত হতে শুরু করে। যেমন বিরহ বলতে বোঝাতো রাধা ও কৃষ্ণের বহুমাত্রিক বিরহ; মাথুর বলতে বোঝাতো কৃষ্ণের মধুরা গমন, কুব্জার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ এবং বৃন্দাবনস্থিত রাধাকে ভুলে যাওয়া; মিলন বলতে বোঝাতো চন্দ্রাবলির প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ ও রাধার মানভঞ্জন প্রভৃতি।

এইসব গান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেন যে, এগুলোর রুচি প্রায়ই নিম্ন মানের ছিলো। বিশেষভাবে পদাবলি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বৈষ্ণব পদাবলির সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ব্যঞ্জনা কবিয়ালগণ ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৫৭] কিন্তু এ পর্যন্ত কলকাতা পর্বের যেসব সখীসংবাদ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তার কোনোটাকেই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রুচিকে অতিক্রম করতে দেখা যায় না। সকল মহাজনের রুচি যে অভিন্ন ছিলো না, সে সম্পর্কে সমালোচকগণ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেও মনে হয় না। তবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনির মধ্যে যেসব মানবিক বৈশিষ্ট্য বিতর্কের জন্ম দেয়, সেগুলো নিয়ে কবিয়ালগণ গান রচনা করতেন বলে তা কখনো কখনো সীমানা অতিক্রম করে ঠিকই, তবে কবিগানের সমকালীন (এমনকি মাইকেলের প্রহসন পর্যন্ত) এবং পূর্ববর্তী কালের (যেমন ভারতচন্দ্রের বিদ্যার কাহিনি) বাংলা সাহিত্যের বিচারে কবিগান কতোটা স্থূল রুচি বহন

---

[৫৭] যেমন Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (2nd ed.; Kolkata: Firma KLM, 1962), p. 294.

করে, তা প্রশ্নাতীত নয়। বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার বিরুদ্ধেও অভিন্ন রুচির অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগানের বিরূপ সমালোচনা করতে যা লেখেন, তার মর্মার্থ হলো, কবিয়ালগণ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে শুধু সেই অংশই গ্রহণ করে, যেখানে 'কলঙ্ক ও ছলনা' এবং 'পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও দোষারোপ' থাকে।[৫৮] কবিগানের গঠনের কারণে কবিয়ালদের তা আকৃষ্ট করে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনিতে এই কলঙ্ক ও ছলনা, অবিশ্বাস ও দোষারোপের অবকাশ থাকে বলেই তা কবিগানের উপকরণ হিসেবে অসাধারণ, এমনকি বিকল্পহীনও বটে।

কবিগানের বিরহ পর্যায়ের গানের মধ্যে প্রত্যক্ষত রাধা-কৃষ্ণের বিরহ থাকে বলে মনে হয়, কিন্তু এগুলোর কথা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, এই বিরহ গানগুলো সমকালীন মানব-মানবীর বিরহের অভিজ্ঞতাতেই পুষ্ট। নিধুবাবুর টপ্পা গানে যে মানবপ্রেমের ছোঁয়া লাগে তার পেছনে কবিগানের এই পর্যায়ের গানের প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো এই জন্য যে, নিধুবাবু এক সময়ে কবিগানের অন্যতম রূপান্তর আখড়াই গানের প্রবর্তক ছিলেন।

সখীসংবাদ ও বিরহ পর্যায়ের গানের ফাঁকে অনেক সময়ে গোষ্ঠ নামের নাম কবিগানের মধ্যে পরিবেশিত হতো। এগুলো কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক গান। এর মধ্যে কৃষ্ণের গোচারণ প্রসঙ্গে মা যশোদার কাতরতা প্রাধান্য পেতো। তবে গোষ্ঠ নামের গানের মধ্যে কৃষ্ণের বাল্যলীলার যাবতীয় কাহিনিই স্থান পেতে দেখা যায়। কৃষ্ণের গোষ্ঠগমনের পাশাপাশি, কালিয়দমন, অসুরবধ, বৃন্দাবনত্যাগ, প্রভাসযজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়ও গোষ্ঠগানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোথাও কোথাও রাসলীলা পর্যন্ত গোষ্ঠগানের বিষয় হতো। এই গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো কখনো চাপান হিসেবে পরিবেশিত হতো না। তাই এই ধরনের গানের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকতো না, একই কারণে বিপরীত পক্ষের জন্য এই গানের জবাব গান পরিবেশনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতো না। দুই দলের মধ্যে যে কোনো একটি দল গোষ্ঠগান পরিবেশন করতে পারতো অথবা শ্রোতাদের অনুরোধে কোনো একটি দল এই ধরনের গান পরিবেশন করতো। এভাবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রশ্নহীন গানই ক্রমে গোষ্ঠ গান হিসেবে পরিচিতি পায়।

কলকাতা পর্বে সখীসংবাদের পরের পর্বের নাম ছিলো খেউড়। এই অংশে অশ্লীল প্রসঙ্গের অবতারণা অধিক হতো। খেউড় গানে 'সাধারণত কোনো পৌরাণিক আখ্যান, চরিত্র বা অনুরূপ ব্যাপারকে সরস, কৌতুকপ্রবণ, আদিরসাত্মক ঢঙে উপস্থাপন' করা হতো।[৫৯] কখনো কখনো সমকালীন প্রসঙ্গও খেউড় গানের বিষয় হতো। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে হুতোমের বারোয়ারি খোলায় কবিগান অনুষ্ঠানের

---

[৫৮] *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, ১৩শ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১), ৭১২।

[৫৯] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩।

একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে জমিদারি প্রথা নিয়ে রচিত নিম্নলিখিত খেউড় গানটি উদ্ধৃত হয়। এই গান পূর্ববঙ্গীয় পর্বের মালফুকারের সঙ্গে প্রতিতুলিত হওয়ার যোগ্য। তুকনামসহ গানটি নিম্নরূপ:

চিতেন বড় বারে বারে এস ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক।
এই বারে গেরে তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক ॥

আস্তাই ক্যামন সুখ পেলে কম্বলে শুলে ব্রহ্মত্তর দেবত্তর বড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গ্যালো, ভূর ভাংলো তোমার, আক্তো জুলুম চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলো জাঁক।
বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো খাক্ ॥

মোহাড়া কুইনের খাসে দেশে প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েছেন।
কংসধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেছেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না ॥[৬০]

খেউড় গানের মধ্যে যেহেতু এইসব ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে, তাই এমন মনে করাই সঙ্গত যে, সেই গানের খেউড় অংশেই জমিদারির পক্ষে বিপক্ষে পাল্লা হয়েছিলো। এটি যে লহর ছিলো না, তাও বোঝা যায়, এই গানের চাপান হিসেবেই কালীপ্রসন্ন গানটি পরিবেশন করেছেন। জমিদারি প্রথা যদি আলোচ্য হয়, স্বাভাবিক কারণেই অনুমেয় যে, সমকালের আরো অনেক বিষয়, যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ তখন খেউড় গানে অন্তর্ভুক্ত হতো।

খেউড় গানের আদিরসাত্মক অংশ নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ আপত্তি ছিলো। তিনি মনে করতেন, নিচু শ্রেণির লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য কবিয়ালদের এই জাতীয় গান পরিবেশন করতে হতো। অন্যদিকে যাঁরা সম্ভ্রান্ত বংশের, তাঁরা রুচিশীল গান পছন্দ করতেন। প্রসঙ্গত তিনি লেখেন: "বিশিষ্টজনেরা ভদ্র গানে [সখীসংবাদে] এবং ইতর লোকেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।"[৬১] ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তি অবশ্য ধোপে টেকে না, যখন তিনিই আবার জানান যে, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর এবং আরো অনেক বিত্তবান লোক আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অশ্লীল খেউড় ও লহর গান উপভোগ করতেন।

---

[৬০] কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, পৃ. ৩৯। গানটি রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, গানটি শোনার পর শ্রোতাদের মনোলোক বিশ্লেষণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি লেখেন: "জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু-চার পাড়াগেঁয়ে রায়চৌধুরী মুনসি ও রায়বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তাররা চোক্ রাঙিয়ে উঠলো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচতে লাগলো।"

[৬১] উদ্ধৃত, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৭।

বস্তুত সব ধরনের খেউড় গান রুচির দিক দিয়ে নিম্নমানের ছিলো, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। শ্রোতাদের আগ্রহ অনুযায়ী এবং কবিয়ালদের যোগ্যতা অনুযায়ী এইসব গানের আদিরসের ব্যবহার ওঠানামা করতো। পৌরাণিক কাহিনি নির্বাচনের উপরেও তা অনেকটা নির্ভর করতো। ধরা যাক মহাভারতের অর্জুন আর কৃষ্ণকে নিয়ে যদি খেউড় তৈরি হতো, সেখানে আদিরস আগমনের সুযোগ পেতো না। কিন্তু যদি মহাভারতের কুন্তী বা দ্রোপদীকে নিয়ে তা তৈরি হতো, সেখানে আদিরসকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হতো। এ প্রসঙ্গে রাম বসুর একটি খেউড়ের উল্লেখ করা যায়, যেখানে জরাসিন্ধুর কন্যা এবং কৃষ্ণকে দুই পক্ষ করা হয়েছে। অথবা ভোলা ময়রা একটি খেউড় যেখানে দ্রোণাচার্য বনাম দুর্যোধনের বিতর্ক রয়েছে। অথবা রাম বসুর খেউড় যেখানে রুক্মিণীর প্রতি শিশুপালের আগ্রহ চিত্রিত।[৬২]

কলকাতা পর্বে কবিগানের শেষ পর্বের নাম ছিলো লহর গান। লহর শব্দটি হিন্দি 'লহ্‌রাই' শব্দ থেকে জাত বলে অনুমান করা হয়। অর্থাৎ এখানে কবিগানের লড়াই খুব উপভোগ্য হতো বলে এর নাম লহর। খেউড় গান শেষ হওয়ার এক পর্যায়ে কবিয়ালদ্বয় সামনা-সামনি পারস্পরিক গালাগালিপূর্ণ গান নিয়ে হাজির হতেন। পরস্পরের জাতি-কুল, মা-বাবা ইত্যাদি নিয়ে কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা এই অংশে থাকতো। বিশ শতকের কবিগানের জোটের পাল্লা অংশের সঙ্গে এই অংশ তুলনীয়। এই অংশ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: "ব্যক্তিগত আক্রমণ, গালাগালি, অমার্জিত ও অমার্জনীয় রংতামাশা, ঠাট্টা ইয়ার্কির চূড়ান্ত করে দু'দলের জয়পরাজয় নির্ধারিত হত। ব্যক্তিগত আক্রমণই লহরের মূল কথা। একদল অপরদলের দলপতিকে ব্যক্তিগতভাবে গালি দিলে বা কুল-জন্ম-সামাজিক অবস্থা নিয়ে খোঁটা দিলে বিবাদী দলকে তার জবাব দিতে গিয়ে গালাগালির মাত্রা চড়িয়ে দিতে হত এবং সমবেত শ্রোতারা এই পঙ্কোৎক্ষেপে অত্যন্ত খুশি হতেন, ঘন ঘন বাহবা বা দুয়ো দিতেন।"[৬৩]

বিশ শতক নাগাদ কবিগানের এই লহর অংশের নাম বদলে হয়েছে জোটের পাল্লা বা মিলনগীতি। আবার কবিগানের শুধু এই অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তরজা নামে আলাদা লোকমাধ্যমের জন্ম হয়েছে।

৭. কলকাতা পর্বে দাঁড়াকবি

ঈশ্বর গুপ্ত কবিগান আলোচনা করতে গিয়ে 'সখের দাঁড়াকবি' বা 'দাঁড়াকবি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয় কবিগানকে তিনি মোট দুই ভাগে

---

[৬২] রাম বসু তার খেউড়টিতে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে জরাসিন্ধুর কন্যার প্রতি বংশ রক্ষার কথা বলে অশ্লীল ইঙ্গিত করেন, ভোলা ময়রা তাঁর খেউড়ে দুর্যোধন কর্তৃক ভাদ্রবধূ দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করে কোলে বসানোর প্রসঙ্গ তোলেন, অন্যদিকে রাম বসু শিশুপালকে গালাগালি করতে গিয়ে তুলসীডালে কুকুরের প্রস্রাব করার কথা বলেন। তিনটি গান উদ্ধৃত করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮৪–৮৫।

[৬৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭।

বিভক্ত করে দেখতেন: এক. কবি, যা দিয়ে পেশাদার কবিগানকে বোঝাতো, এবং দুই. দাঁড়াকবি, যা অপেশাদার কবিগানকে বোঝাতো। ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানকে শুধু 'কবি' বলেছেন, সেই দিক দিয়ে তাঁর 'দাঁড়াকবি' মানে হলো 'দাঁড়া কবিগান'। এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, শখের দলের দাঁড়াকবি এবং পেশাদার কবিগানের গান গাওয়ার রীতি অভিন্ন।

ঈশ্বর গুপ্ত কবিগান এবং দাঁড়াকবিগানে বিশেষ কোনো পার্থক্য না দেখলেও অনেক আলোচক এই দুই ধরনের কবিগানে বিশেষ তফাত দেখতে পান। এই তফাতের কথা প্রথম উল্লেখ করেন গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' (১৮৭৬) গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে তিনি দাঁড়াকবি শিরোনামে আলাদা একটি গানও মুদ্রিত করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখের মৃত্যুর পরে কবিগানের গৌরব কিছু ম্লান হয়। তখন অপেশাদার এক শ্রেণির লোক সনাতনী ধারার কবিগানকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন, সেগুলো দাঁড়াকবি নামে পরিচিতি পায়। গোপালচন্দ্র জানান যে, উনিশ শতকের শুরুতেই কবিগান এবং দাঁড়াকবিগানের রচনারীতিতে তফাত স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী দাঁড়াকবিগানের তুক ছিলো নিম্নরূপ: চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, ২য় ফুকা, ২য় মেলতা, অন্তরা এবং অন্তরার পর ২য় চিতানের পঙ্ক্তিবিন্যাস করতে হতো। এই তুকবিন্যাসের সঙ্গে কবিগানের তুকবিন্যাসে বিশেষ কোনো তফাত নেই। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত মনোমোহন বসুর 'মনোমোহন গীতাবলী' গ্রন্থ থেকেও দাঁড়াকবি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় এর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হাফ-আখড়াই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জানান যে, হাফ-আখড়াই গানের জন্ম হওয়ার পর থেকে কবিগান 'দাঁড়াকবি' নামে পরিচিতি পায়। তাঁর ধারণা অনুযায়ী হাফ-আখড়াইও এক ধরনের কবিগান, যা বসে বসে পরিবেশন করতে হতো, অন্যদিকে দাঁড়াকবি পরিবেশন করতে হতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।[৬৪]

দাঁড়াকবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার সম্পর্ক যে ক্ষীণ, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেন সুকুমার সেন। তিনি মনে করেন 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ 'আদর্শ'।[৬৫] অর্থাৎ এই অর্থে দাঁড়াকবি হলো নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধভাবে রচিত কবিগান। এভাবে যে কবিগানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা গান পরিবেশিত হতো সেগুলো ছিলো দাঁড়া কবি এবং যেসব কবিগানে কবিয়ালগণ উপস্থিতমতো গান বেঁধে জবাব পরিবেশন করতেন, সেগুলো হলো আসল কবি। দাঁড়াকবিগানের সঙ্গে শখের দলের সম্পর্কের বিষয়টিও এই কারণে বোধগম্য। কারণ পেশাদার কবিয়ালকে যতোটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কবিত্বশক্তির অধিকারী হতে হতো, অপেশাদার কবিয়ালের নিকট তা প্রত্যাশা করা হতো না।

দাঁড়াকবি সম্পর্কে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ভাষায়, "যাঁরা অনেক পরিশ্রম ও অনুশীলন করে, বিশুদ্ধ রাগরাগিণী ও সুরে তালে

---

[৬৪] তদেব, পৃ. ৯৪–৯৫।
[৬৫] সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১০৫২।

গাইতেন, তাঁরা দাঁড়াকবির দল বলে অভিহিত হতেন এবং প্রায়ই তাঁরা ছিলেন অভিজাতশ্রেণীর অপেসাদার সৌখীন দল। তাই এঁরা 'সখের কবি' বা 'সখের দাঁড়াকবি' বলে বিশেষ গৌরব দাবি করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার অনেক অভিজাতবংশীয় সন্তান ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিরা দাঁড়াকবির দল তৈরি করেছিলেন।"[৬৬]

৮. কলকাতা পর্বের কবিয়াল

আঠারো ও উনিশ শতকের কলকাতায় কবিগান যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, তাতে এটা খুব স্বাভাবিক যে, কলকাতা এবং তার আশপাশ এলাকার বহু প্রতিভাবান লোক এই পেশার সঙ্গে জড়িত হন। কবিগানের দলপ্রধান, যাঁকে অসাধারণভাবে সৃজনশীল ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হতো, তিনি তো বটেই, কবিগানের অন্যান্য সদস্য, যাঁরা গায়ক এবং বাদক হিসেবে দলের মধ্যে থাকতেন, তাঁদেরও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়ে দলের মধ্যে স্থান করে নিতে হতো। কলকাতায় তখন অনেকগুলো কবিগানের দল গড়ে উঠতে দেখে মনে হয়, কবিগান তখন বেশ ভালো একটি পেশায় পরিণত হয়।

অনেকে তখন শখের দল গঠন করেছিলেন বলে জানা যায়। দলের নাম থেকে মনে হয়, সেখানে মূল কবিয়াল কবিগানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন না, তবে যন্ত্রসঙ্গতকারী এবং কণ্ঠসঙ্গতকারীরা অপেশাদারি ছিলেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ হয়। এ সময়ে কবিগানের পেশা আর্থিক দিয়েও লোভনীয় হয়ে উঠেছিলো বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত ব্রজসুন্দর সান্যালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জন করিতেন এবং কলিকাতাতেই তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। বহুতর স্থান হইতে তাহাদের নিকট বায়না উপস্থিত হইত। কাজেই অর্থ ও যশের কুহকে পড়িয়া অনেকেই এই ব্যবসা অবলম্বন করিতেন।"[৬৭]

অপেশাদার কবিয়ালগণ বিত্তবান পরিবারের সদস্য ছিলেন, তা বলা বাহুল্য। কবিগান তখন বেশ জনপ্রিয় থাকায় এবং পৃষ্ঠপোষকগণ বিত্তবান থাকায় পেশাদার কবিয়ালদেরও আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। এই সচ্ছলতার মাত্রা কবিয়ালের যোগ্যতার সঙ্গে নির্ভর করে থাকবে।

পেশাদার কবিয়ালদের সঙ্গে অপেশাদার বা শখের কবিয়ালদের এক ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকার ১৮২৮ সালের ২২শে নভেম্বর সংখ্যায় 'ভবঘুরে মুচি ডোম কবিওয়ালা' ছদ্মনামে একজন পত্রলেখক লিখেছিলেন, শখের কবিয়ালদের মাত্রাধিক্যের কারণে তাঁদের পেশাগত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি এ কথাও

---

[৬৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০১।

[৬৭] ব্রজসুন্দর সান্যাল, "কবিওয়ালা ৮," *নব্যভারত*, ফেব্রুয়ারি ১৯০৭।

উল্লেখ করেন যে, আদালতে মামলা করে তাঁরা নেড়ি কবিদের কবিগান করা রহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই প্রয়োজনে শখের দলের কবিয়ালদের বিরুদ্ধেও তাঁরা মামলা করবেন।[৬৮]

কলকাতার কবিগানে যাঁরা কবিয়াল ছিলেন, তাঁদের সকলেই গান রচনা করতে পারতেন না। যাঁরা তাঁদের হয়ে গান রচনা করে দিতেন, তাঁদের নাম ছিলো বাঁধনদার। বাঁধনদার সৃজনশীল হলেও দলপ্রধান হিসেবে কবিয়ালই দলের সুনাম-দুর্নামের অধিকারী ছিলেন। বাঁধনদার এবং কবিয়াল এভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন। বিশ শতকে যেমন গীতিকার এবং শিল্পীর সম্পর্ক, আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতা পর্বের কবিগানে তেমন বাঁধনদার এবং কবিয়ালের সম্পর্ক ছিলো। তবে সেই কবিয়ালই খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারতেন যিনি একাধারে বাঁধনদার ও কবিয়াল ছিলেন।

রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়াল গান রচনা ও পরিবেশনা উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মধ্যে রাম বসুর কবিয়াল-জীবন সূচিত হয় বাঁধনদার হিসেবে, পরে তিনি কবিগানের দল গঠন করেন এবং কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। বাঁধনদার এবং গায়ক হিসেবে হরু ঠাকুর ছিলেন সমকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ভোলা ময়রা এবং নীলু ঠাকুর বাঁধনদার হিসেবে ততোটা ভালো ছিলেন না। এর মধ্যে ভোলা ময়রা গুরুর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে গুরুকে দিয়ে নতুন নতুন গান লিখিয়ে নিতেন এবং পরিবেশন করতেন। অন্যদিকে নীলু ঠাকুর তখন অভিমানে গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ করে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ, রামসুন্দর রায় প্রমুখ বাঁধনদারের নিকট থেকে গান নিয়ে পরিবেশন করতেন। নিতাই বৈরাগীও কবিয়াল হিসেবে বেশ দক্ষ ছিলেন, তবে বাঁধনদার হিসেবে ততোটা দক্ষ ছিলেন না। তার ফলে তিনি গৌর কবিরাজ, নবাই ঠাকুর প্রমুখের রচিত গান পরিবেশন করে থাকতেন। সে সময়ে বাঁধনদার হিসেবে গৌর কবিরাজের বিশেষ খ্যাতি ছিলো। নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী ছাড়া আরো অনেক কবিয়াল তাঁর রচিত গান গাইতেন। এঁদের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত যোগীও একজন। গৌর কবিরাজ রচিত বিরহ এবং খেউড় জনপ্রিয় ছিলো। একইভাবে নবাই ঠাকুরের রচিত সখীসংবাদও তখন সংশ্লিষ্টজনদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলো।

আলোচ্য কালপর্বে বাঁধনদারগণ বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন। অনেক কবিয়াল বিশেষ সম্মানীর বিনিময়ে খ্যাতিমান বাঁধনদারদের নিকট থেকে নতুন নতুন কবিগান লিখিয়ে নিতেন। অনেক কবিয়াল বিশেষ সম্মানীর বিনিময়ে দলের সঙ্গেই বাঁধনদার রাখতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবেশন করতেন। অর্থের বিনিময়ে কবিগান লিখে দেওয়ার ব্যাপারে রাম বসুর বিশেষ খ্যাতি ছিলো। রাম বসু নিজে যেমন কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, প্রথম জীবনে তিনি

---

[৬৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

বাঁধনদার হিসেবে নাম করেছিলেন। তাঁর রচিত গান যাঁরা পরিবেশন করতেন, তাঁদের মধ্যে ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুর সিংহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অনেক বাঁধনদার ছিলেন, যাঁরা কখনোই কবিয়াল হননি। এঁদের মধ্যে রামসুন্দর রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, মনোমোহন বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথ ছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির বাঁধনদার। শেষোক্ত ঈশ্বর গুপ্ত এবং মনোমোহন বসু তো এই কালপর্বের কবিগানকে ইতিহাসের পাতায় স্থান দিয়ে গেছেন।

কবিগানে বাঁধনদারের এই কৃতিত্ব অনেক সময়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অনেক বাঁধনদারের রচনা পরবর্তী কালে বিখ্যাত কবিয়ালের নামে চালু হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। তবে উনিশ শতকে প্রকাশিত কবিগানের বিভিন্ন সংকলনের সুবাদে কবিগানে উপেক্ষিত এইসব বাঁধনদারদের অনেকের নাম কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

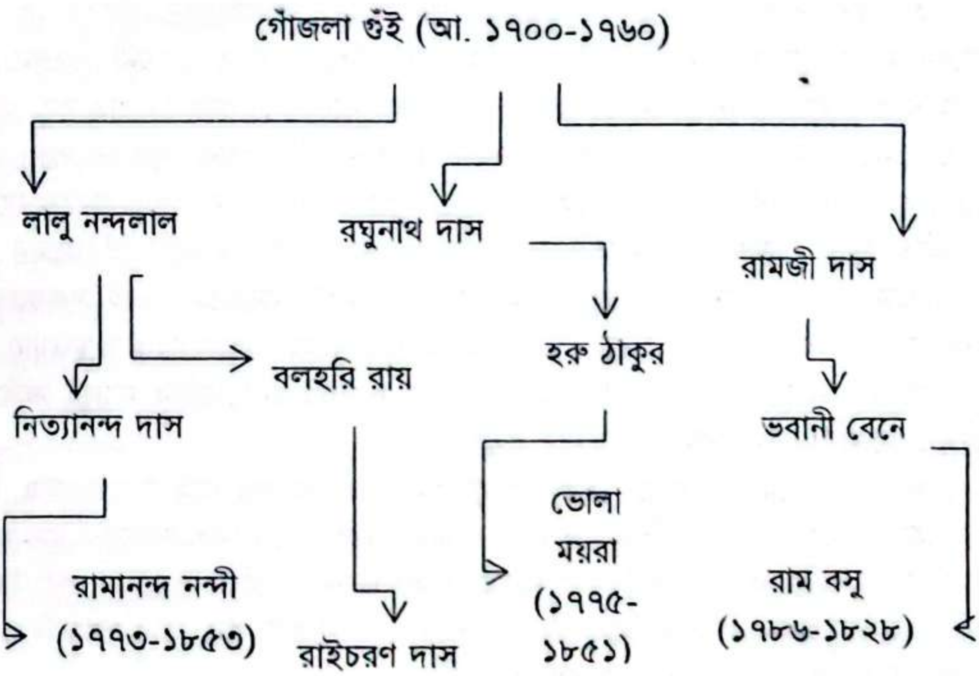
কবিয়ালগণ সাধারণত গুরুপরম্পরায় পরিচিত হয়ে থাকেন। আদিকবি হিসেবে গোঁজলা গুঁইকে (আ. ১৭০০–১৭৬০) স্বীকার করে নেওয়ার মানে হলো, আঠারো-উনিশ শতকের সব কবিয়ালই গোঁজলা গুঁইয়ের পরম্পরার অংশ।

গোঁজলা গুঁইয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিন জন: লালু নন্দলাল (আ. ১৭২৫-১৭৮৫), রঘুনাথ দাস (১৭২৫-১৭৯০) এবং রামজী দাস (আ. ১৭২৫-১৭৯০)। লালু নন্দলালের প্রধান শিষ্য দুই জন: নিত্যানন্দ দাস ওরফে নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১) এবং বলহরি রায় (১৭৪৩-১৮৪৯)। নিত্যানন্দ দাসের শিষ্য রামানন্দ নন্দী (১৭৭৩-১৮৫৩)। অন্যদিকে বলহরি রায়ের দুজন খ্যাতিমান শিষ্য হলেন নিতাই দাস ও রাইচরণ দাস। রঘুনাথ দাসের শিষ্য হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৫)। হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন প্রখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা (১৭৭৫-১৮৫১)। রামজী দাসের বিখ্যাত শিষ্যের নাম ভবানীচরণ বণিক ওরফে ভবানী বেনে (আ. ১৭৩২-১৮২০)। ভবানী বেনের শিষ্য ছিলেন রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)। প্রথম পর্যায়ের কবিগানের এই পরম্পরাকে পরবর্তী পৃষ্ঠার লতিকা দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

এই পরম্পরা লতিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটিভাবে আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রধান কবিগণ অভিন্ন একটি পরম্পরা বহন করছে। বিশেষভাবে ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখ কবি উনিশ শতকের মাঝামাঝি এতোটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, এঁরা শুধু কলকাতাতেই নন, বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশনের আহ্বান পেতেন।

এই কালপর্বের অনেক বিখ্যাত কবিয়ালের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। এমন হতে পারে যে, তাঁরা কোনো অখ্যাত কবিয়ালের নিকট তালিম নিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে গুরুর নাম শিষ্যের খ্যাতির নিচে চাপা পড়ে গেছে। এমন কবিয়ালদের মধ্যে অন্তত কেষ্টা মুচি এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবিয়ালদের পরম্পরা লতিকা



উৎসঃ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "ভূমিকা," *হারামণি*, ৭ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. আটষট্টি।

কবিয়ালদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই সমাজের নিচুতলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেনঃ "সেযুগে অধিকাংশ কবিওয়ালাই সমাজের অন্তেবাসী শ্রেণি থেকেই এসেছিলেন। হরু ঠাকুরই প্রথম ব্রাহ্মণ কবিওয়ালা।"[৬৯] মন্তব্যটি সাধারণীকরণ দোষে দুষ্ট। ব্রাহ্মণ না হলেই সকলে অন্তেবাসী হয়ে যায় না। তাছাড়া অন্তেবাসী মানে হলো অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ। কিন্তু হরু ঠাকুরের সময়ে এবং তাঁর পূর্বে যাঁরা কবিগান করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই স্পৃশ্য সমাজের লোক ছিলেন বলেই মনে হয়, অন্তত পদবি থেকে তেমনটা ধারণা করা চলে। বস্তুত আদি কবি গোঁজলা গুঁই যেমন আগুরি বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের, অন্যরাও প্রায় ক্ষেত্রে কায়স্থ, বৈদ্য অথবা তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাঁতি, শুঁড়ি, বা যুগি সম্প্রদায়ের কবিয়ালের সংখ্যা সেই সারিতে একেবারে নগণ্য। অস্পৃশ্য সমাজের নেই বললে চলে। এই পরিসংখ্যানে কেষ্টা মুচি ছিলেন বরং এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিশেষভাবে যাঁরা শখের কবির দল

[৬৯] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অথবা যে-কোনো সৎশূদ্র বংশোদ্ভূত, যাঁরা ঐ সময়ে বিশেষ বিত্তের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।[৭০]

কলকাতা পর্বের কবিগানে বেশ কয়েক জন মহিলা কবিয়ালের নাম পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী কবিয়াল রাম বসুর শিষ্যা এবং প্রণয়নী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি বাঁধনদার হিসেবেও বিশেষ নাম করেছিলেন। রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতেন বলে জানা যায়। অন্য এক নারী কবিয়াল মোহিনী দাসীর বিপক্ষেও তাঁকে কবিগান করতে হতো। কলকাতা পর্বে যজ্ঞেশ্বরী ও মোহিনী দাসী ছাড়াও আরো অনেক নারী কবিয়ালের নাম জানা যায়, তাঁরা প্রধানত অন্তঃপুরে কবিগান পরিবেশন করতেন। এই দলগুলোতে সকল সদস্যই নারী থাকার কারণে এবং এই সদস্যরা প্রায় সকলে বৈষ্ণবী হওয়ায় এই দলগুলোকে নেড়ি কবির দল বলা হতো। এই ধরনের নেড়িকবির দলের কবিয়াল ছিলেন রত্নমণি, গোলোকমণি, দয়ামণি প্রমুখ।

কলকাতা পর্বের কবিগানে একমাত্র মুসলমান কবিয়ালের নাম পাওয়া যায়, যাঁর নাম হোসেন শেখ। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কবিয়াল হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কবির লহর অংশের উপরে ভিত্তি করে যে তরজা গানের উদ্ভব উনিশ শতকের পশ্চিমবঙ্গে হয়, তার প্রথম দিককার তরজাওয়ালা হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায়।[৭১]

৯. কলকাতা পর্বের কবিগানের সংকলন

আঠারো ও উনিশ শতকের কলকাতায় চাপান হিসেবে পরিবেশিত কবিগানের অনেকগুলো সংকলন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। এসব গানের প্রথম সংকলক হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১৮৫৪-৫৫) প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী বর্ণনার পাশাপাশি তাঁদের রচিত বহু গান উদ্ধৃত করেন।

---

[৭০] ১৮৭৭ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিককার যে ত্রিশ জন কবিয়ালের গান সংকলন করেছিলেন, তাঁদের পদবি থেকে মনে হয় এঁদের মধ্যে অন্তত ১৩ জন ব্রাহ্মণ, ৭ জন কায়স্থ, ৫ জন সৎ শূদ্র, ৪ জন অসৎ শূদ্র এবং ১ জন তথাকথিত ম্লেচ্ছ। এর মধ্যে একজনও অস্পৃশ্য তথা অন্তেবাসী সম্প্রদায়ের নন। এই তথ্য থেকেও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়।

[৭১] নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন হোসেন শেখ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন হোসেন খাঁ, দীপক বিশ্বাস লিখেছেন হোসেন মির্জা। নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৩২; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭; এবং দীপক বিশ্বাস, *কবিগান* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃ. ২৮। এর মধ্যে নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন খাঁকে তরজা গানের উদ্ভাবক বলে দাবি করেন। কিন্তু তরজা গানের গবেষক নিশীথ চক্রবর্তীর ধারণা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভরু ঠাকুর অথবা হাওড়া জেলার মধু ঠাকুর ও তারক পাল তরজা গানের উদ্ভাবক। নিশীথ চক্রবর্তী, *তরজা গান* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩), পৃ. ৭, ৯।

১৮৭৭ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' গ্রন্থে ত্রিশ জন কবিয়ালের অনেকগুলো গান মুদ্রিত হয়। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ও শেষার্ধের কবিয়াল। এই সংকলনে যেসব কবিয়ালের গান মুদ্রিত হয়, তাঁদের নাম হলোঃ রাসু ও নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয়, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, ভবানী বেণে, ভীমে মালাকার, নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, মোহন সরকার, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটনি, রামসুন্দর স্যাকরা, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, গুরো দুম্বো, সৃষ্টিধর ছুতার, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, কালীচন্দ্র হালদার, গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯৪ সালে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবিগানের সংকলন প্রকাশ করেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠাফোলিওতে গ্রন্থটির নাম 'লুপ্তোরত্নোদ্ধার'। বইটি মুদ্রণের সময়ে জানা যায় যে, এই নামে আর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তাই প্রচ্ছদপত্রে বইটির নাম করা হয় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'। এই সংকলনে যাঁদের কবিগান সংকলন করা হয়, তাঁদের নামঃ রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার, লালু নন্দলাল, নীলমণি পাটনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষ নাথ, ও যজ্ঞেশ্বরী।

১৮৯৬ সালে মনুলাল মিশ্র কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেন, তার নাম দেন 'প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান'। এই সংকলনে রঘুনাথ দাস, রাম বসু, উদয়চাঁদ বৈরাগী, হরু ঠাকুর, আণ্টনি, রামপ্রসাদ ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, গোঁজলা গুঁই, নীলমণি পাটনি, লালু নন্দলাল, সৃষ্টিধর, নীলু ঠাকুর, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, মোহন সরকার, পরাণচন্দ্র সিংহ, ভীমদাস মালাকার, ভবানী বেণে, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, নীলকমল, ভোলা ময়রা, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গোরক্ষ নাথ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, চিন্তামণি ময়রা, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসুন্দর রায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ ঠাকুর, রাসু সিংহ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামকমল, রামজী দাস, গোবিন্দচন্দ্র, সাতু রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখের গান সংকলিত হয়। এঁদের মধ্যে সকলেই কবিয়াল ছিলেন না, কয়েকজন বাঁধনদারও ছিলেন।

১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রীতিগীতি' নামের একটি সংকলন, তাতে এইসব কবিয়ালের গান ছাড়া নতুন কিছু কবিয়ালের গান সংকলিত হয়।

বিশ শতকের প্রথম দিকেও কবিগানের বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়, যাতে উনিশ শতকের কবিগান সংকলিত হয়েছে। এইসব সংকলনের মধ্যে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি সংকলন।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কবিগানের দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। আয়তনের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী যে কোনো সংকলনের চেয়ে এ দুটি বড়ো। এর একটির সংকলক

ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র পাল। তাঁর বইয়ের নাম 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান'। এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। এখানে সত্তর জনের বেশি কবিয়ালের পাঁচশোর বেশি গান সংকলিত হয়েছে। অন্য সংকলকের নাম নিরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর বইয়ের নাম 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য'। এখানেও সত্তর জনের বেশি কবিওয়ালার অর্ধসহস্রাধিক কবিগান সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র পালের সংকলনে কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল যেমন পূর্ববঙ্গের কিছু কবিগান সংকলিত হয়েছে।

১০. সমকালীন প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকের কলকাতার কবিগান সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই নির্ভর করেছেন কবিগানের মুদ্রিত পাঠের উপরে। কবিগান যে বহু বৈশিষ্ট্য ধারণকারী একটি শিল্পমাধ্যম, এটি যে যুগপৎ দৃশ্যশিল্প (পারফর্মিং আর্ট) ও সাহিত্য—এর মধ্যে যে সাহিত্য রয়েছে, কণ্ঠসঙ্গীত রয়েছে, যন্ত্রসঙ্গীত রয়েছে, অভিনয় রয়েছে, বিতর্ক রয়েছে—আলোচকগণ তা ভেবে দেখেননি। তাই শুধু সাহিত্য অংশ নিয়ে কবিগানকে বিচার করার ফলে বিচারাকাজে একদেশদর্শিতা ঘটেছে বলে মনে হয়। কবিগানের সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে আলোচকগণ আবার সাহিত্য বিচারের আধুনিক মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, সেটিও আলোচকদের এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। এসব কথা মনে রেখে উনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবিগান-সমালোচনার দিকে তাকানো উচিত। তাতে কবিগানকে কতোটা অকারণ দোষারোপ করা হয়েছে, অথবা কতোটা যৌক্তিকভাবে প্রশংসা করা হয়েছে, তা বোঝা যাবে।

কবিগান সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়।[৭২] তিনি নিজে কবিগান রচনা করতে পারতেন বলে হয়তো এই গানের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিলো। বস্তুত তিনিই আঠারো ও উনিশ শতকের কবিয়ালদের সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এমনকি বিখ্যাত কবিয়ালদের যেসব জীবনতথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন (১৮৫৪–৫৫), পরবর্তী কালের গবেষকগণের নিকট তা আকর হিসেবে বিবেচিত হয়। কবিগান যে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উজ্জ্বল একটি অধ্যায়, সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার পরেই তিনি কবিগানের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সংকলন-কাজে তাঁর এই উৎসাহ থেকে বোঝা যায়, কবিগান সম্পর্কে সত্যি সত্যি তিনি কতোটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কবিগানের কিছু কিছু অংশের রুচিহীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং সেইসব অংশ রুচিহীন বলে তা সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি আগ্রহও দেখান না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে কবিগান সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা সম্পূর্ণ

---

[৭২] এগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ১১০–৪৪০।

ইতিবাচক। কবিগানের খারাপ অংশ যে তিনি সংকলন করেন না, তা এই বোধ থেকে যে, হয়তো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের নিকট তা ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ কবিগান সম্পর্কে একটু-আধটু খারাপ কথা বললেও কবিগানকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা এবং পারফর্মিং আর্ট হিসেবে এর অসাধারণ গুণকে তুলে ধরাই ছিলো তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণ কবিগানের মতো শিল্পমাধ্যম থেকে রসাস্বাদন করতে অক্ষম হন, সে ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি দুঃখ করে লেখেন: "কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দুই একটা ইতর কবিতা শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেননা তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগি হইবেন।—সংপ্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহাশয়েরা স্বদেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন।"[৭৩] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি কবিগান সম্পর্কে যথেষ্ট অনুকূল মন্তব্য করেননি।

এক্ষেত্রে স্পষ্ট ব্যতিক্রম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিগান সম্পর্কে তাঁর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি কবিগানের ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন। কবিগান যে উন্নত সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়, তা বোঝাতে গিয়ে প্রবন্ধটির এক জায়গায় তিনি রাম বসুর 'মনে রৈল সই মনের বেদনা' নামক বিরহ গানের কিছুটা অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর সেই অনুবাদ পাঠ করে যে কোনো পাঠকেরই কবিগানের কবিত্ব সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা সৃষ্টি হবে। জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম তা সচেতনভাবেও করে থাকতে পারেন।[৭৪] তবে বাংলা

---

[৭৩] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃ. ৩৪৪–৪৫।

[৭৪] অনূদিত গানের কয়েকটি চরণ:

It is the spring of the year, and it is the spring of my life;
And the lord of my life has left me for a far distant land.
He came to me with a smile and told me he would go;
I saw that smile, and that smile filled my eyes with tears.

রাম বসুর মূল গানের প্রাসঙ্গিক চরণ-চতুষ্টয়:

একে আমার যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল
হাসি হাসি যখন সে আসি বলে
সে হাসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে।

ভাষায় বক্তৃতা করার সময়ে কবিগান সম্পর্কে যখন তিনি (১৮৭৪) মন্তব্য করেন, তখন প্রশংসার পাশাপাশি কিছু সমালোচনাও স্থান পায়। কিন্তু ইংরেজি প্রবন্ধে সেই সমালোচনা থাকে না। অবশ্য বাংলা ভাষার বক্তৃতায় সমালোচনার তুলনায় প্রশংসার পরিমাণ অনেক বেশি ছিলো। যেমন কবিয়ালদের রচনাকে তিনি ভারতচন্দ্রের রচনার চেয়ে অনেক উন্নত বলে মত প্রকাশ করেন। লেখেন: "রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই ... ।"[৭৫] ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব বিশ্লেষণ করে মনে হয়, কবিগানকে তিনি বাঙালির একটি গর্বিত উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঠিক বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার নিষ্কর্মা ও ভ্রষ্টাচার বাবুসম্প্রদায়ের নিকটে কবিগানের জনপ্রিয়তা তুলে ধরেন। তাতে কবিগানের নেতিবাচকতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ছিলো এমন: "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, শেতার এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইতেন ... ।"[৭৬]

কবিগানের সবচেয়ে যৌক্তিক এবং সবচেয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৪ সালে "কবিসঙ্গীত" প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিগানের বিপক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরেন, তার মধ্য থেকে নিম্নের অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন: খ) কবিগানের মধ্যে ভাবের গভীরতার অভাব; খ) কবিগানে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকৃতি; গ) কবিগানে অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি; ঘ) কবিগানের ভাব ও ভাষা ইতর, সাহিত্যনীতি ব্যভিচারী, বক্তব্য রূঢ় ও অসংযমী;.এবং ঙ) কবিগানে লঘু সুর, উচ্চ স্বর ও চিৎকারের প্রাধান্য।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' সংকলন প্রকাশের পর এই বই সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কবিসঙ্গীত' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু উপরের অভিযোগগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় শুধু সংকলন নয়, প্রবন্ধটি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবিগান শোনার বাস্তব অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন। কবিগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ পরবর্তী কালের সাহিত্য-সমালোচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে, অধিকাংশ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নেতিবাচক বক্তব্যটুকু হুবহু গ্রহণ করেন এবং উদ্ধৃত করেন। একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিগানের ভালো কিছু

দ্রষ্টব্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৮৪।

[৭৫] "বিদ্যাপতি ও জয়দেব," *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯), পৃ. ১৯০।

[৭৬] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (কলকাতা: এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৯০৪), পৃ. ৫৭।

দিকের উল্লেখ করেছিলেন, তা অবশ্য পরবর্তী কালের আলোচকদের তেমন আকৃষ্ট করে না। বিশেষভাবে কবিগানের ভবানী বিষয়ক গান রবীন্দ্রনাথের নিকট 'সর্বত্রই সুমিষ্ট' মনে হতো, সে কথার পুনরাবৃত্তি কেউ করেন না। অথচ কবিগানের বড়ো একটি অংশ—ডাক, মালশি, আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি—এক কথায় ভবানী বিষয়ক গান।

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কবিগানের ভাবের অগভীরতার কথা রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছেন। উল্লিখিত সংকলনে হয়তো ভালো কোনো গান ছিলোও না। তাছাড়া 'ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমত রচিত' গানে বেশি গভীরতা যে প্রত্যাশা করা যায় না, তাও রবীন্দ্রনাথের বোধগম্যতার মধ্যে ছিলো।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের মুগ্ধতা ছিলো। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখের পদের ভাবগত উচ্চতা রবীন্দ্রনাথকে এতোটা মুগ্ধ করে যে, প্রথম জীবনে তিনি ভানুসিংহ ঠাকুরের নামে তা অনুকরণের চেষ্টা করেছিলেন। কবিগানের মধ্যে ভাবগত সেই উচ্চতার অভাব দেখে কবিগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ খানিকটা বিরূপ হতে পারেন। কিন্তু কবিগানের বৈশিষ্ট্যই যে পরস্পরের প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ, তার জন্য উপকরণ হিসেবে বৈষ্ণব সাহিত্যের কোনো বিকল্পও কবিয়ালদের নিকট ছিলো না, রবীন্দ্রনাথ তা বিবেচনায় রাখতে পারতেন।

কবিগানে অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি অধিকাংশ সময়ে দৃষ্টিকটু মনে হয়। এ ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন যথার্থ। নির্দিষ্ট ঐ সংকলনটি রবীন্দ্রনাথকে এমন ভাবনায় স্থিত থাকতে সাহায্য করতে পারে। তবে উনিশ শতকের এমন অনেক কবিগানও পাওয়া যায়, যেগুলোর অনুপ্রাস ও অলঙ্কার সুসমঞ্জস ও উত্তীর্ণ।

কবিগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অভিযোগ ভাষার, ভাবের, নীতির ও বক্তব্যের ইতরতা। উনিশ শতকের শেষার্ধের কবিগানের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ খণ্ডনের কিছু নেই। কারণ কবিগান ছিলো সমকালীন বিত্তবান সমাজের বিনোদনের মাধ্যম। লোকরুচির থেকে দূরে গিয়ে ভিন্ন কিছু সৃষ্টি কবিয়ালদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, যৌক্তিকও হতো না।

সবশেষে কবিগানের লঘু সুর, উচ্চ স্বর ও চিৎকারের প্রসঙ্গ। কবিগান পরিবেশিত হতো বিত্তবান বাড়ির প্রাঙ্গণে। পূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায়, সেসব ক্ষেত্রে লোকসমাগম হতো প্রচুর। ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্র ছাড়া শ্রোতাদের নিকটে পৌছানোর জন্য চিৎকার ও উচ্চ স্বরের কোনো বিকল্প ছিলো না।

রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁর অর্জিত পাশ্চাত্য রুচি দিয়ে কবিগানকে বিচার করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে কবিগানের এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়েছিলো। তবে এই ধরনের সমালোচনা থেকে অন্তত এটা মনে হয় যে, কবিগানকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কৃতি-মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং এর উন্নত মান সৃষ্টি হোক, তা তাঁর অন্তরের অভিপ্রায় ছিলো। যুগের পরিবর্তনে তা হয়তো সম্ভব ছিলো না, কিন্তু কবিগানকে যে তিনি বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংস্কৃতি-মাধ্যম মনে করতেন, তা বোঝা যায়, যখন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন, সহজাত কবিত্বশক্তি নিয়ে তিনি

যদি বাংলাদেশের কোনো গ্রামে কোনো কৃষকের ঘরে জন্মাতেন তাহলে কবিয়াল হয়ে তাঁকে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াতে হতো।[৭৭]

১১. উপসংহার

আঠারো শতকের কলকাতায় কবিগানের যে উদ্ভব ঘটে, তার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষণীয় হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। এই সময়ের কবিগানের সঙ্গে এমন কিছু প্রতিভা যুক্ত হয়, যা কবিগানকে অসাধারণ একটি শিল্পমাধ্যমে পরিণত করে। তার ফলে তা বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়। সেইসব গানের সাহিত্যিক মূল্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যায়িত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ শুধু গানের কথাতেই নয়, কবিগানের সুরেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী যুক্ত হয়। অসংখ্য তুকে বিন্যস্ত সেই কবিগান সাধারণ কবিয়ালের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাফ-আখড়াই ও দাঁড়াকবির মতো দুটো আলাদা প্রকরণের জন্ম হয়। বস্তুত সেগুলো ছিলো কবিগানের বৈঠকি সংস্করণ।

উনিশ শতকের কলকাতায় ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি হওয়ার কারণে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সমন্বয়ে গঠিত কবিগান ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যে কবিগান এক সময়ে দেশীয় সংজ্ঞায় সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে আসছিলো, ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক রুচির কারণে সেই কবিগান স্থূলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলো। বিত্তবানরা আধুনিক হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাটা পড়লো। নতুন পরিবেশে কবিগান যেহেতু পেশা হিসেবে লোভনীয় হয়ে উঠতে পারলো না, সেহেতু প্রতিভাবান লোকদের আকৃষ্ট করতেও তা ব্যর্থ হলো। এভাবে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের কলকাতা পর্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকলো।

কলকাতা থেকে লুপ্ত হতে শুরু করলেও কবিগানের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো গ্রামবাংলায়। কলকাতার প্রভাবে উনিশ শতক থেকেই সেখানে এক ধরনের শ্রোতা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। সেই শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সৃষ্টি হলো নতুন নতুন দল আর নতুন নতুন কবিয়াল। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে বিশেষভাবে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগানের নবজন্ম ঘটলো। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই কবিগানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে।

---

[৭৭] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথ ও রায়তের কথা," *পশ্চিমবঙ্গ*, পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৬ [১৯৭৯]।

তৃতীয় অধ্যায়
কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্ব

১. সূচনা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতা পর্বের কবিগানে ভাটা পড়তে শুরু করে। প্রধান কারণ কবিগানের শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পাওয়া। কবিগান চর্চার জন্য যে ধরনের সামাজিক বন্ধন দরকার, পরিবর্তনশীল কলকাতা মহানগরীতে তার অভাব ঘটে। অন্যদিকে নতুন ধরনের একাধিক বিনোদন-মাধ্যমের প্রতি কলকাতার বিত্তবান শ্রেণিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। এ পরিবেশ কলকাতায় কবিগান চর্চার প্রতিকূলে যায়।

অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ শহরগুলোতে, বিশেষভাবে যেসব অঞ্চলে বিখ্যাত জমিদারদের আবাস গড়ে উঠেছিলো, সেসব অঞ্চলে কলকাতার কবিগান পরিবেশিত হতে শুরু করে। এই কারণে ঐ সময়ের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রাকে কলকাতা ছাড়াও হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলায় কবিগান করতে যেতে হয়।[১] কবিগানে সবসময়ে যেহেতু কমপক্ষে দুটো দলের প্রয়োজন হয়, তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কলকাতায় ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণও এসব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করতেন।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগান এভাবে শুধু কলকাতারই প্রধান বিনোদন-মাধ্যমে পরিণত হয় না, বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কবিগান জনপ্রিয় একটি বিনোদন-মাধ্যমে পরিণত হয়ে যায়। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় যেমন শখের কবিগানের দল তৈরি হয়েছিলো, একইভাবে পল্লিবঙ্গেও তা দেখা যেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়ের গড়া কবিগানের দলের উল্লেখ করা যায়। জয়দেবপুরের রামকুমার সরকার ছিলেন তাঁর দলের কবিয়াল। কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা প্রমুখের বিপরীতে এই দল কবিগান পরিবেশন করে বলে জানা যায়।[২]

---

[১] ধর্মানন্দ মহাভারতী, "ভোলা ময়রা," *সাহিত্য সংহিতা,* মার্চ-এপ্রিল ১৯০৫, পৃ. ৬৫৮।

[২] হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই* (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী: দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬), পৃ. ৬।

বিশ শতকের সূচনা নাগাদ কলকাতা পর্বের কবিগান লুপ্ত হতে শুরু করলেও পল্লিবঙ্গের কবিগান তখন থেকে নতুন মাত্রা লাভ করে। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের পল্লিগুলোতে কবিগান জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এর ফলে পূর্ববঙ্গে কবিগান বিকাশের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। এক পর্যায়ে কলকাতার প্রভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগান বিদায় নেয়। কিন্তু ঠিক একই সময়ে পূর্ববঙ্গের পল্লিতে তা নতুন উদ্যমে বিকশিত হতে শুরু করে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের এই কবিগান আলোচ্য।

পূর্ববঙ্গে কবিগান জনপ্রিয় হতে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। প্রথমে হয়তো কলকাতা অঞ্চলের শিল্পীরাই সব অঞ্চলে গান গেয়ে বেড়াতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ নাগাদ পল্লিবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক কবিগানের দল তৈরি হওয়ায়, কলকাতা থেকে কবিগানের দল ভাড়া করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে সূচিত হয় কবিগানের মধ্যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এভাবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান, ঢাকা অঞ্চলের কবিগান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান, বরিশাল অঞ্চলের কবিগান এবং যশোর অঞ্চলের কবিগানের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হতে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রথম দিকে যতোটা স্পষ্ট না হয়, সময়ের ব্যবধানে তা ধীরে ধীরে বাড়ে। বিশ শতকের সূচনায় দেখা যায়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান ঢাকা অঞ্চলের কবিগান থেকে বহু দিক দিয়ে আলাদা হয়ে উঠেছে। একইভাবে ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগানে নানা রকম স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে। আবার পদ্মা নদীর দক্ষিণের জেলাগুলোতে পরিবেশিত কবিগান পাচ্ছে নতুন কিছু মাত্রা। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এক অঞ্চলের কবিয়ালদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কবিয়ালদের আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া মন্থর হওয়ায় খুব কম ক্ষেত্রেই এই বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। তবে এ কথাও ঠিক যে, অসাধারণ জনপ্রিয় কিছু কবিয়াল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে কবিগান পরিবেশন করেছেন। যশোরের তারকচন্দ্র সরকার, ঢাকার হরিচরণ আচার্য, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার বা বরিশালের নকুলেশ্বর দত্ত ছিলেন এই জাতীয় ব্যতিক্রমী কবিয়াল। তবে মধ্যম মানের কবিয়ালরা প্রায়ই নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকতেন বলে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পূর্ববঙ্গের কবিগানকে অন্তত তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা সম্ভব:

এক. পদ্মার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান;

দুই. পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ যশোর-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের কবিগান; এবং

তিন. মেঘনার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ নোয়াখালী-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান।[৩]

---

[৩] পূর্ববঙ্গের আলোচ্য কালপর্বের কবিগানকে যতীন সরকার প্রাক-হরিচরণ যুগ, হরিচরণ যুগ এবং রমেশ যুগ—এই তিন পর্বে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। যতীন সরকার, *বাংলাদেশের*

২. পদ্মার উত্তরাঞ্চলের কবিগান

পূর্ববঙ্গে পদ্মার উত্তরাঞ্চল বলতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলাকেই বোঝায়। যমুনা, মেঘনা এবং পদ্মা নদী দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি মোটামুটি অভিন্ন, উপভাষাও এক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই অঞ্চলে কবিগান জনপ্রিয় হতে শুরু করে। প্রথম দিকে কলকাতার কবিয়ালগণ এসে এখানে কবিগান পরিবেশন করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই অঞ্চলের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলেও কবিয়ালের জন্ম হতে থাকে। যাঁদের জন্মসাল সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের রামগতি শীল (১৮৪০–১৯০১) এবং রামু মালী (১৮৪১–১৯১৪) হলেন এই অঞ্চলের প্রাচীনতম কবিয়াল। এছাড়া এই অঞ্চলের যেসব কবিয়াল অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার হরিচরণ আচার্য (১৮৬১–১৯৪১) এবং ময়মনসিংহের বিজয় নারায়ণ আচার্যের (১৮৬৯–১৯২৭) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহের কবিগান সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে, বিজয়নারায়ণ আচার্য, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিভূষণ, রাজেন্দ্রকিশোর সেন, দেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের অনেকগুলো রচনা থেকে জানা যায়, ময়মনসিংহের কবিগান তখন কী কী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলো এবং কিভাবে তা পরিবেশিত হতো।[৪] এছাড়া ঢাকা অঞ্চলের কবিগান সম্পর্কে জানার জন্য এই অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের নিজের রচনা যেমন রয়েছে, তাঁর সম্পর্কেও অনেকে লিখেছেন। এমনকি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকাতেও ঢাকার হরিচরণ আচার্য সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।[৫] এইসব উৎস থেকে প্রাপ্ত ধারণার ভিত্তিতে বিশ শতকে ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের কবিগান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাক।

কবিগান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৬৪। উক্ত বিভাজনে ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং বিশেষভাবে পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরাঞ্চল প্রতিনিধিত্বশীল হয় না। তিনি নিজেও অবশ্য ময়মনসিংহ-ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে যশোর-খুলনা অঞ্চলের কবিগানের আঙ্গিকগত পার্থক্যের কথা অন্যত্র স্বীকার করেন। তদেব, পৃ. ৩৩।

[৪] কেদারনাথ মজুমদার সম্পা., *সৌরভ*, এপ্রিল ১৯১৪–জানুয়ারি ১৯২৮ (বৈশাখ ১৩২১ থেকে পৌষ ১৩৩৪)।

[৫] ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকাতেও "কবিগান" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাস রচনায় প্রবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃ. ৭৬-৭৭।

ময়মনসিংহে কবিগান

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দের ধারণা, উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতা থেকে কবিগান ময়মনসিংহে আসে।[৬] ঐ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন তাঁদের মধ্যে রামগতি শীল এবং রামু মালীর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এঁদের তিনি যথাক্রমে দাশরথি রায় (দাশু রায়, ১৮০৬–১৮৫৭) এবং রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবু, ১৭৪১–১৮৩৯) সঙ্গে তুলনা করেন।[৭] এই তুলনা যথাযথ কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেননা, দাশু রায় এবং নিধু বাবু প্রথম জীবনে কবিগান গাইলেও এঁরা দুজনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যথাক্রমে পাঁচালিকার ও টপ্পাগায়ক হিসেবে। তা সত্ত্বেও কলকাতার খ্যাতিমান সংস্কৃতিকর্মীদের নাম দিয়ে ময়মনসিংহের কবিয়ালদের পরিচিত হওয়ার এই ঘটনা কলকাতার সঙ্গে ময়মনসিংহের নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রমাণ করে।

কলকাতা থেকে কবিগান ময়মনসিংহে আসে প্রধানত রাজা, জমিদার, ও নানা শ্রেণির বিত্তবান মধ্যস্বত্বভোগীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুসঙ্গের রাজা রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন স্থানীয় জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে সাধারণ বিত্তবান লোকেরাও কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন ময়মনসিংহের খ্যাতিমান কবিয়াল রামগতি শীল একবার আর্থিক সংকটে পড়লে ফতেপুর গ্রামের দাগু বিশ্বাস তাঁকে কিছু জমি দান করেছিলেন।[৮]

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কলকাতায় প্রচলিত কবিগানের সঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত কবিগানে বিষয়গত ও আঙ্গিকগত কিছু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে রুচির স্থূলতা প্রায় একই রকম ছিলো বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে কবিয়ালদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ কবিগানের গঠন-কাঠামোর মধ্যে যেমন স্থূলতার বীজ রয়েছে, তেমন শ্রোতাবৃন্দের রুচিও স্থূলতার পক্ষে ছিলো। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকুমার দের একটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: "কবিকে কথায় কথায় লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। দেশকালপাত্র যাহা চায়, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে তাহাই করিতে হয়। তা না হইলে লোকসমাজে তাঁহাদের প্রসার প্রতিপত্তি বজায় থাকে কোথায়?"[৯]

উনিশ শতকের শেষার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে রচিত কবিগানের আঙ্গিক কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। অন্তত পঙ্‌ক্তি বা তুকগুলোর নামকরণের দিক দিয়ে তা কলকাতার

[৬] চন্দ্রকুমার দে, "ময়মনসিংহের দাশুরায়," *সৌরভ*, মে-জুন ১৯১৪, পৃ. ২৪৩।

[৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৯ ও ২৭৯ যথাক্রমে।

[৮] চন্দ্রকুমার দে, "ময়মনসিংহের দাশুরায়," পৃ. ২৪৫।

[৯] চন্দ্রকুমার দে, "মালীর জোগান," *সৌরভ*, এপ্রিল-মে ১৯১৪, পৃ. ২১৩।

চেয়ে আলাদা হয়। কলকাতায় কবিগান যখন (১৮৯৬) বিন্যস্ত ছিলো 'চিতেন, পাড়ন, মেলতা, মহড়া, খাদ, মেলতা, অন্তরা, পাড়ন, ফুঁকা, মেলতা' প্রভৃতি নামে,[১০] ময়মনসিংহে তখন তা বিন্যস্ত ছিলো 'চিতান, পরচিতান, ধুয়া, লহর, মহরা, খাদ, ঝুমুর' প্রভৃতি নামে।[১১] ভিন্ন নামে হলেও গানের গঠন কাঠামো প্রায় অভিন্ন ছিলো বলে মনে হয়। সুরের দিক দিয়েও হয়তো উভয় অঞ্চলের গান প্রায় অভিন্ন ছিলো। যদিও এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কোনো মন্তব্য করা কঠিন। প্রধান কারণ উভয় অঞ্চলের গানগুলোর কথাই শুধু রক্ষা পেয়েছে, সুর রক্ষা করার কোনো উপায় তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে এক সময়ে কবিগানকে ঝুমুর গানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়েছিলো। কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের বরাতে জানা যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধের ময়মনসিংহে ঝুমুর গান বেশ জনপ্রিয় হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা থেকে ঝুমুরওয়ালীরা ময়মনসিংহে ঝুমুর গান পরিবেশন করতে যেতো। এই সময়ের ময়মনসিংহের বিখ্যাত কবিয়াল রামগতি শীল এবং রামু মালীকে এইসব ঝুমুরওয়ালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হতো। তবে রামগতি এবং রামুর প্রতিভাবলে ময়মনসিংহের মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, ঝুমুর গান কবিগানের তুলনায় নিম্ন মানের। এই বোধ প্রবল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহে ঝুমুর গানের শ্রোতারা ক্রমে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ময়মনসিংহ থেকে ঝুমুর গান চিরবিদায় গ্রহণ করে।[১২]

পূর্ববঙ্গ পর্বে কবিগানের একটি অংশের নাম টপ্পা, যেখানে কবিয়ালদ্বয় পরস্পরবিরোধী চরিত্রে নিজেদের আরোপিত হওয়ার ঘোষণা দেন। অনেকটা এই জাতীয় গানের আদলে মালফুকার নামে এক ধরনের গান ঢাকাসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় প্রচলিত ছিলো। কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলে উভয় ধরনের গানই টপ্পা গান নামে পরিচিতি পায়। বরং মূল টপ্পাই সেখানে কখনো কখনো 'কবির দাঁড়া' নামে পরিচিতি পেয়ে থাকে। যেমন টপ্পাকে কবির দাঁড়া উল্লেখ করে কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্য লেখেন: "একদিন আমি কবির দাঁড়ায় রাবণ হইয়া রামু সরকারকে মহাদেব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।"[১৩] পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে টপ্পা এবং মালফুকারের গঠন আলাদা। যেমন টপ্পায় সেখানে চিতান, ফুকার, ধুয়া, অন্তরা প্রভৃতি অংশ থাকলেও মালফুকারে থাকে শুধু ফুকার বা অন্তরা নামের একটি স্তবক। সঙ্গত কারণেই তার সুরও থাকে অভিন্ন। কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে চরিত্র আরোপের টপ্পা গান

---

[১০] মনুলাল মিশ্র প্রকাশিত "প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান"-এর বরাতে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২।

[১১] চন্দ্রকুমার দে, "মালীর জোগান," *সৌরভ*, এপ্রিল-মে ১৯১৪, পৃ. ২১৮।

[১২] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃ. ৪৯।

[১৩] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামু সরকার," *সৌরভ*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯১৫, পৃ. ১২১।

এবং আক্রমণাত্মক টপ্পা গানের গঠন প্রায় অভিন্ন, উভয় অংশই চিতান, ফুকার, ধুয়া, অন্তরা প্রভৃতি স্তবক দিয়ে রচিত। তাই প্রথম শ্রেণির টপ্পাকে আলাদা করার জন্য কখনো কখনো তাঁরা সেগুলোকে 'কবির দাঁড়া' নামেও অভিহিত করে থাকতেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলের কবিগানে টপ্পা গান ছিলো পাঁচালি ও ছড়াকাটা অংশের সূচনা-গান। ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি বর্ণনা থেকে মনে হয়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালগণ ছড়া-পাঁচালি ছাড়া শুধু টপ্পা গান দিয়েও কবিগানের লড়াই সম্পন্ন করতে পারতেন।[১৪] কখনো কখনো অভিন্ন বিষয় নিয়ে তিন জন কবিয়াল আলাদা তিনটি টপ্পা রচনা করে পরিবেশন করেছেন, এমনও দেখা যায়। এমন একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন বিজয়নারায়ণ আচার্য। তাতে দেখা যায়, পূজার সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী স্বামীর নিকট নতুন শাড়ির আবদার করছে; এই নিয়ে রামগতি শীল, রামু মালী এবং বিজয়নারায়ণ আচার্য তিন জনে তিনটি টপ্পা পর পর পরিবেশন করেছিলেন।[১৫] বিজয়নারায়ণ আরো জানান যে, পূর্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলে গানের জবাব গান দিয়ে দেওয়ারই রীতি ছিলো। তাঁর ভাষায়: "এখনকার মত তখন কবিগানে ছড়া-পাঁচালী এত অধিক মাত্রায় হইত না; কেবল দলের বিশ্রামের জন্য দু'চার কথা বলা হইত মাত্র। এখন যেমন কথার কাটাকাটি হয়,—চালাকি চাতুরী প্রদর্শন করা হয়,—কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া 'বাহবা' লওয়া হয়, তখন তা' না লইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব, টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কবিগণের কৃতিত্ব প্রকাশের স্থল বহু বিস্তৃত ছিল।"[১৬]

ময়মনসিংহের রামগতি শীল এবং রামু মালী প্রায়ই পরস্পরের বিপক্ষে টপ্পা গান নিয়ে কবিসংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের বিপক্ষেও রামগতি কবিগান করেছেন। রামগতির টপ্পার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিজয়নারায়ণ। তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, টপ্পা গানে কবিয়াল নিজেকে কোনো এক পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্রে এবং অন্যকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো চরিত্রে আরোপ করিয়ে গান রচনা করতেন; আবার বিপরীত সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা সমকালীন কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে বর্ণনামূলক টপ্পাও রচনা করতেন।

রামু-রামগতি প্রসঙ্গে বিজয়নারায়ণ প্রতিযোগিতামূলক টপ্পার উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন একবার এক আসরে রামু মালী বিভীষণ সেজে রামগতিকে রাবণ অভিহিত করে প্রশ্নমূলক যে টপ্পা রচনা করেন, তাতে রাবণের প্রতি অনুযোগ ও উপদেশ থাকে। বলা হয়, রামের স্ত্রীকে অপহরণ করা ঠিক হয়নি; অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করা উচিত ছিলো।

[১৪] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," পৃ. ৪৮-৫৪।

[১৫] বিজয়নারায়ণ আচার্য,"তিনটি টপ্পা," *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৫, পৃ. ২৮৭-৮৮।

[১৬] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহে কবিগান," *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৬, পৃ. ২৬৬।

এর জবাবে রামগতি রাবণ হয়ে যে টপ্পা রচনা করেন, তাতে বলা হয়, আমি ঠিক কাজই করেছি; লক্ষ্মণ যেহেতু তাঁর বোনকে অপমান করেছে, এর মধ্য দিয়ে তার উচিত জবাব দেওয়া হয়েছে।[১৭]

রামগতি সরকার একবার শম্ভু সরকারের বিপক্ষে কবিগান গাইতে গিয়ে সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক টপ্পা রচনা করেছিলেন, অন্য অঞ্চলে যা মালফুকার বা রংফুকার নামে পরিচিত। শম্ভু সরকার নিজে এবং তাঁর দলের সকলে ছিলেন জেলে সম্প্রদায়ের। রামগতি এটিকে বিষয় হিসেবে নিয়ে একটি টপ্পা রচনা করেন। এমন আক্রমণাত্মক টপ্পার জবাব হিসেবে শম্ভু সরকার রামগতিকেও এক হাত দেখে নিয়ে থাকবেন। রামগতির টপ্পাটি জানা গেলেও শম্ভু সরকারের টপ্পাটি সংরক্ষিত হয়নি। বিজয়নারায়ণের বিপক্ষেও তিনি এ ধরনের একাধিক আক্রমণাত্মক টপ্পা রচনা ও পরিবেশন করেছিলেন।[১৮]

বিতর্কমূলক এবং আক্রমণাত্মক টপ্পা গানের জবাব গান থাকে, যেহেতু চাপান গান হিসেবে তা পরিবেশিত হয়। কিন্তু সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত টপ্পা গানের কোনো জবাব থাকে না, যেহেতু জবাব সেখানে প্রত্যাশা করাই হয় না। যেমন রামগতি রচিত পয়সা চুরি বা জুতা চুরি সংক্রান্ত টপ্পা। পয়সা চুরি সংক্রান্ত টপ্পাটি ছিলো নিম্নরূপ:

> পুরাকান্দা গান করিয়া আইলাম সুগুন্দিয়া।
> মোদের মনে ছিলো বাসনা, এখানে কবিগান করবো দুজনা।
> বিধির কিবা ঘটনা, দিলো বেগুন দিয়া ॥
>
> আমরা এবার গেলে কোনো কালে ফিরে হবে না আসা।
> দুঃখেতে বুক ফেটে যায়, সুগুন্দিয়া হইলো কি চোরের বাসা ॥
> আছেন ব্রাহ্মণ শূদ্র মজুমদার, তবে কোন অবিচার আজব তামাশা।
> আমার নিদ্রাকালে গাট্টি খুলে চোরে নিলো নয় পয়সা ॥

পূর্ববঙ্গের কবিগানে পাঁচালি নামের একটি অংশকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়। কলকাতা পর্বের কবিগানে পাঁচালি অংশ ছিলো কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। পাঁচালি তখন আলাদা গান হিসেবে জনপ্রিয় ছিলো, বিভিন্ন সূত্র থেকে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। অনেকটা পালাগানের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কলকাতার সেই পাঁচালি গানে তখন বিশেষ নাম করেছিলেন দাশরথি রায়। পাঁচালিতে তখন গান এবং পয়ার-ত্রিপদীর মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা করা হতো এবং বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক কাহিনি তাতে স্থান পেতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানেও পাঁচালি অংশ দেখা যায় না। তাই ছড়াকাটাকে বা পয়ার-ত্রিপদীর মাধ্যমে বিতর্ক করার বিষয়টি তখন প্রাধান্য পেতো না, যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গানের মাধ্যমে বিতর্ক করা

---

[১৭] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," পৃ. ৫০।
[১৮] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," পৃ. ৫১।

হতো। একদল একটি গান পরিবেশন করতেন, অন্যদল আর একটি গান গেয়ে তার জবাব দিতেন। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ময়মনসিংহ অঞ্চলের এই অবস্থার অবসান হয় এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কবিগানের অঙ্গ হিসেবে পাঁচালিও ময়মনসিংহে জনপ্রিয়তা পায়।

পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে পাঁচালি হলো পয়ার-ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে (অর্থাৎ ছড়ায় ছড়ায়) পরিবেশিত পৌরাণিক কাহিনি। কলকাতা পর্বে আলাদা গান হিসেবে পাঁচালি গানে যে গান থাকতো, পূর্ববঙ্গে তা ধুয়া গান নামে আলাদা পরিচয় ধারণ করে। টপ্পা গান পরিবেশিত হওয়ার পরপরই ধুয়া গান হয় এবং তার পর বিতর্কের যুক্তি হিসেবে কোনো কাহিনি বর্ণনার স্বার্থে কবিয়ালগণ ছড়া-পাঁচালি পরিবেশন করেন। এই পাঁচালি পরিবেশনের আঙ্গিক পালাগানের আঙ্গিকের সমতুল্য, তা বলাই বাহুল্য। পাঁচালিতে বিতর্কের বিষয় এবং কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি বহু সাধারণ বিষয় নিয়েও কবিয়ালকে ছড়া কাটতে হয়। কবিয়ালদের এই ছড়া অনেক সময়ে প্রবচনের মতো হয়ে যায়। রামগতি শীলের ছড়া এর উদাহরণ। যেমন তুলনার এই ছড়াটি:

কুপুত্র আর বলদে
কুগৃহ আর গারদে।
কুভৃত্য আর কুকুরে
কুসঙ্গী আর শূকরে।
অসৎ নারী বদ্ধ জল
হাটের বেশ্যা মাকাল ফল।

অথবা চরিত্র বিষয়ক এই ছড়াটি:

পেঁচক বাসে আঁধারে
ময়লা বাসে শূকরে।
বায়স বাসে মাকালে
হংস বাসে শৈবালে।
চাতক বাসে মেঘের জল
গাধা বাসে ঘোলা জল।
পদ্ম ফুলের মধু থুইয়া
করী বাসে মৃণাল খাইয়া।
কুকার্যে কুলোকের মতি
কুলটা বাসে পরের পতি।
চোরে বাসে পরের ধন
অসৎ পথে পাপীর মন।[১৯]

---

[১৯] উদ্ধৃত, চন্দ্রকুমার দে, "ময়মনসিংহের দাশুরায়," পৃ. ২৪৮।

পাঁচালি অংশে বর্ণিত হয় না, এমন কোনো বিষয় নেই। শুধু পৌরাণিক বিষয়ই নয়, নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমকালীন প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে কাল্পনিক কাহিনি পর্যন্ত এখানে স্থান পায়। কবিয়ালকে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিতে হয় এই অংশে। তার ফলে অনেক মজার মজার বিষয় তাঁদের ছড়ার মধ্যে চলে আসে। অনেক ছড়ার বক্তব্য কিংবদন্তীর মর্যাদা পায়। যেমন রামু মালীকে লক্ষ করে একবার বিক্রমপুরের এক কবিয়াল বলেন, পূর্ব ময়মনসিংহ হলো পাণ্ডববর্জিত এলাকা। তার জবাবে রামু মালী এক অসাধারণ গল্প তৈরি করেন। তিনি বলেন, পূর্ব ময়মনসিংহ পাণ্ডববর্জিত এলাকা, তা সত্য। বারো বছরের বনবাসকালে পাণ্ডবেরা ঘুরতে ঘুরতে ময়মনসিংহ শহরে আসে। এখান থেকে তারা পূর্ব ময়মনসিংহে যাওয়ার ইচ্ছায় শম্ভুগঞ্জ খেয়াঘাটে যায়। খেয়ার মাঝি তাদের নিকট জানতে চায়, তাদের সঙ্গের স্ত্রীলোকটি কে। এর জবাবে পাণ্ডবেরা যখন বলে যে, স্ত্রীলোকটি তাদের পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী, তখন মাঝি তাদের নৌকায় তুলতে অস্বীকার করে। মাঝি বলে, আমাদের দেশে একজন পুরুষের পাঁচজন স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু পাঁচজন পুরুষের একজন স্ত্রী থাকে না; তাই এমন অনাচারী লোকদের তারা পূর্ব ময়মনসিংহে ঢুকতে দেবে না। তখন অগত্যা পাণ্ডবেরা পূর্ব ময়মনসিংহ না গিয়ে বিক্রমপুরে চলে যায়। পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদীতে এই গল্প বলা শেষ করে কবিয়াল উচ্চারণ করেন তাঁর মোক্ষম জবাব: 'বিক্রমপুরে সতীত্ব নাস্তি পোলা জন্মায় চাকরে'।[২০] এই ধরনের স্থূল রুচির গল্প দিয়েও কবিয়ালগণ প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করেন। আবার এই একই রামু মালী তাঁর পাঁচালির মধ্যে ভাগবত-কথা এমন আবেগের সঙ্গে পরিবেশন করেন, যাতে আসরের শ্রোতারা চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। রামু মালীর পাঁচালি পরিবেশনের অসাধারণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিজয়নারায়ণ আচার্য লিখেছেন:

> রামু ইচ্ছা করিয়া সভাকে হাসাইতে কাঁদাইতে পারিতেন। কি শৃঙ্গার, কি হাস্য, কি করুণ, যখন যে রসের পাঁচালী বলিতেন, তখন সেই রসই মূর্তিমান হইয়া শ্রোতার মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিত।
>
> রামুর ছড়া পাঁচালীতে যমকানুপ্রাস কি উৎপেক্ষাপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি বড়ই সুন্দর হইত। ব্যাজস্তুতিতে তাঁহার সমতুল্য সরকার এ অঞ্চলে কেহই ছিলেন না। সৌন্দর্যে মাধুর্যে রামুর উপমাগুলির তুলনা ছিল না। ...
>
> একদিন কাটিহালীর সভায় রামু সরকার পঞ্চ মকারের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা ও তাহার সাধন প্রণালী বর্ণন করিলেন যে সভাস্থ বহু উপাধি ভূষণ পণ্ডিত তচ্ছ্রবণে "ধন্য রামু! ধন্য রামু!" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন।
>
> অনেক সময়ে রামু সরকার করুণ রসের পাঁচালী বলিতে বলিতে তন্দ্রাবাক্রান্ত হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন।[২১]

---

[২০] আলোচিত, যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৮৫–৮৬।

[২১] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামু সরকার," পৃ. ১১৮।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানের পাঁচালি অংশ কিভাবে পরিবেশিত হতো এবং তার ভিতরকার বিষয় কেমন ছিলো, এই উদ্ধৃতি থেকেও তা খানিকটা আঁচ করা যায়। বর্ণনাকারী বিজয়নারায়ণ আচার্যও একজন কবিয়াল ছিলেন। তাঁর বর্ণনার ভাষা এবং ভাবের গভীরতা থেকে মনে হয়, তিনি রামু মালীর চেয়েও বড়ো মাপের কবিয়াল ছিলেন এবং পাঁচালিতে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রামু মালী সম্পর্কে তিনি লেখার সুযোগ পেলেও তাঁর সম্পর্কে কেউ অতো বিস্তৃতভাবে লিখে যাননি।

কবিগানের মূল অঙ্গ ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, লহর কবি প্রভৃতির চরণবিন্যাসে ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ কোনো তফাত ছিলো না; শুধু তুকগুলোর নামকরণে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

ময়মনসিংহের কবিগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রও কমবেশি স্বাতন্ত্র্য ধারণ করে। কলকাতা পর্বের কবিগানে শুধু ঢোল এবং কাঁসি ছিলো প্রধান বাদ্যযন্ত্র। প্রথম দিকে ময়মনসিংহে খোল, করতাল, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দিয়ে কবিগান শুরু হলেও পরে তার সঙ্গে ঢোল-কাঁসিও যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে বিজয়নারায়ণ লিখেছেন, "অতি পূর্বে বর্তমান সময়ের মত ঢোল-কাঁশী সংযোগে কবিগান করা হইত না। তখন খোল, করতাল, আর বেহালার প্রচলন ছিল।"[২২]

উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিয়াল হিসেবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন রামগতি শীল (১৮৪০-১৯০১) এবং রামু মালী (১৮৪১-১৯১৪)। এঁদের চেয়ে কিছুটা প্রবীণ ছিলেন কিশোরগঞ্জের দগদগা গ্রামের কানাই নাথ ও বলাই নাথ নামের দুই সহোদর কবিয়াল। এঁরা উনিশ শতকের শেষ দিকে বৃদ্ধাবস্থায় মারা যান। তাই অনুমান করা যায় উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এঁদের জন্ম হয়েছিলো। কবিগানের মালশি গানকে এঁরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন বলে জানা যায়, যথা: ডাক মালশি এবং লহর মালশি। উভয় ধরনের গানের পরিচয় দিতে গিয়ে যতীন সরকার লিখেছেন, 'ভাববস্তুর দিক থেকে "ডাক মালসী" ছিলো সরল ও সংক্ষিপ্ত, আর "লহর মালসী" ছিলো তত্ত্বমূলক গান।'[২৩] কিন্তু বাস্তবে মালশি গানগুলো কখনো সংক্ষিপ্ত হয় না, যেগুলো সংক্ষিপ্ত, কলকাতা পর্বে সেগুলো বন্দনা গান হিসেবে পরিচিত ছিলো, বিশ শতক নাগাদ তা ডাক গান নামে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে মালশি গানগুলো কলকাতা পর্বেই দীর্ঘাকার এবং তখন তা ভবানীবিষয় নামে পরিচিত ছিলো। এই বিবেচনায় মালশি শব্দের পূর্বকার বিশেষণ বিচার করে মনে হয়, মালশি গানের মধ্যে যেগুলোর কোনো জবাব গান গাওয়ার প্রয়োজন হতো না, সেগুলো ডাক মালশি নামে, এবং প্রতিপক্ষ কবিয়ালকে যেগুলোর জবাব গাইতে হতো সেগুলো লহর মালশি নামে পরিচিত ছিলো। বিশেষভাবে 'লহর'

---

[২২] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহে কবিগান," পৃ. ২৬৬।

[২৩] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৭২।

শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। এটি যেহেতু লড়াই শব্দের প্রতিশব্দ, তাই যেগুলোর জবাব প্রয়োজন হতো, সেগুলোর বিশেষণ হিসেবে 'লহর'-এর প্রয়োগ ঘটা স্বাভাবিক।

কানাই নাথ এবং বলাই নাথের সমকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাঁরা কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আমতলার লোচন কর্মকার, চাইরগাতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, সত্রশিরের ছাড়ুনাথ, কাশীপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কাপালী।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের পঞ্চরামের (রামগতি শীল, রামু মালী, রামকানাই নাথ, রামজয়, এবং রামসুন্দর আচার্য) মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন রামগতি শীল। তিনি ১৮৪০ সালে কিশোরগঞ্জের গাঙ্গাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমকালে তিনি ময়মনসিংহের দাশুরায় তথা দাশরথি রায় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দাশু রায়ের সঙ্গে তিনি কেন প্রতিতুলিত হয়েছিলেন, তা বলা মুশকিল। কারণ দাশু রায় সেই অর্থে বড়ো কোনো কবিয়াল ছিলেন না। অভিমানীও ছিলেন, যা কবিয়ালদের পক্ষে মানায় না। যেমন তিনি রামপ্রসাদ কর্মকারের নিকট কবির লড়াইয়ে পরাজিত হওয়ার পর কবিগান ছেড়ে দিয়ে শুধু পাঁচালি পরিবেশনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, রামগতি কবিগানের পাঁচালি অংশ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন বলে তাঁকে দাশুরায়ের সঙ্গে তুলনা করা হতো! এই অনুমান সত্য হতে পারে, আবার নাও পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল অবশ্য দুজনের মধ্যে লক্ষ করা যায়, তাহলো দুজনেই নারী শিল্পীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দাশরথি রায়ের গুরু ছিলেন অক্ষয়া কাটানি ওরফে আকা বাঈ, অন্যদিকে রামগতির গুরু ছিলেন ঢাকার অজ্ঞাতনামা এক ঝুমুরওয়ালি। দাশুরায়ের সঙ্গে তুলনা করা হলেও প্রতিভার দিক দিয়ে এবং জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে রামগতি দাশরথি রায়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন। রামগতি বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন তাঁর টপ্পা এবং ছড়া-পাঁচালির জন্য। তাঁর রচিত ছড়া ছিলো দ্রুত লয়ের এবং তিনি অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে ছড়া কাটতে পারতেন। পূর্বেই তাঁর একটি ছড়া উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রামগতি শীলের ব্যক্তিজীবন খুব সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিলো না। প্রথম জীবনে নিজ গ্রামের কোনো এক মহিলার কলঙ্ককাহিনি নিয়ে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতায় গ্রামের ভদ্রলোকদের ভদ্রতা ও নৈতিকতার মুখোশ উন্মোচিত হয়। প্রতিফল ভোগ করতে হয় রামগতিকে। রামগতি গ্রামছাড়া হন। জন্মস্থান গাঙ্গাইল ত্যাগ করে তিনি সুকুন্দি গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু স্পষ্টবক্তা হওয়ার জন্য সেখানকার বিত্তবান 'বাবুদের' সুনজর আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। তাই সেখানেও তিনি থাকতে পারেন না। এ সময়ে কৈলাটি-ফতেপুর গ্রামের ভূস্বামী দাগু বিশ্বাস তাঁকে কিছু জমি দান করলে সেখানে তিনি বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু দাগু বিশ্বাসের দেওয়া জমি অনুর্বর থাকায় সেখানে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দুঃখের কাহিনি শুনে আঠারোবাড়ির জমিদার মহিমবাবুও কিছু জমি দান করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়। শেষ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের বড়াইল বাজারের কাছে

এক অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে তিনি তাঁর শেষ জীবনটুকু অতিবাহিত করেন।

রামগতি সরকারের সমবয়স্ক ছিলেন নেত্রকোনার রামপুর গ্রামের তারাচাঁদ দে (১৮৪০-১৯২০)। দারিদ্র্যের কারণে তারাচাঁদ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর যখন ১৬/১৭ বছর বয়স তখন তিনি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান। এই অন্ধ অবস্থায় তিনি তাঁর কবিপ্রতিভার কারণে স্থান পান চন্দনকান্দি গ্রামের জমিদার এবং বিখ্যাত বাঁধনদার সূর্যকান্ত চৌধুরীর বাড়িতে। এই বাড়িতে থাকা অবস্থায় কবিয়াল হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। রামগতি, রামু মালী প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

রামগতি সরকারের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামু মালীর জন্ম হয়েছিলো ১৯৪১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে (চৈত্র ১২৪৭)।[২৪] তাঁকেও দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। এসব তথ্যে মনে হয়, ময়মনসিংহে কবিগান জনপ্রিয় হলেও পেশা হিসেবে কবিগান তখন লাভজনক ছিলো না।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাঁরা এঁদের সমকক্ষ এবং সমকালীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে শম্ভু মালী, কালীচরণ দে, পরান কর্মকার, রামদয়াল নাথ, হরচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দ আচার্য, কৃষ্ণমোহন মালী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, হরিহর আচার্য, কালীকুমার ধর, সাধু শেখ, ঈশান দত্ত, লাল মামুদ এবং বিজয়নারায়ণ আচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৫]

এই কবিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বিজয়নারায়ণ আচার্য। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন সুমিষ্ট ছিলো, তেমনি যে কবিপ্রতিভা কবিয়ালের জন্য অত্যাবশ্যক তাও তাঁর পর্যাপ্ত ছিলো।[২৬] শুধু কবিগান রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাই নয়, গদ্য রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবিগান এবং বিশেষত ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিজয়নারায়ণ আচার্যের রচনাই প্রধান সম্বল। তিনি অত্যন্ত সাবলীল গদ্যভাষায় তাঁর সমসাময়িক কবিয়ালদের পরিচয় 'সৌরভ' পত্রিকায় তুলে না ধরলে পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্পর্কে অনেক তথ্য অজানা থেকে যেতো। কবিগান রচনায় তিনি কতো পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি তাঁর সমকালের কবিয়ালদের রচিত গানগুলোকে মনে রাখতে পারতেন। 'সৌরভ' পত্রিকায়

---

[২৪] যতীন সরকার তাঁর জন্মসাল লিখেছেন ১৯৪০। *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৭৩। কিন্তু 'সৌরভ' পত্রিকায় বিজয়নারায়ণ আচার্যের তথ্য অনুযায়ী তাঁর জন্মসাল হয় ১৯৪১ সালের মার্চ-এপ্রিল। বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামু সরকার," পৃ. ১১৭।

[২৫] পরিশিষ্ট ৮ থেকে এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা জানা যাবে।

[২৬] বিজয়নারায়ণ আচার্যের কণ্ঠস্বর কোকিলের সঙ্গে তুলনা করে টপ্পা রচনা করেন কবিয়াল রামগতি শীল। দ্রষ্টব্য, চন্দ্রকুমার দে, "রামগতির টপ্পা," *সৌরভ*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২৭, পৃ. ২১১।

তিনি যে তাঁর সমকালের বেশ কয়েকজন কবিয়াল সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা তাঁর সেই স্মৃতিশক্তির প্রমাণ বহন করে।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস করার পর তিনি মোক্তারি পাস করেন এবং প্রথম জীবনে মোক্তারি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি কবিগানের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিলো, সেই আগ্রহ তাঁকে শেষ পর্যন্ত কবিগানের পেশায় টেনে নিয়ে আসে। তাঁর কবিগানের গুরু ছিলেন কাশীপুর গ্রামের লোকনাথ চক্রবর্তী। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কবিয়ালদের বিপরীতে তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন। 'সৌরভ' পত্রিকার পাশাপাশি কলকাতার 'আনন্দবাজারপত্রিকা' সহ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গানের বইও সমকালে প্রকাশ পায়।

ময়মনসিংহ পর্বে একাধিক মুসলমান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন লাল মামুদ (১৮৬০–১৮৯৭)। নেত্রকোনা জেলার ঠাওইডহর গ্রামে তাঁর জন্ম। সমকালে তিনি ভক্তকবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন গাজির গানের বয়াতি। পরে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবিগান গাইতে শুরু করেন। বিজয়নারায়ণ আচার্যের সঙ্গেও তিনি কবিগান করতেন। অল্প বয়সে মারা যাওয়ার জন্য তাঁর কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে না।

ঢাকায় কবিগান

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় একটি কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।[২৭] সেই দলে সরকারি করতেন রামকুমার সরকার নামের এক কবিয়াল। কলকাতার কবিয়ালদের সঙ্গে একবার এই দলের কবির লড়াই হয়েছিলো। হরিচরণ আচার্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, কালীনারায়ণ একবার কলকাতার সীতানাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাধব ময়রাকে কবিগানের বায়না করেছিলেন। তাঁরা তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করতেন না। এই পরিস্থিতিতে কালীনারায়ণ রায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে পাঁচ শত টাকা পুরস্কাররূপ ঘুস দিয়ে বশ করেন এবং তাঁর বিপক্ষে তাঁর নিজের দলের একপালা গান পরিবেশনের সুযোগ পান।[২৮] রামকুমার সরকার রচিত কবিগানের একটি সংকলন রাজা প্রকাশ করেছিলেন বালে জানা যায়। তবে এই গানগুলোতে রামকুমার নিজের নামের ভণিতার বদলে রাজা কালীনারায়ণের ভণিতা ব্যবহার করেছিলেন।

---

[২৭] হরিচরণ আচার্য তাঁর বাল্যবয়সে এই কবিগান শুনেছিলেন। তিনি যদি চোদ্দ বছর বয়সেও এই গান শুনে থাকেন, তাহলে ঐ গান পরিবেশনের সাল হয় ১৮৭৫।

[২৮] হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃ. ৬–৭।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান এবং ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়গত বিশেষ কোনো তফাত ছিলো না। ভৌগোলিকভাবে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ আলাদা নয়। উপভাষাগত তফাতও তখন খুব একটা প্রবল ছিলো বলে মনে হয় না।

ঢাকার মহেশ্বরদী পরগনার ডৌকাদী গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী বা হরিশ্চন্দ্র মাস্টার ছিলেন রামকুমার সরকারের মতোই প্রতিভাবান কবিয়াল। তাঁর কণ্ঠ সুমধুর না থাকলেও বিভিন্ন ধরনের কবিগান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একবার কলকাতায় কবিগান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতার কবিয়াল তাঁকে 'পুবদেশের বাঙাল' হিসেবে ব্যঙ্গ করলে তিনি তাঁর উচিত জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

তোমরা পশ্চিমা বলে অনর্থক করো অহংকার।
দুঃখ বলবো কতো আর ॥
এক কথা সত্য বটে, পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে।
তোমরা সকলে সকালে উঠে পূর্বদিকে করো নমস্কার ॥[২৯]

হরিশ্চন্দ্র মাস্টারের সমকালে ঢাকায় আরো অনেক কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। যেমন—পাগলা গ্রামের নিমচাঁদ ঠাকুর, মহেশ্বরদী পরগনার আলগী গ্রামের পঞ্চানন আচার্য ও কানাই আচার্য, ভুলতা গ্রামের নীলমণি চক্রবর্তী, মহেশ্বরদীর বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী, দয়াগঞ্জের মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, পারুলিয়ার জয়হরি সরকার ও বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে দু-এক শুধু কবিগান রচনা করেছেন, কবিগানের আসরে দাঁড়িয়ে কবিগান পরিবেশন করেননি। যেমন মহিমচন্দ্র নন্দী ও বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। মহিমচন্দ্র নন্দী কবিগান রচনার পাশাপাশি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীও বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন। 'দ্বিজদাস' ছদ্মনামে তিনি বহু তত্ত্বসঙ্গীত রচনা করেন। তবে বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী বিশেষভাবে স্মরণীয় হরিচরণ আচার্যের (১৮৬১–১৯৪১) মতো কবিয়ালের গুরু হিসেবে। হরিচরণ আচার্য তাঁর 'বঙ্গের কবির লড়াই' (১৯৩০) বইটি তাঁর এই গুরুর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রটি ছিলো নিম্নরূপঃ "উৎসর্গ। পিতৃতুল্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পরম ভক্তিভাজনেষু। দেবং! আপনি দেশবিশ্রুত পরম রসজ্ঞ কবি। আপনার ছদ্মনামের 'দ্বিজদাসের গান' কাব্যজগতের অমূল্য সম্পদ। আপনার মর্মস্পর্শী রচনাকৌশল অতুলনীয়। আপনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। কবিগান আপনার চিরপ্রিয়—কাব্য-সাহিত্যে আমার যা কিছু সুকৃতি তাহা আপনারই প্রতিভা প্রভাবের ফল। কবিগানের উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের সহিত যে বাক্যুদ্ধ হইয়াছে তাহা যথাযথ একত্র গ্রথিত করিয়া আপনার নামে কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গ করিলাম, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। নিবেদন ইতি। আপনার স্নেহের 'হরিচরণ'।[৩০]

[২৯] হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃ. ১৭।
[৩০] হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃ. ২।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ অঞ্চল তখন পরিচিত ছিলো বিক্রমপুর নামে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এখানেও বেশ কয়েকজন গুণী কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে জয়পাড়া গ্রামের ভৈরব মজুমদার, রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য, মাওয়া গ্রামের চণ্ডী আচার্য বা চণ্ডী ঠাকুর, রসিক আচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে চণ্ডী আচার্যের বিপরীতে হরিচরণ আচার্য বহুবার কবিগান করেছেন।

ঢাকা অঞ্চলের কবিয়ালের মধ্যে হরিচরণ আচার্য ছিলেন সর্বাধিক প্রতিভাবান কবিয়াল। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিলো তাঁর কবিগান পরিবেশনের কাল। তাঁর পূর্বে পূর্ববঙ্গের কবিগান কলকাতার কবিগান থেকে খানিকটা আলাদা হয় ঠিকই, তবে তাঁর হাতেই পূর্ববঙ্গের কবিগান বহু দিক দিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। তাছাড়া তিনিই প্রথম কবিয়াল যিনি বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন তথা বাংলার সর্বত্র পূর্ববঙ্গের কবিগানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন বাংলার সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, তাঁর কবিয়াল শিষ্যরাও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর নিকটে এসে কবিগান শিখেছিলেন।

হরিচরণ আচার্যের জন্ম নরসিংদীতে ১৮৬১ সালের ১৬ই নভেম্বর। প্রথম জীবনে কিছুকাল রামায়ণ গান পরিবেশন করার পর ক্রমে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উনিশ শতকের শেষ পাদেই কবিয়াল হিসেবে আসরে কবিগান গাইতে শুরু করেন। কবিগান করার জন্য যে সৃজনশীলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রয়োজন, হরিচরণ আচার্যের তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলো। বিশ শতকের প্রথম দিকে তাঁর কবিখ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। একই কারণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে কবিগান পরিবেশন করে বেড়াতে হতো। বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ববাংলার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম ছিলো নদীপথ। এজন্য হরিচরণ একটি পানসি নৌকা তৈরি করেছিলেন এবং সেই নৌকায় তিনি সর্বত্র যাতায়াত করতেন। প্রমত্ত পদ্মা-মেঘনাও তিনি এই পানসি নিয়ে পাড়ি দিতেন।

হরিচরণ আচার্য তাঁর কবিজীবনের শেষ দিকে (১৯৩০) 'বঙ্গের কবির লড়াই' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এ বইয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের বহু কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং যশোর থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি এঁদের বিপরীতে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। নড়াইলের তারকচন্দ্র সরকারের (১৮৪৫–১৯১৪) সঙ্গে তাঁর কবির লড়াইয়ের কোনো উল্লেখ এ বইয়ে নেই। তবে তারকচন্দ্র সরকারের জীবনী থেকে জানা যায়, একবার তিনি তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে কবিগান করেছিলেন।[৩১] হতে পারে তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতে গাওয়া তাঁর কবিগানে অসাধারণ কোনো ঘটনা ঘটেনি, অথবা এমন হতে পারে যে, তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতে জয়ী হতে পারেননি বলে সে কাহিনি তিনি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত ছিলেন। বাস্তবে হরিচরণ আচার্য তাঁর এ বইয়ে

[৩১] বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২৮, ৩৯।

কোথাও পরাজিত হওয়ার কথা লেখেননি। হরিচরণ আচার্যের এমন প্রবণতার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর অন্যতম ছাত্রের বরাতে দীনেশচন্দ্র সিংহ। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন: "আচার্যকর্তা ছিলেন অত্যন্ত যশপিপাসু ব্যক্তি। এত যে রাজ্যজোড়া যশ প্রতিষ্ঠা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তবু যেন তাঁর পিপাসা মিটেনি। বিপক্ষ দলের গানে যদি একটা বাহবা পড়ে যেত তবে আর রক্ষা নেই!"[৩২]

তারকচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ফরিদপুরের (গোপালগঞ্জের) দুর্গাপুর গ্রামের হরিবর সরকারের বিপরীতে হরিচরণ আচার্য কবিগান করেছেন, বইটিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বাগেরহাটের যে মধুর দেব সরকারের বিপরীতে তারকচন্দ্র সরকার নিয়মিত কবিগান করতেন, তাঁর ছোটো ভাই বিধুভূষণ দেব সরকারের বিপক্ষেও হরিচরণ আচার্য কবিগান করেছেন, সে তথ্যও বইটিতে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তারকচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

হরিচরণ আচার্য তাঁর কবিয়াল-জীবনে খুলনার (বাগেরহাটের) লালচন্দ্রপুর গ্রামের বিধুভূষণ দেব সরকারের বিপরীতে; বরিশালের নবগ্রাম গ্রামের উমেশ শীল ও (পিরোজপুরের) রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জ দত্তের বিপরীতে; নোয়াখালীর বচুরা গ্রামের কালীকুমার মাস্টারের বিপরীতে; ত্রিপুরার (চাঁদপুরের) পাইকপাড়া গ্রামের জগবন্ধু দত্ত ও রামচন্দ্র মাস্টারের বিপরীতে, (কুমিল্লার) হোসেনপুর গ্রামের হরকুমার শীল ও (কুমিল্লার) আন্দিকোট গ্রামের অর্জুনচন্দ্র দেবনাথের বিপরীতে; ঢাকার (মুন্সীগঞ্জের) মাওয়া গ্রামের চণ্ডী আচার্যের বিপরীতে, (নরসিংদীর) পলাশ গ্রামের ভগবান আচার্যের বিপরীতে, এবং (গাজীপুরের) বেণুপুর গ্রামের অম্বিকা পাটনীর বিপরীতে; ময়মনসিংহের (কিশোরগঞ্জের) বিরুনিয়া গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও একই গ্রামের হরিহর আচার্য প্রমুখের বিপরীতে কবিগান পরিবেশন করেছেন বলে জানা যায়।

হরিচরণ আচার্যের পরিবেশিত কবিগানের ধরন বিশ্লেষণ করে মনে হয়, প্রকরণগত দিক দিয়ে তা কলকাতা পর্বের কবিগানের থেকে অনেকটা বদলে গেছে। পরিভাষাগত তো বটেই বিষয়ের দিক দিয়েও ঘটেছে বহু ধরনের পরিবর্তন। আবার অভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান থেকেও হরিচরণ আচার্যের কবিগান নানা দিক দিয়ে আলাদা ছিলো।

হরিচরণ আচার্যের কবিগান সম্পর্কে সাধারণত দাবি করা হয় যে, অশ্লীলতা থেকে কবিগানকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন।[৩৩] এই দাবির মধ্যে যতোটা অতিশয়োক্তি রয়েছে,

---

[৩২] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (চব্বিশ পরগনা: সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃ. ৩৩০।

[৩৩] যেমন 'কবির ঝঙ্কার' (১৯২৯) বইয়ের ভূমিকায় বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন: "গান, ছড়া প্রভৃতি সমস্তকেই তিনি অশ্লীলতা ও আবিলতা মুক্ত করিলেন। কবিগান তাহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে লাগিল।" বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "ভূমিকা," *কবির ঝঙ্কার*, হরিচরণ আচার্য প্রণীত (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী: হরিপদ সাহা, ১৯৮৬), পৃ. (জ)।

বাস্তবতা ততোটা নেই। কেননা, 'বঙ্গের কবির লড়াই' গ্রন্থে হরিচরণ আচার্য তাঁর প্রতিপক্ষের কবিয়ালদের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে অশ্লীল প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকে না। শুধু অশ্লীলতা নয়, জাতপাত বিষয়ক গালাগালি, আঞ্চলিক-বিদ্বেষ প্রভৃতিও তাঁর কবিগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

কবিগানের শেষ কয়েকটি অংশে অশ্লীল প্রসঙ্গ খুব সহজেই ঢোকার সুযোগ পায়। এর মধ্যে একটির নাম লহর কবি বা খেউড়, একটি অংশের নাম টপ্পা-পাঁচালি, এবং অন্য একটি অংশের নাম জোটের পাল্লা বা কবির লহর। এছাড়া কলকাতার কবিগানের অনুরূপ পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে কবিগানের যে কোনো অংশের মধ্যে দু-একটি আক্রমণাত্মক ফুকার বা স্তবক যোগ করা হতো, যা মালফুকার বা রংফুকার নামে পরিচিত। হরিচরণ আচার্য এর সবগুলো সুযোগ কাজে লাগাতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অশ্লীল শব্দ ও অশ্লীল প্রসঙ্গ যুক্ত করতেন। এমন কিছু অশ্লীল শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন, যা কবিগানের আলোচক দীনেশচন্দ্র সিংহ তা মুদ্রণের সাহস পর্যন্ত পাননি, ঊর্ধ্বকমার মধ্যে ত্রিবিন্দু দিয়ে বুঝিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হরি আচার্যের মালফুকারের একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই কবিগানের মধ্যে আক্রমণাত্মক এই 'মালফুকার' পরিবেশিত হতো। এতে একপক্ষের কবিয়াল দোহার দ্বারা বিপক্ষের কোনো এক কবিয়ালের প্রতি আক্রমণাত্মক একটি তুক (অন্তরা বা ফুকার) পরিবেশন করতেন। একইভাবে বিপক্ষের কবিয়ালও আসরে এসে ঐ গানের জবাব পরিবেশন করতেন। সাধারণত মালশি, সখীসংবাদ বা লহর-কবির সূচনা বা উপসংহার হিসেবে এক বা একাধিক তুকে এটি পরিবেশিত হতো। বিপক্ষের সরকারও সুযোগমতো ঐ ফুকারের জবাব দিতেন। অন্যদিকে হরিচরণ আচার্যের সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সময়ে তিনি এবং তাঁর প্রতিপক্ষের কবিয়াল মালফুকার পরিবেশনের জন্য অতো দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। শুধু মালফুকার নিয়েই তাঁরা বারে বারে আসরে যাওয়া-আসা করেছেন। সেই আসরে অশ্লীলতার মাত্রা কী পর্যায়ে পৌঁছেছিলো, তা দেখা যাক—

একবার সদাশিবদি গ্রামে বৃদ্ধ চণ্ডী আচার্যের সঙ্গে যুবক হরিচরণ আচার্যের একবার কয়েক দিন ব্যাপী কবিগান হয়। শেষ দিনে হরিচরণ আচার্য মালফুকার নামের যে গান পরিবেশন করেন, তার চাপান-উতোর ছিলো এ-রকম:

হরিচরণ আচার্য:

চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেলো আর পেলো কুমার রঘুনাথ।
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ি মাইল দশেক তফাত।
এক বরণ, এক আকৃতি, এক বয়স, এক প্রকৃতি
কেবল হামানদিস্তায় গুঁতাগুঁতি, এই দুইটার একটারও নাই দাঁত ॥

চণ্ডী আচার্য:

মোদের হামানদিস্তার গুঁতাগুঁতি এই কথা তুমি গেয়ে যাও।
আমার তো বৃদ্ধাবস্থা, তোমার কি থাকবে আস্তা

তোমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা, তথা গিয়া পান ছেঁচিয়া খাও ॥

হরিচরণ আচার্য:

আমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা, এই কথা আমি শুনতে পাই।
সময়ে সকলই হয়, আমার তো খিলির সময়
তবে এখন যতো পান ছেঁচা হয়, সকল এই বুড়াকে খাওয়াই ॥

চণ্ডী আচার্য:

ছেঁচা পান আমাকে খাওয়ায়, এই কথা দূরে সরে থাক।
এখন ওসব কথা যাক, হায় আমি কী করিলাম, না জেনে খেয়েছিলাম।
বড়ো ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিলাম, এখনগা সেখ তরুকে খাক ॥

হরিচরণ আচার্য:

ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিলো, আমার দাদার হলো রাগ।
তিনি তো জুইতের সময়ে বাঘ ॥
কী ঘৃণা লাগলো ওটা, ছি নাকি নুনে কটা
কিন্তু এই জন্মে যাবে না খোটা, ঠোঁটেতে চুন-খয়েরের দাগ ॥

চণ্ডী আচার্য:

চুন খয়েরের দাগ লেগেছে কী কথা বললি হরি ভাই।
তোর দলের ডাইনের ধারে, তীর্থ মাগী নাচনা করে।
একটু অগ্রসর হতে দাও ঐ মাগীরে, আমি ওর গালে মুছে যাই ॥

হরিচরণ আচার্য:

তুমি তীর্থের গালে দাগ মুছিবে, ইহাতে কথায় হয় না তাও।
দাদা, আর কোরো না রাও ॥
এই তীর্থের তলে তলে, জল ওঠে বোম্বা কলে
তুমি শেষকালে এই তীর্থের জলে বেশ করে মুখ ধুয়ে ফেলাও ॥

এই চাপান-উতোরের মধ্যকার ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তা যে মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে না, তা খুব সহজবোধ্য। নকুল দত্তের বিপরীতেও হরিচরণ আচার্য একই ধরনের মালফুকার ব্যবহার করেছেন। অথচ নকুলেশ্বর ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন শিষ্য।[৩৪]

ঢাকা অঞ্চলের কবিগানে নারী দোহারের উপস্থিতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বিশেষত হরিচরণের দলে একাধিক নারী দোহার ছিলো বলে জানা যায়। এই নারী দোহারগণ যে জনসমাজের মধ্যেও কখনো কখনো স্থূল রসিকতার বিষয় হয়ে উঠতেন, উপরের উদ্ধৃতিতে তা দেখা যায়। তবে পারিশ্রমিক বিবেচনা করলে এঁরা বেশ

---

[৩৪] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ৩২৮।

ভালো অবস্থানে ছিলেন। অনেক সময়ে কবিয়ালদের চেয়েও তাঁদের পারিশ্রমিক বেশি হতো।[৩৫]

হরিচরণ আচার্যের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর শিষ্য তথা উত্তরসূরি সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর আদর্শের কবিগান জনপ্রিয় হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্রহ্লাদ সরকার (নরসিংদী), হরেন্দ্র চক্রবর্তী (নরসিংদী), সর্বানন্দ আচার্য (নরসিংদী), দ্বারিকা সরকার (কিশোরগঞ্জ), অম্বিকা পাটনী (গাজীপুর), মধুসূদন সাহা (ঢাকা?), তারিণীচরণ সরকার (নারায়ণগঞ্জ), অর্জুন দেবনাথ (কুমিল্লা), বৈষ্ণবচরণ দাস (কুমিল্লা), রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী), কালীকুমার দে (নোয়াখালী), রাজেন্দ্রনাথ সরকার (বাগেরহাট), নকুলেশ্বর দত্ত (ঝালোকাঠি) প্রমুখ।

কবিগানের সূচনা থেকে শুরু করে হরিচরণ আচার্যের সময় পর্যন্ত কবিগানের যতো সংগ্রহ রয়েছে, তার মধ্যে হরিচরণ আচার্যের রচনার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তিনি জীবিত থাকতে 'কবির ঝঙ্কার' নামে দুই খণ্ডে তাঁর প্রায় সব কবিগান সংকলিত হয়। ১৯৮৪ সালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে পূর্ববঙ্গের কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রায় সব গানই হরিচরণ আচার্যের। একইভাবে ১৯৯৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সিংহ পূর্ববঙ্গের কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেন, তারও সিংহভাগ হরিচরণ আচার্যের।[৩৬]

হরিচরণ আচার্যের কবিগানের দলে একাধিক কবিয়াল থাকতেন। এটি তাঁর সময়ে কবিগানের দলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিনা, বলা মুশকিল। তবে তাঁর দলে যেহেতু দুইয়ের অধিক কবিয়াল কাজ করতেন, তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কবিগানের বিভিন্ন অংশের কর্মবণ্টনে তিনি বিশ্বাস করতেন। এভাবে কবিগানে একাধিক কবিয়ালের প্রতিভা সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। যেমন কোনো এক কবিয়াল হয়তো ডাক-মালশি গান গাওয়ালেন, একজন কবিয়াল হয়তো সখীসংবাদ, টপ্পা-পাঁচালি প্রভৃতি গাওয়ালেন, আবার একজন কবিয়াল হয়তো টপ্পা-পাঁচালি গাইলেন ও ছড়া কাটলেন। এক বছর হরিচরণ আচার্যের দলে কাশী নট্ট, নকুল দত্ত এবং রাজেন্দ্রনাথ সরকার এভাবে কর্মবণ্টন' করে গান পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায়। এই তিন জনের মধ্যে কাশী নট্ট গানের জবাব তৈরিতে দক্ষ ছিলেন, রাজেন্দ্রনাথ দক্ষ ছিলেন টপ্পা ও ডাকছড়া অংশে, আর নকুল দত্ত দক্ষ ছিলেন পাঁচালি অংশে।[৩৭] আসরের চাহিদা অনুসারে হরিচরণ আচার্য এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি অংশে

---

[৩৫] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ১।

[৩৬] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪); দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭)।

[৩৭] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৮৭।

হাজির হতেন। হরিচরণ আচার্যের প্রতিপক্ষের কবিয়ালগণও অভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকবেন।

কবিগানের পূর্ববঙ্গে পর্বে ঢাকা শহরের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালভেদ, অঞ্চলভেদ ও ব্যক্তিভেদে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিগানে নানা ধরনের স্বাতন্ত্র্য দেখা দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব অঞ্চলের মানুষ যদি নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে এসে কবিগান করেন, তাহলে সব অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর দায়িত্ব পালন করে ঢাকা। তখন প্রতি বছর আশ্বিন মাস পড়তে না পড়তে নড়াইল, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালোকাঠি, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর, পাবনা প্রভৃতি এলাকা থেকে পানসি নৌকায় করে কবিয়ালরা ঢাকায় আসতেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে নৌকাগুলো ভিড়তো সোয়ারি ঘাটে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভিড়তো সদর ঘাটে। যাঁরা কবিগানের শ্রোতা, তাঁরা এইসব ঘাটে এসে কবিয়ালদের সঙ্গে চুক্তি করে যেতেন। কবিয়ালদের এই মিলনমেলায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ঘটা স্বাভাবিক ছিলো। তাছাড়া এই সুযোগে ভিন্ন অঞ্চলের দুই কবিয়ালের মধ্যে গানের আয়োজন হলে তাঁরা পরস্পরের শৈলীর সঙ্গে পরিচিত ও প্রভাবিত হতে পারতেন।

৩. পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিগান

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল বলতে যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলকে বোঝায়। ভৌগোলিক কারণে, বিশেষত পদ্মার মতো বড়ো নদীর ব্যবধানে পদ্মার উত্তর অঞ্চলের থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিগত কিছু তফাত থাকায় কবিগানে কিছু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ অঞ্চল কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় উত্তর অঞ্চলের তুলনায় কলকাতা পর্বের কবিগান দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চলের কবিগান অধিক প্রভাবিত হওয়াও স্বাভাবিক।

পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের বিশ শতকীয় কবিগানকে যশোরের (নড়াইল জেলার) তারকচন্দ্র সরকারের একটি শাখা, যা মূলত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ কেন্দ্রিক এবং বরিশালের একটি শাখা, যা মূলত ঝালোকাঠি কেন্দ্রিক—এই প্রধান দুই শাখায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এই দুই শাখার কোনোটাই গুরুপরম্পরায় সুস্পষ্টভাবে কলকাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবিগান কলকাতা পর্বের কবিগানের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি হবে, সেটাই স্বাভাবিক। ভৌগোলিক নৈকট্য তেমন অনুমান সমর্থন করে। কিন্তু পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের প্রখ্যাত কবিয়ালদের গুরুপরম্পরা বিশ্লেষণ করে সেই অনুমানের পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু একটিমাত্র পরম্পরার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে কলকাতার অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্য-পরম্পরা চব্বিশ পরগনা-যশোর হয়ে গোপালগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। যথা:

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্য-পরম্পরা

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, কলকাতা (১৭৭০–১৮৩৬)

↓

গোবিন্দ তাঁতি, চব্বিশ পরগনা (উনিশ শতক)

↓

পাঁচু দত্ত সরকার, নড়াইল, যশোর (উনিশ শতক)

↓

রাসমোহন সরকার, নড়াইল | রাইচরণ সরকার, নড়াইল | ঈশ্বর বালা, গোপালগঞ্জ

↓ (ঈশ্বর বালা)

মথুরানাথ বালা, গোপালগঞ্জ (১৮৬৩–১৯১৫) | অম্বিকা বালা, গোপালগঞ্জ

↓ (মথুরানাথ বালা)

নারায়ণচন্দ্র বালা, গোপালগঞ্জ (১৯০৭–১৯৮৪)

উৎস: মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২০।

গোপালগঞ্জ অঞ্চল

প্রারম্ভিক পর্যায়ে গোপালগঞ্জ অঞ্চলের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকারের জন্ম উনিশ শতকের প্রথমার্ধে—১৮৪৫ সালের ২৭শে নভেম্বর শনিবার নড়াইল জেলার জয়পুর গ্রামে। তাঁর মৃত্যু হয় বিশ শতকের সূচনায়—১৯১৪ সালের ১৫ই নভেম্বর মঙ্গলবার। এই কালপর্বে কলকাতায় কবিগান বহাল তবিয়তে চালু ছিলো। তখনকার পল্লিবঙ্গেও তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। তাই গ্রামাঞ্চলে তখন খ্যাত-অখ্যাত বহু কবিয়াল কবিগান পরিবেশন করতেন। তারকচন্দ্র সরকারের প্রথম গুরু ছিলেন তাঁর পিতা কাশীনাথ কাঁড়ার এবং দ্বিতীয় গুরু গোপালগঞ্জের মল্লকান্দি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। তারকচন্দ্র সরকারের বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কাশীনাথের জন্ম তাই আঠারো শতকের শেষ দিকে হওয়া স্বাভাবিক। এই উদাহরণ থেকে মনে হয়, উনিশ শতকের সূচনায় যশোর-খুলনা-ফরিদপুর অঞ্চলে কবিগান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারকচন্দ্র সরকারের পিতৃব্যগণ কলকাতায় চাকরি করতেন। সেই সূত্রে তারকচন্দ্র ছোটো বেলায় এক বা একাধিকবার কলকাতায় গিয়ে থাকবেন। এর ফলে কলকাতা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটা সম্ভব।

তারকচন্দ্র সরকার তাঁর সমকালে যেসব কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেছিলেন, তাঁর মধ্যে নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য; শেরপুরের আনন্দ সরকার; গোপালগঞ্জের বেচারাম সরকার, আনন্দ সরকার, বিষ্ণুপদ সরকার, অম্বিকাচরণ বিশ্বাস, রজনী

সরকার; ঝিনাইদহের পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস; মাগুরার গোবিন্দ তাঁতি, হাকিমচাঁদ; নড়াইলের রাইচরণ সরকার, ফজর আলী বয়াতি; পিরোজপুরের দ্বারিক বিশ্বাস; বাগেরহাটের নদীয়ারচাঁদ সরকার, মধুর দেব সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারকচন্দ্র সরকার তাঁর প্রিয় শিষ্য হরিবর সরকার, মনোহর সরকার প্রমুখের বিপক্ষেও কবিগান করেছেন, এমনকি, প্রশিষ্য রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষেও তিনি কবিগান করেছেন বলে জানা যায়।

তারকচন্দ্র সরকারের সময় থেকে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে কবিগানের অঙ্গ হিসেবে টপ্পা-পাঁচালি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। টপ্পা-পাঁচালির মধ্যে টপ্পা, ধুয়া বা ধুয়া গান, এবং বিভিন্ন ধরনের ছড়া থাকতো। কলকাতা পর্বের কবিগান বা উনিশ শতকের শেষ দিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে এর সবগুলো দিক সমানভাবে ছিলো না। কলকাতা পর্বের যেসব গান পাওয়া যায়, তাতে কবিগানের অংশ হিসেবে কোনো ধুয়া গান পাওয়া যায় না, এমনকি তা পরিবেশিত হতো বলেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। একইভাবে তারকচন্দ্রের সমবয়স্ক ময়মনসিংহ অঞ্চলের রামগতি, রামু মালীদের সময়েও ছড়াকাটাকাটি খুব সামান্য পরিমাণে ছিলো। ধুয়া গান তো ছিলোই না, ছড়াকাটার প্রয়োজনে এক কলিসর্বস্ব ধুয়া ছিলো, যা ঐ অঞ্চলে 'দিশা' নামে পরিচিত।

কবিগানের লহর অংশ, যা তারকচন্দ্রের সময় থেকে টপ্পা-পাঁচালি নাম ধারণ করে, সেটিকে গঠনের দিক দিয়ে প্রায় পাঁচালি গানের নিকটবর্তী করার ব্যাপারে তারকচন্দ্র সরকারের ভূমিকা থাকা সম্ভব। পাঁচালি গানে সাধারণত ধুয়া গানের মতো একটি গান এবং তারপর বিভিন্ন ছন্দের পদ্য থাকতো। তারকচন্দ্র সরকার পরিবেশিত কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি অংশ গঠনের দিক দিয়ে সেই পাঁচালির নিকটবর্তী। গোপালগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর শিষ্যপরম্পরার সকলকে সে আদর্শ অনুসরণ করতে দেখা যায়।

ঢাকার কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের কবিগানে ময়মনসিংহ অঞ্চলের রীতি এবং তারকচন্দ্র সরকারের রীতির সম্মিলন ঘটতে দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন তিনি টপ্পা গানের পরে প্রথম ছড়া কাটতে শুরু করার পূর্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলের মতো 'দিশা' ব্যবহার করতেন, আবার ত্রিপদীর ছড়া শেষ করে পয়ার ছন্দে পাঁচালি শুরু করার মাঝখানে তারকচন্দ্র সরকারের মতো পুরো একটা গান পরিবেশন করতেন।[৩৮] হরিচরণ আচার্য ময়মনসিংহ অঞ্চলে যেমন কবিগান করেছিলেন, একইভাবে তরুণ বয়সে তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষেও কবিগান করেছিলেন। তাই এভাবে উভয় রীতির সম্মিলন ঘটা তাঁর গানে স্বাভাবিক ছিলো। পূর্ববঙ্গের সব অঞ্চলে তাঁর প্রভাব ব্যাপক হওয়ায় সব অঞ্চলেই টপ্পা-পাঁচালির এই রীতি আদর্শ-রীতিতে পরিণত হয়। এভাবে কবিগানের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি ধুয়া গান পরিবেশনের যে রীতি তারকচন্দ্র সরকার সৃষ্টি করেন, হরিচরণের

---

[৩৮] বিশ শতকের প্রথমার্ধে পাঁচালির মধ্যে 'আমার মন বাঁধা রাধা চরণে' শীর্ষক বাউল অঙ্গের একটি গান হরিচরণ আচার্য পরিবেশন করেছিলেন, শুনেছিলেন বিশ শতকের প্রখ্যাত কবিয়াল নকুলেশ্বর দত্ত। দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৭৬।

মাধ্যমে তা সর্ববঙ্গীয় গ্রহণযোগ্যতা পায়। অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে কবিগানের টপ্পা-পাঁচালিতে ব্যবহৃত ধুয়া গানগুলো কবিগানের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়ে ওঠে। বিশ শতকের শেষ নাগাদ এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, অনেক সাধারণ শ্রোতা মনে করতে শুরু করেন যে, ধুয়া গানগুলোই প্রকৃত কবিগান।

পাঁচালির মধ্যে ধুয়া গান পরিবেশনের কাজটি স্বয়ং কবিয়ালকে করতে হয় বলে যে সরকারের সুর যতো ভালো, সেই সরকার ততো সুনামের অধিকারী হন। স্বাভাবিকভাবে সুকণ্ঠের অধিকারী কবিয়ালরা এতে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকেন। কিন্তু পূর্বে যে কৌশলে কবিগান পরিবেশিত হতো, তাতে কবিয়ালকে সুকণ্ঠের অধিকারী না হলেও চলতো। কেননা, তাঁরা শুধু দোহারদের পেছনে দাঁড়িয়ে গানের কথাগুলো রচনা করে বলে দিতেন। সুকণ্ঠের অধিকারী দোহারগণ তা পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু পাঁচালির মধ্যে ধুয়া গান পরিবেশনের রীতি চালু হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। এই নতুন পরিস্থিতিতে একবার কণ্ঠ বসে যাওয়ায় তারকচন্দ্র সরকার চিন্তিত হয়েছিলেন। বিষয়টি তিনি তাঁর আরাধ্য হরিচাঁদের কাছে জানান। কথিত আছে, তখন হরিচাঁদের আশীর্বাদে তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়।[৩৯]

তারকচন্দ্র সরকার তাঁর গানের আসরে পাঁচালির ফাঁকে ফাঁকে যেসব ধুয়া গান পরিবেশন করতেন, তার অনেকগুলো ছিলো বৈষ্ণবীয়; অনেকগুলো ছিলো হরিচাঁদের প্রচারিত ধর্মমত মতুয়া আদর্শের। এই ধুয়া গানগুলো নিয়ে পরে তিনি একটি গানের বই প্রকাশ করেন। বইটির নাম দেওয়া হয় 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন' (১৯৩৭)।[৪০] এইসব ধুয়া গানে মাত্র দুটি তুক থাকতো: চিতান বা স্থায়ী এবং একাধিক অন্তরা। যেমন তারকচন্দ্র সরকারের এই ধুয়া গানটি:

চিতান/ স্থায়ী	কাজ কি আমার মন্ত্রবীজে। হরিচাঁদ ছবি রবির কিরণে উথলিল মধু হৃৎসরোজে ॥
অন্তরা ১	যে অমৃত পিয়ে পিয়ে রসে ডগমগ হয়ে। গেছে আত্মারাম মাত্তা লাগিয়ে মন সরে না গৃহকাজে ॥
অন্তরা ২	যতো ছিলো বৈদিক ক্রিয়া সে ক্রিয়া হলো অক্রিয়া। ছিলো অষ্টপাশে মা মহামায়া সে মা গেছে পুত্র ত্যজে ॥
অন্তরা ৩	যতো ছিলো যাগযজ্ঞ সে যজ্ঞ ছিলো অযজ্ঞ। কলৌ নামসংকীর্তন মহাযজ্ঞ অর্ঘ্য দিলাম তারি মাঝে ॥
অন্তরা ৪	ভুক্তি মুক্তি দুই পৈশাচী তারা হলো ভক্তির দাসী। আমার জাত মেরেছে সর্বনাশী বিবর্ত বিলাস খুঁজে ॥

---

[৩৯] বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, পৃ. ২০।

[৪০] গানগুলোর সংকলক এবং প্রকাশক ছিলেন ওড়াকান্দির মতুয়াচার্য সুধন্যাকুমার ঠাকুর। তদেব, পৃ. ৪৯।

অন্তরা ৫ ডেকে বলে মহানন্দ উদয়গিরি গোলোকচন্দ্র।
ও তা দেখলি নারে তারক অন্ধ রলি উলূকের সং সেজে ॥

পাঁচালির প্রসঙ্গান্তরে অথবা ছড়ার ছন্দ পরিবর্তন করার সময়ে তারকচন্দ্র সরকার এই ধরনের ধুয়া গান পরিবেশন করতেন এবং সেইসব ধুয়া গানের স্থায়ীর সুর অনুযায়ী অবশিষ্ট ছড়ার ছন্দ ও সুর ঠিক করে পরিবেশন করতেন।

তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য-পরম্পরার কবিয়ালগণ বিশ শতকের বৃহত্তর যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের প্রতিনিধিত্ব করেন। নিম্নের লতিকায় তারকচন্দ্র সরকারের এই পরম্পরাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:

তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য-পরম্পরা

- তারকচন্দ্র সরকার, নড়াইল (১৮৪৫–১৯১৪)
  - হরিবর, গোপালগঞ্জ (১৮৭৯–১৯৩৯)
    - রাজেন্দ্রনাথ, বাগেরহাট (১৮৯২–১৯৭৪)
      - কালীদাস, গোপালগঞ্জ
      - গৌরপদ, বাগেরহাট
      - জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বাগেরহাট
      - দ্বিজবর, পিরোজপুর
      - নিত্যগোপাল, গোপালগঞ্জ
      - মৃত্যুঞ্জয় সরকার, বরিশাল
      - রসিকলাল, বাগেরহাট
      - শুকচাঁদ, গোপালগঞ্জ
      - হরষিত, গোপালগঞ্জ
  - মনোহর, গোপালগঞ্জ (১৮৭৯–১৯৩৯)
    - বিজয়কৃষ্ণ, নড়াইল (১৯০৩–১৯৮৫)
      - অনন্ত, খুলনা
      - অনাদিজ্ঞান, বাগেরহাট
      - অরুণ গোঁসাই, নড়াইল
      - আশুতোষ মধু, বাগেরহাট
      - ক্ষিতীশচন্দ্র বর, নড়াইল
      - দিগেন্দ্রনাথ, বাগেরহাট
      - নিখিল, গোপালগঞ্জ
      - নেপাল, নড়াইল
      - বিনয়কৃষ্ণ, গোপালগঞ্জ
      - মনোরঞ্জন, গোপালগঞ্জ
      - রবীন্দ্রনাথ, বরিশাল
      - রসিকলাল, বাগেরহাট
      - শ্রীনিবাস, গোপালগঞ্জ
    - কামিনী সরকার, বাগেরহাট
    - নিশিকান্ত, গোপালগঞ্জ (১৯১৩–১৯৯৩)
      - আসমত আলী, বাগেরহাট
      - ধীরেন্দ্রনাথ, বাগেরহাট
      - রাজেন্দ্র, ছোটো, গোপালগঞ্জ
      - স্বরূপেন্দু, বাগেরহাট

টীকা: একুশ শতকের সূচনায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার এবং নিশিকান্ত সরকারের প্রশিষ্যরা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের প্রধান ধারার কবিয়াল, যাঁদের নাম এই তালিকায় পাওয়া যাবে না, তাঁদের গুরুদের নামই শুধু এখানে রয়েছে।

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, তারকচন্দ্র সরকারের এই শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁরা সকলেই বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। এঁদের বাড়ি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, নড়াইল, খুলনা, বরিশাল এবং পিরোজপুর। আলোচনার সুবিধার্থে এই অঞ্চলকে গোপালগঞ্জ অঞ্চল বলা হয়েছে। এই নামকরণের পিছনে প্রধান যুক্তি হলো, যশোরের নড়াইলে এই ধারার সূচনা হলেও এই পরম্পরার অধিকাংশ কবিয়ালের বাড়ি গোপালগঞ্জ। এছাড়া এই পরম্পরার অধিকাংশ কবিয়াল গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন, সেটিও বিবেচ্য। অনেকে এই ধারাকে মতুয়া ধারা নামে চিহ্নিত করে থাকেন, তাও গোপালগঞ্জের প্রাধান্য স্বীকারের শামিল।[৪১]

ব্যবস্থাপনাগত তাৎপর্যপূর্ণ গভীর কিছু অনৈক্য থাকলেও গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবিগানের বিষয় ও প্রকরণের সঙ্গে ঝালোকাঠি অঞ্চলের বিষয় ও প্রকরণের মিল ঘনিষ্ঠ। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবিগানের যে নমুনা প্রদান করা হয়েছে, তা উভয় অঞ্চলের কবিগানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

তারকচন্দ্র সরকারের সমকালীন ছিলেন গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের আনন্দ সরকার।[৪২] আনন্দ সরকারের শিষ্য ছিলেন বাগেরহাটের বৈঝাকি গ্রামের নদীয়ারচাঁদ সরকার (১৮৪৯–১৯২৬)। নদীয়ারচাঁদ সরকার ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন ও রাজনীতিসচেতন একজন কবিয়াল।

তারকচন্দ্র সরকারের প্রধান তিন শিষ্যের নাম গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের হরিবর সরকার, মনোহর সরকার এবং বাগেরহাটের জেলার গঙ্গচর্না গ্রামের অশ্বিনী সরকার।[৪৩] এঁদের সমসাময়িক ছিলেন পিরোজপুরের রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জলাল দত্ত। কুঞ্জলাল দত্তের গুরু ছিলেন তারকচন্দ্র সরকারের সমকালীন ও প্রতিপক্ষের কবিয়াল বাগেরহাটের বিধুভূষণ দেব সরকার।[৪৪] বিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা কবিগানে বিশেষ

---

[৪১] যেমন বিরাট বৈরাগ্য এই অঞ্চলের কবিয়ালদের কবিগানকে মতুয়া সাহিত্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* (কলকাতাঃ অশোককুমার রায়, ১৯৯৯), পৃ. ৫২৫–৬৮৭।

[৪২] প্রফুল্লচন্দ্র পাল তাঁর 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' বইয়ে আনন্দ সরকারের একটি গান সংকলন করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৪১০–১১।

[৪৩] হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার সম্পর্কে যতীন সরকার লিখেছেন, এঁরা 'খুলনা জেলার দুর্গাপুর গ্রামের দুই সহোদর।' তথ্যটি ঠিক নয়। তাঁদের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গাপুর গ্রামে। এক গ্রামে বাস করলেও তাঁরা সহোদর ছিলেন না। তাঁদের পিতৃদ্বয় সহোদর ছিলেন। হরিবর (যতীন সরকার লিখেছে 'হরিহর') সরকারের পিতার নাম আনন্দ সরকার, অন্যদিকে মনোহর সরকারের পিতার নাম নাগরচাঁদ সরকার। যতীন সরকারের তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৯৯।

[৪৪] বাগেরহাটে বাড়ি হলেও ঝালোকাঠি কেন্দ্রের প্রথম দিককার কবিয়াল ছিলেন বিধুভূষণ দেব। তাঁর কন্যা কুসুমকুমারীও ঝালোকাঠি কেন্দ্রে কবিগান করতেন।

সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এই হরিবর সরকার, মনোহর সরকার এবং কুঞ্জলাল সরকারের শিষ্য। এঁদের মধ্যে হরিবর সরকারের শিষ্য রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২–১৯৭৪), কুঞ্জলাল সরকারের শিষ্য নকুলেশ্বর দত্ত (১৮৯৪–১৯৮৭), এবং মনোহর সরকারের শিষ্য বিজয়কৃষ্ণ সরকারের (১৯০৩–১৯৮৫) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোপালগঞ্জ জেলার হরিবর সরকারের (১৮৬৯–১৯৫১) পিতা আনন্দ সরকার তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতে কবিগান করতেন। মতুয়াচার্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে হরিবর সরকার তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হরিচরণ আচার্য তাঁর 'বঙ্গের কবির লড়াই' বইয়ে হরিবর সরকারের উল্লেখ করেছেন। হরিবর সরকারের কয়েকটি ধুয়া গান তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হরিবর সরকার ভালো গদ্য লিখতে পারতেন, সম্পাদনাও করতেন। তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থখানি তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'দ্বাদশ আজ্ঞা', 'অষ্টাধিক শতনাম', এবং 'মহাবারুণী' তাঁর লেখা তিনটি উল্লেখযোগ্য বই। তারকচন্দ্র সরকার, হরিচরণ আচার্য, নদীয়ারচাঁদ সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। হরিবর সরকারের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর ভাগিনেয় রাজেন্দ্রনাথ সরকার অন্যতম।

হরিবর সরকারের খুল্লতাত ভাই ছিলেন মনোহর (১৮৭৯–১৯৩৯) সরকার। হরিবর সরকারের পিতা আনন্দ সরকার এবং মনোহর সরকারের পিতা নাগরচাঁদ সরকার ছিলেন আপন ভাই। হরিবর সরকারের মতো মনোহর সরকারের গুরুও ছিলেন তারকচন্দ্র সরকার। উজ্জ্বল ফর্সা রং ও সুন্দর চেহারার জন্য সকলে তাঁকে রাঙা কর্তা নামে অভিহিত করতেন। পরবর্তী কালের অসাধারণ জনপ্রিয় বিজয়কৃষ্ণ সরকার এবং নিশিকান্ত সরকার ছিলেন তাঁর প্রধান দুই শিষ্য।

বাগেরহাটের অশ্বিনী সরকার (১৮৭৭–১৯২৭) একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। প্রথম জীবনে তারকচন্দ্র সরকারের দলে দোহার ছিলেন। চিতলমারী থানার কালীগঞ্জ বাজারের কালীখোলায় (অধুনালুপ্ত) আয়োজিত কবিগানের আসরে বিপক্ষের কবিয়াল মাগুরার গোবিন্দ তাঁতির অনুপস্থিতিতে তারকচন্দ্রের নির্দেশে অশ্বিনী সরকারের কবিয়াল জীবনের সূচনা হয়। তবে বেশিদিন তিনি কবিগান করেননি। মতুয়া ধর্ম প্রচার হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। কবিয়াল জীবনে তিনি মতুয়া আদর্শের গানগুলোকে ধুয়া গান হিসেবে পরিবেশন করতেন। তাঁর এই জাতীয় গানের শিল্পমূল্য অসাধারণ। তাঁর গানের বাণী খুব সহজেই আবেগ সৃষ্টি করে, মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁর বহু গান লালনের গানের সঙ্গে প্রতিতুলিত হওয়ার যোগ্য।

এঁদেরই সমকালীন ছিলেন বাগেরহাটের কুড়ালতলা গ্রামের কামিনী সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। তিনি ছিলেন মনোহর সরকারের প্রথম দিককার ছাত্র, তাই মনোহর সরকারের প্রায় সমবয়সী। আলোচ্য কালপর্বে প্রায় সব সরকারেরই পানসি

নৌকা থাকতো; কামিনী সরকারেরও ছিলো। তবে কামিনী সরকার ঘোড়ায়ও চড়তেন। তাঁর নিজস্ব ঘোড়া ছিলো। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার জন্য বর্ণহিন্দু এক নায়েবের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে এবং অভিন্ন কারণে তাঁকে প্রায় নিঃস্ব হতে হয়।[৪৫] অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা তাঁর কবিগানের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিলো।

রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিপ্রতিভা ছিলো অসাধারণ। তাঁর সম্পর্কে যতীন সরকার লিখেছেন: "তিনি যেমন ছিলেন সুদক্ষ গায়ক, বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর ছিল তেমনই অধিকার। সঙ্গীতের রাগরাগিণী বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো গভীর, ছড়া কাটাতেও ছিলেন কুশলী।"[৪৬] রাজেন্দ্রনাথ সরকার সম্পর্কে এ মন্তব্য যথার্থ। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিশেষ পরিচয় ছিলো। কলকাতার মানুষকে পূর্ববঙ্গের কবিগান শোনানোর লক্ষ্যে রাজেন্দ্রনাথকে তিনি ১৯৩২ সালে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কলকাতার অ্যালবার্ট হলে কবিগানের আয়োজন করেছিলেন। যদিও সে বারে কলকাতায় তাঁর কবিগান পরিবেশন যথেষ্ট সুখকর হয়নি।[৪৭] এরপর ১৯৩৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলকাতার আশুতোষ ভবনে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবির লড়াই হয়। এই গানের বিষয় ছিলো নারী ও পুরুষ। রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরুষ পক্ষে এবং বিজয়কৃষ্ণ সরকার ছিলেন নারী পক্ষে। সেখানে শ্রোতা হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের মতো বিদগ্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই কবিয়ালদ্বয়কে আলাদা দুটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথকে দেওয়া প্রশংসাপত্রে তাঁরা লিখেছিলেন, "আমরা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, বাগ্মিতা, এবং সংগীতশক্তি দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার মত সুযোগ্য কবিগায়ক দেশের সর্বত্র সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।"[৪৮] বিজয়কৃষ্ণ সরকারকেও অনুরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া

---

[৪৫] গোপালগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় সকল কবিয়াল ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। হিন্দুসমাজের জাতবিচারের মাপকাঠিতে তাঁরা ছিলেন অ-বর্ণহিন্দু। ব্রিটিশ গবেষকদের নিকটে এঁরা ছিলেন প্রায়-হিন্দু আদিবাসী (semi-Hindu aborigin), বর্ণহিন্দুদের ভাষায় নিম্নবর্ণীয় হিন্দু, এবং ব্রিটিশ সরকারের ভাষায় তফসিলি হিন্দু। অজ্ঞাত অতীত থেকে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর এক ধরনের জাতিবৈরিতা লক্ষণীয়।

[৪৬] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৯৮।

[৪৭] জসীম উদ্‌দীন, *জীবনকথা* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১২৪। বিজয়-গবেষক মণি মণ্ডলের ধারণা, সময়টা ছিলো ১৯৩৫। মণি মণ্ডল, "লোককবি বিজয় সরকারের জীবন ও জীবনী," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ২৮২।

[৪৮] স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান: অতীত ও বর্তমান," *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ, ১৮৯। প্রশংসাপত্রটি স্বাক্ষরিত হয় ১লা অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখে।

হয়েছিলো।[৪৯] কাছাকাছি সময়ে তাঁরা কাশিমবাজার মহারাজের পুত্র শ্রীশ নন্দীর বাসভবনে এবং পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সহায়তায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার অত্যন্ত সমাজসচেতন কবি ছিলেন। তিনি নিজে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ছিলেন, তাই হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিলো। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি হিন্দু সমাজের কঠোর সমালোচনা করতেন। অনেক সময়ে তাঁর সেই সমালোচনা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতো। ডাক-মালশি প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সেই সংস্কারমুখী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটান। যেমন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মালশি গানের বিখ্যাত এই অংশ:

> কতো মদের নেশায় বদের দশায় ব্রাহ্মণ খায় বেশ্যাবাড়ির ভাত।
> তাতে হয় না জাতিপাত, মা মাগো, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ ॥
> নটীর হুঁকায় তামাক খেয়ে কুলীন কোলায় বাড়ি গিয়ে
> এসব ব্রাহ্মণকে না প্রণাম দিয়ে নটীর পদে কোটি দণ্ডবৎ ॥

কালীপূজায় পাঁঠা বলি দেওয়ার ব্যাপারটাকেও তিনি সমর্থন করতেন না। সরাসরি প্রাণীহত্যা না করে মায়ের পূজার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কথা তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত মালশিতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বিধবাহিবাহের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতার কথাও তাঁর কবিগানের বিষয় হিসেবে উঠে আসতো।

তাঁর সমকালের প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগান করেছেন। তাঁর গুরু ছিলেন হরিবর সরকার। হরিবর সরকারের গুরু তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতেও কবিগান করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। রাজেন্দ্রনাথ সরকার পর পর কয়েক বছর হরিচরণ আচার্যের দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করেছেন। এক বছর নকুলেশ্বর দত্তও ঐ দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করেছিলেন। দলে আরো একজন কোল-সরকার ছিলেন কাশী নট্ট নামে। হরিচরণ আচার্য তখন নিজে গান না করে শুধু কোল-সরকারদের দিয়ে গান করাতেন। যেমন এক বছর কাশী নট্টকে বলেছিলেন বিপক্ষের গানের জবাব তৈরি করে পরিবেশন করতে, নকুল দত্তকে বলেছিলেন পাঁচালি বলতে এবং রাজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন টপ্পা এবং ডাক-ছড়া বলতে।[৫০] ডাক-ছড়া হলো ত্রিপদী ছন্দের ছড়া। টপ্পা রচনা করাও বেশ কঠিন কাজ। রাজেন্দ্রনাথকে এই দুটি কঠিন দায়িত্ব প্রদান করার অর্থ তাঁর সৃজনশীলতার উপরে হরিচরণ আচার্যের যথেষ্ট আস্থা থাকা। হরিচরণ আচার্য রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে খুব স্নেহ করতেন। রাজেন্দ্রনাথও তাঁর পরিচয় দেওয়ার সময়ে হরিচরণ আচার্যকে তাঁর গুরু হিসেবে উল্লেখ করতেন।

---

[৪৯] মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৪২।

[৫০] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৮৭।

রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর মতো খ্যাতিমান কেউ হতে পারেননি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বাগেরহাটের গৌরপদ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, রসিকলাল সরকার, গোপালগঞ্জের কালীদাস সরকার, নিত্যগোপাল সরকার, শুকচাঁদ সরকার, হরষিত সরকার, বরিশালের মৃত্যুঞ্জয় সরকার এবং পিরোজপুরের দ্বিজবর সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কালীদাস সরকার এবং দ্বিজবর সরকার কিছুটা সুনাম অর্জন করলেও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর মতো প্রতিভাবান কেউ ছিলেন না।

রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সৃজনশীলতা এবং কবিপ্রতিভা তাঁর সময়ে তুলনাহীন। শব্দচয়নে এবং কবিত্বগুণে তিনি তাঁর সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতির মান খুব উন্নত, কবিতা হিসেবেও সেগুলো মূল্যবান। সংখ্যার দিক দিয়েও তা সমকালীন কবিয়ালদের চেয়ে বেশি ছিলো। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদির প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনার অনেক গান উত্তরসূরিদের নিকট মুখস্থ। বিশ শতকের কবিগানের আসরেও তাঁরা এগুলো পরিবেশন করে থাকেন।

ঝালোকাঠি অঞ্চল

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের ঝালোকাঠিতে কবিগানের বিশেষ একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৫১] বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে পূর্ববঙ্গের কবিগান আলোচনায় ঝালোকাঠির এই কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

প্রথমত, ঝালোকাঠিতে গড়ে ওঠা কবিগানের দলগুলো ছিলো পরিপূর্ণভাবে পেশাদার। এখানে বেশ কয়েকটি কবিগানের দল ছিলো। তার মালিকানা ছিলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে। দলগুলোতে কবিয়াল, দোহার, যন্ত্রসঙ্গতকারীরা বৎসর ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হতেন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময়ে নতুন চুক্তি হওয়া ও পুরাতন চুক্তি নবায়নের কাজ হতো। গানের মরশুম শুরু হতো দুর্গা পূজার দশ দিন পূর্ব থেকে। দলের সকল শিল্পীর মাসিক বেতন নির্ধারিত থাকতো। সেই সঙ্গে থাকতো নানা ধরনের নিয়ম। সেই নিয়মের কিছু পারিভাষিক নামও ছিলো। যেমন 'হেমারতি' ও 'কামাই'। গান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পী আসরে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হতেন অথবা গান চলা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে অপরাধ অনুযায়ী সাত দিন অথবা পনেরো দিনের বেতন কাটার নাম হেমারতি। অন্যদিকে কেউ যদি কোনো বায়নার তিন পালা গানের দ্বিতীয় পালা গান করার পর অনুপস্থিত থাকতেন এবং পরবর্তী বায়নার শুরুতে উপস্থিত হতেন, তাহলে এক বায়না থেকে অন্য বায়না পর্যন্ত সময়ের বেতন পেতেন না, নতুনভাবে কাজে যোগ দিতে হতো, এর নাম হলো কামাই।[৫২] ঝালোকাঠি অঞ্চলের কবিগানে এমন কঠোর পেশাদারি ব্যবস্থাপনা চালু ছিলো।

---

[৫১] ঝালোকাঠি ছিলো তৎকালীন বরিশাল জেলার একটি মহকুমা ও নদী বন্দর।

[৫২] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ৫২।

দ্বিতীয়ত, পেশাদারি এই কবির দলের অনেকগুলোরই মালিক ছিলেন নারী। এইসব দলে মহিলা দোহার থাকতেন। অনেক সময়ে দলের মালিক দোহারের কাজ করতেন। দলে নারী নৃত্যশিল্পীও থাকতেন। ঐকতান বাদনের সময়ে নারী নৃত্যশিল্পীরা আসরে গিয়ে নাচতেন। অনেক দোহার এই নাচে অংশগ্রহণ করতেন, আবার বিশেষভাবে খেমটাওয়ালি নামে পরিচিত নারীশিল্পীরা এই ধরনের নাটে পটু থাকতেন। নাচতে জানা দোহার এবং খেমটাওয়ালিদের বেতন সাধারণ দোহারদের থেকে বেশি হতো। অনেক নারী দোহার এতোটাই সচ্ছল ছিলেন যে, অনেকের সঙ্গে পঞ্চাশ ভরির বেশি সোনার গয়না থাকতো এবং সেই পরিমাণ গয়না পরেই তাঁরা আসরে নাচ-গান করতেন।[৫৩]

তৃতীয়ত, ঝালোকাঠির দলে দোহারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকতো। কবিগানে তখন সাধারণত চারজন দোহার হলেই চলতো। কিন্তু ঝালোকাঠি অঞ্চলে দশ জন পর্যন্ত দোহার থাকতো: ধরতা দোহারসহ প্রথম সারিতে চারদিকে ছয়জন দোহার, আবার তাদের পেছনে আরো চারজন দোহার।[৫৪] ধরতা দোহার মানে ডাক-মালশি-বন্দনা গান যে প্রথমে গায়, পরে তার গান শুনে অন্য দোহাররা গায়। ঝালোকাঠি অঞ্চলে নারী দোহার ও পুরুষ দোহার উভয়ই থাকতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী দোহারই ধরতা দোহারের দায়িত্ব পেতেন। এই দোহারদের সকলের নির্দিষ্ট পোশাক থাকতো। তাঁরা বডিকোটসহ ঘাগরা জাতীয় পোশাক পরতেন এবং কখনো কখনো মাথায় 'জরিদার টুপি' ব্যবহার করতেন।[৫৫] ঝালোকাঠির পুরুষ দোহারদেরও নির্দিষ্ট পোশাক ছিলো। তাঁরা পরতেন উকিলদের মতো কালো গাউন। গাউনের উপরে দলের নাম লেখা থাকতো, যেমন—আদর্শ কবি পার্টি, বীণাপাণি কবি পার্টি ইত্যাদি।[৫৬]

কবিগানের সঙ্গে যুক্ত নারীদের, তা তিনি মালিক হন বা দোহার হন, জনপ্রিয় নাম ছিলো বৈষ্ণবী। নাম থেকে মনে হয়, এঁরা বালবিধবা ছিলেন অথবা প্রথম জীবনে কোনো বৈরাগীর দলে যুক্ত হয়েছিলেন। কবির দলের পুরুষ সদস্যের সঙ্গে এঁরা কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতেন। কিন্তু সামাজিকভাবে বিবাহ না হওয়ায় স্ত্রীর মর্যাদা তাঁরা ভোগ করতে পারতেন না। তবে সামাজিকভাবে বিবাহ না হওয়ায় তারা অন্য ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারতেন। যেমন এই নারীরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে

---

[৫৩] প্রায় দুইশো ভরি সোনার মালিক ছিলেন ঝালোকাঠির বিখ্যাত গায়িকা সরলা। দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ১২৭।

[৫৪] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ৪।

[৫৫] এই পোশাক সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সিংহের বর্ণনা: ১. "পরনে নাচওয়ালীদের মত ঘাঘরা, মাথায় কালো রঙের উপর জরিদার টুপি।" ২. "কালো রং-এর সলনা চুঙ্গি লাগানো ঘাগরা পরা, গায়ে জরির কাজ করা কালো বডি-কোট, তার উপর সিল্কের ওড়না, মাথায় সোনার জাল টিকলি, হাতে গলায় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার—সত্যিই যেন স্বর্গীয় নর্তকীর মর্ত্যে আবির্ভাব।" দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ৩৩, ১৫৯।

[৫৬] তদেব, পৃ. ৪।

পারতেন, স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারতেন, এবং কোনো এক পুরুষের চিরস্থায়ী দাসী হয়ে তাঁদের জীবন কাটাতে হতো না। ঝালোকাঠি অঞ্চলের কবিয়াল রাখাল আচার্যের ধারণা এঁরা 'বেশ্যার অপেক্ষা অনেক সম্মানিতা ছিলেন।'[৫৭] এর অর্থ দাঁড়ায় পতিতারা সমাজে সম্মানিতা, এবং এই বৈষ্ণবীরা আরো বেশি সম্মান ভোগ করতেন। বাস্তবে এই ধরনের তুলনা পুরুষতান্ত্রিক। কেননা কবিগানের সঙ্গে যুক্ত নারীরা দেহব্যবসা করতেন না। পাশাপাশি রাখাল আচার্য অবশ্য এ কথাও স্বীকার করেন যে, ঝালোকাঠি অঞ্চলের বৈষ্ণবীদের মূল পেশা ছিলো গান-বাজনা।[৫৮] গান-বাজনায় আয়ের পরিমাণ ভালো থাকতো বলেই হয়তো এদের দেহব্যবসা করতে হতো না। গান-বাজনা করে তাঁরা তখন পুরুষ দোহারদের থেকেও বেশি উপার্জন করতেন।[৫৯]

কবিগানের এই ঝালোকাঠি ব্যবস্থাপনা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে খানিকটা আলাদা ছিলো। এই আলাদা হওয়ার পেছনে ঝালোকাঠিতে অবস্থিত অন্যান্য কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান এবং তার ব্যবস্থাপনা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। বিশ শতকের প্রথম দিকে ঝালোকাঠি হয়ে উঠেছিলো বিভিন্ন লোকশিল্পের একটি কেন্দ্রভূমি। এসব লোকশিল্পের মধ্যে ছিলো যাত্রাগান, কবিগান, জারিগান, রামায়ণগান, কীর্তনগান, ভাসানযাত্রা গান, গাজির গান প্রভৃতি। এসব লোকশিল্পের শিল্পীরা যেমন এখানে এসে জড় হতেন, তেমনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা এসব গানের আয়োজন করতে চাইতেন, তাঁরাও এখানে এসে ঐসব গানের বায়না করে যেতেন। এই সুযোগে কিছু অর্থবিনিয়োগকারী ব্যক্তি এইসব দল-সংগঠনে ভূমিকা রাখতেন। এর ফলে কবিগানের ব্যবস্থাপনাও যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদির অনুরূপ হয়ে উঠছিলো।

বিশ শতকের সূচনায় ঝালোকাঠিতে কবিগানের দল ছিলো আট-দশটি। এর মধ্যে একটির মালিক ছিলেন যামিনীকান্ত নট্ট। তাঁর দলের সরকার ছিলেন ষষ্ঠীচরণ করাতী, পরে তাঁর শিষ্য রাখাল আচার্য। ষষ্ঠীচরণ করাতী বরিশালের বানারীপাড়ার নিকটবর্তী আলতা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ষষ্ঠীচরণ করাতী নরসিংদীর বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। হরিচরণ আচার্য তাঁকে বিশেষ সমীহ করতেন বলে জানা যায়।

একটি দলের মালিক ছিলেন অধরমণি বৈষ্ণবী। অধরমণি বৈষ্ণবীর দলে কবিয়াল ছিলেন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জলাল দত্ত। বিশ শতকের বিখ্যাত কবিয়াল নকুল দত্ত ছিলেন এই কুঞ্জলাল দত্তের পালিত পুত্র। নকুল

---

[৫৭] রাখাল আচার্যের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "ভূমিকা," *হারামণি*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. চুয়াত্তর।

[৫৮] তদেব।

[৫৯] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কলকাতা: দে বুক স্টোর ১৯৭৭), পৃ. ১। এখানে যে ডাকগান বা বন্দনাগান উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার একটি চরণ নিম্নরূপ: "দেখি সরকারদিগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয় না/ মেয়ের মাইনা হলো ষাট পর্যন্ত।"

দত্ত মূলত ছিলেন নলছিটি থানার সুয়াকাঠি গ্রামের বেচারাম দাসের পুত্র। কুঞ্জলাল অপুত্রক ছিলেন বলে নকুলকে তিনি নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং কবিগান শেখান। দলের মালিক অধরমণির সঙ্গে কুঞ্জ দত্তের সম্পর্ক কতোটা গভীর ছিলো তা বোঝা যায়, নকুল দত্ত তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন দেখে। বস্তুত কুঞ্জ দত্ত এবং অধরমণি স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতেন। নকুল দত্ত তাঁর দত্ত পদবিটি গ্রহণ করেছিলেন এই গুরুপিতার পদবি থেকে।

একটি দলের মালিক ছিলেন কুসুমকুমারী। তিনি নিজে কবিয়াল ছিলেন। তাঁর পিতা বিধুভূষণ দেব ছিলেন ঝালোকাঠির প্রাচীন কবিয়াল। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিলো বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার লালচন্দ্রপুর। কুসুমকুমারীর দলের সঙ্গে বরিশালের নিবারণ বসুর শখের দলের কবিগান শুনে নকুল দত্ত কবিগানের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

রাঙা যামিনী বা যামিনী বৈষ্ণবীর দলে সরকার ছিলেন শরৎ বৈরাগী। শরৎ বৈরাগীর জন্মস্থান ছিলো ঝালোকাঠি। শরৎ বৈরাগীর কণ্ঠস্বর ছিলো সুমধুর। শরৎ বৈরাগী ছিলেন কোনো এক বৈষ্ণবীর পুত্র এবং তাঁর পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিলো। তাৎক্ষণিক জবাব রচনার ক্ষেত্রে শরৎ বৈরাগী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিগান করে শরৎ বৈরাগী এতোটা সচ্ছল হয়েছিলেন যে, ঝালোকাঠিতে তিনি তিন-চারটি বাড়ি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এক পর্যায়ে শরৎ বৈরাগী নিজে আলাদা কবির দল গঠন করলে নকুল দত্তকে নিয়ে রাঙা যামিনী নতুন দল গঠন করেন।[৬০] দলের প্রধান গায়িকা হন সরলা ওরফে শেখ সরলা। এছাড়া যামিনীর বোন কামিনী এবং কামিনীর মেয়ে সুরধুনী ওরফে বোঁচাও ঐ দলে দোহার হিসেবে কাজ করতেন। রাঙা যামিনীর দলে যোগদানের পূর্বে নকুল দত্ত এবং সরলা উভয়ে যথাক্রমে অধরমণির দলে ডাক-সরকার এবং ধরতা দোহার বা প্রধান দোহার হিসেবে কাজ করেছিলেন।

মনোমোহিনী বৈষ্ণবী প্রথমে দোহার এবং পরে কবিয়াল হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কবিগানের দলও করেছিলেন। তাঁর কন্যা হরিদাসীও দোহার হিসেবে নাম করেন। মনোমোহিনীর শিষ্য লক্ষ্মী বৈষ্ণবীও কবিগানের দল করেছিলেন।

লক্ষ্মী বৈষ্ণবীর দলের সরকার ছিলেন চন্দ্রকান্ত দাস বা দিগ্বিজয়ী চন্দ্র সরকার। তাঁর বাড়ি ছিলো ভোলা জেলার সৈয়দপুর গ্রামে। স্বল্পায়ু এই কবিয়ালের গুরু ছিলেন কুঞ্জ দত্ত ও শরৎ বৈরাগী। খুব অল্প বয়সে তিনি হরিচরণ আচার্য, তারিণী সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

দক্ষবালা দল করেন অনাথবন্ধু নাগকে নিয়ে।

কালা যামিনীর দলের সরকার ছিলেন উমেশচন্দ্র শীল। কালা যামিনীর মা গোলোকমণিও নামকরা গায়িকা ছিলেন। ঝালোকাঠি বন্দরে এঁদেরও একাধিক বাড়ি

---

[৬০] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ৩০৭।

ছিলো। এই দলে নারী শিল্পী ছিলেন সর্বাধিক সংখ্যক। দলে দুই জন ক্ষীরোদা ছিলেন একজন ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালি এবং অন্যজন সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা। কালা যামিনী নিজেও একজন দোহার ছিলেন। তিনি তাঁর সুকণ্ঠের জন্য সমকালে কোকিলকণ্ঠী অভিধা অর্জন করেছিলেন।

নকুলেশ্বর দত্ত নতুন দল গঠন করলে সরলা, শরৎবালা ওরফে শরতী প্রমুখ দোহার তাঁর দলে কাজ করেন।

যামিনীকান্ত নট্টের পালিতা কন্যা হিরণবালা ছিলেন 'নৃত্যগীত পটীয়সী ও সুগায়িকা'। দেশভাগের পর এই হিরণবালা ঝালোকাঠি থেকে কলকাতার বিডন স্ট্রিটের ১ নং চন্দ্রসুর লেনে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। নকুল দত্ত তখন হিরণবালাকে তাঁর 'বীণাপাণি কবিপার্টি'-র পরিচালিকা হিসেবে নিয়োগ দেন।

আলোচ্য কালপর্বে ঝালোকাঠিতে কবিয়াল হিসেবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুঞ্জলাল দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, ভারত শীল, বিধুভূষণ দেব, কুসুমকুমারী, মনোমোহিনী, অম্বিকা পাটনী, ষষ্ঠী সরকার, নকুলেশ্বর দত্ত, চন্দ্রকান্ত দাস, অনাথবন্ধু নাগ, রাখাল আচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঝালোকাঠিতে যেসব নারী শিল্পী কবিগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধরমণি, গোলোকমণি, গোলোকমণির মেয়ে কালা যামিনী, রাঙা যামিনী, রাঙা যামিনীর বোন কামিনী, কামিনীর মেয়ে বোঁচা বা সুরধুনী, সরলা, মনোমোহিনী, মনোমোহিনীর কন্যা হরিদাসী, কালা সুখদা, মানদা, রাধি, লাভি, অনন্তবালা, সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালি, লক্ষ্মী বৈষ্ণবী, রাধালক্ষ্মী, দক্ষবালা, মনোহরা, শরৎবালা বা শরতী, প্রিয়বালা বা ঢেড়া বোঁচা, গৌরী, হিরণবালা প্রমুখ ছিলেন জনপ্রিয়। এঁরা সকলেই দোহার ছিলেন, অনেকে দোহারির পাশাপাশি নৃত্যও পরিবেশন করতে পারতেন। এঁদের মধ্যে শরৎবালা বা শরতী ছিলেন নপুংসক। মেয়েদের নাম গ্রহণ করলেও সবসময়ে তিনি পুরুষের পোশাক পরে থাকতেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে এই শিল্পীদের প্রায় সকলে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। যাঁরা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল হতে থাকেন, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছিলো প্রথম জীবনে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা সরলার।[৬১] দেশভাগের সময়ে গৌরীর বয়স ছিলো কম, তিনি আবদুল গনি বয়াতির জারির দলের দোহার হয়ে কিছুকাল টিকে থাকার চেষ্টা করেন।[৬২]

---

[৬১] রাখাল আচার্য তাঁর সম্পর্কে ১৯৫০ সালের ১৬ই জুন একটি চিঠিতে লিখেছেন: "আর একজন মুসলমান স্ত্রীলোক, সরলা, ঐ সময় খুব বড় গায়িকা ছিল। এখনও জীবিত। তাহার প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ছিল। এখন কিছুই নাই। ভিক্ষাবৃত্তিই এখন তাঁহার অবলম্বন। মুহম্মদ মনসুউদ্দীন, "ভূমিকা," *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ছিয়াত্তর।

[৬২] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "ভূমিকা," *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, পৃ. আটাত্তর।

এই নারীশিল্পীদের বৈবাহিক জীবন ছিলো না। তবে তাঁরা কোনো না কোনো পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] এঁদের মধ্যে অন্তত দুজন, যথা প্রিয়বালা এবং হিরণবালা যথাক্রমে বিশ শতকের প্রথমার্ধের দুজন বিখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং নকুলেশ্বর দত্তের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রিয়বালা বা ঢেড়া বোঁচা প্রথম জীবনে হরিচরণ আচার্যের দলে দোহার হিসেবে কাজ করতেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে সেখানে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকবে। প্রিয়বালা বিশ শতকের চল্লিশের দশকে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ছায়াসঙ্গিনীতে পরিণত হন। এক পর্যায়ে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি এতোটা ঘনিষ্ঠ হন যে, মরশুম ছাড়াও তিনি রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকতেন। এমনকি সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দেশত্যাগ করেন, আবার কয়েক বছর ভারতে কাটিয়ে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ফিরে আসেন।

অন্যদিকে দেশভাগের পর নকুল দত্ত তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে বর্ধমানে বাসা নিলেও বছরের অধিকাংশ সময় থাকতেন কলকাতায় বিডন স্ট্রিটে হিরণবালার প্রশস্ত বাসায়। কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার কবিগান শেখার আশায় নকুল দত্তের সঙ্গে সেই বাসায় বেশ কয়েকদিন বাস করেছেন।[৬৪]

ঝালোকাঠি পর্বের কবিগানে গায়িকা সরলা একটি নাটকীয় ব্যক্তিত্বের নাম। দীনেশচন্দ্র সিংহের 'কবিয়াল কবিগান' বই পড়ে মনে হয়, প্রথম দিকে সরলা ছিলেন কবিয়াল নকুল দত্তের অনুপ্রেরণার উৎস। দেখা যায়, নকুল দত্তের কবিয়াল হয়ে ওঠার পেছনে সরলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ১৯১৬ সালে নকুল দত্ত যখন প্রথম দল গঠন করেন, তখনও তাঁর অবস্থান ছিলো সরলার বাড়িতে। ঝালোকাঠি অঞ্চলে তিনি 'শেখ সরলা' নামে পরিচিত ছিলেন। কবিয়াল রাখাল আচার্যের মতো অনেকে তাই মনে করতেন তিনি মুসলমান কন্যা। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সিংহ জানান, সরলা আসলে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া অজ্ঞাতকুলশীল একটি মেয়ে। একজন মুসলমান মিস্ত্রি তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে কোনো এক বৈষ্ণবীকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় আঠারো বছর বয়সী সরলার স্বর্ণালঙ্কারের পরিমাণ (প্রায় দুইশত ভরি), ঝালোকাঠি শহরে তাঁর বাড়িঘরের অবস্থা (দেড় বিঘা জমির উপর পুকুরসহ) দেখে মনে হয়, সে আসলে কোনো এক বিত্তবান বৈষ্ণবীর কন্যা। যদিও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তাঁর পিতা মুসলমান ছিলেন।

ঝালোকাঠি অঞ্চলের কবিগানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও কবিগানের গঠন-কাঠামোগত দিক দিয়ে তা গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবিগানের থেকে মোটেই আলাদা ছিলো না। প্রধান কারণ ঝালোকাঠির দলের সঙ্গে প্রায়ই গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবির

---

[৬৩] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, "ভূমিকা", *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, পৃ. চুয়াত্তর।

[৬৪] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান," *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ৪, জুন ২০০৯, পৃ. ১৫৪।

দলের লড়াই হতো। এমনকি ঢাকা-নোয়াখালীতে যখন ঝালোকাঠির দল কবিগান করতে যেতো, তখনও দেখা যেতো প্রায় ক্ষেত্রে বিপক্ষের কবিয়াল গোপালগঞ্জ অঞ্চলের।[৬৫]

ঝালোকাঠি অঞ্চলের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান কবিয়াল ছিলেন নকুলেশ্বর দত্ত বা নকুল দত্ত বা নকুল সরকার। তাঁর গুরু ছিলেন প্রথমে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুরের কবিয়াল কুঞ্জলাল দত্ত। নকুলেশ্বর দত্ত বিশেষ সৌভাগ্যবান এইজন্য যে তিনি দীনেশচন্দ্র সিংহের মতো একজন গবেষকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তার ফলে তাঁর কবিয়াল জীবন বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হতে পেরেছে। শেষোক্ত কারণে নকুল দত্ত সম্পর্কে যতো তথ্য সুলভ, সমকালের আর কোনো কবিয়াল সম্পর্কে এতো তথ্য পাওয়া যায় না। এতে নকুল দত্তের বাল্যজীবন, কবিয়াল ওঠার প্রক্রিয়া, কাদের সঙ্গে তিনি গান করেছেন, কিভাবে গান করতেন—প্রায় সবকিছুই জানা যায়।

নকুলেশ্বর দত্ত মাত্র একটি বছর হরিচরণ আচার্যের কোল-সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাতেই তিনি তাঁর প্রথম গুরু কুঞ্জলাল দত্তের পাশাপাশি হরিচরণ আচার্যকে গুরু হিসেবে স্বীকার করে নেন। এক পর্যায়ে কুঞ্জলাল দত্ত হয়ে ওঠেন 'বাবা', আর হরিচরণ আচার্য হয়ে ওঠেন 'আচার্য-কর্তা'। তবে হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে তাঁর কবিগানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তাতে মনে হয় না যে, হরিচরণ আচার্যের প্রতি নকুল দত্তের খুব বেশি শ্রদ্ধা ছিলো।

নকুল দত্তের কবিয়ালজীবন অন্য কবিয়ালদের থেকে খানিকটা আলাদা ছিলো। তিনি খুব অল্পদিন ডাক-সরকারি করেছিলেন, তাঁকে কখনো দোহারি করতে হয়নি, মাত্র বাইশ বছর বয়সে নিজে দল করেছেন, দলের দোহারদের মধ্যে তিনজন ছিলেন তরুণী। দল গঠনের পর অল্পকালের ব্যবধানে একটি পানসি নৌকা তৈরি করেন এবং নৌকায় যাতায়াত শুরু করেন।

নকুল দত্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। কবিগান করেছেন উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং বিশ শতকের প্রধান সব কবিয়ালের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘায়ু ছিলেন, জন্ম হয়েছিলো উনিশ শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ ভারতে বরিশালের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, আর ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয় স্বাধীন ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে কলকাতার উপকণ্ঠে।

নকুল দত্তের কবিপ্রতিভা ছিলো অসাধারণ। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিগানের বিভিন্ন অংশ, যথা—ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা, ধুয়া প্রভৃতি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনার পরিমাণও প্রচুর।

---

[৬৫] যেমন কবিয়াল নকুলেশ্বর দত্তের কবিগানের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় নোয়াখালীর দালালবাজার জমিদারবাড়িতে। কবিয়াল কুঞ্জদত্তের শিক্ষানবিসি হিসেবে তখন তিনি ঝালোকাঠির অধরমণির দলে কাজ করছিলেন। বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন যশোর তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য গোপালগঞ্জের মনোহর সরকার। *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৯–৩৩।

৪. মেঘনার পূর্বাঞ্চলের কবিগান

মেঘনার পূর্বাঞ্চল বলতে বৃহত্তর ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামকে বোঝায়। পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিগানের আসরে ঢাকা অঞ্চলের কবিয়ালরা যেমন কবিগান পরিবেশন করেছেন, গোপালগঞ্জ-ঝালোকাঠি অঞ্চলের কবিয়ালগণও সেখানে কবিগান পরিবেশন করতে গেছেন। অনেক সময়ে কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালগণের বিপক্ষেও ঐসব অঞ্চলের কবিয়ালগণ কবিগান পরিবেশন করেছেন। উনিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল এবং সেখানকার কবিয়ালদের সঙ্গে যেভাবে পদ্মার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের কবিয়ালদের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়, চট্টগ্রামের কবিয়ালগণ সেক্ষেত্রে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। মনে হয়, রমেশচন্দ্র শীলের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়ালগণ চট্টগ্রাম এবং মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন শহরের মধ্যে তাঁদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এভাবে মেঘনার পূর্বাঞ্চলের কবিগানকে অন্তত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এক. কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল, এবং দুই. চট্টগ্রাম অঞ্চল।

কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল

বিশ শতকের সূচনায় বৃহত্তর কুমিল্লা পরিচিত ছিলো ত্রিপুরা নামে, বর্তমানে যা চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে নোয়াখালী জেলা ভেঙে হয়েছে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী। মেঘনা নদীর অপর তীরে হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহের সঙ্গে এসব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবল ছিলো। কবিগান চর্চার ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। বিশেষভাবে কুমিল্লা এবং নোয়াখালীর জমিদারগণ যশোর-খুলনা-বরিশাল থেকে যেমন কবিয়াল নিয়ে যেতেন, একইভাবে ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকেও কবিয়াল নিয়ে গিয়ে কবির লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতেন। এই যোগাযোগের ফলে কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালগণও পদ্মার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালদের অনুরূপ রীতিতে অভ্যস্ত হন, তাঁদের গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে তাই লক্ষণীয় কোনো স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না।

এরপরেও আঞ্চলিক কিছু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি না হয়ে পারে না। তেমন একটি স্বাতন্ত্র্য পোশাক ও সাজসজ্জার। বিশ শতকের আশির দশকের সূচনায় ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে চাঁদপুর জেলার কবিয়াল কালোশশী চক্রবর্তী (জ. ১৯২৫) বাগেরহাটের কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকারের (১৯৩৩–২০০৯) বিপক্ষে কবিগান করেছিলেন। সেই আসরে স্বরূপেন্দু সরকারের পরনে ছিলো সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবি, অন্যদিকে কালোশশী চক্রবর্তীর দলের সঙ্গীগণ রঙিন পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁদের পায়ে নূপুর ছিলো।[৬৬]

---

[৬৬] স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান: অতীত ও বর্তমান," পৃ. ২৩৬।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে কুমিল্লা অঞ্চলে যাঁরা খ্যাতিমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জয়চন্দ্র মজুমদারের নাম। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চাঁদপুর জেলার পাইকপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর সমকালীন অন্য এক কবির নাম গৌর সরকার। কুমিল্লা অঞ্চলে এঁরাই প্রথম দিককার কবি। জয়চন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে পাইকপাড়ার জগবন্ধু দত্ত, হুসেনপুরের হরকুমার শীল, নোয়াখালীর বচের গ্রামের কালীকুমার মাস্টার (দে) প্রমুখের নাম জানা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে জয়চন্দ্র তাঁর অন্যতম দোহার দয়ারামকে নিয়ে কলকাতায় যান এবং সেখানে একাধিক পালা কবিগান পরিবেশন করেন। এভাবে কলকাতা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলের কবিগানের একটা সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

নোয়াখালী অঞ্চলে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার হরিচরণ আচার্যের শিষ্য রমেশচন্দ্র আচার্যের (১৯০৭–১৯৭৪) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টপ্পা, পাঁচালি, জবাব রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নকুল দত্ত, হরিচরণ নাথ, তারিণী সরকার, দুর্গাচরণ সরকার, রাইহরণ সরকার, কালোশশী চক্রবর্তী, গোবিন্দ ধুপী, শচীন্দ্রকুমার শীল, কাশীনাথ নট্ট, তারিণী নট্ট, বিপিন সরকার, অক্ষয় আচার্য, যতীন্দ্র গণ প্রমুখের বিপক্ষে তিনি গান করেছিলেন। তাঁর জীবনের দুটি দুঃখজনক ঘটনা হলো, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মারা যান এবং তিনি নিজে মারা যান ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে।

সন্দ্বীপ ও হাতিয়া পাশাপাশি দুটি দ্বীপ। বর্তমানে সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের মধ্যে এবং হাতিয়া নোয়াখালীর মধ্যে। এক সময়ে উভয় দ্বীয় নোয়াখালীর মধ্যে ছিলো। এর মধ্যে সন্দ্বীপ থানার চরবদু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নন্দকুমার দাস। নোয়াখালী জেলার প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছেন। সন্দ্বীপ ও হাতিয়া দ্বীপে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিলো। একটি যাত্রার দলও তিনি গঠন করেছিলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

নোয়াখালীর প্রবীণ কবিয়ালদের মধ্যে যাঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগান করেছেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয় আচার্য, অন্নদাচরণ নট্ট, অম্বিকা লোধ, কালীকুমার দে, কাশীনাথ নট্ট, গুরুচরণ রক্ষিত, গোপাল নট্ট, চন্দ্রকান্ত আচার্য, জ্যোতিন্দ্র গণ, তারক পণ্ডিত, তারিণীচরণ নট্ট, ধর্মনারায়ণ রক্ষিত, নগেন্দ্রনাথ নট্ট, নরহরি সরকার, বঙ্গচন্দ্র নট্ট, বসন্ত লোধ, বিপিন সরকার, ভগবতী ভুঁইয়া, মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট, রমেশচন্দ্র আচার্য, সুবল নট্ট, সুরথ সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ভগবতী ভুঁইয়া শুধু বাঁধনদার ছিলেন, তবে হরকুমার শীল প্রমুখ কবিয়াল তাঁর রচিত গান দিয়ে হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে কবির লড়াই করেছেন বলে জানা যায়।

নোয়াখালী জেলায় কবিয়ালদের এই ব্যাপক সংখ্যা প্রমাণ করে, বিশ শতকের প্রথমার্ধের নোয়াখালীতে কবিগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তবে বিভিন্ন উদাহরণ থেকে মনে হয়, এই গানের বিষয় ও আঙ্গিক ঢাকা অঞ্চলের গানের বিষয় ও আঙ্গিকের অনুরূপ ছিলো।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

বিশ শতকের একেবারে সূচনায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল থেকে আলাদা ছিলো বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষ দিকে এখানে কবিয়াল হিসেবে মোহনবাঁশী সরকার ও চিন্তাহরণ সরকার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই দুজনের কবিগান শুনে রমেশ শীল কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

রমেশ শীলের জন্ম ১৮৭৭ সালের ১১ই মে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে।[৬৭] তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেরা কবিয়াল। কবিগানকে তিনি ভিন্ন মাত্রা দান করেছিলেন। বিশ শতকের শেষার্ধে কবিগান বলতে যে পাঁচালি-নির্ভর এবং কবিয়াল-কেন্দ্রিক এক ধরনের বিতর্কমূলক গান বোঝায়, শতাব্দীর প্রথমার্ধে রমেশ শীলই তার অন্যতম সূচনাকারী।

প্রথম জীবনে রমেশ শীল সনাতন পদ্ধতির কবিগান গাইতেন বলে জানা যায়। অভিন্ন কারণে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মালশি ও সখীসংবাদ রচনা করতে হতো। বৌদ্ধ অঞ্চলের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে একবার তাঁকে গৌতম বুদ্ধের মালশি লিখতে হয়েছিলো বলেও জানা যায়। কিন্তু উনিশো তিরিশের দশকের শেষ দিকে চট্টগ্রামের দুই কমিউনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও বঙ্কিম সেনের সংস্পর্শে এসে রমেশ শীল নতুন মানুষ হয়ে যান।[৬৮] কমিউনিস্টরা রমেশ শীলকে সাম্যবাদ এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কথা বোঝাতে সক্ষম হন। রমেশ শীলও তাতে আন্তরিক ঐক্য পোষণ করেন। এর পর থেকে তিনি যেসব গান রচনা করেন, তার সবগুলোতেই সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে।

কবিগানের মধ্য দিয়ে এই সাম্যবাদ প্রচারের পুরস্কারস্বরূপ ১৯৪৪ সালে রমেশ শীল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। রমেশ শীলের কবিগানের বিষয়বস্তুতে ও প্রকরণে যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে, তার পেছনে তাঁর এই আদর্শিক পরিবর্তন বিশেষ সক্রিয় ছিলো, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

যেমন সনাতনী কবিগানে ডাকগান ও মালশি গান ছিলো আবশ্যিক। সেখানে তিনি দেশবন্দনার গান নিয়ে আসেন। সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, লহর কবি ইত্যাদিকে বর্জন করেন। বন্দনা গানের পরপরই চলে আসেন পাঁচালিতে। সাধারণত কবিগানের পাঁচালি অংশ টপ্পা গান দিয়ে সূচিত হয়, রমেশ শীল সে টপ্পাকেও বর্জন করেন। তাঁর পাঁচালিতে গতানুগতিক পৌরাণিক চরিত্র স্থান পায় না। এমনকি ব্যক্তিচরিত্র থেকেও তাঁর পাঁচালি সরে যেতে থাকে। সেখানে স্থান পায় শ্রেণি অথবা শ্রেণিচরিত্র।

---

[৬৭] যতীন সরকার লিখেছেন এপ্রিল মাস। যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ১০৪। এটি ঠিক নয়। কারণ বঙ্গাব্দের হিসেবে তাঁর জন্ম ছিলো ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার, তা কখনোই এপ্রিল মাস হতে পারে না। খ্রিস্টাব্দের হিসেবে রমেশচন্দ্র শীলের জন্মতারিখ হবে ১৮৭৭ সালের ১১ই মে।

[৬৮] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২৭।

যেমন—চাষি-মজুতদার, শ্রমিক-মালিক, কৃষক-জোতদার, ধনী-গরিব, স্বৈরাচার-সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি।

কবিগানের অংশসমূহের গতানুগতিক পারিভাষিক নামেরও তিনি বদল ঘটান। যেমন ডাক-মালশিকে তিনি বলেন স্বদেশ বন্দনা বা সভা বন্দনা। টপ্পাকে বলেন জেরা। পাঁচালি-ধুয়া ইত্যাদিকে বলেন রং-বোল-পাঁচালি এবং জোটের পাল্লাকে বলেন জোটক।[৬৯]

সঙ্গত কারণেই রমেশ শীলের কবিগানে দোহারদের ভূমিকাও হ্রাস পায়। পাঁচালির মধ্যে ধুয়া হিসেবে যেসব গান পরিবেশন করা হতো তিনি তার বদলে গণসঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেন এবং সেই গানের সুরে সুরে ছড়া কাটেন। অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের কবিগানে ধুয়া গানের যে ভূমিকা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীল গণসঙ্গীতকে দিয়ে সেই ভূমিকা পালন করান। গণসঙ্গীতের সুরে তিনি ছড়া কাটেন, বিতর্ক করেন, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার করেন। পরিশিষ্টের ধুয়া গান অংশে তাঁর একাধিক গণসঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।[৭০]

কবিগানের প্রকরণ ও বিষয়বস্তুতে এমন পরিবর্তন ঘটানোর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান পরিবেশন করা সম্ভব হয়। পূর্বে যেখানে একপালা কবিগান পরিবেশন করতে কমপক্ষে বারো ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতো, সেখানে রমেশ শীল রীতির কবিগান পরিবেশন করতে দুই ঘণ্টাই যথেষ্ট ছিলো। তার ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সভায় অথবা বামপন্থি জনসভার পূর্বে এই ধরনের কবিগানের আয়োজন করে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সঙ্গত কারণে সমকালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রমেশ শীলকে পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর কবিগানের ব্যবস্থা করেন। রমেশ শীল এভাবে ঢাকা-কলকাতা সহ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বামপন্থি ও প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। সঙ্গী হিসেবে তিনি যেমন তাঁর অন্যতম শিষ্য ফণী বড়ুয়াকে পান, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে পান শেখ গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীকে। এঁরা সকলেই বামপন্থি আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং কবিগানের মাধ্যমে তা প্রচারের বিষয়টিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

রমেশ শীল তাঁর পূর্বসূরি কবিয়ালদের সঙ্গে যেমন কবিগান পরিবেশন করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর সমকালীন ও শিষ্য ও শিষ্যতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও কবিগান পরিবেশন করেছেন। এঁদের নামের সারি অত্যন্ত দীর্ঘ। এঁদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—করিম বখ্‌শ, সুবল ভট্ট, অন্নদা নট্ট, কিশোরীমোহন, মোহনবাঁশী সরকার, চিন্তাহরণ সরকার, ফণী বড়ুয়া, শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, রাইগোপাল দাস, হেদায়েতুল ইসলাম, মনীন্দ্র দাস,

---

[৬৯] তদেব, পৃ. ৫৫।

[৭০] দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ৭।

নগেন্দ্রচন্দ্র দে, সারদা বড়ুয়া, তরণীসেন দেয়ারী, প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত, বরদা সরকার, চন্দ্রমণি সরকার, অমিয় সরকার, বিপিন ঠাকুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক কবি বার্মার (বর্তমান নাম মিয়ানমার) রেঙ্গুন (বর্তমান নাম ইয়াঙ্গুন) শহরে কবিগান করতেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে রেঙ্গুন শহরে বহু বাঙালির বসবাস ছিলো। সেখানে বেশ কয়েকটি বাঙালি পাড়াও গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু লোক জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুনে চলে যেতেন এবং একনাগাড়ে দীর্ঘদিন সেখানে বাস করতেন। এই প্রবাসী বাঙালিদের বিনোদনমাধ্যম হিসেবে কবিগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তখন এখানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন, তাঁদের মধ্যে এজাহার মিয়া, নিবারণ শীল, মতিলাল বড়ুয়া, শেখ মোহাম্মদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের কবিগান পরিবেশনের ধরন ঠিক কেমন ছিলো, তা জানা যায় না। তবে সেখানে একাধিক মুসলমান কবিয়ালের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায়, হয়তো পাঁচালি অংশই তাঁদের কবিগানে প্রধান হয়ে উঠেছিলো। এখানকার কবিগান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ লিখেছেন: "বাঙালি কলোনিতে তখন পাঁচ-ছ হাজার বাঙালির বাস। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ সব ধর্মের মানুষই ছিল। সন্ধ্যার পর প্রায় সবারই অবসর। নানা বিনোদনের মধ্যে কবিগানও হতো মাঝে মাঝে। রেঙ্গুনের বাঙালি কবিয়ালদের মধ্যে খ্যাতি ছিল করুলডাঙার আমুচিয়ার মতিলাল বড়ুয়ার। তাঁর সঙ্গে পাল্টা দিতেন শেখ মোহাম্মদ, এজাহার মিঞা অথবা নিবারণ শীল। স্থানীয় বাঙালিরা চাঁদা তুলে রেঙ্গুনের কান্দু বস্তিতে কবিগানের আসর বসাতেন। বছরে বেশ কবার গানের ব্যবস্থা হত।"[৭১]

৫. উপসংহার

পূর্বের আলোচনায় যেমনটা দেখা গেলো, পূর্ববঙ্গ পর্বে কবিগানের সূচনা হয়েছিলো মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কলকাতা থেকে তখন কবিগান একযোগে পল্লিবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গের পল্লিতেও তা ছড়ায়। কিন্তু কবিগানের নতুন পর্ব শুরু হয় শুধু পূর্ববঙ্গেই। পূর্ববঙ্গে কবিগানের ব্যাপক চর্চা হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের বৈচিত্র্য নিয়ে কবিগান টিকে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একশো বছর সে কবিগান কী অবস্থায় ছিলো, পূর্ববর্তী আলোচনায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

দেখা গেছে, যশোর থেকে একটি ধারা খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তারকচন্দ্র সরকার। তবে তারকচন্দ্রের সমান্তরালে আরো একাধিক ধারা এই বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছিলো। যেমন বাগেরহাটের মথুর দেব সরকারের ধারা অথবা নড়াইলের পাঁচু দত্ত সরকারের ধারা।

---

[৭১] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, "ভূমিকা," *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া: জীবন ও রচনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৪।

এইসব ধারার সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব কম ছিলো। এর মধ্যে পাঁচু দত্তের গুরু গোবিন্দ তাঁতি ছিলেন চব্বিশ পরগনার লোক এবং তাঁর গুরু ছিলেন কলকাতার অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তারকচন্দ্রের গুরু বা গুরুর গুরু খ্যাতিমান না থাকায় তাঁর কলকাতার সংযোগটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে তিনিও যে পাঁচু দত্তদের মতো কলকাতার কবিয়ালের শিষ্যপরম্পরার অংশ, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আলোচ্য কালপর্বে ঢাকার ভাওয়াল-বিক্রমপুরে কবিগানের আলাদা একটি ধারা গড়ে উঠতে দেখা যায়। বিত্তবান ভূস্বামী তথা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধারার বিকাশ। এখানে কবিগান জনপ্রিয় হয় সরাসরি কলকাতা থেকে কবিয়ালদের নিয়ে এসে কবির লড়াই করানোর মাধ্যমে। এই লড়াই দেখে স্থানীয় লোককবিরাও এই শিল্পমাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৃহত্তর ঢাকায় কবিগানের একটি শক্তিশালী ধারার জন্ম হয়। সেই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন হরিচরণ আচার্য, এক পর্যায়ে যিনি পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কবিগানের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ধারাও অনেকটা স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের রাজা-জমিদারগণও উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতা থেকে কবিয়াল এনে কবিগানের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয়। সেইসব গান শুনে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেখানে রামগতি শীল, রামু মালীদের মতো প্রতিভাবান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালদের জন্মের পেছনেও ঢাকা-ময়মনসিংহের প্রক্রিয়া কার্যকর ছিলো বলে মনে করা যেতে পারে। উনিশ-বিশ শতকে এই অঞ্চলে কবিয়ালের সংখ্যা দেখে মনে হয়, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও ব্যাপকভাবে কবিগানের চর্চা হতো। এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিকে এই অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের কবিয়ালদের বায়না হতে দেখে মনে হয়, কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল কবিগান বিকাশের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ ছিলো।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের সূচনাও কলকাতা প্রভাবিত হওয়াটা স্বাভাবিক, যদিও সেই অতীত ঘটনার কোনো সাক্ষ্য কোথাও পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল থেকে কবিয়ালগণ চট্টগ্রামে গিয়ে কবিগান করছেন। পরে অবশ্য চট্টগ্রামেও কবিয়ালের জন্ম হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দিকে কবিয়াল রমেশ শীলের আবির্ভাব কবিগানের চট্টগ্রামের ধারাকে নতুন একটি মাত্রা দান করে। বিশ শতকের সূচনা নাগাদ কবিগানকে তিনি এমনভাবে পরিবেশন করতে শুরু করেন, যা আঠারো-উনিশ শতকের কবিগান থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মহা সমারোহের সঙ্গে কবিগান অনুষ্ঠিত হলেও একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কবিগান অনুষ্ঠানের কোনো খবর পাওয়া যায় না। এ সময়ে উত্তরবঙ্গেও কবিগান একরকম অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতের স্বাধীনতার সূত্রে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় কবিগানের শ্রোতাদের একটি বড়ো অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমায়। এর ফলে কবিগানেরও খানিকটা অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়। আবার পূর্ববঙ্গে যে কবিগান

থেকে যায়, তার শরীরেও নানামুখী পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। কবিগানের এই পর্বকে অনুবর্তন পর্ব নামে চিহ্নিত করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই অনুবর্তন পর্বের কবিগানের পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা হবে, যেখানে বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কবিগান সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কবিগানের অনুবর্তন পর্ব

১. সূচনা

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ বাঙালি সংস্কৃতির উপরে গভীর প্রভাব ফেলে। কবিগানের উপরেও সে প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। কলকাতায় কবিগানের জন্ম হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগানের চর্চা অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে এই কালপর্বে কলকাতায় কবিগানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তরজা নামে কবিগানের একটি সংক্ষিপ্ততম সংস্করণ কোনোমতে টিকে থাকে মাত্র। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় যে কবিগানের জন্ম হয়, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তা চর্চিত ও বিকশিত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের এইসব অঞ্চলে ধর্মপরিচয়ের দিক দিয়ে প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই এই পেশার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছিলেন। বিশেষভাবে বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে এই গান দুর্গাপূজার সঙ্গে এবং যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে কালীপূজার সঙ্গে যেভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে যায়, তাতে এর ধর্মসাপেক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই কালপর্বে দু-একজন মুসলমান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটলেও, অথবা রমেশ শীলের মতো দু-একজন কবিয়াল ধর্মনিরপেক্ষ কবিগানের জন্ম দিলেও অধিকাংশ কবিয়াল কবিগানকে হিন্দু ধর্মসংশ্লিষ্ট হিসেবে দেখতেন এবং সেই অনুযায়ী চর্চা করতেন। তাছাড়া তখন কবিগানের কোনো মুসলমান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, এমনকি কবিগানের দলে কোনো মুসলমান দোহার বা যন্ত্রীও ছিলেন না। সাতচল্লিশের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক আবহাওয়ায় কবিগানের বিকাশ তাই স্বাভাবিক কারণে বাধার মুখে পড়ে।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় পূর্ববঙ্গ তথা নবগঠিত পূর্বপাকিস্তান থেকে বিত্তবান হিন্দু শ্রেণি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় অভিবাসী হন। কিন্তু নিম্নবিত্তের সাধারণ হিন্দুদের অনেকে দেশ ত্যাগ করার ঝুঁকি নিতে পারেন না, ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হয়। অর্থবিত্তে দুর্বল হলেও এই শ্রেণির মধ্য থেকে কবিগানের নতুন পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির জন্ম হতে থাকে। অন্যদিকে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক বিত্তবান যে শ্রেণিটি পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রধানত (ভারতের) পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হন, সেখানেও তাঁরা কবিগান শোনার আগ্রহ জিইয়ে রাখেন। ফলে সাতচল্লিশোত্তর পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই নতুন পটভূমিতে অনেক কবিয়াল পূর্বপাকিস্তানে থেকে গিয়ে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন, আবার অনেক কবিয়াল ভারতে অভিবাসী হন। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এবং উভয় দেশে তাঁদের

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কবিয়ালকে তখন কিছুদিন পূর্বপাকিস্তানে এবং কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, তাঁরা পূর্বপাকিস্তানে থাকবেন, নাকি পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন। এমন দোলাচলের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতো কবিয়াল শেষ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে থেকে যান, আবার নকুলেশ্বর দত্তের মতো কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হন।

পূর্ববঙ্গের পূর্বপাকিস্তান পরিচয় অবশ্য খুব বেশি দিন টেকেনি। উনিশশো একাত্তর সালে মাত্র তেইশ বছরের মাথায় তা বাংলাদেশ পরিচয় ধারণ করে। বর্তমান আলোচনায় তাই পূর্বপাকিস্তানসহ বর্তমান বাংলাদেশকে এক কথায় বাংলাদেশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। কবিগানের অনুবর্তন পর্ব বলতে তাই বোঝাবে সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগান। এই কালপর্বে উভয় অঞ্চলের কবিগানের বিষয় ও প্রকরণ কী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, কারা এ সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল কবিয়াল, পরিবেশন কৌশলে বিশেষ কোনো লক্ষণ তৈরি হয় কিনা, এসবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই অধ্যায়ের মূল অন্বিষ্ট।

২. অনুবর্তন পর্বে কবিগানের গঠন

বিশ শতকের মাঝামাঝি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটায় এবং সাতচল্লিশের দেশভাগের কারণে মানুষের জঙ্গমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক অঞ্চলের সংস্কৃতি খুব সহজে অন্য অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময়ে একটি উপসর্গ বিশেষভাবে দেখা দেয়, তা হলো মানুষের কর্মব্যস্ততা। দীর্ঘ বারো ঘণ্টা বসে কোনো গান উপভোগ করার মতো সময় তখন অধিকাংশ লোকের থাকে না। ফলে বাংলাভাষী সব অঞ্চলে কবিগানের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে শুরু করে। এই বাস্তবতায় যশোর-খুলনা অঞ্চলের রাজেন্দ্রনাথ সরকার-বিজয়কৃষ্ণ সরকাররা যেমন অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান করার চেষ্টা করতে থাকেন, ঠিক একই সময়ে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারের স্বার্থে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীল-ফণী বড়ুয়াকেও অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান পরিবেশনের চেষ্টা করতে দেখা যায়। ১৯৩২ সালের দিকে প্রথমোক্তদের অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান করার তাগাদা দিয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন। তখন তিনি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে টিকিটের বিনিময়ে কবিগানের আয়োজন করেছিলেন। কলকাতার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান শোনাতে এই সময়স্বল্পতার বিষয়টি ভাবা হয়েছিলো। অভিন্ন লক্ষ্যে তিনি রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও বিজয় সরকারকে বলেছিলেন ডাক, মালশি, সখীসংবাদ বাদ দিয়ে শুধু টপ্পা-পাঁচালি-ধুয়া নির্ভর কবিগান পরিবেশন করতে।[১] সমকালের পত্রিকায় এই হ্রস্ব কবিগানের সমালোচনা হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু এর ফলে সবার

---

[১] প্রচলিত কবিগানকে কিভাবে সংক্ষেপে পরিবেশন করা যায়, সে ব্যাপারে জসীমউদ্‌দীন কবিয়ালদ্বয়কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য, জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১২৪।

অলক্ষ্যে কবিগানের একটি নতুন গঠন তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। নিকটবর্তী সময়ে অভিন্ন গঠনের কবিগানের জন্ম হয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চট্টগ্রামের রমেশ শীলকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষকে বামপন্থি আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করতে সমকালীন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কবিগানকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেন। অভিন্ন লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের দিকে বঙ্কিম সেন ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার রমেশ শীলের সঙ্গে দেখা করেন এবং বামপন্থি গান গাইতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন।[২] এই ধরনের গান সাধারণত বিশেষ কোনো সভা-সমাবেশের সূচনায় অথবা শেষে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হতো। তাই অন্তত দুটি কারণে কবিগানকে সংক্ষিপ্ত না হয়ে উপায় ছিলো না। প্রথমত ধর্মীয় অনুষঙ্গের ডাক-মালশি-সখীসংবাদ বামপন্থি আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না; এবং দ্বিতীয়ত এইসব অনুষ্ঠানে কবিগানের জন্য বেশি সময় বরাদ্দ করাও কঠিন হয়। এর ফলে রমেশ শীলকে ডাক-মালশি-সখীসংবাদ বর্জিত কবিগান পরিবেশন করতে হয়। এ কাজে তিনি ফণী বড়ুয়ার মতো যোগ্য প্রতিপক্ষ তথা সহযোগীও পেয়েছিলেন। এভাবে উনিশশো ত্রিশের দশক থেকে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত কবিগান কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত চালু হয়ে যায়। অনুবর্তন পর্বের কবিগানের গঠনকাঠামো এই সংক্ষিপ্ত কবিগানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

পাশাপাশি স্মরণীয়, সাতচল্লিশের দেশভাগের পরেও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোতে ধর্মীয় কারণে ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি গান অব্যাহত থাকে। বয়স্ক শ্রোতাদের চাহিদাও হয়তো এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো। কিন্তু কবিগানের যেসব আসর শহরের ব্যস্ত অঞ্চলে হয়, সেসব ক্ষেত্রে কবিগান পাঁচালি কেন্দ্রিক হয়ে যায়। অনেক জায়গায় ডাক গানটা থাকে, জোটের পাল্লাও থাকে, মাঝখানের অনেকগুলো অংশ, যেমন মালশি, সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর, লহর কবি, মালফুকার প্রভৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। সূচনা-সংগীত হিসেবে গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ডাক-গানটা থাকলেও অধিকাংশ জায়গায় কালীবন্দনা ভিত্তিক ডাক গানের বদলে অন্যান্য আরাধ্যের বন্দনা যেমন স্থান পায়, কোথাও কোথাও দেশমাতৃকার বন্দনা জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গানও ডাক গানের জায়গা দখল করে।

বিশের দশকের পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের, আশির এমনকি নব্বইয়ের দশকের কবিগান এভাবে হয়ে ওঠে কবিগানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই সংক্ষেপণ কখনো কখনো এতো বেশি হয়ে ওঠে যে, তখন বিশ শতকের প্রথমার্ধের কবিগানের তুলনায় বিশ শতকের শেষার্ধের কবিগানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গান হিসেবে মনে হয়। এই সংক্ষেপণ অবশ্য গ্রাম ও শহর ভেদে এমনকি আয়োজকদের বাসনা অনুযায়ী আরো বহু রকম বৈচিত্র্য ধারণ করতে বাধ্য হয়।

প্রধান পার্থক্য সৃষ্টি হয় গ্রাম ও শহরের মধ্যে। অনেক গ্রামে বিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রোতাদের উপস্থিতি থাকায় কবিয়ালদের সেই অনুযায়ী গান করতে হয়।

---

[২] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫৫।

ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, ঝালোকাঠির কীর্তিপাশা, বাগেরহাটের মানসা কালীবাড়ি, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি, অথবা বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমগুলোতে কবিগান করার সময়ে কবিয়ালগণ সচেতন থাকেন যে, এসব জায়গায় কবিগানের সংক্ষিপ্ত রূপ অচল। আবার ঢাকা ও কলকাতার রেডিও-টেলিভিশনে, সরকারি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে অথবা সম্মেলনসহ শহরের বিভিন্ন উপলক্ষে যখন কবিগান হয়, তখন সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করার পর কবিয়ালগণ ধরেই নেন যে, আয়োজকগণ সংক্ষিপ্ত কবিগান চাইছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা পাঁচালি-নির্ভর কবিগান পরিবেশন করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাভাষী তাবৎ অঞ্চলের কবিগানের এই বৈশিষ্ট্য একুশ শতকের সূচনায় একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

১৯৮৫ সালে যতীন সরকার 'বাংলাদেশের কবিগান' রচনার সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিশেষভাবে নেত্রকোণার কবিয়াল মদন আচার্য এবং তাঁর প্রতিপক্ষের গানের একটি নমুনা তুলে ধরেছেন।[৩] এই নমুনায় দেখা যায়, দুই পক্ষের কবিয়াল প্রথমে আসরে আসেন না; আসেন দলের দোহার এবং যন্ত্রসঙ্গতকারীরা। উভয় দলের দোহারগণ পালাক্রমে ডাক গান এবং মালশি গান পরিবেশন করেন।[৪] এরপর এক পক্ষের কবিয়াল আসরে আসেন। আসরে এসেই তিনি দোহারদের মাধ্যমে একটি টপ্পা গান পরিবেশন করেন, সেই টপ্পাগানে তিনি নিজেকে হনুমান এবং বিপরীত পক্ষের কবিয়ালকে রাম অভিহিত করে তাঁর নিকট প্রশ্ন করেন। টপ্পা গানটি পরিবেশনের পর দোহাররা বসে পড়লে কবিয়াল প্রথমে পয়ার ছন্দে প্রশ্নটিকে স্পষ্ট করতে থাকেন। পয়ারের মাঝখানে 'দিশা' নামে আলাদা একটি গানের কলি কবিয়াল পরিবেশন করেন। সেটি ছিলো এ-রকম: "ভবে মানব জনম আর হবে না, মায়ের নাম কররে উপাসনা।" কলিটি পরিবেশনের পরে সেই সুর অনুসরণে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত অন্তরায় টপ্পার প্রশ্নকে আরো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়। এরপর কবিয়াল বলতে শুরু করেন ত্রিপদী ছন্দের ছড়া। কিছুক্ষণ ত্রিপদীতে ছড়া বলার পরে কবিয়াল পুনরায় পয়ার ছন্দে ফিরে আসেন। শেষ বারে এই পয়ার-ছড়া বলার সময়ে ঢুলিকে খেমটা তাল বাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রথম কবিয়াল তাঁর আসরের শেষ পর্বের ছড়াটি খেমটা তালে পরিবেশন করেন। এভাবে প্রথম কবিয়ালের আসর শেষ হওয়ার পর প্রতিপক্ষের কবিয়াল তাঁর টপ্পা গান নিয়ে আসরে আসেন। নিয়ম অনুযায়ী টপ্পা গান দোহার দিয়ে পরিবেশন করতে হয়। প্রতিপক্ষের কবিয়ালকে দেখা যায়, টপ্পাগান

---

[৩] প্রতিপক্ষের কবিয়ালের নাম যতীন সরকার উল্লেখ করেননি। সন্দেহ হয়, মদন আচার্যই উভয় পক্ষের গান রচনা করে যতীন সরকারকে শুনিয়েছিলেন। যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬–৪৯।

[৪] যতীন সরকার তাঁর এই বর্ণনায় সখীসংবাদের উল্লেখ করলেও তার কোনো বর্ণনা তিনি দেননি। তাতে সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়, যাতে মনে হয় নমুনাটি মদন আচার্য কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে কথিত।

পরিবেশনের পর তিনি ত্রিপদী ছন্দে ছড়া কাটতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও একটি 'দিশা' ধরেন, প্রথম কবিয়ালের মতো তিনিও সেই সুরের অন্তরায় নতুন নতুন পদ যোগ করতে থাকেন এবং সেইসব পদে প্রথম কবিয়ালের প্রশ্নের জবাব দেন। কয়েকটি অন্তরা গাওয়ার পর প্রতিপক্ষের কবিয়াল পয়ার ছন্দে ছড়া বলতে থাকেন এবং ঐ আসরের সমাপ্তি ঘটান। দ্বিতীয় আসরে যখন প্রথম কবিয়াল, এবং আরো পরে প্রতিপক্ষের কবিয়াল আসেন তখন আর টপ্পা গানের দরকার হয় না। শুধু 'দিশা' দিয়ে গান শুরু করা যায়। টপ্পা-পাঁচালি শেষ হলে শুরু হয় জোটের পাল্লা, যা এই অঞ্চলে 'জুড়িগান' নামে পরিচিত। এই অংশে উভয়ে কবিয়াল আসরে সামনা-সামনি দাঁড়ান, একজন কৃষ্ণ হয়ে প্রশ্ন করলে অন্যজন রাধা হয়ে তার জবাব দেন। এভাবে অনেকক্ষণ গানের সুরে ছড়া কাটতে কাটতে কবিগানের সমাপ্তি হয়।[৫]

দ্বিতীয় উদাহরণ ১৯৯৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত স্বরূপেন্দু সরকার ও বিপক্ষের কবিয়াল ছোটো রবীন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যকার কবিগান। এদের একজনের বাড়ি ছিলো বাগেরহাটের চিতলমারী এবং অন্যজনের বাড়ি ছিলো বাগেরহাটের ফকিরহাটে। এই কবিগানে দুই দলের দোহার ও যন্ত্রসঙ্গতকারী ছিলো অভিন্ন—একজন ঢুলি (শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস), একজন হারমোনিয়মবাদক (ব্রজেন্দ্রনাথ), একজন কাঁসিবাদক (রঞ্জন), একজন দোতারাবাদক (মনীন্দ্রনাথ) এবং দুইজন দোহার (সতীশ মণ্ডল ও খগেন বিশ্বাস)। সন্ধ্যা সাতটায় গান শুরু হয়। প্রথমে কয়েক মিনিট ঢোল, হারমোনিয়ম এবং কাঁসির ঐকতান বাদন হয়। এরপর কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই একটি ধুয়া গান পরিবেশন করেন, ধুয়া গানটির স্থায়ী ছিলোঃ "আমার বাংলাদেশের চাষি আমার বাংলাদেশের চাষি/ যাদের ত্যাগে জাগে দেশ সকলের মুখে ফোটে হাসি।" এরপর তিনি ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় নিজেকে স্বৈরাচারী সরকারের প্রধান এবং বিপক্ষের সরকারকে গণতন্ত্রী সরকারের প্রধান হিসেবে উপস্থাপন করেন। অতঃপর প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী তিনি স্বৈরাচারী সরকারের কতো রকম সুবিধা উদাহরণসহ তুলে ধরেন এবং ফাঁকে ফাঁকে গণতন্ত্রী সরকারের নিকট প্রশ্ন করেন। মাঝামাঝি পর্যায়ে আর একটি ধুয়া গান পরিবেশন করে সেই ধুয়ার অন্তরার সুরে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে দেন। সেই প্রশ্নগুলো শেষ হওয়ামাত্র তিনি পয়ার ছন্দে ছড়া কাটতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে ছড়ার লয় দ্রুত হয় এবং তাঁর আসর শেষ হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ সরকার এসে স্বৈরাচারী সরকারের দোষের দিকগুলো তুলে ধরেন, আর গণতন্ত্রের পক্ষে যতো রকম যুক্তি আছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। স্বরূপেন্দু সরকার যেভাবে দুটি ধুয়া এবং কখনো ত্রিপদী কখনো পয়ার দিয়ে ছড়া কেটেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সরকারও সেভাবে তাঁর আসর শেষ করেন। জোটের পাল্লা ছাড়াই সেদিন কবিগান শেষ হয়।[৬]

---

[৫] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ৩৫–৪৯।

[৬] বর্তমান গবেষক এ সময়ে বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা ছিলেন। পুরো গানটি বাংলা একাডেমীতে রেকর্ড করা হয়। গবেষকও অডিও টেপে গানটি রেকর্ড করেন। সেদিন জোটের

বাংলা একাডেমীর মঞ্চে এমন সংক্ষিপ্ত কবিগান পরিবেশন করলেও কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার বিশ্বাস করতেন, ডাক-মালশি-টপ্পা ছাড়া কবিগান হয় না। তাই একই বছর এপ্রিল মাসে যখন কবিগানের একটি আদর্শ নমুনা তৈরি করতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি এক পক্ষের দোহারদের দিয়ে প্রথম আসরে পরিবেশনের জন্য একটি ডাক ও একটি মালশি গান রচনা করে দেন। সেই আসর শেষ হওয়া মাত্র বিপক্ষের দোহারদের দিয়ে তিনি অনুরূপ ডাক ও মালশি গান পরিবেশনের উল্লেখ করেন। এরপর দোহারসহ একপক্ষের কবিয়ালকে আসরে তোলা হয় এবং একটি সখীসংবাদ গান পরিবেশন করা হয়। বিপক্ষের কবিয়াল এসে সখীসংবাদের জবাব গান পরিবেশনের পর চাপান হিসেবে একটি 'কবি' পরিবেশন করেন। প্রথম পক্ষের কবিয়ালকে তাঁর জবাব গাইতে হয় এবং জবাব গাওয়ার পরপরই প্রথম পক্ষের কবিয়াল নিজেকে বিবেকানন্দ এবং বিপক্ষের কবিয়ালকে রামকৃষ্ণ বানিয়ে একটি টপ্পা পরিবেশন করেন। নিয়ম অনুযায়ী টপ্পা অংশটি পরিবেশনের সময়ে দোহারের দরকার হয়। টপ্পা শেষ হতে না হতেই প্রথম কবিয়াল একটি ধুয়া গান পরিবেশন করেন, ধুয়া গানের পরে ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় কবিয়াল গুরুবন্দনা-আসরবন্দনা প্রভৃতি করেন, পরে একই ছন্দে টপ্পার প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা করা শেষ হলে আর একটি ধুয়া গান পরিবেশন করেন, ধুয়া গান শেষ হতেই পয়ার ছন্দে ছড়া কাটতে থাকেন এবং এভাবে প্রথম কবিয়ালের আসর শেষ হয়। এরপর বিপক্ষ কবিয়ালের আসর। বিপক্ষের কবিয়াল প্রথম কবিয়ালের মতোই প্রথমে টপ্পা, যা প্রথম কবিয়ালের টপ্পার জবাব, তারপরে ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় বন্দনা ও জবাব, পরে একটি ধুয়া এবং পয়ার ছন্দের ছড়া দিয়ে আসর সমাপন। এই নমুনার শেষ অংশ জোটের পাল্লা, যেখানে প্রথম পক্ষ 'সখীরে গোপীর ভজন বিষম যাজন হবে না তা' শিরোনামের একটি গানের স্থায়ী গাইতে শুরু করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়ালকে আহ্বান জানান। এখানেও প্রথম পক্ষের কবিয়াল বিবেকানন্দ এবং বিপক্ষের কবিয়াল রামকৃষ্ণ। তবে কবিগানের এই অংশে উভয়ে সামনাসামনি—একজন এক একটি অন্তরায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার পর অন্যজন আর একটি অন্তরায় তাঁর বক্তব্য রাখতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের নিকট বিবেকানন্দের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কবিগানের সমাপ্তি।[৭]

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল বিশেষত পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিগানও অনেকটা এই নমুনার অনুরূপ। তবে বিশ শতকের ষাটের দশক ও সত্তর দশকের কবিগানের সঙ্গে এই নমুনার যতোটা মিল, বিশ শতকের শেষ দশক বা একুশ শতকের সূচনায় এই নমুনার সঙ্গে বাস্তব কবিগানের ততোটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য এ কথা

পাল্লা না করার পেছনে একটি ঘটনা প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সরকারের আসর শেষ হতে না হতেই শোনা যায়, কারা যেন শহিদ মিনারের পেছনের পতাকাটি ধ্বংস করেছে। এই খবরের পর বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গান সংক্ষেপের নির্দেশ দিলে জোটের পাল্লা ছাড়াই গান শেষ করা হয়।

[৭] পরিশিষ্ট ১-এ এই নমুনা গানটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বীকার করা দরকার যে, সময়-স্বল্পতার জন্য বাংলা একাডেমীর মঞ্চে যে কবিগান পরিবেশিত হয়েছে, এবং সেই কবিগান যাঁরা পরিবেশন করেছেন, পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের গ্রাম তো বটেই ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে গান করার সময়েও তাঁরা দীর্ঘতর কবিগান পরিবেশন করেন, সেখানে ডাক-মালশি থাকে, সখীসংবাদ-কবি না থাকলেও অন্তত টপ্পাটা থাকে। এমনকি একুশ শতকের প্রথম দশকে গোপালগঞ্জের গ্রামেও বেশ দীর্ঘতর গান শোনা গেছে। এমন একটি গানের বিন্যাস ছিলো নিম্নরূপ:

২০০৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাতপাড় রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রমে মণিশঙ্কর সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সরকারের কবিগান হয়। গান শুরু হয় সন্ধ্যা ছয়টায়। এই গানে রবীন্দ্রনাথ সরকারের দোহারগণ একটি ডাক গান পরিবেশন করেন, এরপর রবীন্দ্রনাথ সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারের রচিত একটি মালশি গান পরিবেশন করেন। মণিশঙ্করের দল আর আলাদাভাবে কোনো ডাক-মালশি পরিবেশন করে না। কোনো সখীসংবাদও পরিবেশিত হয় না। উভয় দল যথারীতি টপ্পা-ধুয়া-পাঁচালি পরিবেশন করে। রাত এগারোটার দিকে জোটের পাল্লা দিয়ে গান শেষ হয়।[৮]

কিছুটা বেশি অংশ নিয়ে পরিবেশিত কবিগান শোনা যায় ২০০৮ সালের ২০শে জানুয়ারি মাদারীপুর জেলার কদমবাড়ি গ্রামে গণেশ পাগলের আশ্রমে। এখানে মাগুরা জেলার ছোটো নিশি সরকার এবং গোপালগঞ্জের স্বপন সরকার ছিলেন প্রতিপক্ষ। বাগেরহাটের কবিয়াল গৌতম সরকারও এখানে উপস্থিত ছিলেন। দোহার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর বাগচী, শ্যামল মজুমদার, আশুতোষ বাছাড় এবং অশোক মণ্ডল। হারমোনিয়মে ছিলেন সুশীল ঘরামী, ঢুলি ছিলেন সুষেণ রায়, বেহালায় ছিলেন ভুবন মণ্ডল, এবং কাঁসিতে ছিলেন রুদ্র বাগচী। বিকেল পাঁচটায় গান শুরু হয়। প্রথমে স্বপন সরকারের দল একটি ডাক গান পরিবেশন করে। পরে নিশি সরকারের দল একটি ডাক গান এবং মালশি গান গায়। এরপর স্বপন সরকার একটি সখীসংবাদ পরিবেশন করেন। সখীসংবাদ গান শেষ হলে স্বপন সরকার তপন মিশ্রের ভূমিকায় এবং প্রতিপক্ষকে গৌরাঙ্গের ভূমিকায় নামিয়ে একটি টপ্পা পরিবেশন করেন। টপ্পা শেষ হতে না হতেই একটি ধুয়া গান গেয়ে পাঁচালি শুরু করেন। নিয়ম অনুযায়ী নিশি সরকারও টপ্পা এবং পাঁচালি পরিবেশন করেন। নিশি সরকারের আসর শেষ হলে স্বপন সরকারের পক্ষে আসরে ওঠেন বাগেরহাটের গৌতম সরকার। এভাবে গভীর রাত পর্যন্ত গান চলে।[৯]

২০০৮ সালের ২৮শে জুন ঢাকা ফার্মগেটে খ্রিস্টান মিশন মিলনায়তনে পশ্চিমবঙ্গের দুই কবিয়াল অসীম সরকার এবং সজল সরকার কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। উভয় দলের দোহার এবং যন্ত্রসঙ্গতকারী ছিলেন অভিন্ন। যন্ত্রের মধ্যে

---

[৮] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে সঙ্গী ছিলেন আশিস কুমার এদবর এবং উৎপল বিশ্বাস।

[৯] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে সফরসঙ্গী ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন। পুরো গানটি তিনি ভিডিও করেছিলেন।

ছিলো ঢোল, কাঁসি, হারমোনিয়ম, বেহালা এবং দোতারা। রাত সাড়ে নয়টায় কোনো রকম টপ্পা ছাড়াই সজল সরকার একটি ধুয়া গান গেয়ে আসর শুরু করেন। ধুয়া গানের পরে ত্রিপদীতে কিছুক্ষণ গুরুবন্দনা ও আসরবন্দনা হয়। তারপর সজল সরকার নিজেকে নিশিকান্ত সরকার এবং বিপক্ষের অসীম সরকারকে বিজয় সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন: মানবধর্ম কী, পরান কান্দে হরিচাঁদ বলে গানটি কেন রচনা করেছিলেন, মতুয়া ধর্ম কী ইত্যাদি। নয়টা আটচল্লিশের সময়ে 'কৃষ্ণ বলে ঝরে আঁখিজল' বলে আর একটি ধুয়া গান করেন, এরপর পয়ার ছন্দে দ্রুত ছড়া বলে আসর শেষ করেন। অসীম সরকার আসরে আসেন রাত দশটায়। তিনিও একটি ধুয়া দিয়ে ছড়া কাটতে শুরু করেন। প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার মধ্য দিয়ে জোটের পাল্লা ছাড়াই কবিগান শেষ হয়।[১০]

২০০৮ সালের ৮ই অক্টোবর পিরোজপুর জেলার দীর্ঘা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে কবিগান করেন গৌরাঙ্গ সরকার এবং সুমন্ত সরকার। এঁদের গান শুরু হয় বিকেল পাঁচটায়। গৌরাঙ্গ সরকারের দল প্রথমে আসরে আসে। তাঁদের দলের দোহার জীবন হালদার প্রথমে অনাদিজ্ঞান সরকারের রচিত একটি ডাক গান পরিবেশন করলেন 'এসো দীনবন্ধু হরি প্রেমের কাণ্ডারী' শিরোনামে। কোনো সঙ্গী ছাড়াই একা দাঁড়িয়ে তিনি গানটি পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দল অর্থাৎ সুমন্তের দল এসে কোনো ডাক গান পরিবেশন করে না। তাঁরা পরিবেশন করেন মনোহর সরকারের রচিত 'ও তারা জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে মা তোর কোলে আমি পেলেম কতো সুখ' শিরোনামের মালশি গান। সুমন্ত পেছনে দাঁড়িয়ে গানের কথা বলে দেন আর তাঁর দুই দোহার তাতে সুরারোপ করেন। মালশি গানটি শেষ হওয়ার পরপরই একইভাবে সুমন্ত একটি টপ্পা পরিবেশন করান, টপ্পা শেষ হলে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের একটি ধুয়া (আমি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটি কী) দিয়ে পাঁচালির মধ্যে প্রবেশ করেন। মোট চারটি প্রশ্ন তিনি বিপক্ষের কবিয়ালের প্রতি ছুঁড়ে দেন। গৌরাঙ্গ সরকার আসরে প্রবেশ করেন সন্ধ্যা সাতটায়। প্রথমে তিনি দোহারদের দিয়ে টপ্পা গানের জবাব গাওয়ান। তারপর সাতটা দশ মিনিটে 'ও তুই আসল নকল সকল ভুলে একবার পরান খুলে তাঁরে ডাক' শিরোনামে একটি ধুয়া দিয়ে ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় প্রবেশ করেন। সোয়া আটটার সময়ে আবার একটা ধুয়া গান করেন 'মরি হায় রে হায় কোমরগঞ্জে নৌকা রাখা বড়ো দায়' শিরোনামে। এই গানের অন্তরার সুরে ও তালে ত্রিপদীতে ছড়া কেটে কালীপূজা ও দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার একটা ধুয়া গান করেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লা বলো মোমিন জবানে' শিরোনামে। শেষ পর্যন্ত নয়টার

---

[১০] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে গবেষকের সঙ্গী ছিলেন তাঁর পিতা স্বরূপেন্দু সরকার। কবিগান শুরু হওয়ার পূর্বে আয়োজিত মতুয়া সম্মেলনে কবিয়াল হিসেবে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং 'মতুয়ারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সময়ে পয়ার ছন্দের দ্রুত ছড়ার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আসর শেষ করেন। এর পর সুমন্ত আবার আসেন। রাত সাড়ে এগারোটায় জোটের পাল্লা হয়।[১১]

একুশ শতকের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের কবিগানও প্রায় অভিন্ন গঠনরীতি অর্জন করে। এখানেও কবিগান সাধারণত বিকেল চারটার দিকে শুরু হয় এবং রাত নয়টা দশটার মধ্যে শেষ হয়। এখানে ডাক গানটা শুধু গাওয়া হয়। কোনো কোনো আসরে মালশি গানও গাওয়া হয়। সখীসংবাদ গান হয় না বললেই চলে। এমনকি টপ্পাগান দিয়ে উভয় দলের পরিচয় দেওয়ার যে প্রাচীন রীতি, তাও মানা হয় না। সরাসরি ধুয়া গান দিয়ে ছড়া কাটতে হয় এবং ছড়ার মধ্য দিয়েই নিজেদের পরিচয় প্রদান করে প্রশ্ন, জবাব ও বিতর্ক চালিয়ে যেতে হয়। ধুয়া গানই পশ্চিমবঙ্গে বেশি জনপ্রিয়। তবে সব আসরেই সেখানে জোটের পাল্লা হয়, এবং তা বিশ-পঁচিশ মিনিটের মতো দীর্ঘ হয়।[১২]

পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের এই হ্রস্ব রূপ অবশ্য সাতচল্লিশোত্তর একটি বৈশিষ্ট্য। ১৯৭৪ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত দিল্লির লোকসংস্কৃতি উৎসবে সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর দল যে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন, তাও ছিলো এই হ্রস্ব আঙ্গিকের ধুয়া-পাঁচালি সর্বস্ব কবিগান। প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় সুরেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, "প্রথমেই ঢোলের বাজনা। ওস্তাগ গণেশ দাস ও পঞ্চানন দাস দুজনে ঢোলের মহড়ায় হাতের কসরত দেখালেন। ... এরপরে কবিগানের ধারা অনুযায়ী একখানা ডাক গান (বন্দনা) গাইলেন শিল্পী হারানচন্দ্র সাহা ও উপেন্দ্রনাথ রায়। পাগল বিজয়ের 'চিরসুন্দর এসো বন্দন মন্দিরে প্রেমালোক জ্বালিয়া' সুললিত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়ে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এই বারে দুই কবির লড়াই 'লক্ষ্মী বনাম সরস্বতী' (ধন ও বিদ্যা), লোককবি সুরেন সরকার লক্ষ্মীর ভূমিকায় বনাম লোককবি রসিক সরকার সরস্বতীর ভূমিকায়। ... অন্য দুই কবি 'নারী ও পুরুষের' ভূমিকায় লোককবি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পুরুষ ও লোককবি নিশিকান্ত রায় নারীর ভূমিকায় রূপ দিলেন বটে কিন্তু তেমন জমল না।"[১৩]

উপরের বর্ণনাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের সূচনায় গ্রামাঞ্চলের গানগুলোতে ডাক ও মালশি গান নামমাত্র পরিবেশন করা হয়।

---

[১১] এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় সফরসঙ্গী ছিলেন গবেষকের স্ত্রী দেবী সরকার।

[১২] ২০০৮ সালের ২৫শে মে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও সম্বিতী সরকারের সাক্ষাৎকার এবং ২৬শে মে উমা সরকারের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান যথাক্রমে ২৪ পরগনার নিমতা কলোনি, ২৪ পরগনার নিমতা বাজার, ২৪ পরগনা জেলার বামুনগাছি মুক্তিপাড়া গ্রাম। এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় সফরসঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ বিশ্বাস।

[১৩] সুরেন্দ্রনাথ সরকার, "ইউনেসকো সেমিনারে কবিগানের জয়," বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ৩৮। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী আবদুল লতিফ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনেক সময়ে একজনমাত্র দোহার ডাক গান পরিবেশন করেন, যেমনটা পিরোজপুরের দীর্ঘায় দেখা গেছে। মালশি গানও দোহারগণ পরিবেশন করেন, যেমনটা দেখা যায় মাদারীপুর জেলার কদমবাড়ি গ্রামে। বস্তুত একুশ শতকের কোনো কবিগানেই সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, কবি ইত্যাদি নামের গান শোনা যায় না। তবে গ্রামাঞ্চলে পরিবেশিত কবিগানগুলোর প্রায় সর্বত্র টপ্পা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ঢাকা শহরের যে গান দুটির উল্লেখ করা হলো সেখানে কোনোটাতেই টপ্পা গান হয় না। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের মতো, অথবা প্রচারণামূলক কবিগানের মতো পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালরা অবশ্য বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই ধরনের গান পরিবেশন করে আসছেন।

৩. পদ্মার উত্তরাঞ্চলে কবিগান

অনুবর্তন পর্বে পদ্মার উত্তরাঞ্চলে কবিগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেটুকু থাকে, তা দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায় খুব সামান্য। প্রায় ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ এ সময়ে পদ্মার উত্তরাঞ্চলে গিয়ে গান পরিবেশন করতে থাকেন। যেমন অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, নারায়ণ সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার, সন্ধ্যা সরকার প্রমুখ কবিয়াল বিশ শতকের শেষ কয়েক দশক প্রায় প্রতি বছরই সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা অঞ্চলে কবিগান করেছেন। বিশেষভাবে বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকা মহানগরীতে আয়োজিত কবিগানে প্রায় সব সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। একুশ শতকের সূচনাতেও তা দেখা যায়। ২০০৭ সাল ও ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের রামকৃষ্ণ মিশনে, পোস্তগোলায়, দয়াগঞ্জে, ফার্মগেট খ্রিস্টান মিশনারি মিলনায়তন প্রভৃতি স্থানে যেসব কবিগান হয়েছে, তার সবগুলোর কবিয়ালই ছিলেন পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের।[১৪]

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কবিগানে সক্রিয় ছিলেন মদন আচার্য, কালীকুমার ধর, ঈশান দত্ত, ঈশান নাথ, ক্ষেত্রমোহন শীল, কালীকুমার দাস, উপেন্দ্র সরকার, ইন্দ্রমোহন সরকার, সূর্যমোহন সরকার, চাঁদকিশোর সূত্রধর। দেশভাগের পরে এঁদের প্রায় সবাই দেশ ত্যাগ করে ভারতে অভিবাসী হওয়ায় কবিয়ালদের সংকট দেখা দেয়। তখন আবুল সরকার, আলী হোসেন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ কবিয়ালকে নিয়ে মদন আচার্য কবিগান চালিয়ে যান।

অনুবর্তন পর্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান নেত্রকোনার মদন আচার্য (জ. ১৯১৭)। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গ পর্বের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। খানিকটা বয়সের ভারে, খানিকটা গানের বায়নার

---

[১৪] স্বরূপেন্দু সরকারের চুক্তিপত্রের মুড়িবই থেকে এসব স্থানে কবিগান অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।

অভাবে, আবার খানিকটা প্রতিপক্ষের কবিয়ালের অনুপস্থিতিতে তিনি কবিগান ছেড়ে দিতে প্রায় বাধ্য হয়েছেন এবং অন্যের সাহায্যের উপরে নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে থাকেন।[১৫]

ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে নেত্রকোনা জেলায় কবিগানের চর্চা সবচেয়ে পুরনো। অনুবর্তন পর্বের কবিগানেও এই জেলার আনন্দকিশোর চক্রবর্তী, আবুল সরকার, আলী হোসেন, ঈশান দত্ত, কালীচরণ সরকার, ক্ষেত্রমোহন শীল, জীবন মজুমদার, দুলাল মিয়া, নারায়ণ চক্রবর্তী, বাবুল ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, মকরম আলী, সাধু শেখ, হরেন্দ্র আচার্য প্রমুখ কবিয়াল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিগান ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে কবিগানের আবশ্যিক অংশ হিসেবে দেবদেবী কেন্দ্রিক গানগুলো উঠে যেতে থাকে, প্রাধান্য পায় ধুয়া-পাঁচালি নির্ভর কবিগান। এই পরিবেশে মুসলমান কবিয়ালগণ কবিগানের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং নতুন ধরনের কবিগানে মুসলমান অনুষঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকেন। ঢাকার উত্তর অঞ্চলে এর ফলে বহু মুসলমান কবিয়ালের জন্ম হয়।

এ সময়ে টাঙ্গাইল জেলায় একাধিক কবিয়ালগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যা মূলত মুসলমান কবিয়ালকেন্দ্রিক। এমনই একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা কবিয়াল আফাজউদ্দিন। তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন শান্তিরঞ্জন সেন। শান্তিরঞ্জন সেনের শিষ্য তিনজন: সুবল সরকার, ননীগোপাল দে এবং হেমন্ত সরকার। আফাজউদ্দিনের সমসাময়িক কবিয়ালদের মধ্যে তাঁর মতোই বিখ্যাত ছিলেন শের আলী। শের আলীর শিষ্য-প্রশিষ্য না থাকলেও বিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ আফাজউদ্দিন এবং শের আলীর অনুসরণে টাঙ্গাইল জেলায় বেশ কয়েকজন মুসলমান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে, এদের মধ্যে আবদুল গনি সরকার, আবদুল সরকার, আবদুল ফকির, নহর চাঁদ ফকির, রওশন আলী সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে টাঙ্গাইলে যেসব হিন্দু কবিয়াল বিশ শতকের শেষার্ধে এবং একুশ শতকের সূচনায় কবিগান করেন, যেমন অনিল শীল, কালাচাঁদ সরকার, গণেশ রক্ষিত, চিত্র রঞ্জন সরকার, জীবন সরকার, ননীগোপাল দে, ননী কাপালী, বঙ্কুবিহারী বসাক, বলরাম দেবনাথ, বাবুলাল সরকার, যোগেন্দ্র সূত্রধর, শচীন্দ্রনাথ বর্মণ, শান্তি রঞ্জন সেন, সতীশ সরকার, হেমন্ত সরকার প্রমুখ, সকলেই গুরুপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা কোনো না কোনোভাবে পূর্বোক্ত মুসলমান কবিয়ালদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। টাঙ্গাইলের কবিয়ালদের পরম্পরার ক্ষেত্রে এ এক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক চিত্র।

---

[১৫] এখনো এ অবস্থা বহাল রয়েছে বলে জানান কামালউদ্দিন কবির। তিনি ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, এখনো আশপাশের থানার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে মদন আচার্যকে পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকা সাহায্য করে থাকেন। কামালউদ্দিন কবির, *হাওর জনপদের গীতরঙ্গ: অন্তরঙ্গ আলোয়* (ঢাকা: আইইডি, ২০০৭), পৃ. ৪০।

অনুবর্তন পর্বের প্রথম পর্যায়ে পদ্মার উত্তর অঞ্চলে এভাবে মুসলমান কবিয়ালদের আগমন ঘটলেও কবিগানে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায় না। তাঁদের শিষ্য হিসেবেও মুসলমানদের থেকে হিন্দুরাই এগিয়ে থাকে।

ঢাকা জেলার সাভারের কৃষ্ণগোপাল পাল (জ. ১৯৫২) অনুবর্তন পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল। এই পর্বের কবিয়াল হলেও তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি ডাক গান ও মালশি গান রয়েছে, যা বিভিন্ন আসরে তিনি পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর কবিগানের গুরু ননীগোপাল সরকার। স্বরূপেন্দু সরকার, জগদীশ সরকার, মনীন্দ্রনাথ সরকার, টাঙ্গাইলের দুই সুবল সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেন। তাঁর শিষ্য রণজিৎ সরকার একুশ শতকের সূচনায় কবিগান পরিবেশন করে থাকেন।

সত্তর ও আশির দশকে নরসিংদী জেলার মহাদেব সরকার কবিয়াল হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁর এলাকায় অন্য কোনো কবিয়াল না থাকায় প্রতিপক্ষের কবিয়ালের সন্ধানে তাঁকে পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে যেতে হয়। অনেক সময়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলে গানের বায়না রেখে তিনি দক্ষিণাঞ্চল থেকে কবিয়াল এনে সেসব অঞ্চলে গান করতে যান।

অনুবর্তন পর্বে ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের জন্ম হয় এবং তাঁরা বিশ শতকের শেষার্ধে এই অঞ্চলে সুনামের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে অমূল্যরতন সরকারের (জ. ১৯৩৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গুরু ছিলেন উপেন্দ্রনাথ কাপালী। তিনিও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অমূল্যরতন যাঁদের বিপক্ষে কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে নকুলেশ্বর সরকার, গোপাল সরকার, হরেন্দ্রনাথ সরকার, রাধাবল্লভ সরকার, শের আলী সরকার, জগদীশ সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মানিকগঞ্জের অমর সরকারও (জ. ১৯৪০) একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। তাঁর গুরু ছিলেন জগদীশ সরকার (জ. ১৯৩৩)। মানিকগঞ্জের নিতাই সরকার, মনীন্দ্রনাথ সরকার, যোগেশ সরকার, সহদেব সরকার, রণজিৎ সরকার (জ. ১৯৬৫), রাধাবল্লভ সরকার, হরেন্দ্র সরকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি গান করেছেন।

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিগানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কবিয়াল যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ, একইভাবে মানিকগঞ্জ অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে কাপালী সম্প্রদায়ের কবিয়ালও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এঁদের মধ্যে অমূল্যরতন সরকার, উপেন্দ্রনাথ সরকার, জগদীশ সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখয়োগ্য।

৪. পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে কবিগান

প্রথমেই দেখা যাক অনুবর্তন পর্বে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কোথায় কোথায় কবিগানের আয়োজন হতো। আলোচ্য কালপর্বে এই অঞ্চলের যেসব গ্রাম বা স্থানে কবিগানের আসর বসতো, তার মধ্য থেকে বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, নড়াইল, যশোর,

গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আসরের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এ থেকে বোঝা যাবে, এই অঞ্চলে কবিগানের ব্যাপকতা কী পর্যায়ের। তবে একই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এই গ্রামগুলোর বাইরেও এইসব জেলায় বহু গ্রাম রয়েছে যেসব গ্রামে নিয়মিত কবিগানের আসর হয়। শুধু তিনজন কবিয়ালের স্মৃতি থেকে গ্রামের নামগুলো নেওয়া হয়েছে বলে সেসব গ্রামের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।[১৬]

বাগেরহাট: আন্দাবাজ, আন্ধারমানিক, আমরাগাছিয়া, আমিরপুর, আলাইপুর, ওলপুর, কচুয়া, কলকলিয়া, কাঁকদি-শ্রীপুর, কাইনমারী, কাজদিয়া, কাটাখালী, কাড়াপাড়া, কামারোল, কালশিরা, কালেখারবেড়, কুদির বটতলা, কোধলা, খানপুর, গঙ্গাচন্না, গোপালপুর, গোয়ারা, গৌরম্ভা, গোয়ারা, চরকাঠি, চরবানিয়ারি, চরবানিয়ারি দক্ষিণপাড়া, চাঁদেরকোনা, চামারে গাছতলা, চালনা, চিতলমারী, চুলকাঠি, চুনখোলা, জয়গাছি রঘুনাথপুর, জলসত্র, ঝলমলিয়া, ডাকাতিয়া, তালেশ্বর, তিলেক, দড়ি উমাজুড়ি, দামেরখণ্ড; দিগরাজ, দুয়ানি, দৈবজ্ঞহাটি, দেয়াপাড়া, দোহাজারি, নাগেরবাজার, নোয়াপাড়া, পাঁচ-আনি, পাগলা, পাগলা দেয়াপাড়া, পানিঘাট, পারমধুদিয়া, পিলজঙ্গ, পুটিয়া, পেড়িখালী, ফকিরহাট, ফুলতলা, বইঝাঁকি, বড়বড়িয়া, বড়োদল, বয়ারশিঙ্গা, বাইনতলা, বাগেরহাট রাধেশ্যাম মন্দির, বাগেরহাট শহর, বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমী, বাগেরহাট স্টেডিয়াম, বাধাল, বানিয়াখালী, বাসাবাড়ি, বাহিরদিয়া, বুড়িরডাঙ্গা, বুরুজবাড়িয়া, বেতকাটা, বেতাগা, বেনেগাঁতি, বোয়ালিয়া, বোলতলী, ব্রাহ্মণ রাখদিয়া, ব্রাহ্মণহাট, ভোজপাতিয়া, মংলা, মঘিয়া, মল্লিকেরবেড়, মশনি, মানসা, মালীপাটন, মোরেলগঞ্জ, মৌভোগ, যাত্রাপুর, রঞ্জিতপুর, রণবিজয়পুর, রাখালগাছি, লকপুর, লক্ষ্মীখালী, লস্করপুর, রামচন্দ্রপুর, শড়িতলা, শৈলদহ, শ্যামবাজার, শ্যামবাসাত, শ্রীফলতলা, ষাটতলা, সগুনা, সাংদিয়া, সাচিয়াদহ, সাধের বটতলা, সামন্তসেনা, সিংগাতি, সুগন্ধি, সুলতানপুর, সেনহাটি, সেনেরবাজার, হলদিবুনিয়া, হাড়িখালি, হুড়কা।

খুলনা: আমতলা, আমাদি, কপিলমুনি, কয়লাঘাটা (খুলনা), কর্ণপুর, কাঁকড়াবুনিয়া, কার্তিকখোলা, কৈলাশগঞ্জ, খাসেরডাঙা, খুলনা কালীবাড়ি (ধর্মসভা রোড), খুলনা মিউনিসিপাল মিলয়ানয়ন, খেজুরিয়া, গঙ্গারামপুর, গাজিরহাট, গোরকাঠি, ঘাটভোগ, ঘুটোখালী, চণ্ডীপুর, টুটপাড়া, তিলডাঙ্গা, তেকাটিয়া, দিঘলিয়া, দেলুটি, দোলখোলা, দৌলতপুর, দৌলতপুর কবির বটতলা, নন্দনপ্রতাপ, নৈহাটি, পঞ্চু, পাবলা, পেরীখালী আশ্রম, ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, বাঁশখালী, বাজুয়া, বানিয়াখামার, বানিশান্তা, বারাকপুর, বাহিরদিয়া, মঠবাড়ি, মধুখালী, মহেশ্বরপাশা, মহেশ্বরীপুর, মুনকিয়া, রংপুর, রাড়ুলি, রূপরামপুর, রূপসা, রূপসা শ্মশান, লতা, লতাখামার, শিয়ালী, সামন্তসেনা, সাহস, সুতারখালী, হাজিবুনিয়া, হাটবাড়িয়া।

---

[১৬] এই তিনজন কবিয়াল হলেন বিজয়কৃষ্ণ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার এবং সঞ্জয় মল্লিক।

সাতক্ষীরা: আঠারোশো বিঘা, কলাবাড়িয়া, কাঁদাকাঠি, কামালকাঠি, খড়িয়াডাঙা, খাজুরা, গোপালডাঙা, গোয়ালপোঁতা, চাঁদপুর, দোহার, ধূমঘাট, নাকতাড়া, পাটগাতি, পারুলিয়া, ফুলতলা, বাগডাঙা, বুড়িগোয়ালিনী, ভুরুলিয়া, মহিষাডাঙ্গা, মাদ্রা, মুন্সীগঞ্জ, মেষারডাঙ্গা, শ্যামনগর, সুপ্তিয়া, হরিণখোলা ১, হরিণখোলা ২, হোসেনপুর।

নড়াইল: আগদিয়ার চর, ইচরবাহা, এগারোখান, কলাগাছি, কলাবাড়িয়া, কানাইপুর, কালনা, কালীনগর, খলিশাখালী, গাছবাড়িয়া, গাজিরহাট, গোপীকান্তপুর, চণ্ডীতলা, চণ্ডীপুর, চালনা, জয়পুর, ডমুদি, ডুমদি, দিঘলিয়া, তুলারামপুর, দরিয়াপুর, দেবদুন, দেবভোগ, দৌলতপুর বুড়ো ঠাকুরের গাছতলা, ধলগাঁ, ধুসাহাটি, নলামারা, নিরালী, পাটনা, পানতিতা, পুটিমারি, পোলোইডাঙা, বড়দিয়া, বামনডাঙা, বাহিরগ্রাম, বাহিরডাঙা, বিষ্ণুপুর, মহাজন, মাইগ্রাম, মির্জাপুর, মুলিয়া, যোগানিয়া, রতনডাঙা, রুন্দিঁয়া, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, শুক্তগ্রাম, শ্রীপুর, ষষ্ঠিতলা, হোগলাডাঙা।

যশোর: অভয়নগর, আড়পাড়া, আন্ধা, আলীপুর, কুচলিয়া, কুলটিয়া, কুশোরকোনা, গোবিন্দপুর, চাঁচড়া, চাঁপাকোনা, ঝিকরগাছা, দামুখালী, ধোপাপাড়া, পাঁচকাঠিয়া, পাঁচবাড়িয়া, পাঁচাকড়ি, পোড়াডাঙা, ফুলেরগাঁতি, বড়ো সুন্দলি, বনখলিশাখালী, বাকারডাঙা, বারোবাজার, ভাটবিলা, মনিরামপুর, ময়নাপুর, মশিয়াহাটি, মহাদেবপুর, মাকুন্দি, যশোর পৌরসভা মাঠ, রঘুনাথপুর, রাজাপুর, রামসরা, রূপগঞ্জ, রূপদিয়া, লখাইডাঙা, লেবুগাঁতি, শড়াডাঙা, শাড়াগোল, সমসকাঠি, সুজাতপুর, সুন্দলি হাট, হরিদাসকাঠি, হাজিরহাট শ্মশান।

গোপালগঞ্জ: উত্তরপাড়, ওড়াকান্দি, করপাড়া, কলিগ্রাম, কানাইপুর, কালীনগর, কালুপুর, কাশিয়ানি, গান্ধিয়াসুর, গোপালগঞ্জ কলেজ মাঠ, গোলাবাড়িয়া, গৌরনদী, ঘাগর, জলিরপাড়, টুঠামান্দ্রা, তারাইল, তারাকান্দর, দক্ষিণপাড়, দিঘিরপাড়, নড়াইল লোচন সাধুর বাড়ি, নারানপুর, নিজড়া, নুনিয়া গোপালপুর, পাঁচুরিয়া, ফুলগাছা, বহুগ্রাম, মকসুদপুর, মহারাজপুর, মাঝিগাঁতি, রঘুনাথপুর, রামদিয়া, রামশীল, লখণ্ডা, শানপুকুরিয়া, শুয়াগ্রাম, সাতপাড়, সুক্তা, হাতিয়ারা।

পিরোজপুর: কদমতলা, কলাখালী, কাউখালী, কুড়লিয়া, কৃষ্ণনগর, খেজুরতলা, গড়গুল, গোবর্ধন, চরদোয়ানিয়া, চাইলতাখালী (মলঙ্গীবাড়ি), ছইলাবুনিয়া, জলাবাড়ি, জুজখোলা, টোনা, ডাকাতিয়া, দীর্ঘা, দৈহাড়ি, নইলতলা, নাথারকান্দি, পাত্তাশি, পিরোজপুর রামকৃষ্ণ মিশন, পোরগোলা, বড়মগরা, বানিয়ারি, বাবলা, বাবুরহাট, বিনাগপুর, বিশারকান্দি, ভাণ্ডারিয়া, ভীমকাঠি, মাটিভাঙা, রাধানগর, শাঁখারীকাঠি, শিকদারমল্লিক, শ্রীরামকাঠি, সাচিয়া।[১৭]

---

[১৭] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান," সংখ্যা ৪, জুন ২০০৯, পৃ. ১৬৪; মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৪৫–৪৬; এবং সাক্ষাৎকার, সঞ্জয় মল্লিক, কবিয়াল, গ্রাম: গোবিন্দকাঠি, যশোর। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

বাংলাদেশের এইসব গ্রামের অনেকগুলোতে বারোয়ারি পূজামণ্ডপ রয়েছে, যা বারোয়ারি খোলা নামে বিশেষ পরিচিত। এসব খোলায় কালীপূজা উপলক্ষে কবিগান হতো, অথবা বলা যায় কবিগান উপলক্ষে এসব খোলায় কালীপূজা হতো। কেননা এক সময়ে মনে করা হতো যে, কালীপূজার সঙ্গে কবিগানের একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কালীপূজার গভীর রাতে তখন ডাক গান গেয়ে কবিগানের সূচনা হতো এবং দুপুর পর্যন্ত সেই গান চলতো। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে এই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের বড়ো একটি অংশ দেশত্যাগ করায় অনেক বারোয়ারি খোলায় পূজাও বন্ধ হয়ে গেছে, কবিগানও আর হয় না। তবে অনেকগুলো খোলা সেই ঐতিহ্য একুশ শতকের সূচনা দশক পর্যন্ত ধরে রেখেছে। ফলে সেসব আসরে প্রতি বছরই কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে কালীপূজার অংশ হিসেবে কবিগানের সেই গুরুত্ব অনেকটা লঘু হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া গানের সময়সূচিও বদলে গেছে। বাংলাদেশে অথবা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও আর মধ্যরাত্রিতে কবিগান শুরু হয় না। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সকালে কবিগান শুরু হয় বটে, তবে অধিকাংশ কবিগানই অপরাহ্নে হয়ে থাকে। বস্তুত একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই হয় বিকেলে, না হয় সন্ধ্যায় কবিগান শুরু হয়ে থাকে।

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিগানের মধ্যে প্রথমেই ঝালোকাঠি কেন্দ্রের কবিগানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে এই কেন্দ্রটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এই কেন্দ্রের উদ্যোক্তা, কবিয়াল, গায়িকা, দোহার প্রায় সকলেই দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার ফলে এটা হয়। যে বৈষ্ণবীরা এখানে সম্মানজনক একটি সামাজিক অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তা ধুলোয় মিশে যায়। পাকিস্তানে যেমন তাঁরা অবাঞ্ছিত হন, পশ্চিমবঙ্গেও তাঁদের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এখানকার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল নকুলেশ্বর দত্তও (১৮৯৪–১৯৮৭) তাঁর দলবল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর দলের পরিচালিকা হিরণবালা কলকাতার বিডন স্ট্রিটে বাসা নিতে সক্ষম হলেও কবিয়ালকে বাসা নিতে হয় বর্ধমানে। পশ্চিমবঙ্গে কবিগান আয়োজনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে অপেক্ষা করতে হয় ষাটের দশক পর্যন্ত। ১৯৫৬ সালের অবস্থা বিচার করেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। সে বছর নকুল দত্ত দুর্গাপূজা থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত কোনো বায়না পাননি।[১৮] অথচ বিভাগপূর্ব সময়ে দুর্গাপূজার বায়নার জন্য নকুল দত্তের কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

খুলনা, যশোর এবং ফরিদপুর অঞ্চলেও সাতচল্লিশ সাল থেকে অন্তত দশ বছর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক শূন্যতা বিরাজ করে। এইসব এলাকার খ্যাতিমান কবিয়ালরাও দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারও (১৮৯২–১৯৭৪) দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি এক ঠগ ব্যক্তির নিকট থেকে ৮০ বিঘা জমি কিনেছিলেন

---

[১৮] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান," *স্থানীয় ইতিহাস*, পৃ. ১৫৪।

এবং আত্মীয়-স্বজন নি বসবাস করছিলেন। কিন্তু জমির আসল মালিক মামলা করায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার সর্বস্ব হারান।[১৯] ১৯৫৭ সালে এই ঘটনার পর রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়। ততোদিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়, যাঁরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরাও দু-এক পালা করে কবিগানের আয়োজন করতে শুরু করেন।

নতুন এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সাল থেকে রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার (১৯০৩–১৯৮৫), নিশিকান্ত সরকার (১৯১৩–১৯৯৩) প্রমুখের নেতৃত্বে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে কবিগানের একটি নতুন বলয় গড়ে ওঠে। এ সময়ে তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা পেয়ে আরো কয়েকজন নতুন কবিয়াল তাঁদের দলে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্য কালীপদ সরকার; বিজয় সরকারের শিষ্য অনাদিজ্ঞান সরকার, রসিকলাল সরকার, বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিগেন্দ্রনাথ সরকার; এবং নিশিকান্ত সরকারের শিষ্য ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখ। এই গুরুশিষ্যগণ সকলেই পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকের কয়েক বছর বাংলাদেশে কবিগান করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করায় এঁদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন কবিয়াল শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। যেমন নিশিকান্ত সরকার ১৯৬০ সালে, রসিকলাল সরকার ১৯৬৮ সালে, বিজয় সরকার ১৯৮২ সালে, এবং অনাদিজ্ঞান সরকার ১৯৮৯ সালে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে পূর্ব থেকেই নকুল দত্ত ছিলেন, তাঁর কৃতি শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন। এঁদের সঙ্গে নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখ যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটান। অবশ্য অনাদিজ্ঞান সরকার বৃদ্ধাবস্থায় সেখানে গিয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে সেখানে খুব বেশিদিন গান করা সম্ভব হয় না।

দেশভাগের পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগান করলেও নতুন কালের সঙ্গে তিনি ততোটা তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। তাঁর কবিগানের রীতি এবং গায়কি ছিলো শতাব্দীর প্রথম দিককার। সেই রীতি থেকে তিনি বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে সনাতনী রীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিলো সর্বাধিক। ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তিনি অল্প কয়েক বছর মাত্র কবিগান করেছেন। ১৯৭৪ সালে বাগেরহাটে নিজ বাড়িতে তিনি মারা যাওয়ার আগে প্রায় এক যুগ তাঁর কোনো কবির দল ছিলো না, তবে কখনো কোনো আসরে তাঁকে আহ্বান করা হলে তিনি কবিগান গাইতেন।[২০]

---

[১৯] তদেব, পৃ. ১৫৫।

[২০] ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দিতে বর্তমান গবেষক তাঁর গান শুনেছিলেন। সেই গানে রাজেন্দ্রনাথ সরকার ইন্দিরা গান্ধী এবং স্বরূপেন্দু সরকার শেখ মুজিব হয়ে টপ্পা করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ পর্বে বিশেষভাবে ব্রিটিশ বাংলায় যেসব কবিয়ালের বিকাশ ঘটে, এবং বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কবিগান চর্চায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বিজয়কৃষ্ণ সরকারের। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে নড়াইল জেলার ডুমদি গ্রামে। কবিগানকে সর্বসাধারণের উপভোগ্য করে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি তিনি করেছিলেন দুইভাবে। প্রথমত, কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি অংশে যে ধুয়া গানের প্রচলন তারকচন্দ্র সরকারের সময় থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো, অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় সেই ধুয়া গান দিয়ে তিনি সাধারণ শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হন। উভয়ের জন্মস্থানও ছিলো কাছাকাছি—নড়াইল জেলার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, তাঁর সময়ে তিনি কবিগানের ডাক, মালশি, সখীসংবাদ এবং কবি অংশের আধুনিকায়ন ঘটিয়েছিলেন এবং সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে টপ্পা-পাঁচালিকে কবিগানের প্রধান আকর্ষণে পরিণত করেছিলেন।

বিজয় সরকারের সময়ে কবিগান আর ধুয়া গান প্রায় সমার্থক হয়ে যায়। এর পেছনে তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরও যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি তাঁর রচিত গানের কথার সরলতা ও সহজবোধ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিজয় সরকারের গুরু ছিলেন গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের মনোহর সরকার। সতীর্থ নিশিকান্ত সরকারকে নিয়ে বিজয় সরকার বহু বছর জোট গঠন করে কবিগান করেছেন। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে কবিয়াল বিজয় সরকারের ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ১৯৩২ সালে জসীমউদ্‌দীন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে কবিগানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে কবিগান পরিবেশন করে তিনি সমকালের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। এ সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, মুকুন্দদাস প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের গান শোনানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিজয় সরকার সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন, "মাঝে মাঝে দেশীয় গ্রাম্য গায়কদের মুখে বিজয়ের রচিত বিচ্ছেদ গান শুনিয়া পাগল হই। এমন সুন্দর সুর বুঝি কেহই রচনা করিতে পারে না। ছাপাখানা বা রেডিও গ্রামোফোনের সাহায্য ব্যতিরেকে বিজয়ের নতুন সুরের গানগুলি গ্রামবাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।"[২১]

বিজয় সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ধুয়া গানের প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।
ও সে যে আমায় ভুলবে জীবনে ॥

থাকতো পাখি সোনালি খাঁচায়, কতো কি বলিত আমায় বসে রুপালি আড়ায়।
ফটিকের বাটি ভরে, কতো খাবার দিতাম থরে থরে, পাখি খেতো আনমনে ॥

---

[২১] জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা*, পৃ. ১২৬।

ধুয়া গানে তাঁর কৃতিত্ব কবিগানকে যেমন হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে, একইভাবে ডাক, মালশি প্রভৃতি গানকে তিনি পৌরাণিক আবহ থেকে বের করে এনে সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর লহর কবিও সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে এমনভাবে রচিত, যাতে তা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের যেমন আকর্ষণ করে, আবার নিরক্ষর সাধারণ মানুষকেও আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করেন পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে ষাটের দশক ও সত্তরের দশকে প্রায় প্রতি বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গ গিয়ে গান করে এসেছেন। তবে এই কালপর্বে আলোচ্য এলাকার মধ্যেই তিনি তাঁর অধিকাংশ গান পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর জীবনের শেষ দুই দশকে উভয় দেশে সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন।

এই কালপর্বে বিজয়কৃষ্ণ সরকার যাঁদের বিপক্ষে কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীপদ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রসিকলাল সরকার, কালীদাস সরকার, গৌর সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিশিকান্ত সরকার ছাড়া এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন তাঁর শিষ্য বা শিষ্য সমতুল্য।

বাংলাদেশের কবিগানে বিজয় সরকারের অবদান অসামান্য। কবিগানের পাঁচালিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের ধুয়া গান পরিবেশনে তাঁর জুড়ি ছিলো না। তাঁর রচিত, সুরারোপিত এবং পরিবেশিত এইসব ধুয়া গানের মান ছিলো অসাধারণ। সঙ্গত কারণে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বিজয় সরকারের রচিত ধুয়া গান দিয়ে পাঁচালি পরিবেশন করে থাকেন। অনেক আসরে শ্রোতারাই বিজয় সরকারের ধুয়া গান শোনার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। বিজয় সরকার এভাবে অনুবর্তন পর্বের কবিগানের অসামান্য এক উদাহরণ হয়ে ওঠেন।

বিজয় সরকারের অন্যতম সহযোগী ছিলেন গোপালগঞ্জের নিশিকান্ত সরকার (১৯১৩–১৯৯৩)। নিশিকান্ত সরকার তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সিদ্ধান্তবিশারদ উপাধি পেয়েছিলেন। ষাটের দশকের পূর্বে বেশ কয়েক দশক বিজয় সরকার এবং নিশি সরকার জোট গঠন করে কবিগান পরিবেশন করতেন বলে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে কবিগানের সঙ্গে বিজয়-নিশির নাম একীভূত হয়ে যায়। এই দুজনের মধ্যে বিজয় সরকার যেমন তাঁর ধুয়া গানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন, একইভাবে নিশিকান্ত সরকার বিখ্যাত ছিলেন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সৃজনশীলতা ও কবিপ্রতিভার জন্য।

পিরোজপুর জেলার কাঠালিয়া গ্রামের দ্বিজবর সরকার (১৯১৯–২০০০) ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের প্রিয় শিষ্যদের একজন। কিন্তু বাচনভঙ্গি ও ভাষাশৈলীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর গুরুর ঠিক বিপরীত। তাঁর গুরুর ভাষা ছিলো সংস্কৃতানুসারী, অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় তিনি কথা বলতেন, তাঁর রচিত গানে কোনো আঞ্চলিক শব্দ থাকতো না। কিন্তু দ্বিজবর সরকার যেমন আঞ্চলিক ভাষায় গান লিখতেন, তেমনি পাঁচালি অংশেও পিরোজপুরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতেন। বরিশাল অঞ্চলের

সাধারণ শ্রোতার মানসিক সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এ কৌশল অনেক সময়ে কাজে লাগতো। দ্বিজবর সরকারের মা একজন সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মতুয়া সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। দ্বিজবর সরকারের জ্যেঠতুতো ভাই বিশ্বেশ্বর সরকারও খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। দ্বিজবর সরকারের একটি বিখ্যাত ধুয়া গান রয়েছে, তাতে তাঁর সমকালের খ্যাতিমান কবিয়ালদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২২]

বাগেরহাটের ভাগা গ্রামের রসিকলাল সরকার (১৯২৮–১৯৯০) ছিলেন যেমন সুকণ্ঠের অধিকারী, তেমনি তাঁর সৃজনশীলতার মানও ছিলো খুব উন্নত। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন বাগেরহাটের গৌরপদ সরকার, পরে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো রসিক সরকারও প্রচুর ধুয়া গান রচনা করেছেন। তাঁর ধুয়া গানের সুর সমকালে খুব জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর 'চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে/ আশা করি পরান বন্ধু আছো কুশলে' ধুয়া গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়। রসিকলাল সরকার ১৯৬৮ সালে দেশত্যাগ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। দীর্ঘদিন সেখানে তিনি কবিগান করেছেন।

অনুবর্তন পর্বের কবিগানে বিশেষভাবে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৯২৩–২০০৯) ও কালীদাস সরকার (১৯৩৫–২০০৮) নামের দুই সহোদর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। ছোটো রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন নিশিকান্ত সরকারের শিষ্য, অন্যদিকে কালীদাস ছিলেন বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই দুজনের উত্তরসূরি—বংশগত দিক দিয়ে এবং শিষ্যপরম্পরার দিক দিয়ে। এঁদের দুইজন ভাগিনেয় পিরোজপুরের মণিলাল সরকার এবং গোপালগঞ্জের স্বপন সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কবিগান পরিবেশন করছেন। এছাড়া রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্যদের মধ্যে বরিশালের উজিরপুরের রবীন্দ্রনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, মুকুন্দলাল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় সরকার, গোপালগঞ্জের যতীন্দ্রনাথ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, বাগেরহাটের সন্ধ্যা সরকার; এবং কালীদাস সরকারের শিষ্যদের মধ্যে মাদারীপুর জেলার মনোরঞ্জন বসু, প্রশান্ত সরকার, রুহিদাস সরকার প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিপ্রতিভা ছিলো অসাধারণ, অন্যদিকে কালীদাস সরকার ছিলেন অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী।

অনুবর্তন পর্বে যে কয়জন সরকার পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিয়ালদের মতো ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি গান রচনা করতে পারতেন বাগেরহাটের অনাদিজ্ঞান সরকার এবং স্বরূপেন্দু সরকার তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি নাম। সমকালের অনেক কবিয়ালই এগুলো রচনা করতে পারতেন না; তাই কোনো আসরে শ্রোতারা এসব গান শুনতে চাইলে তাঁরা পূর্বসূরি কবিয়ালদের রচিত গান পরিবেশন করতেন। অন্যদিকে অনাদিজ্ঞান সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার নিজেদের রচিত ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, কবি, টপ্পা, ধুয়া পরিবেশন করতেন।

---

[২২] পরিশিষ্ট ৭-এ ধুয়াগানটি সংকলিত হয়েছে।

অনাদিজ্ঞান সরকার (১৯২৮–২০০৬) ছিলেন বাগেরহাটের বিখ্যাত কবিয়াল নদীয়ারচাঁদ সরকারের পৌত্র এবং রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠতাত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নিকটে কবিগানের হাতেখড়ি হলেও কবিগানে অনাদিজ্ঞানের প্রকৃত গুরু ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ সরকার। অনাদিজ্ঞান সরকার ১৯৫১ সালে দল গঠন করে কবিগান গাইতে শুরু করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সরোজ সরকার, নারায়ণ সরকার, কানাইলাল সরকার, ছোটো বিনয় সরকার, সঞ্জিত পাল সরকার, চারুনাথ সরকার, কৃষ্ণদাস সরকার প্রমুখ অন্যতম। বিশ শতকের আশির দশকের শেষে তিনি পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং ১৯৯০ সালে সেখানে তিনি নতুনভাবে কবিগানের দল গঠন করেন।

নিশিকান্ত সরকার সিদ্ধান্তবিশারদ ছিলেন স্বরূপেন্দু সরকারের (১৯৩৩–২০০৯) কবিগানের গুরু। গুরুর মতোই তিনি শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং টপ্পা-পাঁচালির যুক্তি-তর্কে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। প্রাচীন রীতির হোক বা আধুনিক রীতির—সর্বত্রই তিনি সুনামের সঙ্গে কবিগান করে গেছেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে যেমন সুনামের সঙ্গে কবিগান করতেন, শহর অঞ্চলেও তেমন দক্ষতার সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতেন। স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গে কবি জসীমউদ্‌দীনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিলো, তাঁরা একসঙ্গে ছড়া কাটার প্রতিযোগিতা করেছেন। স্বরূপেন্দু সরকারের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। এগুলো হলো 'ভাটির নাইয়া' (১৯৬৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪), 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঁচালী' (১৯৬৫), 'ঠাকুর এলো মোদের ঘরে' (১৯৬৬), 'মহালক্ষ্মী শান্তিদেবীর পাঁচালী' (১৯৯৮), 'পতিতপাবন গুরুচাঁদ' (২০০০), 'সমাজসংস্কারে মতুয়া' (২০০১), 'ছোটদের ধর্মগ্রন্থ' (২০০২), 'পাগল হরিভজন' (২০০৩), 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকথা' (২০০৬), এবং 'পতিতের বান্ধব' (২০১০)। তাঁর সমকালের অন্য কোনো কবিয়ালের এতোগুলো প্রকাশিত গ্রন্থ নেই। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পরিমাণও যথেষ্ট। মতুয়া আদর্শের প্রচারক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য বর্তমানে সুনামের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করছেন। এঁদের মধ্যে বাগেরহাটের অমূল্য সরকার (১৯৪১–২০১০), খুলনার কৃষ্ণকান্ত সরকার, খুলনার নিখিলচন্দ্র সরকার, খুলনার সুরঞ্জন সরকার, সাতক্ষীরা জেলার হরিবর সরকার, বাগেরহাটের হরিদাস সরকার, পিরোজপুরের সুভাষচন্দ্র সরকার, বাগেরহাটের তিমির সরকার প্রমুখ অন্যতম। স্বরূপেন্দু সরকারের রচিত ধুয়া গানের সংখ্যাও প্রচুর। তাঁর 'ভাটির নাইয়া' বইয়ে এ ধরনের ১৫৫টি ধুয়া গান সংকলিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে এর মধ্য থেকে কিছু বিচ্ছেদ গান পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য তিনি জসীমউদ্‌দীনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ২১শে মার্চ ১৯৫৯ তারিখে লেখা চিঠিতে জসীমউদ্‌দীন এই গানগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "তোমার বিচ্ছেদ গান আমার এত ভাল লেগেছে যা অন্য কারো গানে আজ পর্যন্ত পাই নাই।"[২৩]

[২৩] পত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে 'ভাটির নাইয়া' বইয়ের প্রারম্ভিক অংশে। স্বরূপেন্দু সরকার, *ভাটির নাইয়া*, ২য় সংস্করণ (রাজশাহী: কল্পপ্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১০।

অনুবর্তন পর্বে স্বরূপেন্দু সরকারের বিপক্ষে যাঁরা কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোপালগঞ্জের বিনয়কৃষ্ণ সরকার (১৯৩৫–২০০০) ছিলেন অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী। তাঁর রচিত ও পরিবেশিত ধুয়া গানে তিনি কখনো কখনো আধুনিক লঘুসঙ্গীতের সুর মিশ্রিত করতেন। ভাটিয়ালি, কীর্তন ও আধুনিক গানের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর ধুয়া গানের সুর শ্রোতাদের মুগ্ধ করতো। গোপালগঞ্জের সাতপাড় গ্রামে তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে বহু পরিবার বসবাস করতো। তাঁর দলের দোহার ও যন্ত্রশিল্পী সকলেই ছিলেন সেই বাড়ির বাশিন্দা। ফলে গানের মরশুমে দল গঠন করতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হতো না।

একটি সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার রবীন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯৩৪)। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাইন হারমোনিয়ম বাজাতেন, মা মহারানী বাইন ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী একজন গায়িকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ মুকুন্দলাল সরকার একজন কবিয়াল এবং অনুজ সুবল সরকার একজন ভালো মানের দোহার। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুরে অভিবাসিত মুকুন্দলাল সরকার সেখানে বেশ সুনামের সঙ্গে কবিগান করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সরকারের গুরুর সংখ্যা অনেক, অর্থাৎ তিনি অনেকের নিকটে কবিগান শিক্ষা করেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন গোপালগঞ্জের ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, পরে ঝিনাইদহের শৈলকুপার বিনোদ সরকারের নিকট এবং আরো পরে নড়াইলের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের নিকটে তিনি কবিগান শেখেন।

নতুন প্রজন্মের কবিয়ালদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে নড়াইল জেলার ডুটকুরা গ্রামের নারায়ণ সরকারের (জ. ১৯৪৪) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অনাদিজ্ঞান সরকারের শিষ্য। ১৯৭৪ সালে স্বতন্ত্রভাবে কবির দল গঠন করে তিনি কবিগান গাইতে শুরু করেন। এর আগে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকার ও অনাদিজ্ঞান সরকারের দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করতেন। নারায়ণ সরকার বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে একাধিক বার কবিগান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন গ্রহণ করলেও প্রতি বছর কবিগানের মরশুমে তিনি বাংলাদেশে কবিগান করতে আসেন।

ফরিদপুর জেলার দোলকুণ্ডি গ্রামে জন্ম কবিয়াল গৌরাঙ্গ সরকারের (১৯৪৫–২০১১)। তিনি টাঙ্গাইলের সুবল সরকারের শিষ্য। অধিকাংশ কবিয়ালের জীবনে যেমনটা দেখা যায়, প্রথম জীবনে বাংলাদেশে এবং শেষ জীবনে পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন করেন। গৌরাঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে তার বিপরীত দেখা যায়। প্রথম জীবনে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কবিগান করেছেন, শেষ জীবনে বাংলাদেশে এসে কবিগান পরিবেশন করে যাচ্ছেন। দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে তিনি আরো একটি কারণে ব্যতিক্রমী, তা হলো, তিনি দক্ষিণাঞ্চলেও যেমন কবিগান করেন, প্রায় সমপরিমাণে টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ঢাকা অঞ্চলেও কবিগান করেন। তাঁর শিষ্যরাও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয় অঞ্চলে রয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলার মাহরুগঞ্জের নারায়ণ সরকার, কুচবিহার জেলায় বিমল সরকার ও জিতেন সরকার,

টাঙ্গাইল জেলায় জিতেন সরকার, ফরিদপুরের চাঁদমোহন সরকার, মানিকগঞ্জের সহদেব সরকার, বরিশাল তেতলার নিখিল সরকার, ফরিদপুর বোয়ালমারীর শ্যামপদ সরকার প্রমুখ তাঁর শিষ্য। পদ্মার উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক মুসলমান কবিয়ালের বিপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের যেসব কবিয়ালের কবিগানের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে গৌরাঙ্গ সরকার অন্যতম। তিনি টাঙ্গাইল রওশন সরকার, আবদুল সরকার, আফাজউদ্দিন সরকার, মানিকগঞ্জের আবদুল গনি সরকার, সায়েদ আলী সরকার প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

অনুবর্তন পর্বেও অধিকাংশ কবিয়ালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কম। কৃচিৎ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস কবিয়াল দেখা যায়। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম সঞ্জয় মল্লিক। তিনি এমএ পাস এবং একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। নারায়ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। গানের মরশুম শুরু হলে তাঁকেও কবিগান করতে হয়। তাঁর রচিত ধুয়া গানের সংখ্যা যথেষ্ট। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই কবিয়াল অন্যান্য কবিয়ালের তুলনায় যথেষ্ট ভিন্ন রুচির পরিচয় দেন। তাঁর গুরু অনেক অশ্লীল কথা আসরে উচ্চারণ করলেও তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের অনুবর্তন পর্বে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিয়ালের দেখা পাওয়া যায়। কলকাতা পর্বের মহিলা কবিয়াল বা ঝালোকাঠি পর্বের মহিলা কবিয়ালের তুলনায় এঁদের সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। এই মহিলা কবিয়ালদের মধ্যে সন্ধ্যা সরকার এবং মীরা সরকার বিশেষ জনপ্রিয়।

বাগেরহাট জেলার বেড়গজালিয়া গ্রামের সন্ধ্যা সরকার (জ. ১৯৫৪) বাগেরহাট মহিলা কলেজে পড়ার সময়ে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে গুরু করে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি গুরু রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। সেখানে শ্রীনিবাস সরকার, অমূল্য সরকার, নারায়ণ সরকার, অসীম সরকার, কালাচাঁদ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, তমাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্প দিনেই তিনি এতোটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, কলকাতার 'বর্তমান', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সানন্দা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া তাঁর ভালো না লাগায় অচিরে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। চিরকুমারী সন্ধ্যা সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান করছেন।

সন্ধ্যা সরকারের একজন যোগ্য উত্তরসূরি বাগেরহাটের হলদিবুনিয়া গ্রামের মীরা সরকার (জ. ১৯৭৭)। খুব অল্প বয়সে তিনি কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কবিগান শেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনাদিজ্ঞান সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনাদিজ্ঞান সরকারের শিষ্য হিসেবে ১৯৯০-এর দশকে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এমনকি নেপালে পর্যন্ত কবিগান করার সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়ি বাগেরহাটের দুর্গাপুর গ্রামে বাস করেন। কবিগান শেখা শেষ করে একুশ শতকের সূচনায় তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন।

৫. মেঘনার পূর্বাঞ্চলে কবিগান

মেঘনার পূর্ব তীরে অনেকগুলো জেলা হলেও সাতচল্লিশের দেশভাগের পর কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর প্রভৃতি জেলায় কবিগানের চর্চা একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। ষাটের দশকে তা পুনরায় শুরু হলেও এই অঞ্চলে নতুন কবিয়ালের আবির্ভাব একপ্রকার ঘটে না বললে চলে। তবে কবিগান শোনার প্রতি তাঁদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের আয়োজকগণ প্রধানত পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালদের, এবং কখনো কখনো চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়ালদের বায়না করে থাকেন।

অনুবর্তন পর্বে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের স্থানীয় কবিয়ালদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন চাঁদপুরের কালোশশী চক্রবর্তী (জ. ১৯২৫)। নোয়াখালীর রমেশচন্দ্র আচার্য (১৯০৭–১৯৭৪) এবং কুমিল্লার শচীন্দ্রকুমার শীলও (১৯১১–১৯৭৫) এই কালপর্বে বাংলাদেশে ছিলেন এবং কবিগান করেছেন। তবে এঁদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে কুমিল্লা নোয়াখালীতে বিশেষ কোনো কবিয়ালগোষ্ঠীর জন্ম হয় না। শতাব্দীর মাঝামাঝি এঁরা কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলে গান করলেও শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চলের অধিকাংশ কবিগানের আসরে বায়না পেতেন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কবিয়াল। এইসব অঞ্চলের কবিগানের যাঁরা শ্রোতা তাঁদের বড়ো একটি অংশ পুরনো ধারার কবিগান শুনতে আগ্রহী হওয়ায়, পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ এখানে কবিগান পরিবেশনে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং সঙ্গত কারণেই পদ্মার দক্ষিণ অঞ্চলের কবিয়ালরাই এই অঞ্চলে বেশি বায়না পেতেন। আবার রমেশ আচার্য, শচীন শীল, বা কালোশশী চক্রবর্তী যে ধাঁচের কবিগান গাইতেন, তা শুনতেও এই অঞ্চলের মানুষ খুব একটা আগ্রহী হতো না। এর ফলে রমেশচন্দ্র আচার্যের মতো ভালো মানের কবিয়ালেরও বায়না হয় না, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে তাঁকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বিশ শতকের শেষার্ধে এখানে দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিজয়কৃষ্ণ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নারায়ণ সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার, সন্ধ্যা সরকার প্রমুখ এসে কবিগান করেন।[২৪]

মেঘনার পূর্বতীরে কবিগানের সবচেয়ে উজ্জ্বল কেন্দ্র হলো চট্টগ্রাম। রমেশ শীল (১৮৭৭–১৯৬৭) হলেন এই অঞ্চলের প্রাণ। পূর্বের অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু উনিশ শো ষাটের দশকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সহযোগীগণ বাংলাদেশের কবিগান পরিবেশন অব্যাহত রাখেন। তাঁর কবিগান পূর্ব

---

[২৪] যেমন ১৯৮৯–৯০ মরশুমে স্বরূপেন্দু সরকার বরিশালের ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, খুলনার কৃষ্ণকান্ত সরকার, ফরিদপুরের গৌরাঙ্গ সরকার এবং বাগেরহাটের দিগেন সরকার প্রমুখের বিপক্ষে চাঁদপুর জেলার সুবিদপুর, উচ্চঙ্গা, বাগপুর, গঙ্গারাম, হরিশকুল, বাহাদুরপুর, নোয়াখালী জেলার মাইজদি প্রভৃতি স্থানে কবিগান পরিবেশন করেছেন। একই সময়ে এঁরা ঢাকা জেলার জয়পাড়া, কার্তিকপুর বাজার, ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকাতেও গান করেন। দ্রষ্টব্য, স্বরূপেন্দু সরকারের কবিগানের চুক্তিপত্র, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ (১৯৮৭–৮৮ সাল)।

থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অর্জন করার ফলে দ্বিজাতিতাত্ত্বিক নতুন পাকিস্তানে তিনি জনপ্রিয়তা হারাননি। বরং তাঁর দেখাদেখি বহু মুসলমান কবিয়ালের জন্ম হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রমেশ শীল সম্পর্কে সামান্য মন্তব্য করা হয়েছে। অনুবর্তন পর্বের কবিগানের যে হ্রস্বতা, তা সৃষ্টির পেছনে রমেশ শীলের অবদান নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। তবে একই সঙ্গে স্বীকার্য যে, রমেশ শীলের সমকালেও চট্টগ্রামে দু-এক পালা সনাতন পদ্ধতির কবিগান হয়েছে, এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর এক ধরনের ইসলামি কবিগানও চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রমেশ শীল চেয়েছিলেন কবিগানের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন। এজন্য তিনি ধুয়া গান ও পাঁচালি ভিত্তিক কবিগানকে আদর্শ মনে করেছিলেন। এমনকি ঐ অঞ্চলের সব কবিয়াল যাতে অভিন্ন আদর্শের প্রতি নিবিষ্ট থাকে, সেজন্য ১৯৪৩ সালে কবিয়ালদের নিয়ে একটি সমিতিও গঠন করেছিলেন। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি, সহসভাপতি ছিলেন হেদায়েত ইসলাম খান, সম্পাদক ছিলেন ফণী বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দে, সদস্য ছিলেন তারাচরণ দাস, সারদাচরণ বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস, বরদাচরণ দে এবং শৈলেন সেন। যতোটা জানা যায়, কবিয়ালদের নিয়ে কোনো সমিতি এই প্রথম।[২৫]

রমেশ শীল নিজে তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়াকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও সেখানকার কবিগানে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের কবিগানে মুসলমান কবিয়ালের সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। বিশ শতকের শেষার্ধে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাঁরা কবিগান করেন, তাঁদের ধর্মপরিচয় বিবেচনা করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগান করেছেন, রমেশ শীলকে ধরে নিয়ে তাঁদের সংখ্যা প্রায় দেড় শত। এঁদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নরূপ: ১. অজিউল্লাহ সরকার, ২. অনিল ধর. ৩. অনিল সরকার, ৪. অরুণ বড়ুয়া, ৫. অর্জুন সরকার, ৬. অশ্বিনী দাশ (জ. ১৯৪৯), ৭. আজগর আলী, ৮. আজিজুর রহমান (জ. ১৯৫২), ৯. আবদুল আজিজ (জ. ১৯৬০), ১০. আবদুল মান্নান (জ. ১৯৫৪), ১১. আবদুল লতিফ (জ. ১৯৪৫), ১২. আবদুল শহীদ (জ. ১৯৪৮), ১৩. আবু বক্কর, ১৪. আলতাপ মিয়া, ১৫. আশীষ কুমার ধর (জ. ১৯৪৮), ১৬. আহমদুর রহমান (১৯২৪–), ১৭. এজাহার মিয়া, ১৮. এম আর আলী শেখ, ডাঃ, ১৯. এস এম নূর-উল-আলম (১৯৫১–), ২০. ইব্রাহীম সরকার, ২১. ইয়াকুব আলী (১৯৩১–১৯৯৫), ২২. ইলিয়াছ সরকার, ২৩. ইসমাইল সরকার, ২৪. কল্পতরু ভট্টাচার্য (জ. ১৯৪৭), ২৫. কাজল ভট্টাচার্য (জ. ১৯৬৭), ২৬. কানাইলাল

[২৫] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ১০৭। উনিশশো সত্তরের দশকের শেষে অনুরূপ একটি সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকার। তবে তা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৪২।

শীল, ২৭. কামাল উদ্দীন, ২৮. কামিনী ভেণ্ডার, ২৯. কামিনীমোহন নাথ, ৩০. কালাম মিয়া ফারুকী (জ. ১৯৪৬), ৩১. কুঞ্জমোহন বড়ুয়া (জ. ১৯৪৫), ৩২. গনজম আলী, ৩৩. গোপাল চক্রবর্তী, ৩৪. গৌরচাঁদ সরকার, ৩৫. খগেন্দ্রলাল দে (জ. ১৯৩৯), ৩৬. খায়ের আহমদ, ৩৭. খুকী রানী শীল (জ. ১৯৪৯), ৩৮. গোবিন্দ সরকার, ৩৯. গোলাম সোবহান (জ. ১৯৫০), ৪০. চক্রপাণি ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫৪), ৪১. চপলা ভট্ট, ৪২. ছাবের সরকার, ৪৩. জগদীশচন্দ্র বসু (জ. ১৯৪৭), ৪৪. জগদীশ চক্রবর্তী, ৪৫. জয়ন্তকুমার নাথ (জ. ১৯৫৮), ৪৬. জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (জ. ১৯৫৭), ৪৭. জীবনকৃষ্ণ দাস, ৪৮. টুনু মিঞা সরকার, ৪৯. ডিএল দাস, ৫০. তরণীসেন দেয়ারী (জ. ১৯১৩), ৫১. তেজেন্দ্রলাল দে (জ. ১৯৫০), ৫২. দিলীপকুমার ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫২), ৫৩. দিলীপ দাশ (জ. ১৯৪৮), ৫৪. নজু মিয়া, ৫৫. ননীগোপাল আচার্য, ৫৬. ননীগোপাল সরকার, ৫৭. নবীন ঠাকুর, ৫৮. নাদেরুজ্জামান, ৫৯. নিকুঞ্জ শীল, ৬০. নিকুঞ্জ সরকার, ৬১. নিত্যানন্দ সরকার, ৬২. নিবারণ শীল, ৬৩. নিরঞ্জন চক্রবর্তী (জ. ১৯৪৯), ৬৪. নিরঞ্জন দাস, ৬৫. নিরঞ্জন সাধু সরকার, ৬৬. নুরুল হক (জ. ১৯৪৭), ৬৭. নূরুল হুদা, ৬৮. নূর আহমদ সরকার (১৯১৪–১৯৮৫), ৬৯. পরিতোষ বড়ুয়া, ৭০. পুলিনবিহারী পাল, ৭১. পূর্ণচন্দ্র চাকমা, ৭২. প্রফুল্ল শীল, ৭৩. প্রশান্ত চৌধুরী (জ. ১৯৫৯), ৭৪. ফজল আহমদ, ৭৫. ফণী বড়ুয়া (১৯১৫–২০০১), ৭৬. বাবুল কান্তি দাশ (জ. ১৯৫৪), ৭৭. বাবুল বিশ্বাস, ৭৮. বিএম ফরিদ জামান (জ. ১৯৫৬), ৭৯. বিনন্দ সাধু, ৮০. বিপিন ঠাকুর, ৮১. বিভূতিরঞ্জন নাথ (১৯৩৪–),৮২. বিষ্ণুপদ সরকার (জ. ১৯৫৪), ৮৩. ব্রজহরি সরকার, ৮৪. মকবুল সরকার, ৮৫. মণিবালা সরকার, ৮৬. মতিলাল বড়ুয়া, ৮৭. মধুসূদন নাথ, ৮৮. মনীন্দ্র সরকার (১৯০০–২০০০), ৮৯. মনীন্দ্র দে, ৯০. মনীন্দ্র লাল সাধু, ৯১. মফিজর রহমান, ৯২. মহেন্দ্রলাল দাস, ৯৩. মাধুরী ভট্টাচার্য, ৯৪. মানিক শীল (জ. ১৯৪৬), ৯৫. মিলন শীল (জ. ১৯৪৮), ৯৬. মিলন সরকার, ৯৭. মুহাম্মদ ছৈয়দ, ৯৮. মোস্তাক আহমেদ (জ. ১৯৫২), ৯৯. মোহাম্মদ আবু ইউসুপ (জ. ১৯৫৮), ১০০. মোহাম্মদ ইলিয়াছ সরকার (জ. ১৯৩১), ১০১, মোহাম্মদ হোসেন পণ্ডিত (জ. ১৯২৮), ১০২. যজ্ঞেশ্বর শীল, ১০৩. রতন কুমার দাশ (জ. ১৯৬৫), ১০৪. রতন বড়ুয়া (জ. ১৯৬২), ১০৫. রনজিত কুমার কর (জ. ১৯৪৮), ১০৬. রমণীমোহন দেব (১৯০৫–১৯৭১), ১০৭. রমেশ শীল (১৮৭৭–১৯৬৭), ১০৮. রাইগোপাল দাস (১৯১৮–১৯৮৭), ১০৯. রাখাল দাশ (জ. ১৯৩৯), ১১০. রাখাল মালাকার (১৯৩৫–), ১১১. রাজারাম সরকার, ১১২. রায়মোহন বড়ুয়া, ১১৩. লিয়াকত আলী (জ. ১৯৫৩), ১১৪. শশী সরকার, ১১৫. শামসুল আলম (জ. ১৯৫৪), ১১৬. শিমুল সরকার, ১১৭. শিশির নন্দী, ১১৮. সন্তোষকুমার দে (জ. ১৯৬২), ১১৯. সন্ধ্যা ঠাকুর, ১২০. সরকার কমল দাশ (জ. ১৯৫৯), ১২১. সাধন আচার্য, ১২২. সাধন সরকার, ১২৩. সারদা বড়ুয়া, ১২৪. সুজনবন্ধু ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫১), ১২৫. সুনীলকান্তি দাশ (জ. ১৯৩৮), ১২৬. সুবল শীল (জ. ১৯৬৩), ১২৭.

সুবল সরকার (ডাক্তার), ১২৮. সুরেন্দ্রনাথ পুরোহিত, ১২৯. সুরেশ বড়ুয়া, ১৩০. সুশীল সরকার, ১৩১. স্বপনকুমার দে (জ. ১৯৫০), ১৩২. হরগোবিন্দ, ১৩৩. হরিকৃষ্ট ঠাকুর, ১৩৪. হরিপদ দেয়ারী (জ. ১৯৫২), ১৩৫. হেদায়েত ইসলাম খান।[২৬]

মোট ১৩৫ জন কবিয়ালের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ জন অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ কবিয়াল মুসলমান। বৃহত্তর জেলার হিসেবে এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের অন্য যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামের এই কবিয়ালসংখ্যাও যেমন অস্বাভাবিক বেশি, মুসলমান কবিয়ালের হারও অস্বাভাবিক হারে বেশি। রমেশ শীল কবিগানকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলতে পেরেছিলেন বলে এমন বৃদ্ধি হয়তো সম্ভব। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এমন বিপুল সংখ্যক কবিয়ালের আবির্ভাব থেকে মনে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার ফলে কবিগান অনেকটা সহজ হওয়ায় এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া বিশ শতকের শেষার্ধের চট্টগ্রামে দাঁড়াকবির মতো কবিগানের লিখিত পালা মুখস্থ করে কবিগান করার মতো বহু শখের দলের জন্ম হয়, এঁরাও কবিয়ালের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি করতে পারেন। বস্তুত তেমন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব উদ্যোগে কবিয়াল ইয়াকুব আলী 'কবিগান' নাম দিয়ে এক ধরনের কবিগানের পালা প্রকাশ করেছিলেন, যা মুখস্থ করে যথারীতি কবিগান পরিবেশন করা সম্ভব ছিলো।[২৭] পাকিস্তান সৃষ্টির পর রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে কবিগানের আসর হতো। নতুন কবিয়াল সৃষ্টি করার কাজে এই অনুষ্ঠানের ভূমিকা থাকাও স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের বিষয়বস্তুর দিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সাতচল্লিশের পূর্বে রমেশ শীল এবং তাঁর সহযোগীগণ যেখানে বামপন্থি আদর্শ প্রচারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সাতচল্লিশ সালের পর সেই আদর্শ প্রচার একরকম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রমেশ শীলকেও তখন এমন গান গাইতে বাধ্য করা হয়, যা তাঁর পূর্ববর্তী আদর্শের বিপক্ষে যায়। তাঁর অনেক সহযোগী বামপন্থাকে সমালোচনা করেও গান গাইতে শুরু করেন। বিশেষভাবে এ সময়ে যে সকল কবিয়াল রেডিওতে কবিগান করতেন, তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিলো রমেশ শীলদের মতো প্রচারণামূলক; তবে আদর্শিক দিক দিয়ে তা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটির। যেমন তখন রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচারিত কবিগানের বিষয়বস্তু ছিলো: পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের

---

[২৬] কল্যাণী ঘোষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮); এস এম নূর-উল আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩); এবং মাহবুবুল হক ও শিশির দত্ত সম্পা., *সমকালের কবিয়াল* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, ২০০৭) গ্রন্থ থেকে এই কবিয়ালদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

[২৭] ইয়াকুব আলী, *কবিগান* (চট্টগ্রাম: গ্রন্থকার, ১৯৬৭)। সংকলনটিতে ৩৭টি গান রয়েছে, তার মধ্যে ৫টি জোটক, অন্যগুলো পাঁচালি গান বা পালাগানের মতো। এসব গানের বিষয় পাকিস্তানি জাতীয়তা, যুদ্ধ ও শান্তি, জিন্নাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, ভারতবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রচার, প্রভৃতি।

গুণগান, সরকারি কর্মসূচির প্রচারণা, ইসলামের গুণকীর্তন, ভারতবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। কবিয়াল ইয়াকুব আলীর প্রকাশিত 'কবিগান' গ্রন্থটিতে এই আদর্শের বেশ কয়েকটি কবির পালা সংকলিত হয়। বেশ কয়েকজন কবিয়াল তখন ইয়াকুব আলীর অনুসারী ও সহযোগী ছিলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা এসব কবির পালা পরিবেশন করতেন।[২৮] ইয়াকুব আলী পরিবেশিত কবিগান কেমন ছিলো, তা উপলব্ধির স্বার্থে তাঁর রচিত কবিগানের একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হলো। তাঁর 'পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে ও বিপক্ষে' শীর্ষক জোটকটি নিম্নরূপ:

ধুয়া বন্ধু শুন মূল বিষয়।
পরিবার পরিকল্পনা কেন করা হয় ॥

পক্ষে যেইভাবে জ্যামিতিক হারে মানুষ বাড়ে দেশে।
এমনটি বাড়তে থাকিলে উপাস মরবে শেষে।
ঘন ঘন সন্তান হলে দুর্বল হয় প্রসূতি
(শিশুর) খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান সব দিকে দুর্গতি।
(তাই) হুষের মানুষ চিন্তা করেন থাকিতে সময়
কোনো ভালো কাজ পরিকল্পনা বিনে নাহি হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে আচ্ছা দাদা একটা কথা লোক মুখে শুনি
গুনা হবে বলে লোকে করে কানাকানি।
সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা দিবেন পরিচয়
তোমার কথা মানব কেন গুনা যদি হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে শুনরে ভাই গুনার কথা তাহাদের নাই জানা,
ভ্রূণ হত্যা করলে জানি ধর্মমতে গুনা।
গর্ভধারণ করার আগে যদি রোধ করে
গর্ভপাত না ঘটালে দোষ হইতে নারে।
শরীয়তের আলেমগণও এমন কথা কয়.
সময়মত জন্ম নিরোধ করা ভাল হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে এইবার তবে আর এক প্রশ্ন করি উত্থাপন,

[২৮] এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৯৯। নূর-উল-আলম দাবি করেন যে, ইয়াকুব আলীর কোনো সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলো না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীলকান্তি দাশ প্রমুখ কবিয়াল ইয়াকুব আলীর শিষ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

কোন বয়সে করতে হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ।
ছেলে মেয়ে একেবারে যদি নাহি হয়
বংশ রক্ষা নাহি হলে দুঃখের বিষয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে
বংশ রক্ষা নাহি হওয়ার কোন কারণ নাই
ইহা করবে ছেলে মেয়ে তিন চারটি জন্মাই।
অথবা একটি শিশু জন্মাইবার পর
বিরতি রাখিতে পার তিন চার বৎসর।
এইভাবে জন্মিলে শিশু অধিক নাহি হয়
নাহি ঘটে স্বাস্থ্যহানি অপমৃত্যুর ভয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে
বিরতি রাখিতে পারি কেমন করিয়া
কি ব্যবস্থা আছে তাহা বল প্রকাশিয়া।
স্বাভাবিক গতিতে দেখি শিশু জনম লয়
মানুষের ইচ্ছাতে কি আর ছেলে মেয়ে হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে
মানুষের ইচ্ছাতে হবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ
প্রকৃতির উপরে নির্ভর করবে কি কারণ।
কনডন কিংবা বার্থ কন্ট্রোল বটি ব্যবহারে
ইচ্ছামত ছেলে মেয়ে জন্ম দিতে পারে।
প্লাস্টিক কয়েল জন্মনিরোধ নিঃসন্দেহে হয়
(এটি) লাগানো থাকিলে রয় না গর্ভ হওয়ার ভয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে
তাহলে তো প্লাস্টিক কয়েল নির্ভরযোগ্য বেশী
(সেটার) মূল্য কত কোথায় পাবো বলুন তো প্রকাশি।
আর কি কি ব্যবস্থা আছে বলুন সে বিষয়
এই ব্যাপারে যাহা জানেন বলুন সমুদয়।
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে
শহর বন্দর পল্লীগ্রামের প্রতিটি থানায়
পরিবার পরিকল্পনার অফিস দেখা যায়।
নিকটবর্তী যেই কোনটায় যদি তুমি যাবে
সময়মত উপযুক্ত পরামর্শ পাবে।
(তাঁরা) বিনামূল্যে অথবা কিছু নামমাত্র দাম নিয়া
সাহায্য করেন প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দিয়া।

কনডন কিংবা কয়েল লাগান যেটি ইচ্ছা হয়
অপারেশন করা চলে হলে ঠিক সময় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে আচ্ছা দাদা এইসব হল জন্ম নিয়ন্ত্রণে
বন্ধ্যা যাঁরা শিশুর মুখ দেখে নাই জীবনে।
তাদের জন্য কি ব্যবস্থা পরিকল্পনায়
বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইবার বল আছে কি উপায়।
নাকি শুধু কম জন্মাইবার কথাবার্তা কয়
(শিশু) হয়নি যাদের তাদের বল কি ব্যবস্থা হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যেমন
সুখী সুন্দর পরিবার করিতে গঠন।
বন্ধ্যাত্বও ঘুচাতে পারে সুব্যবস্থা করি
পরামর্শ নিতে পারেন বন্ধ্যা নর নারী।
অস্বাভাবিক গঠনভঙ্গি কিংবা নানা রোগ
বিভিন্ন ব্যতিক্রম কিংবা দৈহিক গোলযোগ।
যেই কোন কারণে যদি বন্ধ্যা কেহ হয়।
পরামর্শ নিলে ভাল হইবে নিশ্চয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

বিপক্ষে তাহলে তো নিঃসন্দেহে বড় সুখবর
সবার জন্য এই ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর।
ভাগ্যের উপর নির্ভর করে জন্মানো নয় ভাল
মাতা পিতার ইচ্ছামত জন্মাইতে বল।
(যদি) বিরতির পর বিলম্বেতে তিন চারিটি হয়
কি করি কাটাবো শিশুর অকালমৃত্যুর ভয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥

পক্ষে (দেখ) সযত্নে রক্ষিত ধন দিনে দিনে বাড়ে
অযত্নে রাখিলে তাহা যায় ছারে খারে।
গাভী দেখ একটিমাত্র বাচ্চা প্রসব করে
একই সঙ্গে দশটা ছানা প্রসবে কুকুরে।
(আরও) গরুর গোস্ত খায় মানুষে, কুকুর নাহি খায়
গরু তবু কুকুর থেকে অধিক দেখা যায়।
(কারণ) যত্নে বাঁচে অযত্নে তার অকাল মৃত্যু হয়।
(এমন) সরল সোজা যুক্তির ভিতর আছে মূল বিষয় ॥

বন্ধু শুন মূল বিষয়।
পরিবার পরিকল্পনা কেন করা হয় ॥[২৯]

চট্টগ্রামে সনাতনী ধারার কবিগানও পাশাপাশি চালু ছিলো। কবিয়াল এস এম নূর-উল-আলম ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের একটি কবিগানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান যে, রাত নয়টার দিকে গান শুরু হয়, প্রথমে ডাক ও মালশি গান পরিবেশিত হয়, এবং পরে টপ্পা গান গাওয়া শেষ হলে মূল কবিয়াল আসরে এসে ছড়া-পাঁচালির জন্য দাঁড়ান।[৩০]

অর্থাৎ অনুবর্তন পর্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান অন্তত তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো: প্রথমত সনাতনী পদ্ধতির কবিগান, দ্বিতীয়ত রমেশ শীলের বামপন্থি আদর্শের কবিগান, এবং তৃতীয়ত পাকিস্তান সৃষ্টির পর দ্বিজাতিতাত্ত্বিক আদর্শের কবিগান। এই তিন আদর্শের মধ্যে শেষ পর্যন্ত রমেশ শীল-পন্থিরাই জয়ী হন। বিশ শতকের শেষার্ধে চট্টগ্রামে যে অসংখ্য কবিয়ালের নাম জানা যায়, তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভাবান কবিয়ালের সংখ্যা খুব বেশি নয়, এবং তাঁদের প্রায় সকলেই রমেশ শীলপন্থি, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এমন কয়েকজন কবিয়াল সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

প্রথমেই নাম করতে হয় ফণী বড়ুয়ার (১৯১৫–২০০১)। বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো পূর্ববঙ্গ পর্বেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন রমেশ শীলের শিষ্য এবং দীর্ঘদিন তিনি রমেশ শীলের বিপরীতে জোট বেঁধে কবিগান করেছেন। ফলে রমেশ শীলের নামের সঙ্গে তাঁর নামটি প্রায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিশ শতকের শেষার্ধে তিনি শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই কবিগান করেননি, ঢাকা শহরের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে বহুবার কবিগান পরিবেশন করেছেন। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩১]

কবিয়াল ফণী বড়ুয়ার কবিগানের প্রকৃতি বোঝার জন্য তাঁর রচিত ধুয়া গান যথেষ্ট।[৩২] যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস প্রমুখের নামে হুলিয়া জারি হলে কিছুকালের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে কবিয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করেন, সেই গানে বিপক্ষে ছিলেন রাইগোপাল দাস। চিত্রটির পরিচালক ছিলেন শান্তি চৌধুরী।

---

[২৯] ইয়াকুব আলী, *কবিগান*, পৃ. ৭১–৭৪।

[৩০] এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃ. ৯৭।

[৩১] এস এম নূর-উল-আলম লিখেছেন ফণী বড়ুয়াকে ২০০০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাস্তবে ২০০০ সালে কাউকেই বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। ফণী বড়ুয়া এ সময়ে অন্য কোনো পুরস্কার পেয়ে থাকবেন। এস এম নূর-উল-আলমের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃ. ৬৭।

[৩২] পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য।

অনুবর্তন পর্বে চট্টগ্রামের কবিয়ালদের মধ্যে কবিয়াল ইয়াকুব আলী, বিভূতিরঞ্জন নাথ, রাখাল মালাকার, রাখাল দাশ, মানিক শীল প্রমুখ কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে বিভূতিরঞ্জন নাথ ১৯৬৩ সাল থেকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত কবিয়াল ছিলেন। কাছাকাছি সময়ে কবিয়াল ইয়াকুব আলী, রাখাল মালাকার ও রাখাল দাশ চট্টগ্রাম এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেছেন। নবীন কবিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান মানিক শীল। তাঁর স্ত্রী খুকী রানী শীলও একজন বিখ্যাত কবিয়াল। বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে মানিক শীল চট্টগ্রাম ও ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে কবিগানের আমন্ত্রণ পান। ঢাকার আমন্ত্রণগুলোর মধ্যে ১৯৮৯ সালে টিএসসিতে, ১৯৯০ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে, ১৯৯২ সালে গণ সাহায্য সংস্থার অনুষ্ঠানে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ও শিল্পকলা একাডেমীতে, এবং ১৯৯৫ সালে ঢাকা বইমেলার কবিগান উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ১৯৮৯ সালে বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে মানিক শীল ফণী বড়ুয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ও শান্তি শীর্ষক কবিগান করেছিলেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগানের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য এখানে উভয় পক্ষের কবিয়াল বিশেষ কোনো ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না। তাঁরা দুটি বিষয় অবলম্বন করে বিতর্ক করেন। বিশ শতকের শেষার্ধে এমন কয়েকটি জনপ্রিয় বিতর্কের বিষয় হলো: সত্য ও কলি, অতীত ও বর্তমান, ধর্ম ও বিজ্ঞান, নারী ও পুরুষ, একাল ও সেকাল, ধন ও বিদ্যা, ধনী ও গরিব, স্বর্গ ও নরক, আসমান ও জমিন, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, গণসংস্কৃতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও শান্তি, কৃষক ও জোতদার, মহাজন ও খাতক ইত্যাদি। আবার চট্টগ্রাম অঞ্চলের যেসব কবিগান একচেটিয়াভাবে প্রচারণামূলক, তেমন কবিগানের বিষয়ের মধ্যে স্বরাজ আন্দোলন, গণ আন্দোলন, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিক্ষা, শান্তি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী নির্যাতন, ক্ষুধা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, ধরা, বন্যা, মারী, শোষণ, হনন, মারণ, কাড়ন, সন্ত্রাস দমন, চরিত্র গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩৩]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়ালদের পাশাপাশি দোহার ও যন্ত্রসঙ্গতকারী হিসেবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঢুলি বিনয়বাঁশী জলদাস বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া এই অঞ্চলের খ্যাতিমান দোহার ও যন্ত্রসঙ্গতকারীদের মধ্যে বোয়ালখালী থানার ভাণ্ডালজুরী গ্রামের উপেন্দ্র দাশ, আনোয়ারা থানার নিবারণ, বিলপুর গ্রামের আবদুল আজিজ, সাতকানিয়া থানার কাটগড় গ্রামের গমনী, স্বর্ণ বাইন, শংকর, কালিয়াইশ গ্রামের নিত্যলাল, জ্ঞানচন্দ্র জলদাশ, চন্দনাইশ থানার বৈলতলী গ্রামের তীর্থবাসী, অর্ণব শীল, দুর্গাদাস, সারদা, রসিক, রমেশ বলী, গাছবাড়িয়া গ্রামের দুলালচন্দ্র নাথ, রমণী নাথ, রাউজান থানার পাঁচখাইন গ্রামের রাইমোহন, সূর্য, সতীশ বাইন, লোহাগাড়া থানার আমিরাবাদের সুরেশ বাইন, হরিশ, মনোমোহন, পদুয়া গ্রামের সুধন্বা, সীতানাথ, বাঁশখালী থানার

[৩৩] এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃ. ৯।

জলদি গ্রামের তরণী, গোপাল, হিমাংশু, রণজিৎ, মতি, প্রশান্ত চক্রবর্তী, পটিয়া থানার আজিমপুর গ্রামের মিলন সরদার, উত্তর চক্রশালার ননাই ঘোষ, ছনহরা গ্রামের টুকু, রাখাল দাশ, চাটরা গ্রামের রাখাল দাশ, মেলঘর গ্রামের জীবন দাশ, দক্ষিণ ভূর্ষি গ্রামের অন্নদা বাইন, বোয়ালখালী থানার ছনদরিয়া গ্রামের বাবুল দাশ, সুনীল দাস, নিরঞ্জন সেন, চট্টগ্রাম শহরস্থ গঙ্গাবাড়ির তরণী বাইন, আনোয়ারা থানার ভীমা, টুনু ও তপন মিত্র প্রমুখের নাম সংগ্রহ করেছেন এস এম নূর-উল-আলম।[৩৪]

৬. পশ্চিমবঙ্গে কবিগান

বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববঙ্গে যখন কবিগানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগান বিলুপ্ত হয়। রাজশাহী বংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকা নিয়ে যে উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তা পূর্ববঙ্গের থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধিক নিকটবর্তী হওয়ায়, সেখান থেকেও কবিগান উঠে যায়। বিশ শতকের সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলে কবিগান তাই ছিলো না বললেই চলে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ব্যাপক হারে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন ঘটায় পূর্ববঙ্গের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে এভাবে পূর্ববঙ্গের অভিবাসিত কবিগান প্রাধান্য লাভ করে।

প্রসঙ্গত স্বীকার করা কর্তব্য যে, খ্যাতিমান কবিয়ালের আবির্ভাব না ঘটলেও বিশ শতকের উল্লিখিত সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও কবিগানের ক্ষীণ একটি ধারা চালু ছিলো। বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বেশ কয়েকজন কবিয়াল বিশ শতকের সূচনায়ও কবিগান চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবিগানের তুলনায় তা নানা দিক দিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। তাই ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ পর্বের অসংখ্য কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কবিগান করতে শুরু করায় পশ্চিমবঙ্গের এই কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, তখন পূর্ববঙ্গের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে নতুনভাবে সমাদৃত হতে থাকে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গে অনুবর্তন পর্বের কবিগানকে অন্তত দুই ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা যায়: গতানুগতিক ধারার পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগান, এবং পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্করণ।

অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের সরকারি অনুষ্ঠানে কবিগানের আয়োজনে উভয় ধারার কবিয়ালগণ নিয়মিতভাবে আমন্ত্রণ পান। সরকারের লোকশিল্প পৃষ্ঠপোষণার অংশ হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনে তাঁদের নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান হয়। এর ফলে কবিয়াল এবং সহশিল্পীদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। অনেকে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেও কবিগান চর্চার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এঁদেরই একজন পুলকেন্দু

[৩৪] এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃ. ছয়।

সিংহ। 'লোকায়ত শিল্পী সংসদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন জেলার কবিয়ালদের নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন।[৩৫]

পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিগান

পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের ধারায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদিঘি থানার জিনদিঘি গ্রামের শেখ গুমানী দেওয়ান (১৮৯৫–১৯৭৬)। জনার্দন কর্মকার ছিলেন তাঁর কবিগানের গুরু। জনার্দন কর্মকার এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণ ঐ অঞ্চলে সনাতনী ধারার কবিগানকে ধারণ করে থাকবেন। প্রথম দিকে শেখ গুমানী দেওয়ান হয়তো সেই প্রাচীন রীতির কবিগান শিখেছিলেন। কিন্তু কবিগানের প্রতি বামপন্থি তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি পড়ায় রমেশ শীলের অনুরূপ শেখ গুমানী দেওয়ানকেও তাঁরা নির্বাচন করেছিলেন। চট্টগামের রমেশ শীলের বিপক্ষে শেখ গুমানী দেওয়ানের পরিচয় এবং একজোটে কবিগান পরিবেশিত হওয়ার সূত্র এটাই। রমেশ শীল ঠিক যেভাবে সংক্ষিপ্ত কবিগান পরিবেশন করতেন, শেখ গুমানী দেওয়ানকেও অনুরূপ সংক্ষিপ্ত গান পরিবেশন করতে দেখে এই অনুমান সমর্থিত হয়।

রমেশ শীলের মতো শেখ গুমানী দেওয়ানের গানেও যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, কুশাসন, মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে তিনি জীবন উড়ে, আশুতোষ সাহা, শশিভূষণ মুচি, জীবনকৃষ্ণ উড়ে, কুচিল ডোম, বসন্তকুমার ধানুকি, দেবেন ডোম (দাস), লম্বোদর চক্রবর্তী, কমলাকান্ত মণ্ডল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রায় সব কবিয়ালের বিপক্ষেও তিনি কবিগান করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রমেশ শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ফণী বড়ুয়া, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার প্রমুখ কবিয়াল।[৩৬] শেখ গুমানী দেওয়ানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কণ্ঠ ছিলো অসাধারণ। এজন্য সমকালে তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে গুমানীর ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এঁদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' খেতাব এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

শেখ গুমানী দেওয়ানের প্রতিপক্ষের কবিয়ালদের কারো বাড়ি মুর্শিদাবাদ, কারো বাড়ি বর্ধমান, কারো বাড়ি বীরভূম। এ থেকে মনে হয় বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ

---

[৩৫] পুলকেন্দু সিংহ, "অগ্রচারিণী লোককবি দুলালী চিত্রকর," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃ. ১৭৭।

[৩৬] কলকাতায় রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে শেখ গুমানী দেওয়ানের কবিগানের একটি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন জঙ্গলরাম হেল্লা। এই গানে রাজেন্দ্রনাথ 'সরকার' এবং গুমানী 'নাগরিক'-এর ভূমিকায় কবির লড়াই করেছিলেন। জঙ্গলরাম হেল্লা, "শেখ গুমানী দেওয়ানঃ এক অনন্য লোককবি," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, ১৭২–৭৩।

পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের নতুন একটি ধারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এই কবিগান আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতায় প্রচলিত কবিগান থেকে আলাদা ছিলো, এমনকি কবিগানের অপভ্রংশ তরজা গান থেকেও। বরং নতুন পর্যায়ের এই কবিগানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের কবিগানের। তাই পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়াল রমেশ শীল বা যশোর অঞ্চলের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বিপক্ষে কবিগান করতে শেখ গুমানী দেওয়ানের কোনো অসুবিধা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের এই ধারা অনুবর্তন পর্বে বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কিছু স্বাতন্ত্র্য অনুবর্তন পর্বেও রয়ে যায়। এই স্বাতন্ত্র্য যেমন পরিভাষাগত, তেমনি আঙ্গিক এবং বিষয়গতও। প্রসঙ্গত কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গীয় ধারায় কবিয়াল কখনো কখনো ছড়াদার নামে, কখনো পাল্লাদার নামে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিগানকে বলা হয় কবির লড়াই। পূর্ববঙ্গে যাঁরা দোহার নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের বলা হয় দোহারকি। পূর্ববঙ্গে যা ডাক গান, পশ্চিমবঙ্গে তা মহড়া গান। এই ডাক গান পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে দোহারগণ দাঁড়িয়ে পরিবেশন করেন, তাঁরা নিজেরা কোনো যন্ত্র বাজান না। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের দোহারকিগণ মহড়া পরিবেশনের সময়ে নিজেরা খঞ্জনি বাজান। পূর্ববঙ্গের কবিগানে ডাক গানের পরপরই কবিয়াল আসরে প্রবেশ করে একখানা ধুয়া গান পরিবেশন করেন, তারপরে সেই ধুয়া গানের সুরে ছড়া কাটেন, যে ছড়া সাধারণত ত্রিপদী ছন্দের হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে মহড়া গানের পরপরই কবিয়াল আসরে ওঠেন, আসরে উঠেই তিনি ছড়া কাটতে থাকেন, এই ছড়ার প্রথম অংশে থাকে গুরুবন্দনা এবং পরের অংশে থাকে কালীবন্দনা। কালীবন্দনা বিষয়ক ছড়ার নাম 'মাইকা ছড়া'। ছড়ার এই ধরনের নাম পূর্ববঙ্গের কবিগানে অনুপস্থিত। অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানে 'পাঁচালি' নামে যা পরিবেশিত হয়, পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে তা ধুয়া গানের সমতুল্য। পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে পাঁচালি হলো ধুয়া গানের সুরে ও তালে রচিত ত্রিপদী ও পয়ার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুধু গানটিই 'পাঁচালি' নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের কবিগানে প্রথম কবিয়ালের প্রশ্ননির্ভর আসরকে সাধারণত বেড় এবং উত্তরনির্ভর আসরকে সাধারণত জবাব বলা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতিতে তা যথাক্রমে চাপান ও উতোর, যা উনিশ শতকীয় কবিগানের পরিভাষার সঙ্গে মেলে।

পূর্ববঙ্গের কবিগানের শেষ অংশ জোটের পাল্লা বা জোটক, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের এই অংশের নাম বোল-কাটাকাটি। জোটের পাল্লার মতোই এই বোল-কাটাকাটির গঠন। অর্থাৎ এই অংশে উভয় সরকার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছন্দিত বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। পূর্ববঙ্গ পর্বে এই ধরনের গানের মধ্যে আলাদাভাবে কোনো গান পরিবেশন করতে দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পর্বে এমন তর্কযুদ্ধের মধ্যেও কবিয়াল আলাদা একটি গান ধরে দিতে পারেন। এই ধরনের গানের নাম 'ঠেস পাঁচালি'। এই ধরনের ঠেসপাঁচালিতে পরস্পরকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে দেখা যায়, যা মালফুকারের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও অনুবর্তন পর্বের পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের কিছু কিছু তফাত লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গীয় কবিগানে ঢোলের সঙ্গে কাঁসি একটি আবশ্যকীয় বাদ্যযন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে এর বদলে ব্যবহৃত হয় জুরি। নতুন ধরনের কিছু বাদ্যযন্ত্র যেমন, সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো প্রভৃতিও পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে বাজতে দেখা যায়।

কবিয়ালের উপস্থাপন কৌশলেও কিছু তফাত লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালগণ আসরে দাঁড়িয়ে যখন ছড়া কাটেন, তখন নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি তাঁকে করতে হয়, সামনে-পেছনে করতে হয়—যা অনেক সময়ে নাচের মতো মনেও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে এইসব অঙ্গভঙ্গির পাশাপাশি কোনো কোনো কবিয়ালকে সরাসরি নাচতে দেখা যায়। একেবারে সরাসরি নাচ, ঢোলের বাজনার তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কবিয়াল দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯১১–১৯৮৮) এমন একজন নৃত্যপ্রিয় কবিয়াল। তিনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চল তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, রংপুর অঞ্চলে এসেও কবিগান পরিবেশন করেছেন। বর্ধমানের সনৎ বিশ্বাসও (জ. ১৯৫২) একইভাবে নেচে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালগণ নাচের পাশাপাশি আঙ্গিক অভিনয়ও করে থাকেন, পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের মধ্যে যা কৃচিৎ দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের পালাগায়কগণ যেমন পাঁচালির ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ কোনো দৃশ্য বোঝানোর জন্য একটি ঘাড়ের চাদর বা মাফলারকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন, পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের অনেকে সেইভাবে গলার চাদর ব্যবহার করেন। ধরা যাক কোনো একটি রুদ্ররসের বর্ণনা, কবিয়াল সেখানে গলার চাদর অথবা শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে ছড়া বলতে শুরু করলেন, এই রকম। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের এমন আঙ্গিক অভিনয় বা ইম্প্রোভাইজেশন খুব কম লক্ষ করা যায়।

অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের এই আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি বিষয়-স্বাতন্ত্র্যও উল্লেখযোগ্য। একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনুবর্তন পর্বে সর্ববঙ্গীয় ছিলো, তা হলো, গানের বিষয় ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। রমেশ শীলের দ্বারা তা সূচিত হলেও বাংলাদেশের সর্বত্র এবং পশ্চিমবঙ্গে তা সম্প্রসারিত হয়। তাই চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীলের ডাক গান যেমন মানববন্দনায় পরিণত হয়, যশোর অঞ্চলে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মালশি গান হয়ে ওঠে দেশমাতৃকার জয়গান, একইভাবে মুর্শিদাবাদে শেখ গুমানী দেওয়ান বা বীরভূমের লম্বোদর চক্রবর্তীর গানেও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ প্রধান হয়ে ওঠে।

অনুবর্তন পর্বের কবিগানে ছড়াপ্রধান অংশ উভয় বঙ্গেই মূল অংশ হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধেও এই অংশে কবিয়ালদ্বয় সাধারণত পৌরাণিক কোনো চরিত্রের ভূমিকায় নিজের অবস্থান জানান দিয়ে অন্যকে বিপরীত কোনো চরিত্রে আহ্বান করেন। কিন্তু অনুবর্তন পর্বে এই অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শুধু চরিত্রই নয়, অনেক সময়ে ভূমিকার মাত্রাগত পরিবর্তনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বে যেখানে কবিয়ালদ্বয়কে দেখা যেতো অর্জুন ও কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে, অনুবর্তন পর্বে সেখানে দেখা

যায় কবিয়ালদের ব্যক্তিপরিচয় ঠিক রেখে বিতর্কের বিষয় ঠিক করে নেন, একজন যদি স্বৈরাচারের পক্ষ নেন তো অন্যজন গণতন্ত্রের—এই রকম। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সনাতনী ধারার পাশাপাশি ছড়াপ্রধান অংশে এমন পরিবর্তন সর্ববঙ্গীয় একটি বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য খানিকটা এগিয়ে থাকে ব্যক্তির বদলে বিষয়ের দিকে। পূর্ববঙ্গে যখন কবিয়ালগণ কখনো ব্যক্তিভূমিকায় আবার কখনো বিষয়ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবিগান করেন, পশ্চিমবঙ্গে তখন গুমানী-লম্বোদরদের প্রভাবে বিষয়ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবিগান করা আদর্শে পরিণত হয়ে যায়। অনুবর্তন পর্বের পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থি রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বামপন্থি রাজনীতিকগণ কবিগানকে তাঁদের প্রচারণার উপায় হিসেবে গ্রহণ করায় এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের বিষয় এমনভাবে নির্বাচিত হয়, যাতে সব আসরেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয় হয়। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীল যে ধরনের বিষয় নিয়ে কবিগানের এই ছড়াপ্রধান অংশ শুরু করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সেগুলোর পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

নতুন এই পশ্চিমবঙ্গীয় ধারায় মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানী দেওয়ানের সঙ্গে বীরভূমের লম্বোদর চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদের অনুকূল রায়, মুর্শিদাবাদের কাঞ্চন মণ্ডল, মুর্শিদাবাদের আফাজউদ্দিন আহমেদ, বীরভূমের অর্কেন্দুভূষণ রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

অনেক সময়ে এঁদের এই খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদের অনেক কবিয়ালকে দেখা যায়, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসে কবিগান করছেন। এঁদের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার গণকর গ্রামের দুলালী চিত্রকর (জ. ১৯৬৬)। চরণ মণ্ডল তাঁর কবিগানের গুরু। গুরু চরণ মণ্ডল ছাড়াও তিনি সনৎ বিশ্বাস, জুবেদ আলি প্রমুখের বিপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, সরকারি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে, আকাশবাণীর বহরমপুর কেন্দ্রে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে কবিগান পরিবেশন করেন। কবিয়াল জুবেদ আলির সঙ্গে ১৯৯৪ সালে তিনি একবার বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ি, ঢাকার কৃষি কলেজ, শিলাইদহ প্রভৃতি স্থানে কবিগান পরিবেশন করেন।

অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিগানের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মুসলমান কবিয়ালদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কবিয়ালদের অর্ধেকের বেশি কবিয়াল মুসলমান সম্প্রদায়ের। দেশবিভাগের পর এঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন বাংলাদেশের রাজশাহীতে অভিবাসিত হন। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলে কবিগান জনপ্রিয় না থাকায় তাঁরা তাঁদের পেশা ধরে রাখতে পারেননি। কালের পরিবর্তনে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কবিগানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান কবিয়ালগণ দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে অভিবাসিত হন না। সর্বোপরি অনুবর্তন পর্বের কবিগান ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে থাকায় মুসলমান কবিয়ালগণ কবিগানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না।

পশ্চিমবঙ্গীয় ধারায় নারী কবিয়ালের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তবে সেখানে মুসলমান নারীর কবিয়াল হওয়ার উদাহরণ নেই। চব্বিশ পরগনার লীলারানী সাধু খাঁ বা মুর্শিদাবাদের দুলালী চিত্রকর এই নারী কবিয়ালদের প্রতিনিধি।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিগান

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যক কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের কবিগানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিগানকে বিভিন্ন সরকারি প্রচারণার মাধ্যম করায় কবিগানে আর এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়। তবে এইসব প্রচারণার কাজে পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের চেয়ে পূর্ববঙ্গের কবিয়ালরা কিছুটা এগিয়ে থাকেন। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং তাঁর গুরু নকুলেশ্বর দত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে, আকাশবাণী কলকাতা ও কলকাতা দূরদর্শনে কবিগান করার সুযোগ পান। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় রীতির কবিগান জনপ্রিয় হতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের যাঁরা আসল শ্রোতা, সেই পূর্ববঙ্গীয় জনসাধারণ সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তাদের আর্থিক দুরবস্থাও চরম আকার ধারণ করে। কবিগানের এই শ্রোতাসংকটের বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথ সরকার ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় প্রকাশ করেছিলেন এভাবে:

> আজ যারা বাস্তুহারা একেবারেই সর্বহারা, তাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা।
> তারা কেহ ঝোঁপ-জঙ্গলে কেহ-বা তাঁবুর তলে
> কেহ পড়ে তালবেতালে আছে আজ নৈনিতালে।
> কেহ-বা দুটো অন্নের জন্য রয়েছে দণ্ডকারণ্য
> কে দিবে কবির মান্য, তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ।
> কেহ-বা বিনা খুনে গিয়েছে আন্দামানে
> কারাই বা কবিগানে পেতে রাখবে কান।[৩৭]

সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে নকুলেশ্বর দত্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রথম কয়েক বছর তাঁকে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে পশ্চিমবঙ্গে তিনি জনপ্রিয় হয়ে

---

[৩৭] ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে ইউনেসকো আয়োজিত আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ সরকার এই ধরনের ছড়া উপস্থাপন করলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবদুল লতিফ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি নেপাল নাগকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং 'কবি বড়ো সত্যি কথা বলেছেন' বলে কেঁদে দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সরকার, "ইউনেসকো সেমিনারে কবিগানের জয়," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃ. ৩৯।

উঠতে থাকেন। তবে পরিস্থিতি কবিগান চর্চার অনুকূল হয় পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ। নকুলেশ্বর দত্ত এ সময়ে নারায়ণ বালা, নিশিকান্ত সরকার, অমূল্য সরকার, হরিনাথ সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করতে থাকেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি স্বরূপেন্দু সরকারের বিপক্ষেও কয়েক পালা কবিগান করেন।

অনুবর্তন পর্বে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন সুরেন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯২৫)। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি 'লোকরঞ্জন কবিপার্টি' নামে একটি কবিগানের দল গঠন করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে এই দল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে সরকারি প্রচারণার কাজে নিবন্ধন লাভ করে এবং চুক্তি ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রচারণামূলক কবিগানের অনুষ্ঠান করতে থাকে। কবিগানে দুই দল থাকলেও চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী এইসব অনুষ্ঠানের নামপত্রে পরিচিতি দেওয়া হতো 'কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর দল'। এই সুযোগে সুরেন্দ্রনাথ সরকার আকাশবাণী কলকাতা এবং কলকাতা দূরদর্শনে নিয়মিত কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। এ সময়ে ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় উপপরিচালক নেপাল নাগের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সরকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। নেপাল নাগের সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথ সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও কবিগান করার সুযোগ পান। কবিগানের এসব আসরে তখন সুরেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে নকুলেশ্বর দত্ত, নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীনিবাস সরকার প্রমুখ সরকার কবিগান পরিবেশন করেছেন। এঁদের মধ্যে নকুলেশ্বর দত্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সরকারের গুরু। নিশিকান্ত সরকারও তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বরূপেন্দু সরকার যখন লবণহ্রদ শরণার্থী শিবিরের বাশিন্দা, তখন বিভিন্ন গণমাধ্যম ও আসরে তাঁকে নিয়েও তিনি বেশ কয়েক পালা কবিগান পরিবেশন করেছেন।

১৯৭৪ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর লোকসঙ্গীত উৎসবে যোগদান সুরেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগানের দল নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। কবিগানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৃজনশীলতা বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের মুগ্ধ করেছিলো। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আবদুল লতিফ উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর এক সময়ের বন্ধু কবিয়াল রসিক সরকারকে দেখতে পেয়ে আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং কবিগানে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যে তিনি আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।[৩৮]

---

[৩৮] সুরেন্দ্রনাথ সরকার, "ইউনেসকো সেমিনারে কবিগানের জয়," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃ. ৩৩–৩৪। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আবদুল লতিফ তাঁর 'দাম দিয়ে

পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের মধ্যে বিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে যাঁরা সবচেয়ে খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে অসীম সরকারের নাম সর্বাগ্রস্মরণীয়। বছরে তিনি প্রায় দুশো পালা কবিগান করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ তো বটেই বাংলাদেশ থেকেও তাঁর কবিগানের ডাক আসে। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য তৈরি হয়েছে, তাঁদের নিয়ে তিনি নিয়মিত গান করেন। কলকাতা মহানগর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও তিনি কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। এইসব গানে তাঁর সহযোগী হিসেবে থাকেন ছোটো মনোরঞ্জন সরকার, অরবিন্দ সরকার, প্রভাত সরকার, তমাল সরকার, হরলাল সরকার, সন্ধ্যা সরকার, উমা সরকার, সজল সরকার প্রমুখ।[৩৯] এঁদের মধ্যে সন্ধ্যা সরকার একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার এই কবিয়ালগণ পশ্চিমবঙ্গে যে কবিগান পরিবেশন করেন, তা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা থেকে যথেষ্ট আলাদা নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিগানই আসল কবিগান। শ্রোতাদের চাহিদা বদলে গেছে বলেই শুধু তাঁরা কবিগানের সংক্ষিপ্ততর সংস্করণ পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের এই অতৃপ্তির বিষয়টি তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নিকট প্রকাশ করেন। যেমন সুরেন্দ্রনাথ সরকার জানান, পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা কবিগান করেন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো বিষয় বা ভূমিকা নির্বাচন করে নিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের মতো শ্রোতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী গান গাইতে হয় না, এখানে ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দের ছড়া তো দূরের কথা অনেক সরকার মিলটা পর্যন্ত ঠিকমতো দিতে পারেন না, দোহারদের কোনো ভূমিকাই থাকে না, তাছাড়া ডাক-মালশি-সখীসংবাদ তো দূরের কথা টপ্পাটা পর্যন্ত কবিয়ালদের গাইতে হয় না, এবং এসব কারণে পশ্চিমবঙ্গে কবিগান করাটা অনেক সহজ।[৪০] প্রায় অভিন্ন তথ্য দেন কবিয়াল অসীম সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যা কবিয়াল সম্বিতী সরকার, সন্ধ্যা সরকার এবং উমা সরকার।[৪১]

অনুবর্তন পর্বে পূর্ববঙ্গীয় ধারার এইসব কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে কবিগান করার সময়ে টপ্প-পাঁচালি অংশের শুধু পাঁচালিটাকেই পরিবেশন করে থাকেন। পূর্ববঙ্গে যেমন ব্যক্তি

কিনেছি বাংলা' শিরোনামের গানে কবিগানের সুর ব্যবহার করেছেন, এমনকি দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েও তা কবিগানের মালশি পর্যায়ের গানের সমতুল্য।

[৩৯] সাক্ষাৎকার: অসীম সরকার। কবিয়াল। নয়া গোপালগঞ্জ, বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা। ঢাকা: ২৮ জুন ২০০৮।

[৪০] সাক্ষাৎকার: সুরেন্দ্রনাথ সরকার, পাইকপাড়া রোড, নিমতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা। তারিখ: ২৬ মে ২০০৮।

[৪১] সাক্ষাৎকার: অসীম সরকার, নয়া গোপালগঞ্জ, বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৮ জুন ২০০৮ (ঢাকা); সম্বিতী সরকার, নিমতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৬ মে ২০০৮; সন্ধ্যা সরকার, বেড়গজালিয়া, বাগেরহাট, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭; উমা সরকার, মুক্তিপাড়া, বামুনগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৬ মে ২০০৮।

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিতর্কের সার অংশটুকু টপ্পায় পরিবেশন করতে হতো, পশ্চিমবঙ্গে তা করতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার মতোই দুই সরকারকে বিষয় নির্বাচন করে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। এসব বিতর্ক কখনো ধর্মনির্ভর হয়, কখনো ধর্মনিরপেক্ষও হয়। যেমন ধর্ম ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র, পুরুষ ও নারী, একাল ও সেকাল, গ্রাম ও শহর ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের রাজনৈতিক আদর্শগত কিছু তফাত লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের প্রায় সকলেই সাম্যবাদী আদর্শের প্রচারক। তবে পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালগণ সরাসরি কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না। অনেক সময়ে কৌশলে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান এড়িয়ে যান। যেমন নারায়ণ সরকার স্বীকার করেন, সচেতনভাবেই তাঁরা রাজনীতিকে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করেন।[৪২]

পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত বাঙালিদের বড়ো একটি অংশ মধ্যভারতের দণ্ডকারণ্য এলাকায় এবং উত্তর ভারতের তরাই বনভূমিতে পুনর্বাসিত হয়। এসব এলাকায়ও ক্রমে কবিগান জনপ্রিয় হয়। বলা বাহুল্য এসব এলাকায় যেসব কবিগান অনুষ্ঠিত হয়, তা সম্পূর্ণত পূর্ববঙ্গীয় কবিগান।

এই শ্রেণির একজন কবিয়াল হলেন বাগেরহাটের কাইনমারী গ্রামের গৌরপদ সরকার (১৯০৪–১৯৮৫)। ১৯৬৪ সালে তিনি দেশত্যাগ করার পর প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মানা ক্যাম্পে স্থান পান, ১৯৬৯ সালে সেখান থেকে তাঁকে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। তাঁর স্থান হয় উড়িষ্যার পারুলকোট জোনের ৫৫ নং গ্রামে। এখানকার পুনর্বাসিত গ্রামগুলোতে তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন: "ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে ঘুরতে পচতে পচতে ভারত বিখ্যাত দণ্ডকারণ্যের পারুলকোট জোনে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ৫৫ নং গ্রামে বসতি নিয়ে জীবন সায়াহ্নে মরণের ঢেউ গুণছি। কবিগান বোধ হয় জন্মগত নাছোড় ব্যাধি। সব ছেড়েছি—আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-স্বাস্থ্য, বিলাস-ব্যসন—এমনকি চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছি, কিন্তু ছাড়তে পারিনি বাংলার কৃষ্টি, বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ কবিগান।"[৪৩] এই অঞ্চলে তিনি একাই শুধু কবিগান করেন, তাই নয়, সেখানে তিনি বেশ কয়েকজন শিষ্য তৈরি করেছেন, যাঁরা ঐ অঞ্চলে নিয়মিত কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। একই অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন তাঁর প্রশিষ্য হরবিলাস সরকার। গৌরপদ সরকারের প্রথম জীবনের শিষ্য রসিকলাল সরকারের নিকট হরবিলাস কবিগান শিখেছিলেন। এই অঞ্চলের অন্য একজন কবিয়ালের নাম বিদ্যুৎ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের নিশিকান্ত সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখ সরকার দণ্ডকারণ্যের এসব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন

---

[৪২] সাক্ষাৎকার: নারায়ণচন্দ্র সরকার, ঠাকুরনগর, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: গোবিন্দপুর, যশোর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[৪৩] উদ্ধৃত, বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* (নদীয়া: পরিমল বৈরাগ্য, ১৯৯৯), পৃ. ৫৯২।

করেন। একুশ শতকের সূচনায় উমা সরকারের মতো তরুণ কবিয়ালরাও এখানে কবিগান পরিবেশন করেছেন।[৪৪]

৭. উপসংহার

কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে, অনুবর্তন পর্বে তা দেখা যায় না। এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যবধান সত্ত্বেও অনুবর্তন পর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কবিগানও প্রায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বস্তুত উনিশশো ত্রিশের দশকে একাধিক কারণে কবিগানের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে শুরু করে, পূর্বের আলোচনায় তা দেখা গেছে। অনুবর্তন পর্বে শেষ পর্যন্ত এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের কবিগান আদর্শ হয়। তবে বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামে শতাব্দীর শেষার্ধেও পূর্ণদৈর্ঘ্যের কবিগানও চালু ছিলো। দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি প্রকৃতিগতভাবেও কবিগান পরিবর্তিত হয়। কারণ সময়স্বল্পতার কথা ভেবে কবিগানের যেসব অংশ বাদ দেওয়ার কথা ভাবা হয়, তার প্রায় সবগুলো ছিলো ধর্মচেতনানির্ভর। যেমন ডাক ও মালশি গান কালীবন্দনামূলক, সখীসংবাদ এবং ভোর-গোষ্ঠাদি ছিলো রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি-ধুয়া-ছড়া-জোটক অংশগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মসাপেক্ষ করা যায়। নতুন প্রজন্মের কবিয়ালগণ তাই কবিগানের এই অংশকে কাজে লাগিয়ে অনুবর্তন পর্বের কবিগানের জন্ম দেন। এভাবে বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে অনুবর্তন পর্বের কবিগান বিষয়ের দিক দিয়ে বিচিত্র হয়ে ওঠে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কবিগান যেমন বামপন্থি রাজনীতি প্রচারের হাতিয়ার হয়, আবার তা সরকারি প্রচারণার কৌশলও হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগানে মুসলমান কবিয়ালগণ দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারণা চালান, পাশাপাশি ইসলাম অনুষঙ্গের অনুপ্রবেশও সেখানে ঘটে; আবার খুলনা-বরিশাল-যশোর-ফরিদপুরের কবিগান সংক্ষিপ্ত হলেও তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের সংশ্লিষ্টতা থেকে যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গও অনেক ক্ষেত্রে বেশি জায়গা দখল করতে থাকে। কোথাও কোথাও অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, অনেক কবিয়াল জারিগানের বয়াতিদের সঙ্গে জারিগানও পরিবেশন করতে পারেন।

অনুবর্তন পর্বে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গ পর্বে হিন্দু জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণির লোকজন মূলত এই জাতীয় গানের আয়োজন করতেন। বিশেষত দুর্গা পূজা এবং কালী পূজায় তাঁরা এই গানের আয়োজন করতেন। এছাড়া বারোয়ারি খোলাও বহু ছিলো, যেখানে গ্রামের সচ্ছল লোকেরা সম্মিলিতভাবে কবিগানের আয়োজন করতেন। অন্যদিকে অনুবর্তন জমিদার শ্রেণির বিলোপ ঘটায় পূর্ববঙ্গে শুধু বারোয়ারি খোলার কবিগানই অবশিষ্ট থাকে। তবে সাতচল্লিশ-উত্তর

---

[৪৪] সাক্ষাৎকার: কবিয়াল উমা সরকার, মুক্তিপাড়া, বামুনগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তারিখ: ২৬ মে ২০০৮।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ যেমন কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে, পাশাপাশি নতুন গণমাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশনে কবিগানের আয়োজন করায় কবিগান চর্চা নতুন মাত্রা লাভ করে।

একাত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে গ্রামের সাধারণ মানুষই ছিলেন কবিগানের মূল পৃষ্ঠপোষক। এ সময়ে চট্টগ্রাম রেডিওতে এক ধরনের কবিগানে প্রচারের ব্যবস্থা করা হলেও সামগ্রিকভাবে কবিগানের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো না বললেই চলে। তার ফলে রমেশ শীলের মতো খ্যাতিমান কবিয়ালকে পর্যন্ত অর্থাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ নূরুল হুদাকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, তখন তিনি কী মারাত্মক অর্থসংকটে ভুগেছিলেন।[৪৫] অথচ তাঁর মতো একজন বিখ্যাত কবিয়ালের পক্ষে অসচ্ছল থাকাটা বিস্ময়কর। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে এই অবস্থার অবসান ঘটতে শুরু করে। যদিও সরকারিভাবে কবিগানের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে আশির দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে একাত্তরের পর বাংলাদেশে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ কবিগান চর্চায় ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। এর ফলে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো কবিয়াল, যিনি পাকিস্তান আমলে প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কবিগান করেছেন, তিনিও বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

অনুবর্তন পর্বে কবিয়ালদের শ্রেণিচরিত্রও বদলে যায়। পূর্ববঙ্গ পর্বে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু অনুবর্তন পর্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহু মুসলমান কবিয়ালকে কবিগান পরিবেশন করতে দেখা যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গ পর্বের সঙ্গে অনুবর্তন পর্বের কবিগানে বহু ধরনের পরিবর্তন লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। কবিগানের রূপান্তর শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য অনেক রূপান্তরের সঙ্গে সেইসব পরিবর্তনের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাবে।

---

[৪৫] পত্রগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য, *রমেশ শীল রচনাবলী*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫০–৫৬।

পঞ্চম অধ্যায়

কবিগানের রূপান্তর

১. সূচনা

কবিগানের রূপান্তর বহুমুখী। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিগান যেমন রূপান্তরিত হয়, স্থানের দূরত্বেও কবিগানে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। এই দ্বিমাত্রিক পরিবর্তন লক্ষণীয় হয় কখনো প্রকরণে, কখনো বিষয়বস্তুতে। প্রকরণগত রূপান্তর আবার বহুমাত্রিক। যেমন কবিগান মূলত বহু ধরনের গানের একটি মিশ্রণ, সেই মিশ্রণের একটি অনুক্রম রয়েছে, সেই অনুক্রমের পরিবর্তন ঘটতে পারে; আবার প্রতিটি গানের রয়েছে আলাদা গঠন, সেই গঠনেরও রূপান্তর ঘটা সম্ভব; এই পরিবর্তন আবার স্থান-কালের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এছাড়া কবিগানের সুরের পরিবর্তন ঘটে অন্তত তিন ভাবে: স্থানভেদে, কালভেদে এবং ব্যক্তিভেদে। কবিগানে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও স্থান-কাল সাপেক্ষ। এমনকি তা পরিবেশক ও শ্রোতার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি সংস্কৃতি ও রুচিসাপেক্ষও বটে।

কবিগানের এই বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও রূপান্তরকে স্পষ্ট করতে হলে আলোচনাটিকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা দরকার: প্রকরণগত রূপান্তর, এবং বিষয়গত রূপান্তর। প্রকরণগত রূপান্তরের মধ্যে পড়ে কবিগানের বিন্যাসগত রূপান্তর, কবিগানের গঠনগত রূপান্তর, উপস্থাপনগত রূপান্তর, আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা ও পোশাকের রূপান্তর, মঞ্চাদির রূপান্তর, কবিয়ালদের এবং সহযোগীদের জীবনযাত্রায় রূপান্তর, কবিগানে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির রূপান্তর, কবিগানের বিভিন্ন অংশের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর রূপান্তর, সুরের রূপান্তর, তালের রূপান্তর এবং কবিগানের ব্যবস্থাপনাগত রূপান্তর। বিষয়গত রূপান্তরের মধ্যে পড়ে আলোচ্য বিষয়ের রূপান্তর, অভিন্ন বিষয় সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ও রুচিগত রূপান্তর ইত্যাদি। কবিগান পরিবর্তিত হয়ে যখন নতুন নাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রকরণ ও বিষয়বস্তুতে ঘটে আমূল পরিবর্তন, তা বলাই বাহুল্য। এই ধরনের রূপান্তরকে বলা যায় কবিগানের চূড়ান্ত রূপান্তর। বর্তমান অধ্যায়ের শেষ দিকে সেই রূপান্তরের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

কবিগানের এই বহুবিধ রূপান্তরগুলোকে সংক্ষিপ্ত উদাহরণ সহযোগে একে একে উপস্থাপন করা হলো।

২. প্রকরণগত রূপান্তর

ক. গঠন ও বিন্যাসগত রূপান্তর

সময়ের পরিবর্তনে কবিগানের বিভিন্ন অংশের সংযোজন-বিয়োজন যেমন ঘটেছে, বিন্যাসগত পরিবর্তনও কমবেশি লক্ষ করা যায়। এক এক শতকে কবিগানের বিন্যাস কেমন ছিলো তা উল্লেখ করলেই এই রূপান্তর স্পষ্ট হবে। আঠারো শতকের শেষ দিককার কবিগানের বিন্যাস সম্পর্কে জানা যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' নামক কবিগানের সংকলন থেকে। জানা যায়, সাধারণত তখন পর পর তিন রাত কবিগানের আয়োজন হতো। এই কবিগানে মোট চার ধরনের গান থাকতো: গুরুবন্দনা, সখীসংবাদ, বিরহ এবং খেউড়। পালাক্রমে এই চার ধরনের গান পরিবেশিত হতো। এই গানগুলোর গঠন প্রায় এক রকম ছিলো। শিরোনাম থেকে গানগুলোর বিষয়বস্তু আন্দাজ করা যায়। সব ধরনের গানেই চিতান ও টপ্পা নামের তুক থাকতো। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কবিয়াল এবং তাঁর সঙ্গীরা সেগুলো একের পর এক পরিবেশন করে যেতেন। তখন চাপান হিসেবে গাওয়া গানের জবাব পরবর্তী আসরে উপস্থিতমতো রচনা করে গাওয়া হলেও কবিগানের লড়াইয়ের আবহ তখনো পর্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠেনি। খেউড় গানের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণের ভাব হয়তো তখন তৈরি হয়েছিলো, কিন্তু বক্তব্য বা যুক্তি বিচার করে কোনো পক্ষকে বিজয়ী করার রীতি তখনো গড়ে ওঠেনি। তখন বিজয়ী হতো সেই দল, যাদের গানের কথা, সুর এবং উপস্থাপন অন্যদলের চেয়ে ভালো হতো।[১]

উনিশ শতক নাগাদ কবিগানের এই বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। গুরুবন্দনার জায়গা দখল করে ভবানীবিষয়। এই গানে তিন চারটি অন্তরা থাকতো। এতে মনে হয় তা বিশ শতকের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ডাক গানের সঙ্গে তুলনীয়। ভবানীবিষয়ক গানের পরপরই তখন সখীসংবাদ পরিবেশিত হতো। এই সময়ের সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড় প্রভৃতি গান চিতান, মহড়া ও অন্তরা—এই তিন তুকে বিভক্ত ছিলো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গানগুলোকে অধিক তুকনাম দিয়ে বিভক্ত করা হয়।[২] তবে আঠারো শতকের কবিগানের অংশ হিসেবে যে চার ধরনের গান ছিলো উনিশ শতকের সূচনা নাগাদ তা একই রকম থাকে বলে মনে হয়।

বিভিন্ন উৎস থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কলকাতার কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়, এর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ সংযোজিত হতে থাকে। এমনকি কবিগানে জয়লাভ করার পরে শখের

---

[১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃ. ৮১।

[২] স্থানভেদে ও কালভেদে তুকনামগুলো তুকনামগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয়, প্রথম অধ্যায়ের "কবিগানের স্তবক ও সুর" পরিচ্ছেদে সারণিসহ সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কবিগানের দল 'প্রভাতি' নামের গান গাইতে গাইতেও বাড়ি ফেরেন।[৩] তখন কবিগানের মধ্যে 'ভোর', 'গোষ্ঠ', 'প্রভাস', 'বসন্ত' প্রভৃতি নামের গান যুক্ত হয়। এমনকি কবিগান নামে চিহ্নিত এইসব গানের মধ্যে ছড়া কাটার সূচনা হয়। প্রথম দিকে এইসব ছড়াগান কবিগানে তেমন গুরুত্ব পেতো না। বিভিন্ন অঙ্গের গান পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে কবিয়ালগণ ছড়া কাটতেন। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ছড়া-কাটা অংশটা খেউড় গানের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। ক্রমে 'খেউড়' গানের প্রকৃতি বদলে যায়। এর সূচনা অংশ, যেটা গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, তা সংক্ষিপ্ত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত টপ্পা নামের একটি তুকই অবশিষ্ট থাকে। খেউড়ের বাকি অংশে কবিয়ালগণ পারস্পরিক প্রশ্ন-উত্তর তর্ক-বিতর্ক ছড়া-কাটার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন। এক পর্যায়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে কবিগানের অংশ হিসেবে 'খেউড়' নামই বর্জিত হয়, তার বদলে নাম হয় 'টপ্পা-পাঁচালি'।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ 'খেউড়' থেকে 'কবির লহর' নামের একটি অংশ আলাদা হয়ে যায়। এটিও বিতর্কমূলক, তবে এটিতে কবিয়ালদ্বয় সামনাসামনি ছড়া কেটে বিতর্ক করেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ কবিগানের এই অংশের নাম হয়ে যায় 'জোটক', 'জোটের পাল্লা', 'বোলকাটাকাটি', 'মিলনগোষ্ঠ' বা 'মিলনগীতি'। কালগত ব্যবধানে যেমন স্থানের ব্যবধানেও কবিগানের এই শেষাংশের পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন এই অংশের পূর্ববঙ্গীয় নাম হলো 'জোটের পাল্লা' বা 'জোটক'; পশ্চিমবঙ্গীয় নাম 'বোলকাটাকাটি'। তবে উভয় অঞ্চলে এটি 'মিলনগোষ্ঠ' বা 'মিলনগীতি' নামে পরিচিত।

উনিশ শতকের কলকাতায় কবিগানের বিন্যাসগত পরিবর্তনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভোলা ময়রা, মাধব ময়রা, সীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরাই কলকাতার কবিগানকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের বিন্যাসগত পরিবর্তন আরো দ্রুত হয়। বিশেষভাবে যশোর অঞ্চলে, ময়মনসিংহ অঞ্চলে, ঢাকা অঞ্চলে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের কোনো কোনো অংশের বর্জন-সংযোজন ঘটতে থাকে।

কলকাতা থেকে কবিগান পল্লিবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার সময়ে খেউড় অংশে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কলকাতা পর্বে খেউড় অংশে কবিয়ালদ্বয় গানের মাধ্যমে তর্কবিতর্ক করতেন, কৃচিৎ সেখানে ছড়া-কাটাকাটি হতো। কিন্তু কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে খেউড় গানের বদলে যুক্ত হয় দীর্ঘস্থায়ী একটি অংশ, যার নাম টপ্পা-পাঁচালি; এর মধ্যে থাকে নানা ধরনের উপাদান: প্রথমে চিতান ও অন্তরা তুকে রচিত পরিচিতিমূলক টপ্পা, তারপরে ধুয়া গান, তারপরে ত্রিপদী ছড়ায় বন্দনা—কোথাও তা ডাকছড়া আবার

---

[৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫।

কোথাও তা মনঃশিক্ষা নামে পরিচিত, অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন ধুয়া গানের সুরে পয়ার-ত্রিপদী-ভঙ্গত্রিপদী-চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের ছড়ায় তর্কবিতর্ক, এবং সবশেষে খেমটা তালে রচিত দ্রুত পয়ারে এই অঙ্গের সমাপ্তি।

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যেসব কবিগান পরিবেশিত হতো, তার প্রায় সবখানেই প্রথমে ডাক, তারপরে মালশি, মালশি গান শেষ হতে হতে পুব দিক ফরশা হয়ে যেতো বলে তখন ভোরগান, সকাল হলে গোষ্ঠগান, তারপর সখীসংবাদ (এবং মাথুর, বিরহ প্রভৃতি), পরে কবি, তারপর টপ্পা-পাঁচালি এবং শেষে জোটের পাল্লা। আঠারো শতকের কবিগানের সঙ্গে তুলনা করলে এর সঙ্গে খুব কম মিলই লক্ষণীয় হয়। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবিগানের সঙ্গে তুলনা করা হলে এই বিন্যাসে পরিভাষাগত পরিবর্তন বেশি, গঠনগত পরিবর্তন ততোটা নয়।

কবিগানের এই বিন্যাসে আর একবার বড়ো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই পরিবর্তনের পেছনে মানুষের ব্যস্ততা যেমন কাজ করে, একইসঙ্গে প্রচারণার কৌশল হিসেবে কবিগানকে ব্যবহার করার কারণটাও তেমন কাজ করে। উনিশশো ত্রিশের দশকে কলকাতার ব্যস্ত শ্রোতাদের কথা মনে রেখে বাগেরহাটের রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও নড়াইলের বিজয় সরকার যেমন এটিকে যেমন টপ্পা-পাঁচালি নির্ভর গানে পরিণত করেন, কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রামের রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়াও তেমন এটিকে পুরোপুরি পাঁচালি-নির্ভর করে তোলেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগান এভাবে সংক্ষিপ্ত কবিগানে পরিণত হতে শুরু করে। কখনো কখনো কোনো কোনো আসরে শ্রোতাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তা বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিন্যাস রক্ষা করে বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবিগানে ধর্মসংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলো গুরুত্ব হারাতে থাকে। একুশ শতকের সূচনায় কবিগান হয়ে ওঠে একেবারে সংক্ষিপ্ত, শুধু পাঁচালি আর জোটের পাল্লা নির্ভর। সাতচল্লিশের পরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশি। তখন অনেক কবিয়াল ধুয়া গানের একটি কলি এবং সেই কলির সুরে ছড়া কেটে গাওয়া জোটের পাল্লাকে কবিগান হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন।[৪] অর্থাৎ আঠারো শতকে যে কবিগানের সূচনা হয়েছিলো মূলত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা দিয়ে, একুশ শতক নাগাদ সেই কবিগান বিতর্ক-সর্বস্ব ছড়াকাটার মধ্যে নিজেকে সীমিত করে ফেলে।

কালের পরিবর্তনে যেমন কবিগানের বিভিন্ন অংশের সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে, স্থানের পরিবর্তনেও তেমন কমবেশি পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়। ব্যক্তিভেদেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। উদাহরণ হিসেবে কবিগানের শেষ অংশ হিসেবে উপস্থাপিত জোটের পাল্লার বিষয় তোলা যেতে পারে। সাধারণত তা কৃষ্ণ-বলরাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে

---

[৪] পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়াল ইয়াকুব আলীর এমন একটি জোটক গান উদ্ধৃত হয়েছে।

গীত হয়। কিন্তু জোটের পাল্লার এক-এক জনের সংলাপ কতোটা দীর্ঘ হবে অথবা হ্রস্ব হবে; ছন্দ, লয়, সুর কেমন হবে, তা যেমন অঞ্চলের উপরে নির্ভর করে, একইসঙ্গে তা ব্যক্তির উপরেও নির্ভর করে। পূর্ববঙ্গীয় কবিয়ালের উপস্থাপিত জোটের পাল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় কবিয়ালের জোটের পাল্লা পাশাপাশি উপস্থাপন করলেও তা বোঝা যাবে।

নিম্নে পূর্ববঙ্গীয় জোটের পাল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বোলকাটাকাটি পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হলো। এতে সুরের বিষয়টি বোঝা না গেলেও উভয় অঞ্চলের মধ্যে যে ছন্দগত ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা বোঝা যাবে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই চরিত্র নিয়ে পূর্ববঙ্গীয় জোটের পাল্লা—

নিত্যানন্দ:
আয় না রে ভাই আয় না সবাই, আমরা মিলনগীতি গাই।
জানি মিলনে পরমানন্দ, নিরানন্দ পায় না ঠাঁই ॥ (ধুয়া)
অনেকক্ষণ শুরু হলো গান, শুনলে হিন্দু, খ্রিস্টান আর মুসলমান
হবে এখন এ গান সমাপন, সভায় নিবেদন জানাই ॥
হরিদাসে আর আমাতে কাব্য দ্বন্দ্ব দুজনাতে
হরিদাসের দুঃখ ঘোচে যাতে, আজ আমি তা করতে চাই ॥

হরিদাস:
গোঁসাই বলবো কি তোমার গোচরে, আছে ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরে।
তুমি বলো নাই তা প্রকাশ করে, তাই অন্তরে দুঃখ পাই ॥

নিত্যানন্দ:
যারে কইস ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর, বত্রিশ অক্ষর ঠিক এ নামের ভিতর
এতে একটি নাম ছাড়া অতঃপর আমি তো দেখতে না পাই ॥
হরির সম্বোধনে হরে, দ্যাখনা বিবেচনা করে
হরিনাম ছাড়া ইহার ভিতরে অন্য নাম তো দেখি নাই ॥
কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কর্ষণ, ইহা কোনো নাম নয় কখন
তাই শ্রীহরির নিকট ভক্তগণ, কহে হৃদয়ভূমি কর্ষণ করো তাই ॥
আর রামের অর্থ জানাইলাম, আত্মা রময়তি ইতি রাম
জীবাত্মায় পরমাত্মায় এক ঠাম, মিলন করাও হে গোঁসাই ॥
তবে ভেবে দেখ হরিনাম বিনে এতে অন্য নাম দেখিনে
ভুল বুঝিলি মূল না চিনে, এ দুঃখ কারে জানাই ॥
পণ্ডিত যাঁরা এ সংসারে পাণ্ডিত্যে এ নাম প্রচারে
তাইতে গৌর নির্দেশ দেয় সবারে, মালায় এ নাম জপা চাই ॥

হরিদাস:
কেহ তো আর কয়নি আগে, তাই তোমার বাক্যে আমার হৃদয়বাগে
যেন প্রেমের ফুল ফোটে সোহাগে, সদা হরিনামের গীতি গাই ॥

নিত্যানন্দ:
আমার হরিদাসের ভুল ভেঙেছে, যখন হরিনামে মন রেঙেছে
তবে আয় হরিদাস নেচে নেচে, হরিনাম করি সদাই ॥

হরিদাস:
এতো দিনে ভেঙে গেছে মোর যতো ভুল।
অকূলের মাঝে আমি পাইলাম কূল ॥

নিত্যানন্দ:
হরিদাসের সব ধান্দা গেলো যবে চুকে।
আশীর্বাদ করি হরিদাস থাক সুখে ॥
সাধুদের নিন্দা কভু কোরো না অধরে।
গৌর রূপে কৃষ্ণ যেন তোমা কৃপা করে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাসের দ্বন্দ্ব শেষ হলো।
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রীতে হরি হরি বলো ॥[৫]

রামী ও চণ্ডীদাস দুই চরিত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় বোলকাটাকাটি—

রামী:
মাছ ধরিছো কোন ছিপে গো, মাছ ধরা দেয় না কেনে।
মাছ আসে যায়, ভেসে বেড়ায়, ধরা না দেয় বড়শির গাঁথনে ॥ (ধুয়া)

চণ্ডীদাস:
বসে আছি চার ফেলে গো চেয়ে আছি ফ্যাতনা পানে।
আমি যাবো না উঠে থাকবো বসে, দেখি মাছ ধরা দেয় কতোক্ষণে ॥

রামী:
এ মাছ এমন ফিচেল, চার খেয়ে যাবে পালিয়ে।
গাঁথি গাঁথি মনে হবে, উধাও হবে ধোকা দিয়ে ॥

চণ্ডীদাস:
চারের সাথে দেবো এমন গুণ মিশিয়ে।
ধরা দেবে আপনা থেকে জ্ঞান হারিয়ে ॥

রামী:
তুমি কী গুণের গুণমণি।
এ মাছ ধরবে কেমনে শুনি ॥

[৫] উভয় কবিয়ালের কথা স্বরূপেন্দু সরকার কর্তৃক রচিত।

চণ্ডীদাসঃ
গুণমণি না হলেও গুণ তো আমি ভালোই জানি।
অঙ্ক কষে সুতো ছাড়ি গহিন থেকে মাছকে টানি ॥

রামীঃ
তোমার সুতোর মাপ আছে জানা।
ভেবেছো কি ডোবাপানা ॥

চণ্ডীদাসঃ
চারের গন্ধ ছড়াবে তোমার আঙিনা।
সুতো না হোক, গন্ধে দেবে টানা ॥[৬] ...

উভয় অংশকে তুলনা করলে বেশ কয়েক ধরনের অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন পূর্ববঙ্গীয় অংশে প্রথমে দুই কলির একটি ধুয়া অনেকটা ভূমিকার মতো, এবং টপ্পা-পাঁচালির মূল চরিত্র এখানে প্রলম্বিত। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে টপ্পা-পাঁচালির চরিত্র বাদ দিয়ে প্রচলিত দুটি চরিত্রে কবিয়ালদের আবির্ভাব, এবং সেই প্রসঙ্গের ধুয়া। অবশ্য পূর্ববঙ্গ পর্বেও কৃষ্ণ ও বলরাম চরিত্র দিয়ে এমন পাল্লা হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গ পর্বে জোটের পাল্লার চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের বিষয়টি ধুয়ার চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের অনুরূপ হয় এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, জোটের পাল্লা যতোই দীর্ঘ হোক না কেন, পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী পুরোটা অংশে অভিন্ন চরণ-বিন্যাস, ছন্দ এবং অন্ত্যমিল অব্যাহত রাখতে হয়। শুধু একেবারে শেষের একটি প্রশ্নোত্তর দ্রুত লয়ের পয়ার দিয়ে করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পাল্লার চরণ-বিন্যাস ও ছন্দ অতোটা কড়াকড়ি পালিত হয় বলে মনে হয় না। উপরের উদ্ধৃতিতেও দেখা যায়, রামী তাঁর উক্তিতে যে ধরনের চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করে, চণ্ডীদাস তার জবাবে সেই একই ধরনের চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল দেয়; নতুন প্রশ্ন ও জবাবের ক্ষেত্রে উভয় কবিয়ালই আলাদা চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করতে পারে।

খ. সাজসজ্জা ও উপস্থাপনগত রূপান্তর

উনিশ শতকে কলকাতা পর্বের কবিগানে যেমনটা দেখা গেছে, কবিয়াল, দোহার, যন্ত্রী সকলে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাল কাপড়ে ঢেকে, অনাবৃত দেহে, নূপুর পায়ে, পাখির পালকযুক্ত তেকোনা টুপি পরে আসরে আসতো।[৭] কিন্তু কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে এক এক অঞ্চলে কবিয়াল এবং তাদের সহযোগীদের পোশাকে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যেমন বিশ শতকের সূচনায় ঝালোকাঠি কেন্দ্রের কবিয়ালগণ ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর

---

[৬] উদ্ধৃত, দীপক বিশ্বাস, *কবিগান* (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃ. ১১।

[৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৩–৬৪।

পরলেও তাদের পুরুষ দোহারগণ উকিলের গাউনের মতো রঙিন পোশাক পরতেন এবং দলের নারী দোহারগণ পরতেন বডিকোট ও ঘাঘরা।[৮] একই সময়ে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়াল এবং তাদের দোহারগণ পায়ে নূপুর পরতেন।[৯] একুশ শতক নাগাদ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের শিল্পীদের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পায়। নারীরা শাড়ি পরেন, অন্যদিকে পুরুষেরা ধুতি-পাঞ্জাবি এমনকি পাজামা-পাঞ্জাবিও পরতে শুরু করেন।

আঠারো-উনিশ শতকে কবিয়ালগণের পোশাক দলের অন্যদের পোশাকের থেকে আলাদা ছিলো না। তখন সকলেই খালি গায়ে থাকতেন এবং রঙিন ধুতি পরতেন। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিয়ালদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ধুতি-ফতুয়া ইত্যাদি মার্জিত পোশাক পরতে শুরু করেন। তবে এ সময়ে যাঁরা পল্লিবঙ্গে কবিগান করতেন, তাঁরা শুধু ধুতি পরতেন বলে মনে হয়, শীতকালে ধুতির উপরে বড়ো জোর চাদর ব্যবহার করতেন। উনিশ শতকের শেষ দিককার কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার ও হরিচরণ আচার্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তাঁদের দুজনের উর্ধ্বাঙ্গে কোনো বসন নেই। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম যেমন বিজয়নারায়ণ আচার্য, রমেশ শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার বা নকুলেশ্বর দত্ত—যাঁদের সকলেরই জন্ম উনিশ শতকের শেষ দিকে, তাঁরা সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন, অন্তত সেই ধরনের পোশাক-পরা ছবিতে তাঁদের দেখা যায়। একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশের কবিয়ালদের পোশাক সাধারণত পাঞ্জাবি ও পাজামা, তবে দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দু কবিয়ালগণকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখা যায়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মপরিচয় নির্বিশেষে সকল কবিয়ালই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। বিশ শতকের শেষ দিকে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা প্রায় সকলেই শাড়ি-ব্লাউজ পরেন, অনেকে শাড়ির উপরে একটি চাদরও ব্যবহার করে থাকেন।

একুশ শতকের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালগণের পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দীপক বিশ্বাস, যা উদ্ধৃতিযোগ্যঃ "পোশাকের ব্যাপারে কবিয়ালদের ইউনিফরম আছে। কবিয়ালরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন। সাদা ধুতি হলেও পাঞ্জাবি সাদা বা ঘি রঙের পরতে দেখা যায়। সাদা সুতির বা ঘি রঙের সিল্কের পাতলা উত্তরীয়ের চওড়া দিকটা তিন ভাঁজ বা চার ভাঁজ করে কাঁধের উপর দিয়ে মেলে দেন বা একদিকের বগলের নীচ দিয়ে অপর কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।"[১০] কবিয়ালদের এই

---

[৮] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কলকাতাঃ সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃ. ৪।

[৯] ১৯৮০ সালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কবিগানে চাঁদপুরের কবিয়াল কালোশশী চক্রবর্তী কবিগান পরিবেশনের সময়ে পায়ে নূপুর ব্যবহার করেছিলেন। স্বরোচিষ সরকার, "কবিগানঃ অতীত ও বর্তমান," *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ২৩৬।

[১০] দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, পৃ. ১৪।

চিত্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক রকম, তা মনে হয় না।[১১] বাংলাদেশের কবিয়ালগণও যে সবক্ষেত্রে এক ধরনের পোশাক পরেন, তাও নয়। পাঞ্জাবির রঙের বিষয়টিও ব্যক্তিরুচির উপর নির্ভর করে।

কবিয়ালদের পোশাকে যেমন পরিবর্তন ঘটে, দোহারদের পোশাকেও তেমন পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিগানের সকল শিল্পীকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখা যায়। তবে শতাব্দীর শেষ দিকে কবিয়ালদের সহযোগীগণকে সাধারণ পোশাকে দেখা যায়ঃ কেউ পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন, কেউ প্যান্ট-শার্ট পরেন। এ পর্যায়ে মহিলা দোহারদের উপস্থিতি একেবারেই হ্রাস পায়। তাই তাদের পোশাকের পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করা গেলো না।

কবিগান পরিবেশনের সময়সূচি এক এক সময়ে এক এক রকম। আঠারো শতকের কবিগান ছিলো পর পর তিন রাতের গান। রাতের সূচনায় শুরু হতো, রাতের শেষে শেষ হতো। এই সময়সূচি উনিশ শতকের প্রথম দিকেও ছিলো। তাই বিজয়ী দল প্রভাতি গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতে পারতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিগান যখন দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়, তখন কবিগান শুরু হতে থাকে মধ্যরাত্রিতে এবং পরের দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। একাধিক পালা হলে একই সময়সূচি অনুযায়ী প্রতি দিন। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সময়সূচি মোটামুটি সর্বত্র অনুসৃত হতে দেখা যায়।[১২] বিশ শতকে কবিগান সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় এবং একাধিক গণমাধ্যমে তা পরিবেশনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়, কবিগানের এই সময়সূচিতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। কোনো অনুষ্ঠানের সূচনা বা সমাপ্তি হিসেবে যখন কবিগানের আয়োজন হয়, তখন সেই অনুযায়ী তার সময়সূচি নির্ধারিত হয়। উনিশশো ত্রিশের দশকে রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, বা নিশিকান্ত সরকার কলকাতায় যেসব কবিগান পরিবেশন করেছিলেন, তা ছিলো সন্ধ্যাবেলায় শুরু হওয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার কবিগান। একই সময়ে রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়াদের কবিগানও ছিলো সন্ধ্যার দিকে শুরু হওয়া কবিগান। এই ধারাই ক্রমে বলবৎ হয়। একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশের গ্রামবাংলায় আয়োজিত অধিকাংশ গানের আসর বিকেলের দিকে শুরু হয়ে মধ্যরাত্রির পূর্বে শেষ হয়ে যায়।[১৩]

স্থান ও কালভেদে উপস্থাপন-কৌশলেও বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তবে প্রধান পরিবর্তনটি গানের অঙ্গবদলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আঠারো-উনিশ শতকে কবিয়ালের ভূমিকা ছিলো প্রধানত রচয়িতার, পেছনে বসে তিনি গান রচনা করতেন, গায়ক বা

---

[১১] বর্তমান গবেষক ২০০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তারিণীমাঝির ঘাটে অসীম সরকারের কবিগান শোনেন। অসীম সরকার সেদিন গরদের একটি পাঞ্জাবি পরেছিলেন, তাঁর গলায় বা কাঁধে কোনো উত্তরীয় বা চাদর ছিলো না।

[১২] বিশ শতকের শেষার্ধেও এই সময়সূচি দক্ষিণাঞ্চলে চালু থাকতে দেখা যায়।

[১৩] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে শোনা কবিগানের প্রায় সবগুলোই সন্ধ্যায় শুরু হতে এবং মধ্যরাত্রির পূর্বেই শেষ হতে দেখা গেছে।

দোহারদের কানে গানের কথা বলে দিতেন, গায়ক তা সুর দিয়ে উপস্থাপন করতো। ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, লহর, খেউড়—সব ধরনের গানে এই রীতি প্রযোজ্য ছিলো। বিশ শতকের প্রথম দিকে কবিগানের এই দোহারসর্বস্বতা হ্রাস পেতে শুরু করে। বিশেষভাবে টপ্পা-পাঁচালি বা আলোচনা অংশ দীর্ঘতর হতে থাকায় দোহারদের ভূমিকা হ্রাস পায়। একুশ শতক নাগাদ দোহারদের ভূমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে যায়। শুধু ধুয়া গানের স্থায়ী বা চিতানের শেষ অংশের পদটি সমস্বরে গাওয়া ছাড়া তাঁদের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। অথচ বিশ শতকের প্রথম দিকেও দোহারদের ভূমিকা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, অনেক সময়ে সুকণ্ঠের অধিকারী কোনো দোহার কবিয়ালের চেয়েও অধিক সম্মানী পেতেন, যেমনটা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ কবিগান একেবারে কবিয়ালসর্বস্ব গানে পরিণত হয়। এটি পূর্ববর্তী শতাব্দীর কবিগানের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা আলাদা। উনিশ শতকেও কবিগান ছিলো একটি দলীয় উপস্থাপন, সকলের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কিন্তু বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের সূচনায় একা কবিয়ালই গান গেয়ে, অভিনয় করে, ছড়া কেটে আসর মাতিয়ে রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ঢোলের তালে তালে কবিয়ালকে নাচতেও দেখা যায়।[১৪]

গ. যন্ত্রাদির রূপান্তর

কবিগানে প্রধান বাদ্যযন্ত্র ঢোল। ঢোল ছাড়া কবিগানের কথা ভাবা যায় না। এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের যোগ-বিয়োগ হলেও ঢোলের বিকল্প কোনো কালেই নেই। আঠারো শতকের কবিগানে ঢোলের সঙ্গে অন্য কী কী যন্ত্র ব্যবহৃত হতো, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে কবিগানে যন্ত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের আখড়াই গানে ঢোলের পাশাপাশি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। কবিগানের গঠনও যেহেতু আখড়াই গানের অনুরূপ, তাই অনুমান করা যেতে পারে যে আখড়াই গানের মতো কবিগানেও নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো। জানা যায় হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের গায়কেরা বাইশ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। এই বাইশ ধরনের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কী কী বাদ্যযন্ত্র ছিলো, তার তালিকা হয়তো পাওয়া কঠিন, তবে ঢোলের পাশাপাশি আরো দু-

---

[১৪] এই কবিয়ালসর্বস্বতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে কবিগান সম্পর্কেই ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকেন। সবচেয়ে উদ্ভট ধারণা পোষণ করেন দেবেশ রায়। তাঁর 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' উপন্যাসে দেখা যায় যোগেন মণ্ডল কবিয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গলায় ঢোল নিয়ে তা বাজাতে বাজাতে তরজা গানের মতো প্রশ্নোত্তর করছেন। দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* (কলকাতা: দে'জ, ২০১০), পৃ. ৩৫৮–৫৯।

এক ধরনের আনদ্ধ যন্ত্র, বাঁশি জাতীয় কিছু বাদ্যযন্ত্র, কিছু তারযন্ত্র, কাঁসি বা জুরি জাতীয় কিছু তালযন্ত্র সেই যন্ত্রাদির তালিকায় থাকা সম্ভব। উনিশ শতকের প্রথমে কবিগান শুরু হওয়ার আগে কোথাও কোথাও বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানও হতো। এই ঐকতানের বিভিন্ন অংশ আখড়াই গানের আদলে দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েনবন্দি, মোড় প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলো।

কলকাতা পর্বের কবিগানে বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য থাকাটা স্বাভাবিক ছিলো, যদিও ঢোল এবং কাঁসি ছিলো সেখানে মূল যন্ত্র। কিন্তু কবিগান পল্লিবঙ্গে প্রবেশ করার পর প্রথম দিকে হয়তো আর্থিক কারণে বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা হ্রাস পায়। কোনো কোনো অঞ্চলে কবিগানের জন্য আলাদা যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয় না। তাই হয়তো উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে ঢোল-কাঁসির পরিবর্তে কীর্তনের খোল, করতাল আর বেহালা দিয়ে কবিগান পরিবেশিত হতে দেখা যেতো।[১৫] আবার উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ এই ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঢোল এবং কাঁসিই মূল বাদ্যযন্ত্র হয়ে ওঠে এবং শুধু এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের উপরে নির্ভর করে এখানকার শিল্পীরা অনায়াসে একাধিক রাগ-রাগিণীভিত্তিক দীর্ঘ দীর্ঘ তুকে রচিত গান নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। এই অঞ্চলের কবিয়ালরা বিশ শতকের সূচনাতেও কিভাবে শুধু কাঁসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে কবিগান পরিবেশন করতেন, তা দেখে বরিশাল অঞ্চলের কবিয়াল নকুলেশ্বর দত্ত একবার বিস্মিত হয়েছিলেন।[১৬]

কবিগানে হারমোনিয়মের ব্যবহার কলকাতা পর্বে শুরু হওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ঢোল এবং কাঁসির সঙ্গে এই যন্ত্রটিও জনপ্রিয় হয়। যশোরের তারকচন্দ্র সরকার বা ঢাকার হরিচরণ আচার্যের দলে যেমন হারমোনিয়ম ছিলো, প্রায় সমকালের ঝালোকাঠি কেন্দ্রেও হারমোনিয়ম হয়ে উঠেছিলো বিকল্পহীন একটি বাদ্যযন্ত্র।

বিশ শতকের সূচনা নাগাদ কবিগানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রায় সর্বত্র হারমোনিয়ম, ঢোল, কাঁসি, বেহালা, দোতারা, সানাই, সরোদ, বাঁশি, জুড়ি, খঞ্জনি, নূপুর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একুশ শতকের সূচনায় এসব যন্ত্রের সঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।[১৭]

ঘ. মঞ্চাদির রূপান্তর

আঠারো-উনিশ শতকে কবিগান পরিবেশিত হতো কলকাতায়। জমিদারগণ ছিলেন সেই গানের পৃষ্ঠপোষক; এমনকি অনেকে ছিলেন শখের কবিয়াল। অতএব এই পর্বের

---

[১৫] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহে কবিগান," *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৪, পৃ. ২৬৬।
[১৬] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ২৬১।
[১৭] দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, পৃ. ১৪।

কবিগানের মঞ্চ বেশ মানসম্মত ছিলো, এমন ধরে নেওয়া যায়। শিল্পীসংখ্যা ও শ্রোতাসংখ্যার উপরে মঞ্চের আয়তন ও উচ্চতা নির্ভরশীল হতো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কবিগানের সূচনাকালে শিল্পীসংখ্যা এবং শ্রোতাসংখ্যা কম ছিলো, তাই সেই কবিগানের আসরের জন্য আলাদা উচ্চতা না হলেও চলতো। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগানের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এতোটা বৃদ্ধি পায় যে, অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দারোয়নদের চাবুক পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছিলো বলে জানা যায়। তাছাড়া পরিবেশনকারী শিল্পীদের সংখ্যাও তেরো-চোদ্দ জনের মতো হয়। এতে অনুমান করা সহজ যে, তেরো চোদ্দজন শিল্পীর তাঁদের যন্ত্রাদিসহ বসতে কতোটা জায়গার দরকার এবং অসংখ্য মানুষের নিকট এই শিল্পীদের দৃশ্যযোগ্য করে তুলতে আসরের কতোটা উচ্চতা প্রয়োজন। এসব কারণে মনে হয়, জমিদার বা বিত্তবান ব্যক্তিদের বাড়ির সামনে তখন কয়েক ফুট উচ্চতার এবং একশো থেকে দেড়শো বর্গফুটের মঞ্চ তৈরি করার প্রয়োজন হতো।

কলকাতা থেকে কবিগান পল্লিবঙ্গে আসার সময়ে মঞ্চের এই আভিজাত্য সর্বত্র সব সময়ে রক্ষিত হয়নি। ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলে যখন কবিগান শুরু হয়, তখন মঞ্চ তো দূরের কথা কবিয়ালদের বসার জন্য ভালো কোনো আসনের ব্যবস্থাও থাকতো না। শুধু ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন।[১৮] অনেক সময়ে অজনপ্রিয় কবিয়ালদের বেলায় অথবা শ্রোতাহীন আসরে এমনটা সম্ভব হলেও, কবিগানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে পারে না। তাই এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো কবিয়ালকে কৃতিত্ব দেওয়ার চেয়ে যুগপরিবর্তন এবং কবিগানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশ শতকে কবিগানের আসর বিভিন্ন প্রকারের হয়। গ্রামাঞ্চলের মঞ্চ বা প্রদর্শনী বা মেলার মাঠের মঞ্চ প্রায় একই রকম হয়। কিন্তু শহরের অডিটোরিয়মে যখন কবিগান হয়, তখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত স্থায়ী মঞ্চই কবিগানের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার অডিও-ভিডিও মাধ্যমে যখন কবিগানের আয়োজন করা হয়, তখন সেখানে মঞ্চের ব্যাপার আলাদা। এর মধ্যে অডিওতে যেহেতু কিছু দেখার নেই, তাই কোথায় বসে শিল্পীরা কবিগান পরিবেশন করছেন, সেখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভিডিও মাধ্যমে মঞ্চ অপরিহার্য। তাই ভিডিও করার সময়ে প্রায় ক্ষেত্রেই কৃত্রিম মঞ্চ তৈরি করে নিতে হয়।[১৯]

---

[১৮] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫৫।

[১৯] অধিকাংশ ভিডিও চিত্রে কবিগানের যে মঞ্চ দেখা যায়, তার কৃত্রিমতা অপ্রকাশিত থাকে না। কেননা প্রযোজকগণ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য এটা হয়। বাংলাদেশের

ঙ. সুরের রূপান্তর

আঠারো শতকে ঝিঁঝিট, বেহাগ, দক্ষিণি প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশিত হতো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভৈরবী, বাগেশ্বরী, বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশনের খবর পাওয়া যায়। একই গানের বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন রাগে পরিবেশন করা হতো, এমন তথ্যও জানা যায়। বিশেষত কবিগানের সংকলনগুলোতে প্রতিটি গানের সঙ্গে নানা ধরনের রাগ নির্দেশ করতে দেখা যায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে কবিগানের সুর সুনির্দিষ্ট আদল পায়। তারপরেও এক এক অঙ্গের গানে এক এক রাগের প্রাধান্য থাকে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবিগানের সঙ্গীতপ্রধান অংশের গুরুত্ব লোপ পায়, ধুয়া গান নামে এক ধরনের লঘুসঙ্গীতই তখন অবশিষ্ট থাকে। সেগুলোর সুর কখনো কখনো রাগরাগিণী অনুসরণ করতে পারে বটে, তবে সে বৈশিষ্ট্য এর জন্য আবশ্যিক হয় না।

একুশ শতকের সূচনায় কবিগানের সুর বলতে ধুয়া গানের সুরকেই বোঝাতে থাকে। এইসব ধুয়া গান কখনো শ্যামাসঙ্গীতের সুরে, কখনো কীর্তনের সুরে, কখনো ভাটিয়ালি সুরে, কখনো বাউল সুরে, কখনো মুরশিদি সুরে, কখনো-বা মাইজভাণ্ডারি গানের সুরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এসব গানের অধিকাংশই কোনো না কোনো লোকসঙ্গীতের মধ্যে পড়ে। তবে কীর্তন গান কিছুটা ব্যতিক্রমী। কেননা, কীর্তন গান মূলত রাগনির্ভর। দিনের প্রহর অনুযায়ী বিভিন্ন রাগে কীর্তন রচিত। যেমন তোড়ী, কামোদ, শ্রীরাগ, পাহাড়ী, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগের কীর্তন বিভিন্ন সময় অনুযায়ী পরিবেশিত হয়ে থাকে। অতএব কেউ যদি কীর্তনের সুর অনুসরণ করে ধুয়া গান রচনা করেন, তাহলে তিনি জেনে হোক বা না জেনে হোক ঐসব রাগ দ্বারা প্রভাবিত হতেই পারেন।

স্থান-কাল ভেদে ধুয়া গানের সুরেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের ধুয়া গান পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালের কণ্ঠে ভিন্ন সুরে গীত হতে থাকে। বিজয় সরকারের সুর ছিলো মূলত ভাটিয়ালি-প্রধান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক আসরে অসীম সরকার ভাটিয়ালি সুরের গানকে বাউল আঙ্গিকে পরিবেশন করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "এ বঙ্গে বাউল যেহেতু জনপ্রিয়, আমিই তাই ওই সুরের মধ্যে বাউল টাচটা নিয়ে এসেছি। এতে যুব সমাজ বেশি গ্রহণ করেছে। আসর ও শ্রোতার রুচি বুঝে সুরের রকমভেদ ঘটাতে হয়।"[২০]

টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে যেমন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত অসীম সরকারের সিডিগুলোতেও এই অবহেলার ছাপ স্পষ্ট।

[২০] "সাক্ষাৎকার: লোককবি অসীম সরকার," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস সম্পা. (কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ২৬১।

এ ধরনের পরিবর্তন স্বয়ং গীতিকারকেও করতে দেখা যায়। যেমন রসিকলাল সরকার তাঁর 'চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে' শীর্ষক গানটি ভাটিয়ালি সুরে রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের আসরে গানটি পরিবেশন করেন, তখন এর সুরে বাউল সুরের ছোঁয়া লাগে, এমনকি লয়ও দ্রুত হয়।[২১]

চ. তালের রূপান্তর

কীর্তন গানে ছোটো লোফা, বড়ো লোফা, রূপক, যতি, তেওট, দোঠুকি, দশকোশী, দাশপেড়ে, শশীশেখর, বীরবিক্রম প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গ দিয়ে এসব তাল বাজানো যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ অঞ্চলে যেহেতু ঢোলের পরিবর্তে মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হতো, তাই অনুমান করা যায় যে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে এসব তাল ব্যবহৃত হতো। নড়াইলের কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের দলে সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী নামের একজন শিল্পী মৃদঙ্গ বাজাতেন, তাতে মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবিগানে মৃদঙ্গ সূত্রে ঐসব তালও অনুসৃত হতো।[২২]

অন্যদিকে উনিশ শতকের কবিগানের যেসব নমুনা ছাপা হয়েছে, তাতে পশতো, দক্ষিণি প্রভৃতি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব তাল ঠিক কতো মাত্রার তা উদ্ধার করা কঠিন। অন্যদিকে বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে যেসব তাল ব্যবহৃত হতো, সেগুলো হলো: দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁক, গড়খেমটা, একতালা, কাওয়ালি, পঞ্চম সোয়ারি, দশকুশি, কাশমারী, তেওট, রূপক প্রভৃতি।

তালের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। একুশ শতকের সূচনাতেও পশ্চিমবঙ্গে ঢোল আর করতালই কবিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। পূর্ববঙ্গের মতো বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র সেখানে অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও সেখানে 'ঢুলির ওস্তাদিতে আসর কখনো ঝিমিয়ে পড়তে পারে না', এমনটা জানা যায়।[২৩]

ছ. ব্যবস্থাপনাগত রূপান্তর

কলকাতা পর্বে কবিগানের ব্যবস্থাপনা দুইভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। কখনো কখনো কবিয়াল নিজে দল নিয়ন্ত্রণ করতেন, দলের লোকদের নিয়োগ দিতেন, তাদের প্রশিক্ষণ

---

[২১] পূর্ববঙ্গ পর্বে তিনি যে সুরে গানটি বেঁধেছিলেন, স্বরূপেন্দু সরকার সেই সুরে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের একটি আসর থেকে রেকর্ড করা একটি গানের ক্যাসেট গবেষককে উপহার দেন বাগেরহাট জেলার কালেখাঁরবেড় গ্রামের কবিয়াল হরিদাস সরকার।

[২২] বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবিগানে মৃদঙ্গ বাজাতেন সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী। নিরঞ্জন কুমার সরকার, সম্পা. *সুরেন্দ্র স্মরণিকা* (নড়াইল: শঙ্কর অধিকারী, ২০১০), পৃ. ৭।

[২৩] "সাক্ষাৎকার: লোককবি অসীম সরকার," পৃ. ২৬২।

দিতেন, দলপতি হিসেবে তাদের সুখ-দুঃখের সাথি হতেন। পাশাপাশি সে সময়ে বিত্তবান লোকদের শখের দলও ছিলো, যেখানে বিত্তবান লোকটি নিজে কবিগানের দলের মালিক থাকতেন, কবিয়াল নিয়োগ করতেন, দোহার নিয়োগ করতেন, বাদ্যযন্ত্রী নিয়োগ করতেন। কবিগান তখন খুব জনপ্রিয় থাকার জন্য কোনো একটা দল পরিচালনা করা তখন লোকশানের ব্যাপার ছিলো না। তবে উভয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে কবিয়াল নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাই ভালো ছিলো বলে মনে হয়। কেননা, উনিশ শতকে যেসব দল বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র কবিগান পরিবেশন করতেন, তার প্রায় সবগুলোই ছিলো কবিয়াল নিয়ন্ত্রিত দল।

পূর্ববঙ্গে পর্বেও কবিগানের এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাপনা চোখে পড়ে। ঢাকা জয়দেবপুরের জমিদার কালীনারায়ণ নিজে শখের দল করলেও, নিকটবর্তী সময়ে ঢাকা এবং ময়মনসিংহের কবিগানের দলগুলো মূলত কবিয়ালকেন্দ্রিক ছিলো। যশোরের তারকচন্দ্র সরকারের পিতা কাশীনাথ সরকার নিজে কবিগান পরিচালনা করতেন। সমকালে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলেও কবিয়াল নিয়ন্ত্রিত দলই বেশি ছিলো। উনিশ শতকের মতো বিশ শতকে পূর্ববঙ্গের কবিগানের জন্য এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ শখের দল হলে অন্য বিত্তবান কেউ তার পরিচালক, কিন্তু পেশাদার হলে কবিয়াল নিজেই দলের পরিচালক।

কবিগানের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যবস্থাপনা চালু হয় বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ঝালোকাঠিতে। ঝালোকাঠি বর্তমানে একটি জেলা শহর (১৯৭২ সালে মহকুমা, ১৯৮৪ সালে জেলা)। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এটি ছিলো বরিশালের একটি থানা সদর। তবে পৌরসভা হিসেবে ঝালোকাঠি বেশ প্রাচীন। ১৮৭৫ সালে এখানে পৌরসভা গঠিত হয়। বরিশালের নদীবন্দর হিসেবে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই এর খুব সুনাম ছিলো। বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে অনেকে তখন একে দ্বিতীয় কলকাতা হিসেবে আখ্যায়িত করতো।[২৪] সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও এটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে সব ধরনের লোকশিল্পীদের মিলনকেন্দ্র ছিলো। এর ফলে এখানে ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোক্তার জন্ম হয়। তাঁরা যাত্রা, কীর্তন, কবি, রয়ানি, জারি, গাজি প্রভৃতি প্রায় সব ধরনের গানের দলের মালিকানা অর্জন করেন। এখানকার যাত্রার দল সারা বাংলাদেশে, এমনকি কলকাতায় পর্যন্ত গান পরিবেশন করতে যেতো। এই শহরের নট্ট অপেরার সুনাম এখনো এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

ঝালোকাঠি শহরের যাত্রাদলের যাঁরা মালিক ছিলেন, তাঁদের বলা হতো অধিকারী। তিনি সব ধরনের শিল্পীকে নিয়োগ দিতেন, শিল্পীরা নির্ধারিত বেতনে মরশুমের শুরুতে তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতেন এবং মরশুম শেষে বেতন নিয়ে শিল্পীরা বাড়ি ফিরে যেতেন। সম্ভবত এই ব্যবস্থাপনার দেখাদেখি ঝালোকাঠিতে কবিগানের পেশাদারি দল তৈরি হতে শুরু করে। কবিগানের এই পেশাদারি দলে অধিকারীর মতোই একজন পরিচালক

[২৪] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "ঝালকাঠি জেলা" ভুক্তি।

থাকতেন, যিনি বছরের শুরুতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতেন, দলের সব ধরনের শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করতেন, কবিয়াল নিয়োগ করতেন, চুক্তি অনুযায়ী সকলকে বেতন দিয়ে, নিজের ব্যবসায়িক লাভ তুলে আনতেন। অধিকাংশ সময়ে কবিগানের দলের ঐসব অধিকারীর নামে কবিগানের দলের নাম হতো। অনেক সময়ে কবিয়াল যদি খ্যাতিমান হতেন, তাহলে কবিয়ালের নামেও দলের নাম পরিচিত হতে পারতো।

ঝালোকাঠিতে কবিগানের এই ব্যবস্থাপনার আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এসব ব্যবস্থাপক ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা। রাঙা যামিনী, কালা যামিনী, সরলা প্রমুখ তখন এসব দল পরিচালনা করতেন। এসব মহিলার সামাজিক মর্যাদা ছিলো না বললেই চলে। তবে এঁরা প্রায় সকলেই তখন বিশেষ বিত্তবান ছিলেন বলে সমাজের লোকজন এঁদের গৌণ করে দেখার সাহস পেতো না। বরিশালের বিখ্যাত কবিয়াল শরৎ বৈরাগী, কুঞ্জলাল দত্ত, নকুলেশ্বর দত্ত প্রমুখ এঁদের দলে বেতনভোগী কবিয়াল হিসেবে কবিগান করতেন।

বিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কবিয়াল নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনাই একমাত্র ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়। অঞ্চলভেদে কবিগানের ব্যবস্থাপনায় কমবেশি তফাতও যে লক্ষ করা যায় না, তা নয়। যেমন যশোর খুলনা অঞ্চলে কবিয়াল তাঁর দোহার ও যন্ত্রীদের পালা হিসেবে চুক্তি করতেন। প্রতি পালা অনুযায়ী যাতায়াত ও খাবার খরচ ব্যতীত তাঁদের নির্ধারিত টাকা প্রদান করা হতো। যে সময়ে একজন দিনমজুরের দৈনিক মজুরি দশ টাকা, সে সময়ে একজন ঢুলি পেতেন পালা প্রতি পঞ্চাশ টাকা, দোহার পেতেন যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ ত্রিশ টাকা, কেউ বিশ টাকা, কেউ-বা পনেরো টাকা। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনাও এই রকমের ছিলো বলে মনে হয়। তবে একই সময়ে ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের ব্যবস্থাপনা ছিলো এর থেকে খানিকটা আলাদা। এখানে পালার পুরো টাকাটা বিভিন্ন অংশে ভাগ হতো। আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দেওয়ার পর ষোলো আনার ছয় আনা নিতেন কবিয়াল, চার আনা নিতেন ঢুলি, অন্যরা কেউ দুই আনা, কেউ-বা এক আনা করে পেতেন। অর্থাৎ একশো ষাট টাকার বায়না হলে কবিয়াল পেতেন ষাট টাকা, ঢুলি পেতেন চল্লিশ টাকা, অন্য চার জন হয়তো গড়ে পনেরো টাকা করে পেতেন।

৩. বিষয়গত রূপান্তর

কলকাতা পর্বের কবিগানের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "এ গান একইসঙ্গে গ্রাম্য গান, আবার নাগরিক শিল্প; লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত, আবার ভব্যসাহিত্যেরও আত্মীয়; গীতাত্মক আবার কবিতাত্মক; দেবদেবীর লীলারসে পূর্ণ, আবার বাস্তব জীবনের রঙ্গরসে উতরোল; কখনও বিশুদ্ধ ভক্তির গান, কখনও মানবীয় প্রীতিরসে পূর্ণ; কখনও সুস্নিগ্ধ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক, কখনও অতি

জঘন্য ইতরতায় পর্যবসিত।"[২৫] কলকাতা পর্বের কবিগান সম্পর্কে করা এ মন্তব্য স্থানকাল নির্বিশেষে সব ধরনের কবিগানের জন্য প্রযোজ্য।

স্থান-কাল ভেদে কবিগানের এইসব বৈশিষ্ট্যের কোনো কোনোটা কখনো প্রধান হয়, আবার কোনো কোনোটা কখনো গৌণ হয়। এভাবেই মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও কবিগানে নানা মাত্রার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

ক. বিষয়বস্তুর রূপান্তর

আঠারো শতকে কবিগানের বিষয় ছিলো সীমিত। এ সময়ে ভবানী বিষয়ক গানে চণ্ডীদেবীর বিভিন্ন রূপকে বিষয়বস্তু করা হতো। তার মধ্যে প্রাধান্য পেতো দুর্গা এবং কালী। সখীসংবাদ বিষয়ক গানের বিষয়বস্তু ছিলো রাধাকৃষ্ণের কাহিনি, সেখানে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মা যশোদা, কৃষ্ণের ভাই ও বন্ধুগণ, রাধা, রাধার আত্মীয়-স্বজন, সখীরা ও প্রতিদ্বন্দ্বী নারীরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতো। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনি ও কবিয়ালদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ স্থান পেতো খেউড় নামক অংশে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতা পর্বের কবিগানে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। কালীবন্দনা গানের পাশাপাশি গৌরবন্দনাও কবিগানের অংশ হয়ে যায়। দুর্গা বিষয়ক গানও ভবানীবিষয়, সপ্তমী প্রভৃতি নামে জনপ্রিয়তা পায়। সখীসংবাদের পরিসর বৃদ্ধি পায়। সেখানে ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর, বসন্ত প্রভৃতি নামের গান সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। খেউড়ের পরিসর বাড়ে সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গই নয়, সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গাদিও খেউড়ের বিষয় হয়। যেমন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় (১৮৬২) জমিদারি প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে খেউড় গান পরিবেশনের তথ্য জানা যায়।[২৬]

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট টপ্পা-পাঁচালি নামক অংশে গঠনগত কারণে খেউড়ের অনুরূপ বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে গাঠনিক কারণে টপ্পা-পাঁচালি অংশে পারস্পরিক বিতর্কের পাশাপাশি গল্পের আকারে বহু বিষয়ের অবতারণা হয়। সমকালের প্রায় সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ধারণা এই অংশে ঢুকে পড়ে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের কবিগান কলকাতা পর্বের কবিগানকে পুরোপুরি ধারণ করে, পাশাপাশি নতুন অংশও সংযোজিত হয়। তবে এই পর্বের এক পর্যায়ে কবিগানের ধর্মসাপেক্ষ অংশগুলো ঝরে পড়তে থাকে। তার ফলে পৌরাণিক কাহিনির

---

[২৫] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭।

[২৬] কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৩৯।

অনুপ্রবেশ থাকলেও কবিগান থেকে কালী, দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য হ্রাস পায়। বিশ শতকের শেষার্ধে এই খণ্ডিত ধারা প্রাধান্য পায় এবং এর বিষয়বস্তু কমবেশি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের কবিগানের খেউড় বা লহর অংশ যেমন দুটি পরস্পরবিরোধী পটভূমিতে বিকশিত হয়, বিশ শতকেও তেমন টপ্পা-পাঁচালি ও জোটের পাল্লা অংশে সে দ্বান্দ্বিক পটভূমি লক্ষণীয়। এই দ্বান্দ্বিক পটভূমি তৈরি করা হয় সাধারণত কবিয়ালদের উপরে পৌরাণিক দ্বন্দ্বপূর্ণ দুটি চরিত্র আরোপ করায়। সময়ের ব্যবধানে এই চরিত্রের ধরন যেমন বদলায়, পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও সমকালীন দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্রও সেখানে যুক্ত হয়, কখনো চরিত্রের বদলে দ্বান্দ্বিক বিষয়ও কবিয়াল চরিত্রে আরোপিত হয়।

কবিয়ালদের এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র ও বিষয়ের পরিবর্তন নিম্নের সারণিতে দেখানোর চেষ্টা করা হলো।

সারণি

কবিগানের দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্র ও বিষয়ের পরিবর্তন

কলকাতা পর্বে দ্বান্দ্বিক চরিত্র	পূর্ববঙ্গ পর্বে দ্বান্দ্বিক চরিত্র	পূর্ববঙ্গ পর্বে দ্বান্দ্বিক বিষয়
ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণ	রাবণ-বিভীষণ	ঈশ্বর-মানুষ
কর্ণ-অর্জুন	হনুমান ও রাম	গণতন্ত্র-রাজতন্ত্র
কৃষ্ণ-গান্ধারী	গৌরাঙ্গ-শোভা দেবী	জোতদার-কৃষক
বিদুর-কৃষ্ণ	ধনঞ্জয়-লুৎফর	ধনতন্ত্র-সাম্যবাদ
বিভীষণ-রাবণ	গোবিন্দ ঘোষ-গোপীনাথ	ধর্ম-অধর্ম
বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্র	গান্ধারী-শ্রীকৃষ্ণ	পণপ্রথা—ভালো-মন্দ
ভীম-অর্জুন	নন্দী-শিব	মহাজন-শ্রমিক
যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন	মাইকেল-রামকৃষ্ণ	সাক্ষরতা-নিরপেক্ষতা
রাম-রাবণ	বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ	সাম্প্রদায়িকতা-
কৃষ্ণ-শকুনি	চৈতন্যবালা-তারকচাঁদ	অসাম্প্রদায়িকতা
চাঁদ-মনসা	রানা কুম্ভ-মীরা বাঈ	একাল-সেকাল
কৃষ্ণ-দুর্যোধন	ভূদেব-জ্যোতির্ময়	গ্রাম-শহর
অর্জুন-বভ্রুবাহন	বিভীষণ-শ্রীকৃষ্ণ	বিজ্ঞান—আশীর্বাদ-
বুদ্ধদেব-ছন্দক	লক্ষ্মণ-অহিরাবণ	অভিশাপ
যম-সাবিত্রী	বিশ্বামিত্র-শ্রীরাম	শিক্ষিত-চাষি
চিন্তা-বিল্বমঙ্গল	শ্রীনিবাস-দুর্বাসা	মেয়েরা ঘরে-বাইরে
শুকদেব-রম্ভা	জগাই-শ্রীগৌরাঙ্গ	মহাজন শোষক-
কৃষ্ণ-বৃন্দা	অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণ	উপকারী
	বালি-শ্রীরাম	গণতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র
	ইন্দিরা গান্ধী-শেখ মুজিব	

উৎস: পারিবারিক অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

কবিগানের ধর্মসংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে বিশ্বাসগত পরিবর্তনও ঘটে। কলকাতা পর্বের কবিগানে শাক্ত এবং বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রধান ছিলো। এমনকি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ পর্বেও শাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসই প্রাধান্য বজায় রাখে। এমনকি এ সময়ে ময়মনসিংহের মুসলমান কবিয়াল লাল মামুদও সেই বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে কোনো গান রচনা করেন না। বিশ শতক নাগাদ এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামি বিশ্বাস, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মীয় বিশ্বাস, এবং মতুয়া ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস। এইসব বিশ্বাস অনুযায়ী তখন কবিগানের বিভিন্ন অংশ যেমন ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি শ্রেণির গান রচিত হতে থাকে।

মালশি গানগুলোর বিশেষত্ব হলো, কালীর উদ্দেশে রচিত এইসব গানে সমকালীন সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পায়। অনুবর্তন পর্বের মালশি গানে দেখা যায় কালী পরিণত হয়ে গেছে দেশমাতৃকায়। যেমন নড়াইলের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের 'রূপসী বাংলার মালসী'। এখানে কালীর পরিবর্তে বঙ্গমাতাই কবির উদ্দিষ্ট।[২৭]

খ. দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর

কবিগানে অশ্লীলতার বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো: কলকাতা পর্বের কবিগান খুব অশ্লীল ছিলো, পূর্ববঙ্গের কবিগান সেই অশ্লীলতা থেকে মুক্ত। এই অশ্লীলতা মুক্তির ব্যাপারে কার কতোটা ভূমিকা ছিলো, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। কারণ একাধিক কবিয়ালকে এই কৃতিত্ব প্রদান করতে দেখা যায়। যেমন বিষ্ণুপদ বাগচীর দাবি, তারকচন্দ্র সরকার সর্বপ্রথম 'কবিগানের মধ্য থেকে এই অশ্লীলতা ব্যাধি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'[২৮] হরিচরণ আচার্যের 'কবির ঝঙ্কার' বইয়ের ভূমিকায় বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, 'তিনি [হরিচরণ আচার্য] স্বীয় প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবভাবে কবিগানকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিয়া নব নব রাগরাগিণীর অপূর্ব সংযোগে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। গান, ছড়া, প্রভৃতি সমস্তকেই তিনি অশ্লীলতা ও আবিলতামুক্ত করিলেন।'[২৯] প্রায় অনুরূপ দাবি করেন ময়মনসিংহের কবিয়াল বিজয়নারায়ণ সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কবিয়াল মদন আচার্য।[৩০] কবিয়াল রমেশ শীলের জীবনী রচনা করতে গিয়ে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদও বলেন, কবিগানকে 'প্রচলিত অশ্লীলতা' থেকে মুক্ত করেছিলেন রমেশ শীল।[৩১] বিজয়কৃষ্ণ সরকার সম্পর্কেও একই দাবি তোলেন মহসিন হোসাইন।[৩২]

---

[২৭] গানটির জন্য ৩ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[২৮] বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, পৃ. ২৪।

[২৯] বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "ভূমিকা," *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড, পৃ. জ।

[৩০] শফিকুর রহমান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১১৫।

[৩১] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২৪।

[৩২] মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২৭।

এঁদের সকলের দাবির মধ্যে যে ঐক্যটি লক্ষণীয়, তা হলো, সকলেই মনে করেন যে, কবিগানের কলকাতা পর্বে অশ্লীলতা ছিলো এবং পূর্ববঙ্গ পর্বে সে অশ্লীলতা দূর হয়। যদিও এই ধারণা কতোটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ করা চলে। কেননা কলকাতা পর্বের কবিগানের যেসব নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এবং পূর্ববঙ্গ পর্বের যেসব কবিগান পাওয়া যায়, তার মধ্যকার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। বিষয়ভেদেই তা কখনো অশ্লীল হয়ে ওঠে, আবার কখনো মার্জিত হয়। ঢালাওভাবে কোনো পর্বের কবিগানকে অশ্লীল বা মার্জিত বলা যায় না। বস্তুত শ্রোতাদের রুচির উপরে কবিগানের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে। শ্রোতারা যদি নারীবর্জিত হয়, আসর যদি হয় শ্মশানখোলার মতো নির্জন স্থান; পুরুষ কবিয়ালগণ সেখানে শ-কার ব-কারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেই পারেন, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ অথবা উনিশ শতক ও বিশ শতক বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটা বলেছিলেন, কবিগানে বারে বারে ঘুরে ফিরে আসে পৌরাণিক চরিত্রগুলোর চারিত্রিক হীনতা, পারস্পরিক দোষারোপ ও অবিশ্বাস, যৌনতা ও বীভৎসতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ।[৩৩] সখীসংবাদ হোক বা খেউড় সবখানেই তা ছড়িয়ে থাকে। বিশেষভাবে সখীসংবাদের অশ্লীলতা এক পর্যায়ে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে যায়। যেমন মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থে একজন মহিলা জমিদারের অসতীপনা চিত্রিত করতে গিয়ে লেখেন 'ঘোমটার মধ্যে সখীসম্বাদ'।[৩৪] সখীসংবাদ এখানে অনৈতিক কাজকর্মের সমার্থক। এর পেছনে সখীসংবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির প্রভাব থাকাটা স্বাভাবিক। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে কলকাতা পর্বের কবিগানের থেকে পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে কিছুটা তফাত দেখা যায়। কলকাতা পর্বের সখীসংবাদের তুলনায় পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগান খানিকটা উন্নত রুচির হয়ে ওঠে বলে মনে হয়। মাত্র দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। প্রথমে উনিশ শতকীয় কবিয়াল রাম বসুর সখীসংবাদের এই কলিগুলোর দিকে তাকানো যাক:

> একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।
> তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
> সে বিনে এ যৌবন রতন, বলো রক্ষক কে করিবে রক্ষণ।
> জানে না কমলকলি ফুটিবে মাসান্তে ॥[৩৫]

---

[৩৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কবিসঙ্গীত," *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১১শ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১), পৃ. ৭১২।

[৩৪] মীর মশাররফ হোসেন, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী,' *মশাররফ রচনা সম্ভার*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪২।

[৩৫] প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ২৫২।

নায়িকার যৌবনাবেগের সঙ্গে রজস্বলা হওয়ার ইঙ্গিতটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। একই সঙ্গে যৌনতার ইঙ্গিত দিয়ে প্রেমিককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। কিন্তু একই বিরহের বিষয় যখন পূর্ববঙ্গের কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার বা হরিচরণ আচার্য লেখেন, তখন তার মধ্যে এসব ইঙ্গিত প্রায় অনুপস্থিত থাকে। পরিবর্তে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেম তথা প্রেমের জন্য ত্যাগস্বীকারের বিষয়। যেমন তারকচন্দ্র সরকারের সখীসংবাদের অংশ:

বলিস বন্ধুর কাছে বিনয় করে বিরহিণী গেছে মরে,
শ্যাম তোমা বিহনে, আর চিন্তা নাই তোমার সনে,
লইয়া এক নতুন রানী সুখে থাকো নীলকান্তমণি
আমরা যতো গোপ-গোপিনী শুনে সুখে রবো বৃন্দাবনে ॥[৩৬]

অথবা হরিচরণ আচার্যের সখীসংবাদের কথা:

সখী সেদিন কি আর ফিরে হবে, মনে মনে ভেবে দেখ তাই।
হা মরি কি মরি, যাতনা সইতে নারি, ইচ্ছা হয় বিষ খাই।
আমার কথা যদি সখী মনে হতো তার, করতো প্রেমের ব্যবহার।
না আসতে পারলে একান্ত, আমার মতো সেও কানতো
পত্র লিখে সদা জানতো ব্রজের সমাচার ॥[৩৭]

কালভেদে দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন অবশ্য সর্বত্র লক্ষণীয় হয় না। এর সঙ্গে ব্যক্তিভেদ এবং স্থানভেদ সম্পর্কিত থাকে। এমনও দেখা যায়, শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও কবিয়ালদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কবি-সমালোচক ঈশ্বর গুপ্ত নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন।[৩৮] সমকালীন কবিয়ালদের নিকট তেমন মনোভাবই প্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু শতাব্দীকাল ব্যবধানে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন নারীশিক্ষা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, তখনো কবিয়ালরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। যেমন পিরোজপুরের কবিয়াল দ্বিজবর সরকারের 'ভারত শিয়ালীর কবি'-র একটি অংশ:

মেয়েরা সব চাকরি করে স্বামী রাঁধে ভাত।
কপালপোড়া ভাবে আমার ফিরেছে বরাত। মরি হায় হায় রে।

---

[৩৬] সংকলিত, বিষ্ণুপদ বাগচী, তারকচন্দ্র সরকার (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৬২।

[৩৭] হরিচরণ আচার্য, *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী: হরিপদ সাহা, ১৯৮৬), পৃ. ৮৯।

[৩৮] "আগে মেয়ে গুলো, ছিলো ভালো,/ ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।/ একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,/ আর কি তাদের তেমন পাবে?" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, "দুর্ভিক্ষ," *কবিতা সংগ্রহ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: কেদারনাথ রায়, ১৮৮৫), পৃ. ১২১–২২।

ক্রমে দাম্পত্যে ঘটিলো ব্যাঘাত গো, মূলের চাকা উল্টো দিকে ফিরেছে।
বাঘের গাল হরিণশাবক চাটতেছে ॥[৩৯]

এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে মনে হয়, কবিগানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করা কঠিন। স্থান, কাল ও ব্যক্তি ভেদে তা কখনো মধ্যযুগীয়, আবার কখনো তা চূড়ান্তভাবে আধুনিক। অনেক কবিয়াল একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় মানসিকতা এবং আধুনিক সাম্যবাদী চেতনা ধারণ করেন, সেটাও দেখা যায়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কবিগান এমন একটি গান যেখানে কবিয়ালদের সব সময়ে দ্বন্দ্বমূলক পটভূমিতে গান করতে হয়। তার ফলে জীবনের আদর্শ যাই হোক না কেন, তাঁদের রচিত গানগুলো হয় বিভিন্ন আদর্শের। তাই রমেশ শীল সাম্যবাদী গান রচনা করার পাশাপাশি পাকিস্তানি আদর্শের গান যেমন রচনা করেন, একইভাবে বৈষ্ণবীয় আদর্শের গান, এমনকি মাইজভাণ্ডারী পীরের প্রতি নিবেদিত গানও তাঁকে রচনা করতে দেখা যায়। শেষোক্ত গানের সংখ্যা তাঁর অন্যান্য গানের চেয়ে বরং বেশি। কবিয়ালদের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব উনিশ শতকেও যেমন ছিলো, বিশ শতকেও তা অব্যাহত থাকে, এমনকি একুশ শতকের সূচনাতেও এর অন্যথা হয় না।

কবিগানের এই দ্বন্দ্বপূর্ণ পটভূমি থাকার জন্য একই কবিয়াল কখনো আধুনিকতাকে উদারভাবে গ্রহণ করেন, কখনো তার সমালোচনায় মুখর হন। এমনকি বিশেষ কোনো একটি কবিগানের মধ্যে যুগপৎ রক্ষণশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার ধরা পড়ে। যেমন বিশ শতকের শেষার্ধে রচিত নড়াইলের নারায়ণ সরকার তাঁর 'বিয়ের যৌতুকের কবি'-তে তিনি যৌতুকের তীব্র সমালোচনা করেন, যা তাঁর আধুনিক মনের পরিচায়ক। কিন্তু যৌতুকের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি প্রাচীন কালের দাম্পত্যকে আদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, তা আবার তাঁর রক্ষণশীল মনের পরিচায়ক।

দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির কথা গভীরভাবে বিচার করলে মনে হয়, কবিগানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, কবিগানের গঠনগত ও বিষয়গত কারণেই তাঁরা খানিকটা রক্ষণশীল হয়ে পড়তেন। কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়, কবিগান যেহেতু ছিলো সাধারণ মানুষের গান, তাই সব কালেই তা সাধারণ মানুষের মনের কথা বলে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেহেতু রক্ষণশীলতা অধিক পরিমাণে থাকে, অধিকাংশ কবিগান তাই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত হয়। আধুনিকতার বিষয়টি বরং অধিকাংশ সময়ে হয় আরোপিত। রমেশ শীলের কবিগানের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই তিনি নিজে থেকে যখন গান রচনা করেন, তখন তা ধর্মভাবের হয়, হোক তা হিন্দু বা মাইজভাণ্ডারি; কিন্তু কমিউনিস্টরা যখন তাঁকে ব্যবহার করেন, তখন তাঁর গান হয় শ্রেণিচেতনায় পুষ্ট। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কবিয়ালকে অনুরোধ করা হলে তিনি যে কোনো আদর্শের গান গেয়ে শোনাতে পারেন। পাকিস্তানের জয়গান তিনি একই কারণে গেয়েছিলেন। গান গাওয়াই কবিয়ালের মূল লক্ষ্য, আদর্শ নয়।

---

[৩৯] ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।

কলকাতা পর্বের কবিগানে প্রতিপক্ষ কবিয়ালদের মধ্যে লড়াইয়ের ভাবটা পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানের চেয়ে প্রবল ছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমনকি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবিগান যখন পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে, তখনো এই লড়াইয়ের মনোভাব অটুট থাকতে দেখা যায়। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যতো ধরনের কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব, তা করতে কসুর করতো না। এমনকি এই কৌশলের মধ্যে পেশিশক্তি প্রদর্শনের বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন একটি ঘটনার কথা জানা যায়, কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বের ময়মনসিংহে। উনিশ শতকের শেষ দিকে হাসনপুর গ্রামে দোলযাত্রা উপলক্ষে হোলি গানের মধ্যে কবিগানের পাঁচালি বলছিলেন একদিকে রামগতি শীল এবং পরাণ কর্মকার, অন্যদিকে বিজয়নারায়ণ আচার্য এবং কালীচরণ দে। গানের এক পর্যায়ে দুই দলের মধ্যে মারামারি লেগে যায়, তাতে বিজয়নারায়ণের পক্ষের লাঠির আঘাতে পরাণ কর্মকারের দাঁত ভেঙে যায়।[৪০]

এ ধরনের পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী কবিগান বিশ শতকে এসে দুর্লক্ষ্য হয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আয়োজকগণ কোনো একজন কবিয়ালের উপরে দায়িত্ব দেন কবিগান পরিবেশনের জন্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কবিয়াল বিপক্ষের কবিয়ালকে জোগাড় করে নিয়ে গান করেন। অনেক সময়ে দেখা যায় গানের পুরোটা মরশুম কোনো একজন কবিয়াল বিপক্ষের কোনো বিশেষ একজনের সঙ্গে জোট বেঁধে কবিগান করছেন। ময়মনসিংহের রামগতি ও রামু, যশোরের তারকচন্দ্র ও গোবিন্দ তাঁতি, ঢাকার হরিচরণ ও চণ্ডী ঠাকুর, নকুলেশ্বর ও রাজেন্দ্রনাথ, বিজয় ও নিশি প্রমুখ সরকারের জোট পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে বহুল আলোচিত। সাধারণ মানুষও এঁদের মধ্যকার লড়াই উপভোগ করতে বিশেষ আগ্রহী থাকতেন। কিন্তু এঁরা যেহেতু সারা বছর ধরে পরস্পরের সঙ্গে বিতর্ক করতেন, তাই সেসব বিতর্ক যে এক ধরনের অভিনয় হতো তা বলাই বাহুল্য। এভাবে কলকাতার কবিগানের লড়াই পূর্ববঙ্গে প্রথম দিকে কিছুটা থাকলেও বাস্তব কারণে তা শেষ পর্যন্ত বাকযুদ্ধের মধ্যে সীমিত থাকে, সত্যিকারের লড়াই হয়ে ওঠে না।

৪. চূড়ান্ত পরিবর্তন

স্থানকালের ব্যবধানে কবিগানের পরিবর্তন কখনো এতো বেশি হয় যে, তা তখন ভিন্ন নামে পরিচিতি পায়। এমন চূড়ান্ত পরিবর্তনেরই অন্য নাম রূপান্তর। পূর্ববর্তী আলোচনায়, বিশেষভাবে কলকাতা পর্বের কবিগানের আলোচনায় দেখা গেছে, বেশ কয়েক ধরনের গানকে আত্তীকৃত করার মধ্য দিয়ে কবিগান কিভাবে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করছিলো এবং কবিগান কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠছিলো। কবিগানের গঠন ও বিষয় বিবেচনায় উনিশ শতকের কবিগানকে একুশ শতকের কবিগানের সঙ্গে তুলনা

---

[৪০] বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা," *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃ. ৫৪।

করা হলে, তা সম্পূর্ণ আলাদা গানের মতো মনে হবে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন ঘটেছে বলে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও কবিগানের নাম একই থাকে। কিন্তু কখনো এমন হয়েছে যে, কবিগানের মূলধারাটি বজায় থাকার পাশাপাশি কবিগানের অনুরূপ নতুন দু-একটি প্রকরণের জন্ম হচ্ছে। কবিগানের এমন রূপান্তর ঘটছে যে, তাকে নতুন নাম গ্রহণ না করে উপায় থাকছে না। কবিগানের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে সৃষ্ট এমন গানের মধ্য থেকে দু-একটি পরিচয় একে একে উপস্থাপন করা হলো।

ক. তরজা গান

কবিগানের কলকাতা পর্বে তরজা গানের সৃষ্টি। তরজা শব্দটি আরবি তরজীবন্দ (تَرجِیعبَند) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ কবিতার এমন চরণ, যা ধুয়ার মতো বারে বারে উচ্চারণ করতে হয়।[৪১] মধ্যযুগের সাহিত্যে ছড়াগানের প্রতিশব্দ হিসেবে শব্দটি চালু হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন: "ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে/ করিয়াছে বর্ণনে/ সেই তর্জা পড়ে অনুক্ষণ।"[৪২] ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই থাক না কেন, উনিশ শতক নাগাদ তরজা নামে বাংলা গানের নতুন একটি মাধ্যমের জন্ম হয়। সামগ্রিক বিচারে তরজা গান মানে হলো এক ধরনের বিতর্কমূলক ছড়াগান। কবিগানের বিকল্প হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এই লোকমাধ্যমটি বিশ শতক ও একুশ শতকে বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

যাঁরা তরজা গান পরিবেশন করেন, তাঁদের দাবি অনুযায়ী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভরু ঠাকুর সর্বপ্রথম তরজা গানের প্রচলন করেন, তাঁর শিষ্য ছিলেন ধ্রুবচাঁদ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা পর্বের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা প্রমুখের বিপক্ষে ধ্রুবচাঁদ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, বারুইপুর, মগরাহাট প্রভৃতি এলাকায় তরজা গান পরিবেশন করতেন।[৪৩] মুর্শিদাবাদের হোসেন শেখের বিপক্ষেও তিনি তরজা গান গাইতেন বলে জানা যায়। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিও হোসেন শেখের বিপক্ষে তরজা গান পরিবেশন করতেন।[৪৪] অনেকের ধারণা উনিশ শতকের শেষার্ধে হাওড়া জেলার সালকিয়া অঞ্চলেই তরজা গানের উদ্ভব হয়। এই অঞ্চলের মধু ঠাকুর এবং তারক পাল প্রথম তরজাগায়ক।[৪৫]

---

[৪১] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "তরজা" ভুক্তি। প্রফুল্লচন্দ্র পালের ধারণা এটি 'তর্জন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃ. পঁচিশ।

[৪২] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন সম্পা. (নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৩), পৃ. ৫৭৩।

[৪৩] নিশীথ চক্রবর্তী, *তরজা গান* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩), পৃ. ৯।

[৪৪] দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, পৃ. ২৮। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ও হোসেন শেখের জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ৮।

[৪৫] নিশীথ চক্রবর্তী, *তরজা গান*, পৃ. ৭।

তরজা গান যে কবিগানের অনুকরণে গড়ে উঠেছিলো তা বোঝা যায় এর গঠন থেকে। কবিগানের শেষ অংশ—যা কবির লহর, জোটক বা জোটের পাল্লা নামে পরিচিত—যেখানে উভয় কবিয়াল সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে গানের সুরে ছড়া কেটে পরস্পরের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চালিয়ে যান, তরজা গানের মূল অংশ সেটা। অনুমান করা যায়, কবিগানের এই অংশ শ্রোতাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এই অংশ নিয়ে তরজা গানের জন্ম হয়েছিলো। তবে লক্ষণীয়, কবিগানের অংশ হিসেবে জন্ম হলেও তা কবিগানের সমান্তরালে কলকাতা এবং তার আশেপাশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পুরো বিশ শতক তো বটেই, একুশ শতকের সূচনায়ও তরজা গান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকের জেলাগুলোয় বিশেষ জনপ্রিয় একটি লোক-মাধ্যম।

তরজা গানের শিল্পী, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদি, সাজসজ্জা, পরিবেশনরীতি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি প্রদান করা হলে বোঝা যাবে কবিগানের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা কী পর্যায়ের।

তরজা গানের মূল শিল্পী তরজাওয়ালা নামে পরিচিত। তরজা গানে সব সময়ে দুজন তরজাওয়ালার প্রয়োজন হয়। এদের সহায়তাকারী যন্ত্রসঙ্গতকারীগণ কখনো আলাদা, আবার কখনো অভিন্ন। আলাদা হলে সেক্ষেত্রে দুই দলের যন্ত্রসঙ্গতকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, এক হলে তিন-চারজন সহায়তাকারী নিয়েই গানের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতে পারে। একুশ শতক নাগাদ তরজা গানে ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে একটি ঢোল, একটি কাঁসি এবং একটি হারমোনিয়ম আবশ্যিক।

তরজাওয়ালা এবং সহশিল্পীদের পোশাকে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। সাধারণত তাঁরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। তবে তরজাওয়ালা সাধারণত পায়ে নূপুর পরে থাকেন।

তরজা গানের জন্য বড়ো ধরনের কোনো মঞ্চের দরকার হয় না। এক একটা আসরের সময়কাল সাধারণত দুই থেকে তিন ঘণ্টা। প্রথমে একজন তরজাওয়ালা এসে একটা গান ধরেন এবং সেই গানের সুরে ছড়া কেটে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই দ্বিতীয় তরজাওয়ালাও আসরে উঠে দাঁড়ান এবং একই সুরে ছড়া কেটে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রশ্নোত্তর অধিকাংশ সময়ে সমিল ছড়ায় হয়ে থাকে, কখনো কখনো তা অমিলও হতে দেখা যায়; এমনকি সরল গদ্যেও।

তরজার বন্দনা গানের বিশেষ দুটি অংশ রয়েছে: চৌবন্দী ও আকড়। 'চৌবন্দী' হলো বন্দনা গানের সুরে কথা বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গেয়ে শোনানো অংশ আর 'আকড়' হলো গানের বিষয়বস্তুকে সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা বা বিস্তার করা। চৌবন্দী ও আকড়ের পরপরই শুরু হয় ছড়া কাটা। তরজা গানের বন্দনা গান, যা আসর গান নামেও পরিচিত, অনেক সময়ে কবিগানের ডাক গানের মতো মনে হয়। যেমন মানিকচন্দ্র দাসের এই গানটি:

ওমা মহামায়া মোহমায়া দিয়াছ অধম সন্তানে।
তাইতো উমা হররমা আছি গো মা অজ্ঞানে ॥

শিবের কৃত তন্ত্রশাস্ত্র জানাই বারতা।
শৈলসুতা জগদ্ধাতা গুণের অতীতা ॥

এই কি তোর মা উদারতা ছেলের প্রতি নাই মমতা,
পাষাণকায়া তোমার পিতা দয়া করো কেমনে ॥

আমরা হাঁটাহাঁটি খাটাখাটি করিলাম কতো।
দেহটি করিলাম মাটি হয়ে বিব্রত।
ঐ চরণে শরণাগত পড়ে আছি মা মায়ার শাসনে ॥

ওমা, আমরা মনেতে ভাবি না একবার
আসতো এ তিন সংসার, আর ব্রহ্মময়ী সারদা সারা তুমি মাগো সার
রাতুল চরণ তোমার ভজন সাধন করিবার
সুযোগটি কই দিলে আমায় পড়ে আছি অচেতনে ॥

আদ্যাশক্তি দিয়া শক্তি দেখাও চাতুরী
পঙ্গুজনা রঙ্গখানা লজ্ঘায়ে গিরি
লক্ষ ধনের অধিকারী তারে সাজাও মা দিনভিখারি
পাপী যায় বৈকুণ্ঠপুরী মা কেবল তোর করুণাগুণে ॥[৪৬]

এই গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পর্বের যে-কোনো কবিয়াল রচিত ডাকগান প্রতিতুলিত হতে পারে। তরজা গানের মূল অংশ হলো ছড়া কাটা। এই ধরনের গানের পরেই কবিগানের জোটের পাল্লার মতো ছড়া কেটেই মূল তরজা শুরু হয়। যেমন ডিপ-টিউবওয়েলের জন্ম কিভাবে হয়, সেই প্রশ্নের উত্তরে মেঘনাদ মণ্ডলের পয়ারে রচিত ছড়া:

মহাভারতের যুদ্ধকালে ভীষ্মের শরশয্যা হলো।
পিপাসার জন্য অর্জুনেরে বারি আনতে বললো।
পাতালেতে বারি আছে জেনে অর্জুন বাণ ছাড়লো।
পাতাল হতে জল এসে ভীষ্মের বদনেতে পড়লো।[৪৭]

ছন্দের উপস্থিতি কম হলেও ছড়াটিতে মিল আছে, দেখা যায়। তবে অনেক সময়ে কবিগানের ছড়ার মতো ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দেও তরজা গানের ছড়া তৈরি হয়ে থাকে। যেমন ভোলা ময়রা এবং জগা বেরার মধ্যকার ছড়া-কাটা। এখানে দেখা যাচ্ছে ভোলা ময়রা ভগ্ন চৌপদীতে এবং জগা চৌপদীতে ছড়া কাটেন। যথা:

ভোলা ময়রা—

কি করে বললি জগা জড়া গোলোক বৃন্দাবন।

---

[৪৬] তদেব, পৃ. ৬৬–৬৭।
[৪৭] উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৪৪।

যেখানে চাষা রাজা বামন প্রজা চৌদিকে দেখ বাঁশের বন ॥

আমি ভোলা তুই রে জগা
শোনরে বলি হতভাগা।
বুঝলি না তো গোড়া আগা
বুঝলি না তার বিশেষ কারণ ॥

জগা বেরা—

সে ভোলা তুই নয়রে ভোলা
বৃথা তোর চাতুরী ছলা
কৈলাসে যার গিরিবালা
পায় না মুনিগণ দরশন।
আমি জগাই এই ভগবান
ত্রিতাপ জ্বালা দি পরিত্রাণ
তুই ভোলা হসরে অজ্ঞান
আমি হই পতিতপাবন ॥

কবিগানের ধুয়া গান হিসেবে যেমন কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, মুরশিদি, মারফতি, দেহতত্ত্ব বিভিন্ন নামের গান অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তেমনি তরজা গানের মধ্যেও ছড়াকাটার ফাঁকে ফাঁকে তরজাওয়ালারা এ জাতীয় গান পরিবেশন করে থাকেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিপরীত পক্ষকে আক্রমণ করে এক ধরনের 'টপ্পা' গান রচিত হতো। অনুরূপভাবে তরজা গানের মধ্যে 'ঠেস টপ্পা' নামে এক ধরনের গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এর আঙ্গিক কবিগানের ধুয়া গানের মতো হলেও নামের দিক দিয়ে তা টপ্পাকে মনে করিয়ে দেয়। যেমন তরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের একটি ঠেস টপ্পা:

গাছেতে বেল পেকেছে ওরে কাক ডালে বসে ভাবছে কি।
পেঁপে নয় যে ঠুকরে খাবে বেলের মর্ম বুঝবে কি ॥

এইসব কাকের এমন স্বভাবধারা শুকনো বিষ্ঠায় ঠোকর মারা।
আমি হলাম জ্যান্তমরা এনার তরজা শেখায় আছে বাকি ॥

আমি বলবো এদের কিছু কিছু গাব গাছে ফলবে লিচু।
বাঁশবাগানে বুনো কচু কোনটা ভালো কোনটা মন্দ চিনলে কি ॥[৪৮]

একুশ শতকের সূচনা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যাঁরা তরজাওয়ালা হিসেবে খ্যাতিমান, তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছে নিশীথ চক্রবর্তী। সেই তালিকা

---

[৪৮] উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৪৮–৪৯।

অনুযায়ী কয়েকজন তরজাওয়ালার নাম নিম্নরূপ: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা—গোলাম রসুল, তরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, তারা নস্কর, নুরউদ্দিন মোল্লা, প্রকাশ বারিক, প্রভঞ্জন মাঝি, বসন্তকুমার নস্কর, মেঘনাদ মণ্ডল, শম্ভুনাথ মোদক, স্বপনকুমার মণ্ডল, হরিপদ মিস্ত্রি, হারাণচন্দ্র জোয়ারদার; উত্তর চব্বিশ পরগনা—অসীম সরকার, কার্তিক মল্লিক, কালীপদ দাস, দেবেন সরদার, প্রফুল্ল সরকার; হাওড়া—অজিতকুমার মান্না, নেপাল চক্রবর্তী, বাঁশি দলুই, শংকর মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল; হুগলি—গোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, মহামায়া দাস, রামপদ পাত্র, শ্রীকুমার সেন, সাগর পণ্ডিত; মেদিনীপুর—মণিভূষণ প্রামাণিক, মদনমোহন দলুই; বাঁকুড়া—কৃষ্ণকান্তি খাঁ, মানিকচন্দ্র দাস।[৪৯]

খ. জারিগান

ফারসি জারি (زاری) থেকে জারিগানের নামকরণ হয়েছে। জারি শব্দের মূল অর্থ ক্রন্দন, বিলাপ বা প্রচার করা।[৫০] এই অর্থ ধারণ করেই বাংলায় জারিগানের অর্থ দাঁড়িয়েছে শোকগীতি। কারবালার যুদ্ধের করুণ কাহিনি এবং বিশেষভাবে নবীজির দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের করুণ মৃত্যু নিয়ে রচিত কাহিনিই জারিগানের মূল বিষয়। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত জারিগান ছিলো পাঁচালিগানের মতো বর্ণনামূলক এবং সেখানে হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনির পাশাপাশি, মক্কার জন্মকথা, জহরনামা, সাদ্দাদের কাহিনি, শাহজালালের কাহিনি, সোহরাব-রুস্তমের কাহিনি প্রভৃতি স্থান পেতো। হিজরি মহররম মাসের সূচনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জারিগান পরিবেশিত হতো বলে জানা যায়। জারিগানের এই প্রকরণ ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা পায়। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি' গ্রন্থে এই শ্রেণির বেশ কয়েকটি জারিগান উদ্ধৃত করেছেন।[৫১] কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে জারিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কবিগানের সরাসরি প্রভাবজাত বলে খুব সহজে অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন, "জারীগানের সঙ্গে কবিগানের তুলনা করা যাইতে পারে। হয়ত এই দেশী কবিগানের অনুকরণেই আমাদের মুসলিম সমাজে জারীগানের প্রচলন হইয়াছিল।"[৫২]

বিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু করে একুশ শতকের সূচনা পর্যন্ত বাংলাদেশে যাঁরা জারিগান পরিবেশন করেন, তাঁরা ঐতিহ্যিক এইসব কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি

---

[৪৯] তদেব, পৃ. ১৫–১৬।

[৫০] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "জারি গান" ভুক্তি।

[৫১] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৪৩–৮১।

[৫২] জসীমউদ্‌দীন, জারীগান (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৮), পৃ. ৯।

জারিগানের মধ্যে কবিগানের মতো প্রশ্নোত্তরমূলক পাঁচালি অন্তর্ভুক্ত করেন। তার ফলে ঐতিহ্যিক কাহিনিগুলোর পাশাপাশি নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ও সমকালীন প্রসঙ্গ জারিগানের মধ্যে স্থান পায়।

বিশ শতকের জারিগানে কবিগানের মতোই দুটি দল থাকে। উভয় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহ থাকে। কবিগানের দলনেতা যেমন কবিয়াল, জারিগানের দলনেতা তেমন জারিয়াল বা বয়াতি। কবিগানে যেমন দোহারের দরকার হয়, জারিগানেও প্রতিটি দলে দুই থেকে চারজন করে দোহার থাকে। কবিগানে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন হারমোনিয়ম, ঢোল, কাঁসি, দোতারা, বেহালা, সারিন্দা, জুড়ি, বাঁশি—জারিগানেও তা আবশ্যিক বাদ্যযন্ত্র। কবিগানের পাঁচালি অংশে ছড়া কাটার পূর্বে কবিয়াল যেমন ধুয়া গান ধরেন, জারিগানেও তেমন ধর্মীয় অনুষঙ্গের ধুয়া গান দিয়ে প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া কাটা শুরু হয়।

জারিগানের এই নতুন পর্যায়ে কবিগানের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, ইতিহাসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন জারিগানের প্রবাদপুরুষ ঝিনাইদহের পাগলা কানাই (১৮০৯–১৮৮৯) তাঁর সময়কালের একাধিক কবিয়ালের সঙ্গে কবিগান করেছেন। কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বের অন্যতম প্রধান কবিয়াল নড়াইলের তারকচন্দ্র সরকারের (১৮৪৫–১৯১৪) বিপক্ষেও তিনি কবিগান করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫৩] এতে মনে হয় উনিশ শতকেই জারিগান এবং কবিগানের মধ্যকার তফাত কমে এসেছিলো এবং প্রকরণ দুটিতে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো। পাগলা কানাইয়ের অন্যতম শিষ্য ইদু বিশ্বাস এবং হাকিমচানও তারকচন্দ্রের বিপক্ষে কবিগান করেন। সমকালে নড়াইলের বিখ্যাত জারিগায়ক ফজর বিশ্বাসও (১৮৬০–১৯৪৫) তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন বলে জানা যায়।[৫৪]

কবিগানের সঙ্গে জারিগানের এই সম্পর্ক বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অটুট থাকে। তার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক কবিয়াল প্রয়োজনমতো কখনো কবিগান করেছেন, কখনো জারিগান করেছেন। বিশ শতকের শেষার্ধের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকার (১৯০৩–১৯৮৫) মোসলেম মোল্যাহ বয়াতি (১৯০৩–১৯৮৭), আবদুল গনি বয়াতি প্রমুখের বিপক্ষে জারিগান করেছেন। নিকটবর্তী সময়ে বাগেরহাটের স্বরূপেন্দু সরকার (১৯৩৩–২০০৯) এবং আসমত আলী বয়াতি (১৯২৭–২০০০) পাকিস্তান পর্বের শেষ দিকে কখনো কবিগান আবার কখনো জারিগান পরিবেশন করেছেন।

কবিগানের মতো জারিগানেও বন্দনাগান থাকে, বর্ণনামূলক এক ধরনের গান থাকে, যার নাম একেবারেই কবিগানের অনুরূপ—গোষ্ঠগান। এরপর কবিগানের পাঁচালির মতো জারিগানের মূল অংশ শুরু হয়। কবিগানে যেমন দ্বন্দ্বমূলক দুটি পক্ষে

---

[৫৩] বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, পৃ. ২৮।
[৫৪] তদেব, পৃ. ২৮।

কবিয়ালদ্বয়কে অভিনয় করতে হয়, জারিগানেও তেমন জারিয়াল বা বয়াতিকে দুটো পক্ষ অবলম্বন করতে হয়। এসব দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ, জীবাত্মা-পরমাত্মা, গুরু-শিষ্য, শরিয়ত-মারিফত, আদম-শয়তান, সুফি-মোল্লা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবিগানের শেষ দিকে যেমন জোটক বা জোটের পাল্লা হয়, জারিগানের শেষ দিকেও তা থাকে এবং তা জোটক নামে অভিহিত হয়।

নতুন পর্যায়ের এই জারিগানে বিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ পুরুষ বয়াতির পাশাপাশি মহিলা বয়াতিও লক্ষণীয়। কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামে মুহররম মাসের একাদশ ও দ্বাদশ দিনে একাধিক মহিলা কবিয়াল জারিগান পরিবেশন করেন বলে জানা যায়। এই অঞ্চলে জারিগানের পাশাপাশি জারিনৃত্যও পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিশ শতকের শেষার্ধে কবিগানের সমতুল্য এই জারিগানে যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মোসলেম মোল্যাহ বয়াতি, আবদুল গনি বয়াতি, আবদুল মালেক দেওয়ান, আবদুল খালেক দেওয়ান, দারোগ আলী বয়াতি, সাই আলী বয়াতি, আব্বাস আলী ভাসান, মোহাম্মদ আলী আকবর মিয়া, আসমত আলী বয়াতি, খোরশেদ আলী বয়াতি, আবদুল কাদের বয়াতি, উকিল উদ্দিন বয়াতি, ইদ্রিস আলী বয়াতি, আবদুস সত্তার বয়াতি, সাইদুর রহমান বয়াতি প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫৫]

কবিগানের ধুয়া এবং জারিগানের ধুয়ায় বিশেষ কোনো তফাত নেই। যেমন বাগেরহাটের আসমত আলী বয়াতির একটি ধুয়া:

কোকিল গাও রে গান তমালের ডালে
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে ॥

আলিফেতে আছে আল্লাহ, মিমে মহম্মদকে বানাইয়া
কেন মধ্যেতে লাম বসাইলা, নামের ভেদ কি বলো খুলে ॥

আপে বারি করি করিলেন সৃজন, নূরেতে সে পাক পাঞ্জাতন
আলি ফাতেমা হাসান হোসেন, রাসুল ময়ূর রূপে আরশে ছিলে ॥

আমার নবী যখন জন্ম নিলো, বিবি আমিনার গর্ভেতে এলো
বলো চার জন তারা কোথায় ছিলো, কিভাবে জগতে এলে ॥

---

[৫৫] বাংলাদেশে জারিগানের বয়াতি অসংখ্য। এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশেরর প্রায় প্রতিটি গ্রামে জারিগানের বয়াতি খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন বাগেরহাট জেলার সদর থানার দেপাড়া গ্রামেই বাস করেন অন্তত চার জন বয়াতি: তৈয়ব আলী বয়াতি, নূর মহম্মদ বয়াতি, মুজিবুর রহমান বয়াতি, এবং সত্তার খান বয়াতি। পার্শ্ববর্তী মাধবকাঠি (সাহাবউদ্দিন বয়াতি), জোবাই (ঝাহেরউদ্দিন বয়াতি), গজালিয়া (লেহাজউদ্দিন বয়াতি, আলকাছ বয়াতি), কচুরিয়া (আবদুল গফুর বয়াতি এবং তাঁর পুত্র ইদ্রিস আলী বয়াতি) প্রভৃতি গ্রামে একাধিক বয়াতির বাসস্থান। এ থেকেই বাংলাদেশে জারিগায়কদের সংখ্যা আন্দাজ করা সম্ভব। সাক্ষাৎকার: ইদ্রিস আলী বয়াতি, কচুরিয়া, বাগেরহাট। সাক্ষাৎকারের তারিখ, কালীগঞ্জ বাজার, ২০ মে ২০১০।

যখন ময়ূর রূপে আরশের উপর, মা ফাতেমা ছিলেন গলার হার
ছিলেন হাসান হোসেন কানের ঝংকার, আলি করমুল্লাহ তাজ রূপে ছিলে ॥

আসমত বলে আমি গোনাগার, যেন শেষকালে কী দশা হয় আমার
তুমি তরাইয়া নাও পরওয়ারদেগার, আমি দীন হীন খাকসার বলে ॥[৫৬]

অথবা ইদ্রিস আলী বয়াতির ধুয়া গান:

ডাকিলে নাইকো জবাব খুঁজলে দেখা না পাই চোখে।
যেজন ঘোরে লাভের আশায় রাখো তারে মহাসুখে ॥

কেহ আল্লা বলে ডাকে তোমায়, হরিনামে কেউ ডাকে ধরায়।
কেউ বা জিশু বলে মুখে।
কেউবা মানে না তোমায়, না দেখিলে আপন চোখে ॥

তুমি নাকি বন্ধু হওরে সবার, আবার সর্বজীবের হওরে অধিকার
এ অখণ্ড ভুবলোকে।
কি নাম ধরে ডাকি তোমায় পড়ে গেছি ঘূর্ণিপাকে ॥

ভবে কতো রসিক নাইয়া, গাউস কুতুব পীর আউলিয়া
মুনি-ঋষি ধ্যানে থাকে।
তব প্রেমে পাগল হইয়া চলে গেছেন এক পলকে ॥

কবি ইদ্রিস কেন্দে আকুল হয়, জানতে তোমার আসল পরিচয়
নাম ঠিকানা বলে দে কে।
কেউ কয় সাকার, কেউ কয় আকার, কেউ নিরাকার বলে যাকে ॥[৫৭]

গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবিগানের যেসব ধুয়া গান সংকলিত হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, জারিগানের এইসব ধুয়ার গঠন হুবহু এক। প্রথম দুই চরণ স্থায়ী বা চিতান, এবং পরে একাধিক অন্তরা। এসব গান যখন পরিবেশন করা হয়, তখন তা কবিগানের ধুয়া, না জারিগানের ধুয়া আলাদা করে বোঝা যায় না। কবিগান এবং জারিগানের বিষয়ও অনেক সময়ে অভিন্ন হয়, যেমন—নারী-পুরুষ বা গুরু-শিষ্যের পাল্লা। কখনো কখনো পরিবেশন এবং ধর্মীয় কিছু অনুষঙ্গ ছাড়া কবিগান এবং জারিগানের মধ্যকার তফাতও বোঝা মুশকিল হয়। এমনকি জারিগানের মূল বিষয় কারবালার যে কাহিনি, অনেক জারিগানের মধ্যে তা একবারও উচ্চারিত হয় না, আবার এমন কবিগানও হয়, যেখানে হাসান-হোসেনের কাহিনি পাঁচালির মতো করে বর্ণনা

[৫৬] ১৯৮১ সালে আসমত আলী বয়াতির নিকট থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

[৫৭] ১৯৮১ সালে আসমত আলী বয়াতির নিকট থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত। ২০১০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ফোনের মাধ্যমে বয়াতির নিকট থেকে যাচাইকৃত।

করা হয়। কবিগান এবং জারিগানের এই অভিন্নতা গবেষকদেরও অনেক সময়ে বিভ্রান্ত করে।

গ. বিচার গান

অনেকের ধারণা বিচার গান কবিগানের নামান্তর।[৫৮] বস্তুত বিশ শতকের ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, নাটোর প্রভৃতি অঞ্চলে বিচার গান জনপ্রিয় একটি লোকমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বিচার-গায়ক আবদুল হালিম বয়াতির ধারণা, পশ্চিমবঙ্গীয় 'কড়চা' গান বিবর্তিত হয়ে বিচার গানের জন্ম হয়েছে।[৫৯] কবিগানের মতো এ গানেও দুটি পক্ষ থাকে, থাকে দুইজন মূল গায়ক; কবিগানের মূল গায়কের মতো এরা 'বয়াতি' অথবা 'সরকার' নামে পরিচিত হয়। এক গায়ক গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, অন্য গায়ক গানের মাধ্যমেই সেই গানের জবাব দিতে চেষ্টা করেন। গানগুলোর গঠন বাউল আঙ্গিকের। পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে সখীসংবাদাদি গানে যেমন গান দিয়ে গানের জবাব দিতে হতো, এও অনেকটা সেই রকম। তবে সখীসংবাদাদি গানে যেমন অনেকগুলো তুক থাকতো, বিচার গানে থাকে মাত্র দুটি তুক—একটি চিতান এবং একাধিক অন্তরা। জারিগানের মতো এ গানের মূল গায়ককেও বয়াতি বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রাদিও জারিগান বা কবিগানের অনুরূপ।

বিচার গানের আসর বসে সাধারণত দর্শক-শ্রোতাদের মাঝখানে। প্রথমে বিষয় নির্বাচন করে নেওয়া হয়। বিষয়ের মধ্যে থাকে নবিতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, মেরাজতত্ত্ব, সুফিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, যৌবনতত্ত্ব প্রভৃতি। কবিগান বা জারিগানের মতো শরিয়ত-মারফত, জীব-পরম, নবুয়ত-বেলায়েত, নুর-কার, আদম-শয়তান, হিন্দু-মুসলমান, কাম-প্রেম, ধর্ম-কর্ম, আস্তিক-নাস্তিক, সাকার-নিরাকার, কবি-বিজ্ঞানী, নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্বমূলক বিষয় নিয়েও বিচার গান হয়।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিচার গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিচার গানে কবিগানের পাঁচালির মতো প্রথমে একটি ধুয়া গান গাওয়া হয়, পরে সেই গানের ভাব সম্প্রসারণ করা হয়—কখনো গদ্যভাষায়, কখনো পদ্যভাষায়। মানিকগঞ্জ জেলায় এই ধরনের

---

[৫৮] যেমন প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম-আল-দীন ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর একটি আলোচনা-সভায় জানান, ১৯৯২ সালের শীতকালে তিনি মানিকগঞ্জের বিচারগায়ক আজহার বয়াতি এবং মফেজ বয়াতিকে দিয়ে কবিগান পরিবেশন করিয়েছিলেন। "বাংলাদেশের কবিগান: উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য, আলোচনা," *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৮৫।

[৫৯] শফিকুর রহমান চৌধুরী, "বিচার গান এবং প্রবীণ শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি," *লেখা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১২।

গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। ক্রমে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বিচার গান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।[৬০] ভিডিও মাধ্যমেও তা প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা বিচার গান পরিবেশন করেন, তেমন কয়েকজন বয়াতির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

ফরিদপুরের আবদুল হালিম বয়াতি, আহমদ বয়াতি, জাজিরার বাসুদেব ভক্ত, অম্বিকাপুরের হাজেরা, ফরিদপুরের কোব্বাছ আলী, ছাদেক আলী বয়াতি, কাছিম ফকিরের ছেলে ছাদের বয়াতি, আমত বয়াতি, শাকপাইদার রশিদ হাজি, প্রেমতারার ইয়াছিন বয়াতি, বরদিয়ার তমিজউদ্দিন বয়াতি, সদরদির মোহন বয়াতি, যশোরের কানাই, মহেন্দ্র, কুষ্টিয়ার বেহাল শাহ, ঝাড়ু শাহ, শুকুর শাহ, তক্কেল শাহ, খোদা বকশ শাহ, খোরশেদ শাহ, লাইলি, পাবনার কইজুড়ির এম এ গফুর, ওমর আলী বয়াতি, বনকোলার রওশন বয়াতি, রায়পুরার মোহন বয়াতি, বিক্রমপুরের কেদু বয়াতি, আউটশাহির মারফত আলী বয়াতি (জন্মান্ধ), পাইকপাড়ার আলাউদ্দিন বয়াতি, শাহাবুদ্দিন বয়াতি, ফুলতি গজারিয়ার জালালউদ্দিন বয়াতি, ঢাকার বামনসুরের মালেক দেওয়ান ও খালেক দেওয়ান, ছাদেম আলী বয়াতি, ডেমরার চনপাড়ার রজ্জব আলী দেওয়ান, নবীগঞ্জের আলেক দেওয়ান, মুন্সীগঞ্জের ওসমান গনি, শানদার রহম আলী, মানিকগঞ্জের আজহার বয়াতি ওরফে টেনু বয়াতি, ময়মনসিংহের আবেদ আলী বাউল, বরমিয়ার ইমান আলী বয়াতি, নাটোরের আলাউদ্দিন বয়াতি, সিলেটের আবুল হোসেন মাস্টার, কুমিল্লার গৌরীপুরের ওলানপাড়ার আব্বাস আলী বয়তি, নূর ইসলাম, মালেক বয়াতি, বরিশালের মঙ্গল বয়াতি।[৬১]

ঘ. ঘাটু গান

টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গানের নাম ঘাটু। কবিগানের মতো এই গানেও দুটি দল থাকে। দলের প্রধানকে বলা হয় সরকার বা বয়াতি। কবিগানের মতো এই গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ঢোল। অন্য যন্ত্রের মধ্যে থাকে হারমোনিয়ম, করতাল, খঞ্জনি প্রভৃতি। ঘাটু গানের দলে নারীবেশী তরুণবয়স্ক ছোকরা থাকে। এই ছোকরা গানের সঙ্গে নাচে। নাচের সময়ে ছোকরা রঙিন শাড়ি পরে, পায়ে নূপুর থাকে, হাতে থাকে চুড়ি, নাকে ও গলায় থাকে বিচিত্র অলঙ্কার। মাথার চুল পিঠের উপরে ঝুলিয়ে দেয়। বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে, তাতে গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়। বর্ষাকাল ও শরৎকাল ঘাটু গানের প্রধান ঋতু। প্রধানত মনসা পূজা ও দুর্গা পূজায় ঘাটু

---

[৬০] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "বিচার গান" ভুক্তি।

[৬১] শফিকুর রহমান চৌধুরী, "বিচার গান এবং প্রবীণ শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি," পৃ. ১৩।

গানের আয়োজন হয়। ঘাটু গানে উভয় দলের পালা পূর্বনির্ধারিত থাকে। সাধারণত একদল রাইয়ের ভূমিকায় এবং অন্যদল শ্যামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৬২] একজন একটা প্রশ্ন করে, আবার অন্যজন তার জবাব দেয়।

যেমন—

রাই শ্যাম বুঝাইয়া দে
শাতালী পর্বতের নীচে কৃষ্ণ নামে গো মালা কে জপে।
ও কৃষ্ণের নামে মালা কে জপে।

শ্যাম রাই বুঝাই তোরে
শাতালী পর্বতের নীচে মহাদেব মালা জপতাছে।
চান্দের মরণ আসে গো মাসে, সূর্যের মরণ কাবার ঘরে।
রবি শশী গো আকাশে ঘুরে।[৬৩]

অন্যত্র—

রাই বারে বারে বলছি শ্যাম গো কমল নিদ্রা কইরো না।
একটা গাছে দুইটা কলি, একটা ছোটো একটা বলি
একটা কলির মূল্য শ্যামগো তোমায় বেচলে হবে না।

শ্যাম ছি ছি ধনী কমলিনী তোর কমলে মধু নাই।
ঢাকা থনে কলকাতা যাবো, নানা ফুলে মধু খাবো
এমন নিষ্ঠুর ভ্রমর, পচা ফুলের খায় মধু।[৬৪]

এই ধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক গান ছাড়াও কবিগানের ধুয়া গানের মতো ঘাটু গানের মধ্যেও এক ধরনের গান পরিবেশিত হয়, এগুলোর নাম 'ছম' গান। ধুয়া গানের মতো এগুলোর বিষয়ও বিচিত্র। কখনো কখনো তা 'দেহতত্ত্ব', 'রং বাউলা', 'বিচ্ছেদ', 'জল-ভরা', 'মুরলী', 'সন্ন্যাস' প্রভৃতি নামেও পরিচিত হয়। যেমন নিম্নের ছমগানটি দেহতত্ত্বমূলক:

কোন কামিলে ছাইছে ঘর গো ঘরের রাখছে নিশানা।
ঐ নিশানা দিয়ে জল পড়িয়া গো ভিজল সাধের বিছানা ॥

ঐ বিছান ভিজলে যেমন তেমন গো তোশক ভিজলে শুকায় না।
ঐ তোশক ভিজলে শুকায় না গো তোশক ভিজলে শুকায় না ॥[৬৫]

---

[৬২] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*, পৃ. ১৬-৬১।
[৬৩] মামুন তরফদার, *টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য* (ঢাকা: ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ. ৯৫।
[৬৪] তদেব, পৃ. ৯৫–৯৬।

ঙ. আলকাপ গান

আলকাপ গান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় জনপ্রিয়। এটিকেও কবিগানের একটি পরিবর্তিত রূপ বলে মনে হয়। এই গানের সঙ্গে ঝুমুর গানেরও গভীর মিল রয়েছে। আলকাপ গানের 'আশায়' অংশে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় হয় রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর ইত্যাদি।[৬৬] আলকাপ গানের জন্ম ১৮৪৮ সালে চাঁপাই নববাগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মোনাকষা গ্রামে। এই গ্রামের ভবতারণ সরকার ছিলেন এই গানের উদ্ভাবক। তাঁর শিষ্য বনমালী শীল এই গানকে জনপ্রিয় করেন। ক্রমে তা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আলকাপ গানে আদিরসাত্মক বিষয় ও স্থূল হাস্য-পরিহাস প্রাধান্য পায়। কবিগানের মতো এই গানে উপস্থিত সৃজনশীলতা, সঙ্গীত এবং ছড়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কবিগানের দলপতিকে যেমন সরকার নামে অভিহিত করা হয়, আলকাপ গানের দলপতিও সরকার নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। আলকাপ গানে অবশ্য দলপ্রধান কখনো কখনো ওস্তাদ বা মাস্টার নামেও পরিচিত হন।

আলকাপ গানের দোহার এবং যন্ত্রসঙ্গতকারীগণ কবিগানের দোহার এবং যন্ত্রসঙ্গতকারীদের অনুরূপ। তবে আলকাপ গানে বাড়তি থাকে দু-এক সং, দু-তিন জন ছোকরা। বিভিন্ন কালপর্বে স্থানভেদে কবিগান বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়। কিন্তু আলকাপ গান রাতের গান। রাতভর এ অনুষ্ঠান চলে। যাত্রাগানের মতো এর মঞ্চ হয়, মঞ্চের একদিকে মঞ্চে ওঠার পথ থাকে।

বিশ শতকের কবিগানের মতো আলকাপ গানেও মূলত দুটি অংশ: গান এবং ছড়া। গানের বিষয় হয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, নাহয় পৌরাণিক। অন্যদিকে ছড়া কাটা হয় সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে। আলকাপ গানের প্রধান আকর্ষণ সং এবং ছোকরা। এরা খেমটা ও ঝুমুর নাচে বেশ দক্ষ হয়। সাধারণত মেয়েদের পোশাক পরে এরা নাচে।[৬৭]

---

[৬৫] তদেব, পৃ. ৯৬–৯৭। ঘাটু গানকে কখনো কখনো 'মালশি' গানের সমার্থক মনে করা হয়। যেমন একটি ছম গানের কলি: "হাঁটু ভাঙ্গা ঘাটুর ঘোড়া ঘাটু গান তো জানস না।/ ঘাটু গান তুই জানস না গো মালসি গান তুই জানস না।" তদেব, পৃ. ১০২। তবে এই মালসি গানের সঙ্গে কবিগানের 'মালশি' গানের কোনো সম্পর্ক নেই। গানের গঠন এবং বিষয় থেকেও তা স্পষ্ট।

[৬৬] চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অন্যত্র এই 'আশায়' অংশ পরিবেশিত হয় না। অধিকাংশ স্থানেই একপাক্ষিক আলকাপ গান প্রচলিত। সাক্ষাৎকার: মুহম্মদ মুহসিন উদ্দিন, আলকাপ গানের সরকার, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। তারিখ: বিনোদপুর বাজার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[৬৭] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "আলকাপ গান" ভুক্তি; মযহারুল ইসলাম তরু, *বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীত* (ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৬৮–৭৫।

৫. উপসংহার

কবিগানের এইসব পরিবর্তন এবং রূপান্তর স্থানকালসাপেক্ষ তো বটেই, শ্রোতাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, তাদের জীবনদৃষ্টি ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কলকাতা পর্বে কবিগানের শ্রোতা ছিলো প্রধানত বিত্তবান জমিদার শ্রেণি। তখন কবিগানের পেশা ছিলো অত্যন্ত লাভজনক। ফলে কবিগানের নানা রকম পরিবর্ধন ঘটে—কথায়, সুরে, যন্ত্রে এবং উপস্থাপনরীতিতে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানেও প্রায় অভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। কারণ পূর্ববঙ্গ পর্বেও কবিগানের মূল শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলো গ্রামীণ জমিদার ও অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণি। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং সেইসঙ্গে নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বহু ধরনের পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে।

কবিগান আর একবার প্রচণ্ড ধাক্কা খায় দেশবিভাগজনিত কারণে। পূর্ববঙ্গ পর্বে কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের বিত্তবান শ্রেণি। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে তারা দেশ ত্যাগ করায়, পূর্ববঙ্গের কবিগান পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। কবিয়ালরাও দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। কবিগানের সাধারণ শ্রোতারাও ব্যাপক হারে দেশ ত্যাগ করে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় অভিবাসী হয়। অনেক শ্রোতা পুনর্বাসিত হয় ভারতের বিভিন্ন অবাঙালি অধ্যুষিত প্রদেশে, যথা—উত্তর প্রদেশে, উত্তরাখণ্ডে, ছত্তিশগড়ে, মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্র প্রদেশে, উড়িষ্যায় এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। কবিগানের শ্রোতাদের এই দুরবস্থা কবিগান চর্চায় যেমন বাধা সৃষ্টি করে, কবিগানের গঠনের উপরেও তা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কবিগানের শ্রোতাদের এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় শ্রোতারা গরিব হয়ে পড়ে, সঙ্গত কারণে তাদের কর্মব্যস্ততা বাড়ে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে চর্চিত কবিগানের আয়তন হ্রাস পায়। এক পর্যায়ে তা তরজা গানের মতো স্বল্পায়তন হয়ে পড়ে।

সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও কবিগানের অবস্থা সঙ্গিন হয়। সেখানে যেমন পৃষ্ঠপোষকদের অভাব দেখা দেয়, কবিগান চর্চার জন্য যে রাজনৈতিক স্থিরতা প্রয়োজন, তারও অভাব দেখা দিতে থাকে। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিও অনেক সময়ে কবিগান চর্চায় সরাসরি বাধা সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি কবিগানকে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো তখন পূর্ববঙ্গের কবিগানও সংক্ষিপ্ত রূপ পায়। কবিগান যে কোথাও কোথাও জারি গান বা বিচার গানের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সম্ভবত তা এই পারিবেশিক পরিবর্তনের ফল।

কবিগানের একটি রূপান্তর বেশ সূক্ষ্ম। রূপান্তর না বলে বরং সেটাকে প্রভাব বলাই সমীচীন। যেমন উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিহারীলাল চক্রবর্তী যে আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত করেন, তার বহু বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী কবিগানের অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থের অনেক কবিতাকে সখীসংবাদের প্রভাবজাত বলে মনে হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কবিগানের ভাব, ভাষা, অলঙ্কার ও সুর দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মনে রয়ে গেল মনের কথা' গানটির সঙ্গে

রাম বসুর 'মনে রইলো সই মনের বেদনা' গানটি প্রতিতুলিত হতে পারে, একইভাবে হরু ঠাকুরের 'হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমতি তৃষিত চাতকজনা' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে' গানটি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের যেসব জায়গায় শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করেছেন, সেসব ক্ষেত্রেও তিনি কবিগানের ভবানীবিষয়ক গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়।[৬৮]

---

[৬৮] মিতা চক্রবর্তী, "কবি সঙ্গীতের ইতিহাস ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার প্রভাব," *কালান্তর*, অক্টোবর ১৯৮৪; যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃ. ১৫–১৭।

উপসংহার

অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতো স্থানকালের ব্যবধানে কবিগানেও নানা ধরনের পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে, পূর্বের আলোচনায় তা দেখা গেছে। লক্ষ করা গেছে আঠারো শতকের কলকাতায় উঠতি মধ্যবিত্তের বিনোদনমাধ্যম হিসেবে কবিগানের উদ্ভব ঘটে, উনিশ শতক থেকে তা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদানে পরিণত হয়। উদ্ভবকালে কবিগানের যে আদল তৈরি হয়েছিলো, উনিশ শতকের কলকাতাতেই তাতে নানা ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, সেই পরিবর্তিত কবিগান গ্রামবাংলায় জায়গা পায়। তবে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় স্বাভাবিক কারণে কলকাতার কবিগানের তুলনায় গ্রামবাংলার কবিগান খানিকটা দুর্বল হয়। তবে সময়ের ব্যবধানে গ্রামবাংলার কবিগানও সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে। কালক্রমে গ্রামবাংলায় প্রতিভাবান কবিয়ালদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পূর্বের আলোচনায় যেমনটা দেখা গেছে, কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে বেশ কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবিয়ালের আবির্ভাব হয়। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ পূর্ববঙ্গ পর্বের এই কবিয়ালদের উত্তরসূরিরা বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোতে তাদের কবিগান পরিবেশন অব্যাহত রেখেছেন।[১]

অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমনটা দেখা গেছে, কবিগানের এক ধরনের পরিবর্তনকে রূপান্তর ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখা করা যায় না। এর ফলে কবিগান সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে পরিচিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন কবিগানের লহর অংশ ভেঙে জন্ম হয় তরজা গানের। একইভাবে জারিগান, বিচার গান, ভাবগান, আলকাপ গান প্রভৃতি গানের বিশ শতকীয় যে রূপ চোখে পড়ে, তার বহু বৈশিষ্ট্য কবিগানের সঙ্গে মিলে যায়। কালানুক্রম বিবেচনায় এগুলোকে নিঃসন্দেহে কবিগান-প্রভাবিত বলা যায়। কোনো কোনোটিকে কবিগানের রূপান্তর বলেও মনে হতে পারে। অন্যদিকে কবিগান নামে পরিচিত হলেও কবিগানের আঙ্গিক

---

[১] বাংলাভাষী অঞ্চল বলতে সাধারণত বোঝায় বাংলাদেশ; ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ, আসাম প্রদেশের বরাক উপত্যকার জেলাগুলো, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের উদ্বাস্তু কলোনিসমূহ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ; লন্ডন ও দুবাইয়ের মতো শহর; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর। স্বরোচিষ সরকার, "বিশ শতকে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী," *বিশ শতকের বাংলা*, মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১০), পৃ. ২৩১–৩৩।

ও প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রাখলে প্রতিটি শতাব্দীতেই কবিগানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গান বলে মনে হয়, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে।

আঠারো শতকের কবিগানের সম্পূর্ণ কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ নমুনা পাওয়া যায় তিন শতকের: উনিশ শতক, বিশ শতক এবং একুশ শতক। এই তিন শতকের কবিগানকে অভিন্ন কবিগান হিসেবে বিবেচনা করা হয়তো কঠিন। কিন্তু তিন শতাব্দীতেই কবিগানের মধ্যে মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য মোটামুটি অভিন্ন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ১. কবিগানে সবসময়ে দুটো দল থাকে, ২. দলনেতার নাম কবিয়াল বা সরকার বা কবির সরকার, ৩. পালাক্রমে ও সামনাসামনি কবিয়ালদ্বয় বাদ-প্রতিবাদ করেন, ৪. তাৎক্ষণিক রচিত গান ও সুরেলা ছড়ার মাধ্যমে বাদ-প্রতিবাদ রচিত হয়, ৫. বাদ-প্রতিবাদের সময়ে উভয় কবিয়াল কোনো না কোনো চরিত্রে নিজেদের উপস্থাপন করেন, এবং ৬. কবিগানের কণ্ঠসহযোগীদের নাম দোহার বা গায়ক, যন্ত্রসহযোগীদের মধ্যে ঢুলি প্রধান।

কবিগানের ইতিহাস ও রূপান্তর আলোচনায় সবচেয়ে বড়ো সীমাবদ্ধতা কালগত। একজন গবেষকের পক্ষে শুধু সমকালীন কবিগানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব। পূর্ববর্তী কালে পরিবেশিত কবিগান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সহায়ক উপকরণের সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইসব উপকরণ আবার বিভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে আঠারো এবং উনিশ শতকের কবিগান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মুদ্রিত গণমাধ্যমের সাহায্যে। বলা বাহুল্য, কবিগানের খুব কম অংশই পূর্বরচিত থাকে। তাই মুদ্রিত মাধ্যমে কবিগানের যে অংশ কাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, বাস্তবে তা কবিগানের খুব সামান্য অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু সেই সময়ে মুদ্রিত কবিগান অনুষ্ঠানের কোনো ছবি পাওয়া যায় না, বিবরণও পাওয়া যায় খুব সামান্য। তার উপর ভিত্তি করে আঠারো-উনিশ শতকের কবিগান অনুষ্ঠানকে ধারণায় পুনর্গঠিত করা কঠিন কাজ। তাতে নানা ধরনের অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদিও এছাড়া ভিন্ন কোনো পথও গবেষকের নিকট খোলা ছিলো না।

এক্ষেত্রে বিশ শতকের কবিগান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের কবিগানের অডিও-ভিডিও পাওয়া না গেলেও, বিভিন্ন লেখকের বর্ণনা থেকে এ সময়ের কবিগান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বিশ শতকের শেষার্ধে এবং একুশ শতকের সূচনার কবিগান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় বিচিত্র উপায়ে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ যেমন এ সময়ে সহজ, তেমনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও মাধ্যম থেকেও কবিগানের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়। এ সময়ের বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যমও সহায়ক উপকরণ হিসেবে নানাভাবে সাহায্য করে।

কালভেদে কবিগানের একটি আঞ্চলিক ভূগোল তৈরি হয়েছিলো, আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে এবং উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কবিগানের এই আঞ্চলিক অবস্থান

পরিবর্তিত হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে কবিগানের এই অঞ্চল অতিক্রমণের ঘটনা দৃশ্যযোগ্য হতে থাকে। তার ফলে পূর্ববঙ্গের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে যেমন বিস্তার লাভ করে, উত্তরবঙ্গেও তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই অতিক্রমণ অনেকটা স্থায়িত্ব পায় সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর। দেশভাগের পর বাঙালি সমাজের বিরাট একটি অংশের অভিবাসন প্রক্রিয়া কবিগানের অঞ্চল অতিক্রমণে বিশেষ অনুঘটক হয়ে কাজ করে। তার ফলে মানিকগঞ্জের কবিয়াল যেমন উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে (পশ্চিমবঙ্গের) অভিবাসী হন, গোপালগঞ্জের কবিয়ালও তেমন রাঢ়ের বীরভূম জেলায় স্থান পান। পূর্ববঙ্গের মানুষ বাংলার বাইরেও অভিবাসিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বাইরেও কবিগানের অতিক্রমণ ঘটে। একুশ শতকের সূচনায় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর যে অঞ্চলেই বাঙালিদের বাস, সে অঞ্চলেই কবিগানের আসর তৈরি হতে থাকে। একুশ শতকের সূচনায় এভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও কবিগান অনুষ্ঠানের তথ্য জানা যায়।[২]

কবিগানকে প্রচারণার কৌশল হিসেবে কাজে লাগানো শুরু হয় বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে। বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ তাঁদের আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কবিগানকে তখন মনোনীত করেছিলেন বলে। তাঁদের আহ্বানে সফলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন চট্টগ্রামের রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়া। এই সূত্র ধরে সমস্ত বঙ্গভাষী অঞ্চলে কবিগান সম্প্রসারণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। কবিগানকে সাম্যবাদ প্রচারে কাজে লাগানোর এই উদাহরণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বপাকিস্তানের সরকারগুলোরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারাও কবিগানকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার কথা অনুভব করে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ক জরুরি তথ্য জনগণকে অবহিত করতে বা সরকারি নীতিমালা প্রচারের লক্ষ্যে প্রথমে রেডিওতে এবং পরে টেলিভিশনে নিয়মিতভাবে কবিগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। পাশাপাশি গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি তথ্য প্রচারের কাজেও কবিগান ব্যবহৃত হয়। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেও সরকারি প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে কবিগান ব্যবহৃত হতে থাকে। চট্টগ্রাম রেডিও এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলো এবং এই সুযোগে তখন ইয়াকুব আলীর মতো বেশ কয়েকজন মুসলমান কবিয়ালের জন্ম হয়।

জীবিকা বা পেশা হিসেবে কবিগান স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতায় দুই ধরনের কবিয়াল ছিলেন: পেশাদার এবং শৌখিন। তখনকার কলকাতায় বিত্তবান জমিদারদের প্রাচুর্য থাকায় মনে হয়, পেশাদার কবিয়ালগণ এবং তাঁদের সহযোগীগণ গানের বিনিময়ে যে অর্থ পেতেন, তা দিয়ে তাদের বাৎসরিক ভরণপোষণের কাজ সম্পন্ন হতো। কবিয়ালগণ তখন নির্ধারিত পারিশ্রমিক ছাড়াও নানা ধরনের পুরস্কার পেতেন। তাদের পোশাক-আশাক,

---

[২] যেমন কবিয়াল অসীম সরকার তাঁর সহযোগীকে নিয়ে ২০০৮ সালে দুবাই শহরে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন।

জীবনযাত্রার মান, সামাজিক মর্যাদা, বিলাসিতা, কলকাতায় বসবাসের যোগ্যতা ইত্যাদি থেকে মনে হয় পেশাদার কবিয়ালগণ তখন বেশ সচ্ছল ছিলেন। তাঁদের সেই সচ্ছলতা দোহার ও যন্ত্রসঙ্গতকারীদের মধ্যে চুইয়ে পড়তো, সেটাই স্বাভাবিক।

কবিগানের প্রতি জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা যতোদিন বহাল ছিলো, ততোদিন কবিগানের শিল্পীরা সচ্ছল ছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিগান কলকাতা থেকে গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রামীণ কবিয়ালদের জীবিকা হিসেবে কবিগান পর্যাপ্ত ছিলো কিনা, সন্দেহ হয়। তখন গ্রামবাংলার বিত্তবান মধ্যস্বত্বভোগীরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যে পরিমাণ পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে সক্ষম, তেমন পৃষ্ঠপোষকতার পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি। তাই দেখা যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধে নড়াইলের কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকারের পিতা কবিয়াল কাশীনাথ সরকারের (মৃত্যু ১৮৫৯) মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাঁর সংসারের আর্থিক দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করে। অর্থাৎ তখনকার দিনে কবিগানের পেশায় এমন আয় হতো না, যাতে ভবিষ্যতে সাংসারিক ব্যয় মেটানোর জন্য কবিয়াল বা সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে পারতেন। পিতার মৃত্যুর পর তারকচন্দ্র সরকার কবিগানের দল করলেও প্রথম দিকে তাঁকে যথেষ্ট অর্থকষ্টের মধ্যে থাকতে হয়েছিলো। এক বছর কবিগানের বায়না না থাকায় তারকচন্দ্রকে মাছ বিক্রি করে বাঁচার চেষ্টা করতেও দেখা যায়।[৩]

প্রায় অভিন্ন আর্থিক দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় কিশোরগঞ্জের কবিয়াল রামগতি শীলের। উনিশ শতকের শেষার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে তিনি বেশ জনপ্রিয় কবিয়াল ছিলেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আর্থিক দুরবস্থা থেকে তাঁর মুক্তি ঘটেনি। একজন ভূস্বামী তাঁকে জমি দান করেছিলেন ঠিকই, তবে সেই জমিতে কোনো ফসল না হওয়ায় দারিদ্র্য থেকে তাঁর মুক্তি ঘটে না। শেষ জীবনে তাঁকে কিশোরগঞ্জ জেলার বড়াইল বাজারের কাছে নদীর কূলে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোটো একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে বসবাস করতে হয়েছে।[৪]

উনিশ শতকের গ্রামবাংলায় কবিয়ালদের আর্থিক অবস্থা এমন খারাপ হলেও বিশ শতকের সূচনা নাগাদ এই অবস্থার অবসান ঘটে। তখন দেখা যায় তারকচন্দ্র সরকার বা হরিচরণ আচার্যের মতো তখন প্রায় সকল কবিয়ালেরই নিজস্ব পানসি নৌকা থাকতো। তাঁরা সেই নৌকায় করে বিভিন্ন অঞ্চলে গান করতে যেতেন। পানসি নৌকা থাকাটাও তৎকালে আর্থিক সচ্ছলতার প্রতীক ছিলো। পানসি নৌকা থাকলে সেই নৌকায় মাঝি-মাল্লার দরকার হতো, বাবুর্চির দরকার হতো, সেইসব মাঝি-মাল্লা-বাবুর্চির বেতন দিতে হতো। যথেষ্ট সচ্ছলতা অর্জিত না হলে কবিয়ালগণ পানসি ব্যবহার করতে পারতেন না। শুধু পানসি নৌকাই নয়, বিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিয়াল

---

[৩] স্বরূপেন্দু সরকার, *শ্রীশ্রী হরিচাঁদের জীবনকথা* (রাজশাহী: কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ২৩৩।

[৪] চন্দ্রকুমার দে, ময়মনসিংহের দাশুরায়," *সৌরভ*, মে-জুন ১৯১৪, পৃ. ২৪৯–৫০।

নকুলেশ্বর দত্তের লাইসেন্স করা বন্দুকও ছিলো। সেই বন্দুক দিয়ে তিনি বহু বার হরিণ শিকার করেছেন বলে জানা যায়।[৫]

আলোচ্য কালপর্বে শুধু কবিয়ালদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে উঠেছিলো, তাই নয়। কবিগানের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শিল্পীদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। তখন দোহারের অর্থনৈতিক অবস্থার এতোটা উন্নতি হয় যে, কোনো কোনো মহিলা দোহার তখন দুইশো ভরি পর্যন্ত সোনার গহনার মালিক হয়েছিলেন।[৬]

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর কবিগানের পেশা পুনরায় মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ে। কবিগানকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করা কোনো কবিয়ালের পক্ষেই আর সম্ভব হয় না, না পূর্ব পাকিস্তানে, না পশ্চিমবঙ্গে। যে নকুলেশ্বর দত্ত পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে ব্যস্ত কবিয়াল ছিলেন, সেই নকুলেশ্বর দত্ত পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার পর গানের বায়নার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছেন।[৭] দোহারদের অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। শেখ সরলা নামের যে দোহারের ঝালোকাঠি শহরে বাড়ি ছিলো এবং দুইশো ভরির বেশি সোনার গহনা ছিলো, দেশ ভাগের পরে সেই সরলাকে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।[৮]

চট্টগ্রামের রমেশ শীলের মতো কবিয়ালের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কবিগান করে জীবিকা নির্বাহ করা তাঁর মতো খ্যাতিমান কবিয়ালের জন্যও আর সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক কারণে তাঁকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাল কাটাতে হয়। সাতচল্লিশ-পূর্ব কালে যে কবিয়াল কলকাতাসহ বাংলার প্রায় সব অঞ্চল মাতিয়ে রেখেছিলেন, সাতচল্লিশের পরে সেই কবিয়ালকে অন্যের করুণার উপরে নির্ভর করে বাঁচতে হয়। তখন যে সকল সজ্জন ব্যক্তি তাঁকে নিয়মিত সাহায্য করতেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাহমুদ নূরুল হুদা। রমেশ শীল তাঁকে তাঁর দুরবস্থার কথা জানিয়ে মাঝে মাঝে যেসব চিঠি লিখেছেন, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'রমেশ শীল রচনাবলী'-তে তা মুদ্রিত আছে।[৯]

বিশ শতকের মাঝামাঝি যেসব কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ হয়েছিলো। এর ফলে অনেক কবিয়াল পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে কখনো পশ্চিমবঙ্গে আবার কখনো পূর্ববঙ্গে যাতায়াত করেছেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতো খ্যাতিমান কবিয়ালও কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে থাকার পর বাগেরহাটে

---

[৫] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কলকাতা: সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃ. ৪১১–১২।

[৬] দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃ. ১২৭।

[৭] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান," *স্থানীয় ইতিহাস*, জুন ২০০৯, পৃ. ১৫৫।

[৮] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. ছিয়াত্তর।

[৯] *রমেশ শীল রচনাবলী*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫০–৫৬।

ফিরে এসেছেন। বাগেরহাটে ফিরে এলেও কবিগানকে একমাত্র জীবিকা করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তখন তিনি মাদারীপুরের রাজৈর থানার চৌরাশি গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মপ্রচার ও গুরুগিরিকেই অন্যতম পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে কবিগান করাই ছেড়ে দেন। বিজয় সরকার ও নিশি সরকারকে সুবিধামতো কখনো পূর্ববঙ্গে কখনো পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের মতো প্রতিভাবান কবিয়ালও কবিগানকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করে টিকে থাকতে পারছিলেন না। ফলে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো খ্যাতিমান কবিয়ালকে পর্যন্ত কখনো রামায়ণ গান গাইতে হয়েছে, কখনো জারিগান গাইতে হয়েছে, এমনকি গুরুগিরি করেও অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে হয়েছে।

পেশা হিসেবে কবিগানের এই মন্দা দশা সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। তখন প্রায় সকল কবিয়ালকেই বিকল্প পেশার দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। এ সময়ে অনেক কবিয়াল কবিরাজি, ঝাড়ফুঁকের মতো অবৈজ্ঞানিক পেশার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছেন। রমেশ শীল এর উদাহরণ। পিরোজপুরের নন্দলাল আচারিয়া বা দ্বিজবর সরকারের মতো অনেক কবিয়াল পিতৃপুরুষের পেশা কৃষিকাজকে মূল পেশায় পরিণত করেছেন। গোপালগঞ্জের বিনয় সরকার কাপড়ের দোকান দিয়েছেন। বাগেরহাটের দিগেন সরকার গানের মাস্টারি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন। নেত্রকোনার মদন সরকারকে দেখা যায় ঘড়ি-কলম-তৈজসপত্রে নাম খোদাই করার কাজ গ্রহণ করতে।[১০] বিশ শতকের ষাটের দশকে কবিগান প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকারও বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহরে ঘড়ি-কলমে নাম খোদাই করে অর্থ উপার্জন করেন।[১১]

যে কবিয়াল যতো বেশি পুরাণ জানেন, সেই কবিয়ালের সুনাম ততো বেশি হয়। পুরাণে এই বিশেষজ্ঞতা কবিয়ালদের ব্যক্তিচরিত্রের উপরেও কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে অনেক কবিয়াল, বিশেষত গুরুস্থানীয় কবিয়াল গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে পৌরাণিক ছকে ফেলে দেখতে আগ্রহী হন। এর অন্যথা হলে তিনি কষ্ট পান সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে অনেক সময়ে দেখা যায় সামান্য ত্রুটির জন্য কবিয়াল তাঁর আপন শিষ্যকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এই ধরনের অভিশাপ যে অধিকাংশ সময়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ড, গুরুস্থানীয় কবিয়াল তা ভেবে দেখেন বলেও মনে হয় না। এই ধরনের দু-একটি অভিশাপের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য তাঁর শিষ্য গাজিপুর জেলার অম্বিকা পাটনীর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর জোট বেঁধে কবিগান করেছিলেন। সামান্য কারণে সেই অম্বিকারচরণকে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন।

---

[১০] সাক্ষাৎকার: মদন আচার্য, সহিলপুর, নেত্রকোনা। তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০১০। গবেষকের পক্ষে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি গবেষক, আইবিএস।

[১১] স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল জীবন ও তাঁর গান," পৃ. ১৬০।

কুমিল্লার আন্দিকোট নিবাসী হরিচরণ আচার্যের অন্য আর এক শিষ্য অর্জুন দেবনাথকেও তিনি একই অভিশাপ দিয়েছিলেন।[১২] একইভাবে নেত্রকোনার মদন আচার্যও তাঁর শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এই অভিশাপ দেওয়ার কারণটি ছিলো হাস্যকর। জোটের পাল্লায় বৃদ্ধ মদন গান সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ গান দীর্ঘতর করে যেতে থাকেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মদন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে অভিশাপ দেন যেন অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিলো বলে মদন আচার্য দাবি করেন।[১৩]

কবিয়ালদের সমিতি বিশ শতকের কবিগানের একটি নতুন উপসর্গ। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে (১৯৩৮ সালে) চট্টগ্রামের রমেশ শীল তাঁদের সহযোগীদের নিয়ে 'রমেশ উদ্বোধন কবি সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। রমেশ শীল ছিলেন এই সমিতির সভাপতি, হেদায়েত ইলসাম এবং ফণীন্দ্রলাল বড়ুয়া ছিলেন সম্পাদক।[১৪] অল্প কালের ব্যবধানে এই সমিতির নাম পরিবর্তিত হয়, নতুন নাম হয় 'রমেশ উদ্বোধন কবি সংঘ', এবং পরে 'জেলা কবিয়াল সমিতি'। বিশ শতকের শেষ দিকে এসে এই সংগঠনেরই নাম হয় 'বাংলাদেশ লোক-কবিয়াল সমিতি'। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ (২০০৩) এই সমিতির সভাপতি মানিক শীল এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম নূর-উল-আলম।

বিশ শতকের সত্তরের দশকের সূচনায় কলকাতায় গঠিত হয়েছিলো 'বঙ্গীয় লোককবি সংস্থা' নামে কবিয়ালদের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের সভাপতি-সম্পাদক দুজনেই ছিলেন গোপালগঞ্জ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী: সভাপতি নিশিকান্ত সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ সরকার।

সত্তর দশকের শেষে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কবিয়ালদেরও একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে অবশ্য জারি, বিচার, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের শিল্পীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নড়াইলের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সভাপতিত্বে ১৯৭৯ সালের জুন মাসে গোপালগঞ্জে 'বাংলাদেশ চারণ কবি সংঘ' নামে এই সমিতি গঠিত হয়েছিলো। প্রাথমিক কমিটিতে বিজয়কৃষ্ণ সরকার সভাপতি এবং অনাদিজ্ঞান সরকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সমিতি গঠনে নড়াইলের মহসিন হোসাইনের বিশেষ ভূমিকা ছিলো বলে জানা যায়।[১৫] একই অঞ্চলের কবিয়ালদের নিয়ে একুশ শতকের সূচনায় খুলনায় 'রূপান্তর' নামের একটি এনজিও-র উদ্যোগে নতুন একটি সংগঠন গড়ে উঠছে।

---

[১২] হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃ. ৩০০।

[১৩] সাক্ষাৎকার: মদন আচার্য, সহিলপুর, নেত্রকোনা, তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০১০। গবেষকের পক্ষে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি গবেষক, আইবিএস।

[১৪] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২৪।

[১৫] মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৯–৪০।

কবিগান যেহেতু সাধারণ মানুষের গান, সেহেতু এই গানে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সাধারণ মানুষের সমাজভাবনাকে প্রতিফলিত করে। সেদিক দিয়ে কবিগানে প্রতিফলিত সমাজভাবনার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। উনিশ শতকের যখন থেকে কবিগানের নমুনা পাওয়া যায়, তখন থেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ঘটনাই কবিগানের কোনো না কোনো অংশে প্রতিফলিত হয়। যেমন ঈশ্বর গুপ্ত রচিত একটি মালশি গানে সমকালের নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়টি চিত্রিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন:

কোথা রইলে মা, ভিক্টোরিয়া, মা মাগো, কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে সুখো আর নাহি পর্শে
প্রজারা নাহি হর্ষে, সবাই বিমর্ষে
এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে, কেবল বর্ষে যাতনা।
'আসিয়া' আসিয়া মাগো করুণাময়ী, করুণাচক্ষে দেখ না ॥

নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুটি, দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধবধপে বাইরে শাদা
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ তায়।
হোলে চোরের কাছে ধর্মকথা, মর্ম কভু বোঝে না ॥[১৬]

কবিগানের মালশি নামের অঙ্গে গঠনগত কারণেই সমকালীন প্রসঙ্গ স্থান পায়। তার ফলে এই গানগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয় বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। দু-একটি উদাহরণ দিলে এই প্রতিফলনের স্বরূপ বোঝা সহজ হবে।

বিশ শতকের সূচনায় নেত্রকোনার কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের মালশি গানে বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গ উঠে আসে এভাবে:

কালিকে তুমি ভবপালিকে বাঙ্গালিকে নিও না আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি ভগবতী মা, মাগো সন্তানের প্রতি হইও না বাম ॥
আমাদের নাই বাসনা ওগো শ্যামা যেতে সেই শিলং ডিব্রুগড়ে।
কতো ধইঞ্চা গাছ আর তুরা পাহাড় মাগো নাম শুনে প্রাণ কাঁপে ডরে ॥[১৭]

আবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর গানে ফুটে ওঠে চরকা-কাটার মাহাত্ম্য:

ও দিদি তোমরা বলছো কি।

---

[১৬] দীর্ঘ গানটির শুধু মহড়া নামের তুকটি উদ্ধৃত করা হলো। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিতা সংগ্রহ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: কেদারনাথ রায়, ১৮৮৫), পৃ. ৯৯।
[১৭] উদ্ধৃত, যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), ৮৯।

চরকা আমার পুতের সমান, চরকা আমার ঝি।
আগে একটু তৈল পাইছি না, শাকে দিব কি।
(ও) এখন আমার চরকার ভাগ্যে বুটের ডাইলে ঘি ॥[১৮]

এ সময়ের কবিগানে বঙ্গভঙ্গ-অসহযোগের ব্যাপারে ভিন্নমতও প্রতিফলিত হয়। সমকালের রাজনীতিতে এই ভিন্নমত ছিলো একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাঙালি মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বড়ো একটি অংশ বঙ্গভঙ্গ-অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে আসছিলেন এই ভয়ে যে, দেশের স্বাধীনতা লাভ মানে বর্ণহিন্দু সুবিধাভোগী শ্রেণির সুযোগ বৃদ্ধি। তাতে বাঙালি মুসলমান এবং নমঃশূদ্র হিন্দুদের প্রভু বদল হবে মাত্র। বিষয়টিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন বাগেরহাটের কবিয়াল নদীয়ারচাঁদ সরকার। তিনি লেখেন:

গান্ধি বেটার ফন্দি শুনে জুনিকে জ্বালায় মার্গে বাতি।
ফড়িং নাচে তিড়িং বিড়িং লাফ দিয়া যায় আগুন খাতি ॥

উপপোকা কয় স্বরাজ পাবো, উঁচ করে ভিটে বাঁধবো
ইন্দ্রের সভায় যাবো যুদ্ধ করতি।
আকাশের চাঁদ কেটে আনবো ছেলের গলায় মেডেল দিতি ॥

মশা বলে চাষার রক্ত রোদি পোড়া বড়ো তিক্ত।
গরু ঘোড়ার লেজ শক্ত পাইনে খাতি
এবার গান্ধি যদি স্বরাজ পায় তো আমরা খাবো রাজার হাতি ॥

দেখো স্বরাজ চাচ্ছে যারা হারে স্বরাজ নিবে যারা।
বড়ো লোকে স্বরাজ পালি ছোটো লোকের দফা সারা ॥[১৯]

নদীয়ারচাঁদ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মালশি গানে খুব কৌশলে একই কথার প্রতিফলন ঘটে। তিনি তাঁর 'স্বরাজভাবনার মালশি'-তে ভারতের স্বাধীনতা চান, তবে একটু দেরি করে চান। তাঁর মনোভাব এমন, আগে দেশের মানুষের মধ্যকার সামাজিক বৈষম্য দূর হোক, সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হোক, তারপর স্বাধীনতা আসুক। স্থিত অবস্থায় ভারত স্বাধীন হলে কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের অধিক লাভ হবে, সে ব্যাপারে তিনি পিতা নদীয়ারচাঁদ সরকারের মতোই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তাই শ্রোতাদের অনুরোধে স্বরাজের গান গাইলেও গানের শুরুতে যেমন নরম ভাষা ব্যবহার করেন, আবার গানের শেষে তেমন স্পষ্ট বলে দেন, এই মুহূর্তেই স্বাধীনতা নয়। তাঁর গানের সূচনা অংশ এমন:

---

[১৮] তদেব।

[১৯] ১৯৮১ সালে নদীয়ারচাঁদ সরকারের পৌত্র কবিয়াল অনাদিজ্ঞান সরকারের নিকট থেকে সংগৃহীত।

দশ মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি ভক্তিমুক্তি দাত্রী।
বড় বিপদে শ্রীপদে তব লইনু শরণ
আমি ভজনবিহীন অতি অভাজন অনন্ত পথের যাত্রী।
আমার দেহরাজ্য ভারতভূমি হল পরাধীন, দুঃখে কাঁদব কতদিন।
মাগো পুত্রকন্যার চক্ষের ধারা, ভারতমাতার বক্ষভরা
তবু রাজ্য স্বাধীন করা, তোমার নয় কি সমীচীন?

আবার গানের শেষ ফুকারে বলেন:

আমার দশেন্দ্রিয় স্বরাজপ্রিয়, যার যার স্বার্থের দায়
চায় না দেশের একতায়।
মা মাগো, যেন এ অবস্থায় হয় না স্বরাজ, আমি তো আগেই নারাজ
যুক্ত সাজে সাজুক সমাজ, তারপর মুক্ত অবস্থায় ॥[২০]

রমেশ শীলের গানে একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। একইভাবে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় সাম্যবাদী যে আদর্শের জন্ম হয়েছিলো, তারও প্রতিফলন ঘটে। যেমন রমেশ শীলের অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ক এই গানটি:

আর যায় না চুপ করে থাকা।
যতীন্দ্র বাবুর নেতৃত্বেতে বন্ধ হবে রেলের চাকা ॥

মজদুরের একতার জোরে রেলের বিটে মরিচা পড়ে।
আমার রক্তে উদর পুরে, আমাকে ডেম ব্লাডি ডাকা ॥

ব্যবসার ছলে বণিক এল, ডাকাত সেজে লুট করিল,
মালকোঠার ধন হরে নিল, আমারে সাজায়ে বোকা ॥

কৃষক মজদুর একযোগেতে, হাত মিলালে হাতে হাতে
শ্বেতাঙ্গ দুশমনের হতে তবে যাবে জীবন রাখা ॥[২১]

এই গানের মধ্যেও সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন আছে। তবে সরাসরি সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে রমেশ শীলের এই গানে:

বাংলার কৃষক ভাইগণ, হওরে চেতন
জমিদারের হাতের মুঠায় কৃষকের জীবন ॥

মাথার ঘাম পায়েতে ফেলি জলে ভিজি রোদে জ্বলি,
আট মাস থাকে গোলা খালি, নিত্য অনটন ॥

---

[২০] সংকলিত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও সম্পাদনা* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ১৫৬।
[২১] *রমেশ শীল রচনাবলী*, পৃ. ৩৫৯।

বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগা লুটে
রেহাই চাইলে জ্বলি উঠে, আগুনের মতন ॥

শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় 'যম-দুয়ার',
লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ ॥

হিন্দু মুসলমানে মিলি, এক সঙ্গে আওয়াজ তুলি,
জমিদারি যাক চলি বাঁচিবে জীবন ॥[২২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মালশি গান রচনা করেছিলেন নকুলেশ্বর দত্ত। সেই গানের প্রথম কয়েক কলি নিম্নরূপ:

ছিল পাকিস্তানের প্রবল চেষ্টা, উপনিবেশ বাংলাদেশটা
কায়েম করবেন ইয়াহিয়া খান।
তারা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশটা শোষণ করে
এবার মুজিবরের করে কাটা গেল কান ॥

বাংলায় ইলেকশনের হুকুম দিয়া ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া
দেশবাসী মোর পক্ষে জোট
ভরে উঠবে সোনার কোট, হায় গো
কিন্তু ভোট গণনায় দেখল যখন, ভেঙ্গেছে তার নেশার স্বপন
শতকরা নিরানব্বই জন দিল মুজিবের পক্ষে ভোট ॥

হবে বাঙ্গালি সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকশনের ফলে
থাকবে অবাঙ্গালি করতলে এই কি কভু হতে পারে ॥

ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়াহিয়া ভুট্টো বোনাইর যুক্তি নিয়া
হুকুম দিয়া নির্বাচন বাতিল করে ॥[২৩]

কবিগান বাঙালি সংস্কৃতির ঠিক কতোটা দখল করে আছে তা বোঝা যায়, বাঙালির কণ্ঠে কবিগান শব্দটি কতোবার উচ্চারিত হয়, তা দেখে। সেই তুলনায় কবিগান নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা খুব বেশি হয়নি। বর্তমান গবেষণায় তিন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কবিগানের একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হলো। এমন ক্ষুদ্র পরিসরে অমন ব্যাপক এলাকা তুলে ধরা সুকঠিন। তার ফলে বহু খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ভবিষ্যতের গবেষক, যাঁরা বিশেষ কালের এবং বিশেষ স্থানের কবিগানের উপরে নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করবেন, সেই অসম্পূর্ণতা পূরণের দায় তাঁদের হাতে রইলো।

---

[২২] তদেব, পৃ. ৩৬৭।
[২৩] সংকলিত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান: সংগ্রহ ও সম্পাদনা*, পৃ. ২১৭।

পরিশিষ্ট ১

কবিগানের নমুনা

(টীকা: ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বর্তমান গবেষকের অনুরোধে গবেষকের পিতা কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার এটি রচনা করে দেন। নমুনাটি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে পরিবেশিত হয়, পাঠককে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দান করা। কবিগানের কালপরিধি প্রায় বারো ঘণ্টা, অন্যদিকে এই নমুনাটি পড়তে বড়ো জোর আধ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। এ থেকে এই নমুনার অসম্পূর্ণতা কী পরিমাণ তা আন্দাজ করা সম্ভব। তাছাড়া একজনমাত্র কবিয়াল উভয় পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেছেন বলে, বাস্তব ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, এখানে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া নমুনাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-এর মতো মিলনান্তক একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু সকলেই জানেন কবিগানের জন্য নির্বাচিত অধিকাংশ বিষয়ের মধ্যেই মিলনান্তক হওয়ার সুযোগ কম। ঐসব ক্ষেত্রে জোটের পাল্লা অংশে কবিয়ালদ্বয়কে মিলনের সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন কোনো চরিত্র যেমন কৃষ্ণ-বলরাম ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এই নমুনায় তার প্রয়োজন হয়নি। নমুনাটি পাঠ করার সময়ে পাঠককে এসব সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে মনে রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

প্রথম দলের ডাক গান

বিশ্বে তাহার গান বিশ্বে তাহার গান।
সে গান শুনতে হলে হৃদয় খুলে পেতে রাখো কান ॥
বহে সমীরণ করে তারই গুণকীর্তন
ডাকে পাতায় পাতায় জগৎ-পাতায় মাতায় সবার মন।
ঐ দেখ নেচে নেচে উঠায় কতো সঙ্গীতের তুফান, কুসুমের বাগান।
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাজে বহুবিধ যন্ত্র
ঐ শোন উচ্চরবে উচ্চারয়ে অব্যক্ত মন্ত্র
ঐ দেখ শত প্রকার কতোই যন্ত্র করিছে আহ্বান ॥

চলিছে অষ্টম প্রহরই অমিয় সঙ্গীত লহরী।
দেখ রে নয়ন শোন রে শ্রবণ, আর কেন মিছে গহরি।
সাজিয়ে প্রকৃতি নানা আভরণে, সতত প্রণমি তাহারি চরণে, পুলকে উঠিছে শিহরি।

কতো তাল কতো রাগ কতোই রাগিণী, উঠিছে ছুটিছে দিবস-রজনী।
আমার হৃদয়ের মাঝে, মাঝে মাঝে শুনি, বাজায় বাঁশরি শ্রীহরি ॥
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত)

প্রথম দলের মালশি

চিতান আমি ক্ষুদ্রাকারে মা তোমারে পূজা করে সেজেছি ক্ষুদ্র।
পেলেম এই পূজার ফল বুঝিতে তাই তোমায় চাই পূজিতে
মাগো সাজায়ে অসীম সমুদ্র ॥

ফুকার মানসপূজা ভিন্ন অন্যমতে, এই পূজা পারে না হতে
ভক্তিহীনের এই পূজায় আসক্তি।
ও মা আদ্যাশক্তি, আদিতে দাও আমাকে এই শক্তি।
তোমায় সকল রূপে সকল সাজে, পূজিব অনন্ত সাজে
দেখবো অনন্ত বাঁধনের মাঝে, আমার অনন্তকাল মুক্তি ॥

মিশ আমার এই সংকল্প নয়কো অল্প হয় না যেন নষ্ট
মাগো ইহা গচ্ছ, ইহা তিষ্ঠ, স্বকৃপায় সন্তুষ্টা হয়ে।

মুখ তোমার পূজায় মাগো আমার কল্পনাতীত হয়ে জাগো, পঞ্চ আকাশ ছেয়ে ॥

প্যাঁচ মণ্ডপঘর মোর আকাশখানি, তাতে প্রকৃতির বায়ুর্ব্যজনী
সূর্য প্রদীপ চাঁদ ধূপতির ধূপ
দেখবো সূর্যালোকে তিনটে চোখে মা তোমার ঐ বিশ্বব্যাপী রূপ।
আসন শিবস্বরূপ লও হৃদিপদ্ম, ভক্তি অর্ঘ্য অশ্রু পাদ্য
দৈবী সম্পদ বিংশ পাদ নৈবেদ্য, প্রসাদ করে দাও তুমি নিয়ে ॥

মুখ তোমার পূজায় মাগো আমার কল্পনাতীত হয়ে জাগো, পঞ্চ আকাশ ছেয়ে।
খোচ মনটা করুক ঘণ্টা-বাদ্য বীজ আদি মিশাইয়ে ॥

ফুকার অসৎ চিত্তবৃত্তি পশুগুলি তোমার দ্বারে দেবো বলি
তর্পণ করবো জ্ঞান-যজ্ঞ আগুনে।
মিলবে অনন্তাভিমুখে সুখে সব তোমার চরণে।
আমার আত্মারাজ্যের প্রতিবেশী, সপ্ত স্বর্গের দেবী আসি
মাগো, দেখবে তোমার রূপরাশি, সবে অনিমেষ নয়নে ॥

মিশ আমার এই সংকল্প নয়কো অল্প, হয় না যেন নষ্ট
মাগো ইহা গচ্ছ ইহ তিষ্ঠ স্বকৃপায় সন্তুষ্টা হয়ে ॥

অন্তরা আন্তরূপিণী তারা মহৎ ব্রহ্মপ্রসবিনী, বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী
নশ্বরত্বের পরপারে অনন্ত জীবনাগারে
সর্বাকারে একাধারে দেখা দাও বিশ্বরূপিণী ॥

চিতান দেখি দৃশ্যমান এ বিশ্ব হতে, মাগো অতি ভীষ্ম তোমার ধ্যান।
ভেবে মূর্চ্ছিলা দারু আদি নরকে নিরবধি, আগের সেই পাপে আমি হই অজ্ঞান ॥

ফুকার পূজায় যাবতীয় শব্দবাদ্য, প্রাণীমুখে প্রণবাদ্য, যোগীমুখে সুবাদ্য বম বম।
বাজে অনাহতে সুসঙ্গীতে উত্তমের উত্তম।
পূজার উৎসাহে উৎসাহী ধরা হেরো হর মনোহরা
মাগো, তুমি না জাগিলে তারা, হবে বাহ্য পূজা ধমাধম ॥

মিশ তোমায় পূজার পর বিসর্জন দেবো, প্রেম সাগরের জলে।
মুখে জয় কালী জয় কালী বলে, সে জলে রবো ডুবিয়ে ॥

মুখ তোমার পূজায় মাগো আমার কল্পনাতীত হয়ে জাগো, পঞ্চ আকাশ ছেয়ে ॥
(রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত)

দ্বিতীয় দলের ডাক

মা তুই দিসনে কেন সাড়া গো মা তুই দিসনে কেন সাড়া।
শুধু কি তুই মাটির মা-টি, খাঁটি নাই কিছু খড়কুটা ছাড়া ॥
মা মা বলে ডাকলেম কতো, তবু সাড়া পেলেম না তো
মা ও ছেলের সম্পর্ক তো এ নহে তারা
তোর বরাভয় কি মিছে নাকি, সত্য কি মুণ্ড আর খাঁড়া।
শুনেছি তুই পাষাণীর কন্যে, বুঝি শুনতে পাস না ডাক সেই জন্যে
মা হয়ে ছেলের সৌজন্যে এ কেমন ধারা।
এবার না শুনলে ডাক হবি অবাক, তোরে ডাকবো না রাক্ষসী ছাড়া ॥

মা হতে কে বলেছিলো হবে তোর কহিতে
সন্তানের যন্ত্রণা যদি পারবে না সহিতে
শুনি কুপুত্র হয় বহুতর কুমাতা নয় মহীতে।
মা ইচ্ছাময়ী তুই ইচ্ছা করে, আনলি এ সংসারে মোরে
ত্রিতাপ জ্বালায় শুধু কি দহিতে
তাতে কে করে ভয় দিলে অভয় শিরে শকতি বহিতে।
মা বাবাকে তো হাবা পেয়ে পাড়াতেছিস ভয় দেখায়ে
লোকলাজে মুখ বুঁজে হয় সহিতে
কিন্তু ভুলিস না মা, মা গুণে ছা, হবে তোর স্বরূপে রহিতে ॥

দ্বিতীয় দলের মালশি

চিতান মহামায়া তোর খেলা বুঝিতে, মোর পুঁজিতে নাহি কিঞ্চিৎ জ্ঞান।
খেলো খেয়ালের বশে খেলা, জীবগণের ঘটে জ্বালা

যায় না ভোলা থাকিতে পরাণ ॥

ফুকার মাগো তেরো শো আটষট্টি সালে দেখালি মা তুই যা লীলে
মঙ্গলবার ছাব্বিশে বৈশাখ, টঙ্কারি অমঙ্গলের ঢাক
মা মাগো সূর্যদেব না উঠিতে, তোর কুটিল ভ্রূকুটিতে
যেন ভোলা প্রলয় প্রকটিতে ফুকিল প্রলয়ের বিষাণ ॥

মিশ দৃশ্যমান শ্যামলীর সে ভয়ঙ্করী বেশ
পরাণে মরনের নির্দেশ পেয়ে যতো নারীনর ॥

মুখ শেষের নাম দ্বি-অক্ষরে, স্মরে হিন্দু-মুসলিম সমস্বরে অন্তরে নিরন্তর ॥

প্যাঁচ ক্রমে ঘরবাড়ি সব হলো চুরমার, কতো কোল শূন্য হয়ে গেলো মা-র।
একত্তর সব মাঠের ভিতর, করে অভেদজ্ঞানে গলাগলি মহৎ কি ইতর।
গরু মোষ ছাগল কুকুর পাদ্রি আর মুনশি ঠাকুর
ছেড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী সুর, কী মধুর মিলন করালেন ঈশ্বর ॥

মুখ শেষের নাম দ্বি-অক্ষরে স্মরে হিন্দু-মুসলিম সমস্বরে অন্তরে নিরন্তর ॥

খোচ সবে বোঝে মা বিপদে তোর শ্রীপদের কী আদর ॥

ফুকার মাগো তুই তো বলিস ধর মো-কে, তা না করে ধর্মকে সব লোকে ঠকাই।
বুঝি বিমাতার ন্যায় তাই, ভীমারূপে আসিয়া, তোর সৃষ্টি নিস ভাসিয়া
মা তোর স্বভাবে মরি হাসিয়া, বুঝি তোর ন্যায় রাক্ষসী আর নাই ॥

মিশ শুনি কুপুত্র অনেক ভবে হয়, হয় না কুমাতা
যতো শাস্ত্রের বাক্য নয় অন্যথা, জানে মানে জ্ঞানী নর ॥

খোচ সবে বোঝে মা বিপদে তোর শ্রীপদের কী আদর ॥

অন্তরা একবার দেখা মা তোর সাম্য মূর্তি, জরা দেহে মরে বাঁচি
যদি পুত্রকে তোর পারিস খেতে, বেড়াতে কি পারবি নাচি।
মা ষোলো সাল কি ছাব্বিশ সালে খড় ছিলো না অনেকের চালে
এবার যে খেলা খেলালে ধনীর গালে ঢোকে মাছি।
এমনকি নাই লোটামাটি, আশ্রয় শুধু আকাশ-মাটি
কেবল ধ্বনি হা অন্ন হা রুটি, চলো ছুটি যাই করাচি।
মা বাইশদিয়া খেপুপাড়া, পাথরঘাটা টুরাপাড়া
নাহি জনমানবের সাড়া, পশুপাখি নাই আর বাঁচি
কারে কে আর করে তালাশ, পথে ঘাটে অগণন লাশ
কেবল বেড়েছে শকুনির উল্লাস, মহানন্দে ফিরছে নাচি ॥

চিতান গেলো মানুষ গরু কতো তাহার এবারে আর হিসাব নাহি তার
গেলো কতো নগর কতো গ্রাম, লেখা যায়নি তারি নাম

এমনকি রাজ্যের কাঠামো ভেঙে প্রায় সাবাড় ॥

ফুকার আবার মংলা পোর্টের কথা জানি, স্টিমার চল্লিশখানা ডুবুরি সেজেছে নদীর খান তিরিশে কূলের পরে স্থবির।
মা মাগো বাণিজ্যের একটি জাহাজ ডুবেছে পশরের মাঝ
আবার সুন্দরবনের মাথায়ও বাজ, বন কাটা লাগবে না বাওয়ালির ॥

মিশ কহে স্বরূপ কাঁদি এ রূপ যদি করো মাঝে মাঝে
মাগো তুমি জীবজগতের মা যে, সে কথা ভুলে যাবে আপামর ॥

মুখ শেষের নাম দ্বি-অক্ষরে স্মরে হিন্দু-মুসলিম সমস্বরে অন্তরে নিরন্তর ॥

(১৩৬৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৬১ সালে খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে সংঘটিত এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পরে, বাগেরহাট জেলার কাঠিগোমতী গ্রামের কবিগানের আসরে স্বরূপেন্দু সরকার কর্তৃক মালশি গানটি রচিত ও পরিবেশিত)

প্রথম দলের সখীসংবাদ

চিতান মধুর কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে, জানে না প্রেম প্রেমিক বিনে
প্রেমিকা প্রেমিকের সনে প্রেমের আলাপন।
ডুবে সেই প্রেমের অকূল সাগরে রাধে পেলো শ্যাম নাগরে
নিশীথে নিকুঞ্জে করে প্রেম আস্বাদন ॥

ফুকার একদিন শ্যামের সনে শ্যামদুলালী বসিয়া বিরলে
ও তার মনের মানুষ বনে পেয়ে মনের কথা বলে, হায় হায় হায়
কেন জাতিকুলমান ত্যাগী হলেম তোমার প্রেমসোহাগী
ভরা কলসী ভরবার লাগি জল ফেলে যাই জলে ॥

মিশ জল ফেলে যাই জল আনিতে কালিন্দীর কূলে
বন্ধু তোমাকে না দেখতে পেলে ভেঙে পড়ে দেহমন ॥

মুখ বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা হরে নিতে মন ॥

প্যাঁচ কেন তোমায় ভালোবাসি ঘর ফেলে জঙ্গলে আসি দাসী হলেম রাঙা পায়
বাঁশের বাঁশি কী গুণ জানে কী কথা কয় কানে কানে
কুলজা অকূলে আনে ফিরতে নারে কিনারায় ॥

মিশ পর হলো আজ আপন বন্ধু আপন হলো পর
বনের মাঝে মিলনের ঘর, ঘর হয়েছে গহন বন ॥

মুখ বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা হরে নিতে মন ॥
খোচ কোন দেশে প্রেমের বসতি মূরতি কেমন ॥

ফুকার তোমার রূপের জ্যোতি অতি কালো তবু ভালো লাগে।

কেন কালো রূপের মাঝে এতো ভালোবাসা জাগে, হায় হায় হায়
বাঁকা আঁখি মধুর হাসি দেখলে কেন হই উদাসী
অধরে অমিয়রাশি যাচে অনুরাগে ॥

মিশ দেখলে না যায় দেখার আশা না দেখলেও জ্বালা
বন্ধু তোমার লীলাখেলা বুঝবে কী অবলাগণ ॥

মুখ বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা হরে নিতে মন ॥

অন্তরা হারে আগে কে জানিত বন্ধু তোমার প্রেমে এতো জ্বালা
নিলাম তোমার পায়ে ফুল দিয়ে শ্যাম আমি কুলকলঙ্কের মালা
হারে ও বন্ধুরে
বাজলে তোমার মোহনবাঁশি মন হতে চায় বনবাসী
শাশুড়ি ননদী আসি ঘরে দেয় তালা
কাঁদি একলা ঘরে নয়নজলে ফুলে ফুলে কুলবালা।
হারে ও বন্ধুরে
প্রেমের পূজা করতে গিয়ে পদে পদে আঘাত খেয়ে
দুঃখ দিয়ে সাজালেম ডালা
আমার মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ সোনার দেহ পুড়ে কালা ॥

চিতান জ্বালা জুড়াইতে বনে গিয়ে তোমার বক্ষে বক্ষ দিয়ে
তবু তো জুড়ায় না হিয়ে, এ কেমন ব্যাধি
আমার কিসের অভাব কইতে নারি, তবু কেন জ্বলে মরি
এ ব্যাধি কী দিয়ে সারি, কী তার ঔষধি ॥

ফুকার তোমায় যতো পাই মোর কাছে কাছে আরো ততো চাই।
বুঝি জনমভরে পেয়ে তোমায় এ পাওয়ার শেষ নাই। হায় হায় হায়
তুমি আমি নাই যেখানে, আমি শুধু তুমির মানে
জাবট গোকুল বৃন্দাবনে সে দেশ কোথা পাই ॥

মিশ দেখলে না যায় দেখার আশা, না দেখলেও জ্বালা
বন্ধু তোমার লীলাখেলা বুঝবে কি অবলাগণ ॥

মুখ বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা হরে নিতে মন ॥
(নিশিকান্ত সরকার প্রণীত)

দ্বিতীয় দল কর্তৃক সখীসংবাদের জবাব

চিতান তখন প্রেমময়ীর প্রেমপ্রবন্ধে ডেকে শ্রীগোবিন্দে কয়।
রাধে পঞ্চরসের রসিকে, বশ করলো শ্যাম শশীকে
দাসীকে কি প্রেমের গুরু কয় ॥

ফুকার কেন জাতিকুলমান ত্যাগী হলেম তোমার প্রেমসোহাগী
জাতিকুল আর মানগৌরব, রাধে মূলের দেওয়া নয় এসব
প্রেম যে পরম আত্মস্বরূপ, রূপের মাঝে জাগায় অরূপ
হলো প্রেম সমুদ্র কুলমান কূপ, সেথা কূল পেলো অকূলার্ণব।
কেন জাতিকুলমান ত্যাগী হলেম তোমার প্রেমসোহাগী
জাতিকুলশীলমান জানি প্রেমে নাই এর ব্যবধান
প্রেম মানে না সমাজবেড়ি হোক না মুচি হোক না হাড়ি
দিতে প্রেম সাগরে সোজা পাড়ি চিরদিন চলে উজান।
বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা
কী কথা শুধালে রাই, ইহা শিখেছি তো তোমার ঠাঁই
চোখে চোখে প্রেম উৎপত্তি, বক্ষে প্রেমের অবস্থিতি
জানি নিরাকার হয় প্রেমের মূর্তি, ইহার উৎস যে তোমাতে পাই।
বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা
প্রেমাধার রাধারানী তাই তার চরণে চিরঋণী
প্রেম জন্মে হ্লাদিনী হতে, ব্যক্ত আছে ত্রিজগতে
এবার ছড়ায়ে তাই ব্রজের পথে ধন্যা হলো ধরণী।
বলো প্রেমের জন্ম কোথা সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা
কামনায় প্রেমের ভিত্তি নিয়ে তাহার সাথে সৎ বৃত্তি
অনুরাগে পুড়ে পুড়ে বিবেক ঠুকনির আঘাত মেরে
শেষে নিষ্কাম রসে শোধন করে সামর্থায় প্রেম উৎপত্তি।
কেন জাতিকুলমান ত্যাগী হলেম তোমার প্রেমসোহাগী
কুলের প্রতি থাকলে টান, আমি হই না তাহার কালাচান
কূলের বাঁধন দিয়ে খুলে তরী ছাড়িলে অকূলে
আমি তারে ছেড়ে এ গোকুলে, ভুলে যাই না অন্য স্থান ॥

মিশ তোমার আমার প্রেমের মিলন রবে অবিচ্ছেদ
শেষ হবে না এই পরিচ্ছেদ, রাধে তোমাকে জানাই।
আমি বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি আমার প্রেমের গুরু রাই ॥

প্যাঁচ আবার বললে বাঁশরীতে জানে কিনা গুণ
সুরের মাঝে ভালোবাসি রাধা নামের ধুন।
ঋষভের রা ধৈবতের ধা, তাতে আমার বাঁশি সাধা
দিয়ে রাধা নামের সুধা রাধে তোমাকে ভুলাই ॥

খোচ কালো শশী ভালোবাসি এ বাঁশিটি তাই ॥

ফুকার রূপের জ্যোতি অতি কালো, তবু কেন লাগে ভালো
বলো বলো রসময় তুমি কী সুধালে অসময়

আমি রূপটি অতি কালো তোমার রূপে জগৎ আলো
হলো আলোর গুণে কালো ভালো, কালোর গুণে হলো আলোর জয়।
তুমি আমি নাই যেখানে আমি শুধু তুমির মানে, সে দেশ কোথায় পাওয়া যায়
রাধে এ দেশে সে দেশ কোথায়।
তুমি আমি মিলাইব, দুই দেহে এক দেহ হবো
শেষে কিশোরী প্রেম বিলাইব, আর জন্ম নিবো সোনার নদীয়ায় ॥

অন্তরা আমি কি আর জানি রাধে আমার প্রেমের জ্বালাটা কী।
তুমি আমি নই অভিন্ন এক আত্মা দুই দেহে থাকি।
আমি বাঁশি তুমি রন্ধ্র, আমি কাব্য তুমি ছন্দ
আমি ফুল আর তুমি গন্ধ একত্রে থাকি।
আমি হলেম বেলাভূমি, সমুদ্রের জল হলে তুমি
যবে ঊর্মি হয়ে নাচো তুমি, আমি তোমায় বক্ষে রাখি ॥

দ্বিতীয় দলের কবি

চিতান হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মা-বাবা প্রায় উপেক্ষিত
শিক্ষার আর মূল্য রইলো কই?
কেউ মূর্খ পিতায় চায় না দিতে সত্য পরিচয়
দেখে মনে হয় বাবা ঠিক তালই ॥

ফুকার একজন গরিব লোকের দুটি ছেলে বড়োটি বিএবিটি পাস
ও তার শ্বশুর মশায় ধনী, জমি বিঘে শ-পঞ্চাশ
হায় লাভ করে শ্বশুরের ভেট পেলো এ সার্টিফিকেট
এখন শ্বশুর বাড়ির কেটে টিকেট, মা-বাবার নেয় না আর তালাশ ॥

মিশ ছেলের পিতা পরের বেগার খেটে দিন আনে দিন খায়
একদিন আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষায় কাজ বেগর উপবাসী দিবসভর ॥

মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥

প্যাঁচ ছেলে সান্ধ্যভোজন অবসানে রয়েছে গিন্নির সনে সুখশয়নে
হতেছে নানা রসের কথা।
দেখে হেনকালে খোলা জালনার ফাঁকে পিতার মাথা।
ছেলে কয় কী হলো লেঠা, বিরক্তিতে জ্বলে গা-টা
বুড়ো তোমাকে এখানে পাঠালো কেটা
আজও কি যম তোমার পায়নি খবর ॥

মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥

খোচ একটা বুড়ির খোরাক জোগানো এতো কি দুষ্কর ॥

ফুকার তুমি এখনো তো খাটতে পারো, বয়স তো হয়নি বেশি ততো
চুল যা সাদা বায়ুর জোরে নইলে কে বুড়ো কতো।
হায় মাঝে মাঝে টাকা যে চাও বিচারে টাকা কি পাও
পিতার ডিউটি ছাড়া করোনি ফাও, বিএ পাস তুমি করাওনি তো ॥

মিশ আমার শ্বশুর মশায় টাকা দিয়ে পড়ালো আমারে
এখন সাহায্য করবো তোমারে সে বেটার না নিয়ে কি খোঁজখবর ॥

অন্তরা বাবা কী কবো একবার ভাবো, তোমাকে বাবা বলা যায় নাকি।
তোমায় লোকসমাজে বাবা বললে গো কও আমার মানসম্মান থাকে নাকি।
করো অভদ্রের ন্যায় চলাফেরা নাহি কাণ্ডজ্ঞান
আয়না ধরে দেখো তোমায় দেখায় হনুমান
আমার শ্বশুর সোনার চান।
আমি বাবুর জামাই আরো বিদ্বান গো, মূর্খকে তাই বাবা বলা যায় নাকি।
আবার বুড়ির কথা বলবো কোথা, তারও যাহা গুণ
গ্রাজুয়েটের মা লাউকে কয় নাউ লবণকে কয় নুন
ইচ্ছা হয় দুঃখেতে হই খুন।
বুড়ির আবার মাথা-ভরা যেমন উকুন গো
আমার শিক্ষিতা বউ তাই সইতে পারে না কি ॥

চিতান বাবা তোমার চরণ ধরে করি মানা, আমার শ্বশুর বাড়ি আর এসো না
এখনো লোকে জানে নাই।
তোমায় সকালবেলা দেখলে সবে যাবে আমার জাত
শ্বশুরবাড়ির ভাত আমার ভাগ্যে নাই ॥

ফুকার তোমরা লালন-পালন যা করেছো পরকালে শোধ করবো দেনা
কিন্তু বোঝা উচিত বর্তমান তো শ্বশুরের কেনা।
হায় শাস্ত্রের নীতিবাক্যে অস্তি, গতস্য শোচনা নাস্তি
সবই বর্তমানে স্বস্তি স্বস্তি, মূর্খ হয়ে এসব বুঝবে না ॥

মিশ আমার শ্বশুর মশায় টাকা দিয়ে পড়ালো আমারে
এখন সাহায্য করবো তোমারে সে বেটার না নিয়ে কি খোঁজখবর ॥

মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥

প্রথম দল উপস্থাপিত কবির জবাব

চিতান তখন সুশিক্ষিত পুত্রের বাক্যে দুঃখে তার মূর্খ পিতা কয়।
ভবে রতিশাস্ত্র না জানিয়া জন্মালে ছেলে তার কপালে এমনি দশা হয় ॥

ফুকার আমি বাপ হয়ে যে ভুল করেছি, তার মাশুল দেবার নাই

জগৎবাসী সবারে জানাই।
গৃহাশ্রমে যাবে যবে, সদ্‌গুরুর ঠাঁই শিক্ষা লবে
করে যে সাধন শোধন কৈতবে, ভবে তার বিপদের ভয় নাই।
খোকা তোর ব্যবহারে হৃদমাঝারে দিলি তুই যেটুকু বেদন
মণি তুই আমার কথা শোন
জ্ঞানীর হলে মূর্খ-ব্যাধি চিকিৎসা লাঠ্যৌষধি
সমাজপতিরা এর দিলে বিধি তবে হয় ব্যাধি নিরসন।
এখনো লোকে জানে নাই মুখে যদি ইহা উচ্চারিস
তবে তুই আমার কথা নিস
দেখাতে তোর শিক্ষার ধারা, এ ভবে ধনী যাহারা
আর যাদের সুন্দর চেহারা তাদের বাপ বলে ডাকিস।
আমি ঠিক হনুমানের প্রায় হাটে হাটে ঢেরা দিয়ে দাও
তুমি তো সেই হনুমানের ছাও।
হোক না পাস এমএ বিএ ধনীর মেয়ে করলে বিএ
ছেলে পশুর ন্যায় যায় বিক্রি হয়ে, সবার কাছে এ কথা জানাও॥

মিশ জানি অনুলোমে ধরাতলে হলে সন্ততি হয় তারা মেধাবী ও ধর্মে মতি
দুর্গতি হয় প্রতিলোম বিবাহে
পরাশর সংহিতাতে জানি স্পষ্ট লেখা আছে তাতে, দ্বিমত নাই তাহে॥

প্যাঁচ খোকা ভালো করে জেনে না, আছে সেই শাস্ত্রে আরো নিশানা
বর্ণসংকর কেমনে জন্ম লয়।
যদি স্বামী হতে স্ত্রীর পিতা অধিক ধনী হয়।
আর স্বামী হতে রমণী যদি হয় বেশি গুণী
হয় না সেথা মধুর রসের আমদানি
সেই গর্ভের সন্তানকে সংকর কহে॥

খোচ জায়তে বর্ণসংকর ধর্ম না রহে॥

ফুকার গ্রাজুয়েটের মা লাউকে কয় নাউ এই বলে দুঃখে মরতে চাস।
শ্বশুর বাড়ির অন্নেরই সাবাস।
জননী আর জন্মভূমি যখনে না চিনলে তুমি
সমাজে আরো অধিক হবি দামি, আজ হতে তোর শাশুড়ির দুধ খাস।
আমার শেষ মিনতি তাদের প্রতি শিক্ষিত যুবক আজ যারা
সমাজ তো হলো প্রায় সারা।
থেকো না তোমরা চুপে, জাগো দেশের মেরুদণ্ডরূপে
যতো কুসংস্কার আছে ব্যেপে, প্রয়োজন পরিষ্কার করা॥

মিশ নইলে আমার মতো এ জগতে ঠকবে অনেকে

একে শিক্ষা পায় অন্যকে দেখে, তার মূলে যদি কাণ্ডজ্ঞান রহে ॥

প্রথম দলের টপ্পা, ধুয়া ও পাঁচালি

টপ্পা

চিতান আমি কল্পনাতে নরেন দত্ত কাব্যগীতিকায়।
তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংস বাসনা করেছো ধ্বংস
কালিকার প্রেমের অংশ পেলে রসনায় ॥

অন্তরা তুমি নারী বাড়ি ত্যাগ করিয়া মাটির মূর্তি পূজিছ দক্ষিণেশ্বর।
সাজিলে পর সংসারী কংসারি কি পায় না নারীনর ॥

প্যাঁচ আর কোরান পুরাণ বাইবেল বেদ যাতে বিরাট মতভেদ
কেমনে তাহার করলে একত্তর।
তোমার আজগুবি সব কাণ্ড দেখে আজ আমার ব্যথিত হলো অন্তর ॥

মুখ সাজিলে পর সংসারী কংসারি কি পায় না নারীনর ॥

ধুয়া

আমি যার লাগিয়া পাগল হলেম সই তারে পেলেম বা কই।
আমার মনের কথা প্রাণের ব্যথা রে, সে বিনে আর কারে কই ॥

হলাম আমি পাগলপারা সখী জানিনে তাহারে ছাড়া দুঃখে চক্ষে বহে ধারা।
হয়ে আর কতো কাল তারে হারা আমি একা একা রই ॥

সাথিহারা বুনো পাখি করে বনে যেমন ডাকাডাকি তেমনি একা থাকি।
যাবে এখনই এ জীবনটা কি, বুকে ধান দিলে হয় খই ॥

জানি অগ্নিশিখা নেভে জ্বলে তবে কী লাগি সাগরের জলে বাড়বাগুন জ্বলে।
সখী তোরা তো ঘিরে সকলে তবু কেন পুড়ে সাড়া হই ॥

সখী তোরা বল না সবে সে রূপ স্বরূপে মিলাবে কবে থাকবো নীরবে।
আমার এমন ভাগ্য কবে হবে, যেন তাহার কেনা হই ॥

পাঁচালি (ত্রিপদী)

প্রথমে আসরে দাঁড়িয়ে আমি শ্রেষ্ঠ ইষ্টদেবে নমি
সৃষ্টি যাঁরা করলো ভবে আমারে
জানি শ্রেষ্ঠ ইষ্ট পিতামাতা তাই তাদের পায়ে নোয়াই মাথা
যেন প্রেমাস্বাদ পায় বিশ্বে অধম পামরে।
পরে বন্দি মাতা সরস্বতী তাঁর চরণে করি নতি
মাগো আমায় আশিস করো দান

তোর করুণা পেলো যাঁরা ভবে শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরা
জগতের করিল কল্যাণ।
রত্নাকর দস্যু শুনি তোর কৃপাতে বাল্মীক মুনি
তোর কৃপাতে কবি কালিদাস
বিশ্বকবি রবি ঠাকুর তোর কৃপা মা পেয়ে প্রচুর
গীতাঞ্জলি করিল প্রকাশ।
লেখক কবি হতে যাঁরা জনগণের মনে জাগায় সাড়া
পরিচিত চারণকবি নামে
সভায় তাঁদের কথা থুই সর্বপ্রথম গোঁজলা গুঁই
এই কবিগান আনলো ধরাধামে।
বিশেষ করে কলিকাতায় জনগণকে গানে মাতায়
গোঁজলা গুঁইয়ের অনুসারীগণ
সে গানের সুর ভেসে ভেসে ছড়ায় সারা বাংলাদেশে
পূর্ববঙ্গে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
যেমন জয়পুরের তারকচাঁদ পেতেছিলেন প্রেমের ফাঁদ
তাঁর শিষ্য নিরক্ষর অশ্বিনী
ভক্তজনের করিতে হিত রচিলেন শ্রীহরিসঙ্গীত
মাগো তোমার প্রেমভাণ্ডার জিনি।
জয়পুরের এই তারকচন্দ্র এই কবিগান করে কেন্দ্র
নতুন ধারা আনিলেন বাংলায়
আবার নরসিংদির হরিচরণ লাভ করিলেন তোর শ্রীচরণ
মুগ্ধ সবাই তাঁহার প্রতিভায়।
তাঁহার কোঙর দুটি ফুল রাজেন্দ্রনাথ আর নকুল
সারা বাংলায় হলেন জনপ্রিয়
তাঁরকচাঁদের কৃপা লভি হলেন হরিবর মনোহর কবি
ছড়াইলেন কাব্যের অমিয়।
এঁদের ছাত্র বিজয়-নিশি বিজয়কীর্তি দিশি দিশি
ছড়াইয়া বাংলা করলো জয়
পরবর্তী সরকার মাঝে রসিক বাবু নতুন সাজে
কাব্যসম্ভার দেয় সারা বাংলায়।
হই যেন মা তাঁদের মতো এই আশিস করো সতত
অন্য কিছু আমি নাহি চাই
সভায় যতো ভক্তবৃন্দ বন্দি চরণারবিন্দ
আমায় কৃপা করিবেন সবাই।
এখন টপ্পাখানার যে বৃত্তান্ত স্মরণ করি আদ্যোপান্ত
কল্পনাতে নরেন দত্ত নামে

বিপক্ষের রামকৃষ্ণের কাছে যে কয়খানা প্রশ্ন আছে
প্রকাশ তাহা করি পর্যায়ক্রমে।
তোমার মতো ভক্ত নাই লোকমুখে শুনিতে পাই
কেউ বা তোমায় বলে অবতার
আজ যে কয়টি প্রশ্ন নিয়ে এলেম তোমার কাছে ধেয়ে
মীমাংসা আজ তুমি দেবে তার।
কী জানাবো মহাভাগ নারী-বাড়ি করে ত্যাগ
মাটির মূর্তি করিয়া সৃজন
অদ্য আমার কথা রাখো দক্ষিণেশ্বর কেন থাকে
সত্য করে করো বিশ্লেষণ।
সংসারে রয়েছে যারা ঈশ্বর কি পাবে না তারা
ভোগ হতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হলে
সবে হয়ে তোমার অনুসারী গেলে সবে সংসার ছাড়ি
মানুষ কি আর থাকবে ধরাতলে।
সারদাকে করে বিয়ে ঘর না করে তাঁকে নিয়ে
ত্যাগ করিলে কেন মহাত্মন
ঠিক করে করো বর্ণনা এটা কি অধর্ম না
বিয়ের মন্ত্রে পাই যে নিদর্শন।
বিশেষ রূপে ভার বহনে তাহাকে বিবাহ ভনে
ধর্মসাক্ষী করে করলে বিয়ে
তারে যদি ত্যজো আজ মোটে কি করে না লাজ
সভায় তাহা দেবে আজ বুঝাইয়ে।
আবার গর্ভধারিণী মাতা যিনি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠা জানি
এতো তোমার শাস্ত্রেরই বারতা
সেই মাতাকে দুঃখ দিলে তাহাতে কি ধর্ম মিলে
জ্ঞানী হয়ে করতে পারো কি তা?
মন্দিরে যে মাটির মা-টি ও মাটি তো নহে খাঁটি
জননীর চাইতে বেশি নয়
নৈবেদ্য যা দাও তাহারে শক্তি তো নাই তার আহারে
বুঝি ইহা পণ্ডশ্রম নিশ্চয়।
আছে তব শাস্ত্রমাঝে পিতামাতায় ঈশ্বর রাজে
সেই মা-বাবা ত্যাজ্য করে যারা
বিশ্বের যতো গুণী জ্ঞানী এ বাক্য নেনে না মানি
ইহা খাঁটি মূর্খ লোকের ধারা।
ভবে যতো অবতার কিবা আমি কবো তার
প্রোফেট কিংবা পয়গম্বর যতো

জন্মেছে সবে সংসারে তোমার মতো কে ঘর ছাড়ে
বুঝলাম তোমার জ্ঞান নহে উন্নত।
পাই না আমি কিছু ভেবে মানুষকে কী শিক্ষা দেবে
আবার তুমি করো গুরুগিরি
তোমার কেহ হলে শিষ্য ফলবে নাকো তাতে শস্য
তোমার কার্য সকলি বিচ্ছিরি।
কোরান পুরাণ বাইবেল বেদে সবে জানি নির্বিবাদে
একেক ধর্ম একেক কথা কয়
তুমি সাধু কেমন করে এগুলোকে দাও এক করে
কেমন করে আনলে সমতায়।
কোরানের আল্লাহ যিনি সাকাররূপে নহেন তিনি
হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর অগণন
জানি মোরা আদ্যোপান্ত পুরাণের যে সিদ্ধান্ত
সাকার রূপ সে করেছে গ্রহণ।
কেমনে ইহা এক হয় তাই ঘটেছে বিপর্যয়
আমি ইহা বুঝতে নাহি পারি
যদি তোমার দলে নিবে সুন্দর করে বুঝাইবে
তবে তোমার দিবো বলিহারি।
মাত্র কটি প্রশ্ন এনে নিবেদিনু শ্রীচরণে
ধরো গোঁসাই আমার কথা ধরো
এই সভ্য মধ্যে সুষ্ঠুরূপে জ্ঞানীবর্গের সমীপে
সুন্দররূপে এর মীমাংসা করো।
এখন আমি সুর আর ছন্দে ভাব রস কাব্য প্রবন্ধে
ধুয়ার সুরে গাহি একটি গান
শ্রোতাবর্গ আছেন যাঁরা আকর্ণন করিবেন তাঁরা
গোঁসাই কেমন করেন জবাব দান।

ধুয়া

ও বিদেশি নাইয়া কোন দেশে যাও বাইয়া।
আমার বন্ধুরে পেলে যাইও মোর কথা জানাইয়া ॥

কইও আমার বন্ধুর কাছে বিরহিণী আজো বেঁচে আছে
যে প্রকার নদীর ঢেউ নাচে তীরে আছাড় খাইয়া।
যদি হয় মমতা আমার কথা কইও তারে যাইয়া ॥

ভাবি তারে যাবো ভুলে হাসি দেখবো নাকো ফোটা ফুলে
তবু কোকিল তমাল ডালে বিষ ঢালে গান গাইয়া।

শুনে পাখির গীতি বন্ধুর স্মৃতি মনে দেয় জাগাইয়া ॥

আর এক কথা কইও তারে ব্যথা দিলে ব্যথা বাড়ে
তবু কেন অবলারে যায় এতো কাঁদাইয়া।
ওগো ব্যথার পাছে ব্যথা আছে কইও তায় বুঝাইয়া ॥

স্বরূপ কহে ভেবে ভেবে আমার বন্ধুরে যে প্রাণ সঁপিবে
কান্না তাহার না ফুরাবে ত্রিদিবেও যাইয়া।
তবু মন কেন চায় থাকতে ডুবে তার রূপসাগরে নাইয়া ॥

পাঁচালি (পয়ার)

বেশি কথা বলে আর নাইকো প্রয়োজন।
অল্পে অল্পে ভাব মম করি সমাপন ॥
কল্পনাতে নরেন আমি বিপক্ষে রামকৃষ্ণ।
কালিকার প্রতি তাঁর মনটি সতৃষ্ণ ॥
সাধন-ভজন কিছু মোর জানা নাই।
গূঢ় তত্ত্ব সাধুজির কাছে জানতে চাই ॥
এ কারণে গুটি কতো প্রশ্ন আমি করি।
সর্বসমন্বয় সাধু তার বরাবরি ॥
সুন্দর মীমাংসা দিয়ে দুঃখ করবে দূর
অন্ধকার নাশি হবে আনন্দ প্রচুর ॥
তাই রামকৃষ্ণ তুমি মোর কথা নিয়ো
যে প্রশ্ন করেছি তার ঠিক জবাব দিয়ো ॥
এ পর্যন্ত ভাবধারা করি আমি সাঙ্গ
তব বাক্যে ওঠে যেন প্রেমের তরঙ্গ ॥

দ্বিতীয় দলের টপ্পা, ধুয়া ও পাঁচালি

টপ্পা

চিতান তুমি ভাবোন্মত্ত নরেন দত্ত কাব্যপ্রবন্ধে।
আমি তোমার কাব্যে রামকৃষ্ণ কালী নামে মন মোর সতৃষ্ণ
পেয়ে কালীতে সেই রাম ও কৃষ্ণ ভজি আনন্দে ॥

অন্তরা জানি নারী যে হয় নরকের দ্বার, সংসারে সং ছাড়া আর কিছু নয়
ভোগেতে মানুষ ভোগে ত্যাগে চিরশান্তি সুনিশ্চয় ॥

প্যাঁচ আর কোরান পুরাণ বাইবেল বেদ কোথায় দেখলে মতভেদ
জ্ঞানের চশমা চোখে যদি লয়
তখন বিভেদ দৃষ্টি আর থাকে না, সর্বত্র দর্শন করে ব্রহ্মময় ॥

মুখ ভোগেতে মানুষ ভোগে ত্যাগে চিরশান্তি সুনিশ্চয় ॥

ধুয়া

কিসের লাগিয়া ভাইরে করো সবে জাতাজাতি।
আছে বিশ্বমাঝে একটি জাতি সে জাতির নাম মানবজাতি ॥

মূলে মোরা একজনের সন্তান শুধু ভাষাভেদে কহি আল্লাহ-ভগবান
কভু আদম মনু নয় ব্যবধান শতরূপা হাওয়া সতী ॥

হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সবে ভাই মোদের একই মাতা একই পিতা একই অন্ন খাই
মোরা এক জলে স্নান করি সবাই একই চন্দ্রসূর্য সাথি ॥

বেদ বাইবেলে এক ব্রহ্মবাদ কোরানেও কহে কোলহু আল্লাহু আহাদ
মোরা না বুঝে করি বিসম্বাদ করি অন্ধকারে হাতাহাতি ॥

স্বার্থবাদী মানুষ একদলে এই মহামানবজাতি ভাগ করেছে কৌশলে
তাইতে নিত্য হত্যাকাণ্ড চলে নিজ হাতে বধি স্বজাতি ॥

স্বরূপ কহে বাকি নাইরে আর সকল শাস্ত্রে কহে কলির শেষে হবে একাকার
মানুষ শিক্ষা পেলে কাটবে আঁধার জ্বলবে তবে জ্ঞানের বাতি ॥

পাঁচালি (ত্রিপদী)

নমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ যেই যার উপরে আর কেহ নেই
লা-শরিক আল্লাহ যারে বলেন মোহাম্মদ
আবার খ্রিস্টানেরা তেমনি করে বাইবেলে প্রকাশ করে
দেয়ার ইজ নো গড একসেপ্ট অলমাইটি গড।
সেই পূর্ণব্রহ্মের সত্তা লয়ে প্রেমের বার্তা মর্তে বয়ে
পাপের গ্লানি যিনি করলেন দূর
কী আর আমি কবো তার সে যে প্রেমের অবতার
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরিঠাকুর।
নমি তাহার রাতুল পদে সাথি যে বিপদে সুপদে
এলেন যিনি পতিত জীব তরিতে
সাঙ্গ হলে দিনের খেলা খেয়াঘাটে পারের বেলা
স্থান যেন পাই আমি তাহার তরীতে।
পরে বন্দি আদ্যাশক্তি মায়ের চরণ যার শ্রীপদ করলে স্মরণ
ভবসিন্ধু তারণের উপায়
শরণ নিয়ে যার পায় ব্যাঘাত বিঘ্ন দূরে যায়

বারে বারে প্রণাম করি তায়।
কোন পুষ্পে পূজবো তোরে ভেবে যে হই সারা
দিতে তোর পায় গোলাপ টগর কেতকী বকুল চাঁপা কতো কী
চাতকীপ্রায় হই যে আত্মহারা।
কতো গুণ তোর কহি মা
দেখলেম আমি ভবের হাটে তুই যা ঘটাস তাই তো ঘটে
ঘটে পটে রটে যে তোর মহিমা।
তাই মায়ের গুণ বর্ণিতে নারি নাহি দিলে ভক্তিবারি
যায় না পাওয়া তাঁর যুগল চরণ
তাই মাগো আমায় কৃপা করি আশিস করো হে শঙ্করী
কাব্যসাগর যেন হই তারণ।
পরে বন্দি সভায় শ্রোতা যতো পদে করি মাথা নত
সবে আমায় করুন আশিস দান
আপনাদিগের আশিস পেয়ে যাবো কাব্যের তরী বেয়ে
হৃদয়ে সবার ফুটুক ফুলবাগান।
মনঃশিক্ষা করি শেষ বক্তব্যে করি প্রবেশ
কল্পনাতে সাজলেম গদাধর
বিপক্ষে মোর দত্ত নরেন যে কয়খানা প্রশ্ন করেন
মীমাংসা তার করবো অতঃপর।
ত্যাগ করিয়া নারী-বাড়ি কেন আমি সংসার ছাড়ি
নরেন তুমি তাহা জিজ্ঞাসিলে
নারী ঠিক নরকের দ্বার আর সংসারে কিছু নাই সার
সংসারেতে শান্তি নাহি মিলে।
বুঝাই তোমায় নারী কেমন ভাগাড়েতে গোহাড় যেমন
কুকুরেতে শুকনো হাড় নিয়ে
যখনেতে চর্বণ করে চোয়াল ফেটে রক্ত ঝরে
তৃপ্ত হয় সে নিজের রক্ত পিয়ে।
শেষে যখন বুঝতে পায় হাড়ের ভিতর কিছু নয়
শেষে ঘটে অশেষ যন্ত্রণা
রমণী ঠিক তেমনিমতো বুঝিয়া দেখো সতত
পুরুষ নারীর পেয়ে কুমন্ত্রণা—
যেটুকু আনন্দ লভে নারী তা দিয়েছে কবে
নিজের পিতৃসত্তা নষ্ট করি
ক্ষণিকের আনন্দ পেয়ে পিছের দিকে দেখো চেয়ে
নারীর মাঝে নিজে গেছে মরি।
তাই তো নারী ভালো নয় মনেতে কোরো প্রত্যয়

সংসারেতে কেবা আপনজন
যখনেতে মুঁদবে আঁখি বুঝতে পারবে সবই ফাঁকি
পুত্রকন্যা স্বার্থেরই স্বজন।
আর বললে মাকে ত্যাগ করেছি ইহা বলা মিছামিছি
মা-বাবা ত্যাগ করা সম্ভব নয়
মায়ের চারি বাবার চারি এ দেহটা গড়া তারই
মা-বাবা তো দেহে সুনিশ্চয়।
তাহা হলে চিন্তা করো ধরো আমার কথা ধরো
মা-বাবা তো আমার দেহে আছে
মা-বাবা রয় আমার দেহে তাই আমি নিঃসন্দেহে
কালীভজন করতে পারি পাছে।
বললে তোমার মতো সবাই হলে মানুষ কি আর ধরাতলে
থাকবে কভু, ইহা সত্য নয়
কোনো সংসার কি অফিসে একেক জন যায় একেক বেশে
সবার কি আর একই কর্ম হয়।
সংসারে কেউ মৎস্য ধরে কেহ বা হল কর্ষণ করে
কেহ জনকল্যাণেরই তরে
দুরূহ পথ করে গ্রহণ তারা হবে আমার মতন
তাহারা আর রয় না ছোট্ট ঘরে।
খাঁটি জ্ঞানী আছেন যাঁরা প্রকৃত বুঝেছেন তাঁরা
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর বাড়ি
সেই বাড়ি কেউ ছেড়ে যেতে পারে কি আর কোনোমতে
তবে আমি কেমনে বাড়ি ছাড়ি।
আবার বললে মাটির মূর্তি পূজি ঠিকই মা-টির মূর্তি পূজি
প্রতীক বিনে জ্ঞানভক্তি কে পায়
পরম ব্রহ্মের প্রতীক গড়ি দক্ষিণেশ্বর আছি পড়ি
ঐ মায়ের পা অনুপায়ের উপায়।
তুমি তো বললে আমারে ঈশ্বর নাকি নিরাকারে
তিনি যদি সর্বশক্তিমান
সাকার হতে না পারলে সে বুঝে দেখো হৃদয়দেশে
সর্বশক্তির শক্তি হয় ম্লান।
বিশেষ করে সাকার বিনে নিরাকারকে নিতে চিনে
কোনো দিনে কেহ নাহি পাবে
এর মীমাংসা যা জ্ঞান-দর্শনে মানে তাহা জ্ঞানীগণে
মূর্খেরা সর্বদা উলটা ভাবে।
যেমন নিরাকার গন্ধ লভিতে সাকার ফুল হয় হাতে নিতে

ফুল বিনে কি গন্ধ পাওয়া যায়
হারমোনিয়ম সাকার বটে　　　　নিরাকার সুর তাতে ওঠে
সাকার ছাড়া নিরাকার কোথায়।
তাই তো সাকার মূর্তি গড়ে　　　　নিরাকারকে নিতে ধরে
দক্ষিণেশ্বর আমার সাধন-ভজন
কী বলবো তোমার কাছ　　　　দেখেছো আতসী কাচ
জড় কাচে পারে সূর্যের কিরণ।
তাইতে মাটির মূর্তি গড়ে আমি　　　　লাভ করিতে বিশ্বস্বামী
জ্ঞানভক্তিতে দান করি নৈবেদ্য
মনে করো বিবেচনা　　　　মূর্খেরা এ বুঝিবে না
আগে নিজের চিত্ত করো শুদ্ধ।
আবার বললে আমি কেমন করি　　　　সর্বধর্ম সমন্বয় করি
ধৃ ধাতু মন ধর্ম যারে কয়
মানুষ যাহা ধারণ করে　　　　বাঁচে বাড়ে বিশ্বপরে
তাহা ছাড়া ধর্ম কিছু নয়।
বেদের বাণী জানো নিজে　　　　একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে
কোরানেও তেমনিমতো গৎ
আল্লাহর কোনো শরিক নাই　　　　বাইবেলেও বলে তাই
সর্বশক্তিমান একা গড।
বলো দেখি আমার ধারে　　　　তুমি বিভেদ পেলে কোথাকারে
শাস্ত্রগ্রন্থ পড়া প্রয়োজন
এসব কথা মূর্খ লোকে　　　　বলতে পারে এ ভূলোকে
নরেন তুমি শিক্ষিত সুজন।
যতো মত ততো পথ হয়　　　　গন্তব্য তো আলাদা নয়
সবাই চাহে ঈশ্বরের সান্নিধ্য
এই কথাটি রাখলে মনে　　　　সকল অমিল যায় তখনে
রয় না বিভেদ কোনো ধর্মের মধ্য।
যেমন খুলনা হতে ঢাকা গেলে　　　　বিভিন্ন পথ তথায় মেলে
কেউ বা বাসে কেউ বা লঞ্চে যায়
কেহ বা যায় রেলগাড়িতে　　　　পায়ে হেঁটে কেউ পারে যেতে
সবাই কিন্তু ঢাকাতে পৌঁছায়।
শিক্ষিত লোক তুমি যবে　　　　বেশি কি আর বলতে হবে
ক্ষুদ্র দৃষ্টি মেলে দেখো দূরে
এখন আমি এসব ছাড়ি　　　　জমাইতে কাব্যের পাড়ি
গাহিব গান একটা ধুয়ার সুরে।

ধুয়া

ও মন ভোলারে মানুষ যদি হবি মানুষ ধর।
যা না মনমানুষের সঙ্গ নিয়ে ভুলে গিয়ে আত্মপর ॥

মানুষ আছে বিশ্বভরা সহজে কি যায় রে ধরা
হয়ে আগে জ্যান্তে মরা সাজতে হয় মানষের নফর ॥

মানুষ যদি চাস কিনিতে যাস না ভুলে চাস কি নিতে
ভক্তি মূল্যে কিনিতে হ না অগ্রসর ॥

চাস না ভুলে জ্ঞান দালালে পাবি না খুঁজে পালালে
আঁধারে আলো জ্বালালে খুলবে তোর ঢাকা শহর ॥

মূলাধারে কুণ্ডলিনী সাড়ে তিন প্যাচেতে যিনি
জ্ঞানে লয় তাহারে জিনি জেনে নে খবর ॥

অন্তরে করিয়ো ধার্য চলে ব্রহ্মনাড়িতে যে কার্য
বিনে জ্ঞানের সাহায্য সবই বাহ্য আড়ম্বর ॥

ধরবি রে এমন মানুষ পান করে যে প্রেমের পীযূষ
ডুব দিয়ে ছাড়ে না উস নিস্পন্দ নিথর ॥

বিবেক লৌহের ঠুকনি দিয়ে নিস তারে পরখ করিয়ে
শেষে যার তরে তোর কাঁদবে হিয়ে দেখবি যে প্রথম নজর ॥

পেলে সে মানুষের পরশ এ দেহ তোর হবে সরস
মিলিবে পরমের দরশ দ্বিদলের উপর ॥

পাকাস না কাঁঠাল কিলায়ে নিজকে আগে দে বিলায়ে
সে স্ব-রূপে স্বরূপ মিলায়ে রবি রে শান্তিনগর ॥

পাঁচালি (পয়ার)

বেশি কথা তবে আর বলবো কী কারণ
নরেন তো শিক্ষিত ব্যক্তি মূর্খ নয় কখন ॥
তাইতে অল্পে অল্পে যাহা করেছি বর্ণনা
মনে হয় নরেনের দুঃখ আর রবে না ॥
যে কয়খানা প্রশ্ন এনে দিলো আমার ঠাঁই
মীমাংসা তার করে দিলাম গলদ কিছু নাই ॥
ইহাতেও মনের ধান্দা যদি নাহি যায়
ভালো করে বুঝাইবো সুষ্ঠু মীমাংসায় ॥
তবে নরেন একটা কথা জেনে রেখো মনে
শূন্য কলসি বেশি শব্দ করে এ ভুবনে ॥

যখনেতে কলসিটি পূর্ণ হয়ে যায়
বক বক শব্দ আর নাহি থাকে তায় ॥
ফুলের উপরে ভ্রমর মধুপান তরে
গুণ গুণ রব শুধু অবিরাম করে ॥
গুণ গুণ রব তার থামিবে তখন
নিরিবিলি মধু পান করিবে যখন ॥
কথা লও শান্ত হও মন করো ঠিক
সব ছেড়ে কালী মায়ে করো হে নিরিখ ॥
দেখিবে সকল আশা হবে তব পূর্ণ
বিভেদ কালিমা যতো সব হবে চূর্ণ ॥
এই পর্যন্ত ভাবধারা শেষ করি আর
শ্রোতৃবৃন্দ নেন সনে মোর নমস্কার ॥

জোটের পাল্লা

প্রথম সরকার
ধুয়া
সখীরে গোপীর ভজন বিষম যাজন হবে না তা
যারা করলো সাধন চাই নে সে ধন থাকগে ওসব পুরাণ কথা ॥

যে জনা মন চুরি করেছে সহচরী সে বিনে কে ঘুচাবে মনের ব্যথা
আমি বনে বনে কেঁদে ফিরি মনের মানুষ পাই নে কোথা ॥
(তারকচন্দ্র সরকার প্রণীত গানের অংশবিশেষ)

আমি কল্পনাতে নরেন দত্ত কিছু শুনিতে চাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব
ও যাতে একেবারে ঘুচবে আমার মনের ব্যথা।
আমি দেশবিদেশে ঘুরে মরি মনের মানুষ পাইনে কোথা।
তুমি বিপক্ষে রামকৃষ্ণ সুজন আমার মনের ব্যথা করো নিরসন
তুমি তাড়াতাড়ি এসো গোঁসাই আছো কোথা।
তোমায় পেয়ে মোর জুড়াবে হিয়ে ঘুচে যাবে সকল ব্যথা।

দ্বিতীয় সরকার
আমি রামকৃষ্ণ আজ কল্পনাতে নরেন দাঁড়াইলাম তোমার সাক্ষাতে
তুমি খুলে বলো কী বেদনা তোমার চিতে
আগে পারিলে মন ঠিক করিতে থাকবে না আর মলিনতা।

প্রথম সরকার
গোঁসাই কী জানাবো তোমার প্রতি আছে মন ঠিক করার কী পদ্ধতি

আমার সম্মুখে তুলে ধরো আজ তাহার নথি
আমি বুঝি না তোমার ভাবগতি জানাও যে সাধন-বারতা।

দ্বিতীয় সরকার
জানি মন ঠিক করার আছে নিয়ম আগে করে লও ইন্দ্রিয় সংযম
শেষে বুঝতে পাবে কোনটা খাঁটি ধরম করম
হবে ভাব আশ্চর্য ধর আচার্য তার সঙ্গে নিয়ে দীনতা।

প্রথম সরকার
শুনেছি পরশমণির পরশ ফলে নাকি লোহাতেও সোনা ফলে
তাহলে সাধন-ভজন লাগে না তার কোনো কালে
সাধুরা পরশের ন্যায় ধরাতলে ঘুচাতে পারে মলিনতা।

দ্বিতীয় সরকার
যদি লোহাতে মরিচা থাকে পরশ কিছু করতে নারে তাকে
যতো ছোঁয়ায় তবু লোহা পড়ে ফাঁকে
ভবে জীবগণে তাই কর্মপাকে কোনটা খাঁটি বোঝে না তা।

প্রথম সরকার
তোমার এ যুক্তিতে মোর আস্থা নেই ঠাকুর তোমায় যদি ব-কলমা দেই
তাহলে কি পারো না তুমি সহজেই
তোমায় দেখে আমি আমাতে নেই, তোমার চরণে নোয়ালেম মাথা।

দ্বিতীয় সরকার
যখন নরেন আজি আমার হলো তবে এর চেয়ে কী আনন্দ বলো
পেয়ে নরেনকে মোর শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেলো
নরেন সব ছেড়ে মা-র মন্দিরে চলো জ্ঞানভক্তি দেবে কালীমাতা।

প্রথম সরকার
যাক তবে বেশি বলে কীবা প্রয়োজন
গুরুকৃপা ভাগ্যবলে হয়েছে যখন।
গুরু বৈমুখ হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে
কৃষ্ণ বিমুখ হলে গুরু রাখিবারে পারে।
তাই মম গুরু যবে হয়েছে সদয়
যে পথে চালাবে চলবো এই অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় সরকার
তোর মতো ছেলে আর নাহি মোর ভবে
তোর দ্বারা জগতের শ্রেষ্ঠ কার্য হবে।
মোর কার্য যাহা কিছু থাকিবেক বাকি

এ কারণে তোরে যাই এ ভবেতে রাখি।
বিবেকের আনন্দ যবে হইবে স্ফুরণ
বিবেকানন্দ নাম করিবি গ্রহণ।
তোর শিরে আমি আজ দিনু আশীর্বাদ
দীর্ঘজীবী হও তব পুরুক মনঃসাধ।
এই পর্যন্ত আমাদের গান সাঙ্গ হলো
প্রেমানন্দে ভক্তগণে হরি হরি বলো ॥

পরিশিষ্ট ২

ডাক

১. বলাই নাথ

করুণাময়ী মা, আজ জানা যাবে তোর কেমন করুণা।
দণ্ড হাতে শিয়রেতে বসিয়াছে রবির নন্দন গো মা, রবির নন্দন
আমি ভয় পেয়ে মা বলে ডাকি ঘনে ঘন ॥

মাতাপিতা বর্তমানে, যদি সন্তানে কষ্ট পায়, সে সন্তানে কষ্ট পায়
রাগে কি সন্তান ত্যাগে গো দয়াল বাপমায় ॥
আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি দুঃখহর দুঃখহরা, গো দুঃখহরা
তোরে খেয়াঘাটে বসে ডাকে বলাই কপাল পোড়া ॥

২. রামু মালী

হরি বলে ডাকরে আমার মন, এলো নিকটে শমন, তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ?
তোমার গণা দিন যে দিনে দিনে গত হলো, তা কি টের পেয়েছ।
যাবে যদি তব পারে, বল কৃষ্ণ হরে হরে, কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ।
পড়ে ভবের ফান্দে, রামু কান্দে ভক্তিধনে মন বঞ্চিত হয়েছ ॥

এ দেহ থাকতে চেতন, হরি বল মন, জীবনের ভরসা আরকি?
যখন আশবে শমন, দিবে দরশন, তখন ঘোর হবে দুই আঁখি ॥
যার জন্য খাট বেগারি, তারা সবে রবে পড়ি, উড়ে পালাবে প্রাণপাখি।
তোমার ভবের কামাই ভবে রবে, মন তোরে দিবেই বা কি, নিবেই বা কি?

৩. হরিচরণ আচার্য

হর-অঙ্গনা তোর রঙ্গভঙ্গে কাঁপে অঙ্গ রণবঙ্গিণী মা রণভঙ্গ ভঙ্গ দে সকালে।
মা তোর রণচণ্ডীরূপে গিয়ে ইউরোপে কেন হেন প্রলয় করলি অকালে ॥
ক্লেশেতে পড়েছি দেশে নাই কাপড় চিন্তায় সকলে ফাঁপড়
কি জানি কি ঘটে কয়দিন পর পরপ্রত্যাশীদের কপালে।
জানি তুই লেংটা তোর পতি লেংটা তাই লেংটা রাখবি সন্তান সকলে ॥

গিয়েছে স্বর্ণমুদ্রা রজতমুদ্রা দেখালো ঘণ্টামুদ্রা মুদ্রাশূন্য নোটে

যারা মাছ-পানের ব্যবসা করে তারা তো পড়েছে সংকটে।
যারা মা গরিব লোক ঘরে নাই বাক্স-সিন্দুক
জল পড়ছে—বিষম দুঃখ কাগজ ভিজে উঠে
মা তোর গণেশের ইঁদুরকে বলিস যেন দেখে শুনে কাটে ॥

৪. হরিবর সরকার
ও মনভ্রমরা হরির চরণপদ্মে পড়।
রাধার প্রেমানন্দ ভরে যুগল পদে পড়ে নামের মধু পান কর ॥
ছিলো বিরজারই কূলে বিরাজিত ছলে যমুনারই জলে এলেন তার উপর।
রাধার প্রেমানন্দে ভেসে নবদ্বীপ এসে যুগল পদে মিশে হলো কি সুন্দর।
পেয়ে পদ্মফুলের গন্ধ তারক মহানন্দ প্রেমমকরন্দ পিয়ে অনিবার।
লয়ে মৃত্যুঞ্জয় লোচন গোলোক হীরামন শ্রীধাম ওড়াকান্দি হলে পুনঃ অবতার।
পেয়ে সুগন্ধিত মধু পিয়ে ভক্তসাধু মাতি নিলো যবন হিন্দু হরিপ্রেমসিন্ধু
হরিবর এক বিন্দু নাহি পেলো তার ॥

কলির জীব ধন্যরে শ্রীহরি অবতার।
দয়াল নিত্যানন্দ মহানন্দ তারকচাঁদ সদানন্দ শিবশঙ্কর।
প্রভুর কড়ার ছিলো মায়ের সনে জন্মিবে ঐশান্য কোণে করিবে বাঞ্ছা পূর্ণ অন্নপূর্ণা মার।
এ গোলোক হতে সেই সীতানাথ শুনে সেই গোলোকচাঁদের হুহুঙ্কার।
আর নন্দ হলো যশোমন্ত বিশ্বামিত্র রমাকান্ত সন্দীপন ভারতী তিন শক্তি একত্তর।
স্বামী মহানন্দের দয়া বিনে নগণ্য প্রেমশূন্য দীন হরিবর ॥

৫. মনোহর সরকার
ত্বং কালী কালবারিণী কলুষনাশিনী তারা।
দুর্গমে দুর্গতি হর, ও মা দুর্গে দুঃখহরা।
হিমালয়নিবাসিনী শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী ঘিকট অট্টহাসিনী শব শিবা শবারূঢ়া।
দশদিক দমিত করা দিগ্বসনা দিগম্বরা বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা বরাভয়দায়িনী হরা ॥

জাগো মাগো কুণ্ডলিনী খোলো খোলো দ্বার।
জীবের চরমে পরম গতি সেই সহস্রার।
জীব থেকে চতুর্দলে লংবীজে তোর জাগালে খুলে যায় গ্রন্থি সুষুম্নার
তখন অবহেলে চলে যাবে ত্রিবেণীর ওপার ॥

৬. রাজেন্দ্রনাথ সরকার
তারা মাগো আমায় তুলে নাও তোমার প্রেমের বাজারে
আমি যতো নারী চক্ষে হেরি যেন তার মাঝে পাই তোমারে ॥
তুমি আদ্যা প্রকৃতি বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি ডাকিনী যোগিনী আদি রমণী জাতি

দিয়ে সবার প্রীতি আমার প্রতি নিষ্কাম প্রেম দিয়ে যাও প্রাণ ভরে।
তুমি মহামায়া রূপ তুমি সে কন্দর্প কূপ সে কূপে ডুব দিয়ে এমন বিষয়ে লোলুপ
এবার দেখাও তোমার প্রেমের স্বরূপ যেন সেই রূপে মোর মন ফিরে ॥

স্বর্গরাজ্যে শুদ্ধাসনে স্বর্ণপদ্মোপরি, সহস্রারে তুমি মাতা রাজরাজেশ্বরী
তোমার তারণ কারণ যুগল চরণ ভবপারের তরী।
আঁধার স্বাধিষ্ঠানে মন করিছে পরিভ্রমণ দুর্ভেদ্য পদ্ম মণিপুরী
সেথা মায়াশক্তিরূপে শক্তি মদনমঞ্জরী
প্রেমামৃত বর্ষিয়া জীবাত্মা আকর্ষিয়া শঙ্কা দূর করো গো শঙ্করী
আমি তোমার পদপ্রান্তে জপি শ্রীগুরু শ্রীহরি ॥

৭. কুঞ্জলাল দত্ত
তুমি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী পুরাণে প্রচার।
তারিণী তুমি দুঃখহারিণী কালনিবারিণী জননী তোর একি অবিচার ॥
মা তুই কারো জন্যে সুধা রেখে কারো জন্যে রাখলি হলাহল
কারো শুকনা বৃক্ষে ফল মা মাগো কারো শুকায় পূর্ণ কুম্ভের জল।
কারো জন্যে বালাখানা কেহ পায় না ধুলার বিছানা
কারো জন্যে মিছরির পানা কারো ভাগ্যে জ্বলন্ত অনল ॥

কারো ঘোষে কুকলঙ্ক কারো গুণের কীর্তি
কেহ করে বেশ্যাবৃত্তি কেহ পায় সমাজের পূজা।
মা হয়ে মা কারো পক্ষে তাকাস মা কৃপাকটাক্ষে কারো বক্ষে দুঃখ দাও দক্ষজা।
কেহ থাকে শ্মশানখোলা কারো বাসা বৃক্ষতলা কারো বাড়ি চকমেলা দালান
কেহ অনশনে প্রাণে মরে কারো ঘরে গোলাভরা ধান।
কেহ করে জমিদারি কেহ কড়ার ভিখারি
কেহ দৌড়ায় জুড়ির গাড়ি কেহ টানে পালকির বোঝা।
রঙ্গিণী তোর রণক্ষেত্রে রঙ্গ যায় না বুঝা ॥

৮. মধুসূদন সরকার
আমায় শান্তি দে মা শান্তিময়ী ঠাকুরানী।
ওমা উৎকলবাসিনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী লোচননন্দিনী ॥
তুমি মাগো নারায়ণী সর্বশক্তি করাঙ্গিণী করুণারূপিণী মাগো ও হে জননী
তুমি জগৎ-জীবন ভক্তপ্রাণধন তুমি আমায় রক্ষা করো গো জননী।
জগবন্ধুর মানবলীলা হরিচাঁদের প্রেমের খেলা ভক্তে দাও করঙ্গের মালা হরিচাঁদ গৃহিণী
যতো হরিবোলা মতুয়া মাতালো জগৎ, মধু ত্রিতাপে তাপিত জননী ॥

কোন গুণে বর্ণিব মা তোর মহিমা অপার

আমি তো পাষণ্ড ভণ্ড অতি দুরাচার মা তোর ওড়াকান্দি পূর্ণ লীলা পুনঃ-অবতার।
মাগো গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দিলে জীব যায় বৈকুণ্ঠে চলে
পূর্ণ হলে মর্ত্যে এসে জন্মিবে আবার
মা তোর কামনা-সাগরে ডুবলে বাঞ্ছা পূর্ণ তার।
মাগো জীব তরাতে এসেছিলে অধমে রলেম ভুলে
দুঃখ বুঝি এই কপালে গেলো না আমার
মাগো দয়া করো দয়াময়ী মধুসূদনের উপর ॥

৯. নকুলেশ্বর সরকার
নমামি মা কুণ্ডলিনী নমি মুণ্ডমালিকে।
নমামি যোগেন্দ্রজায়া নগেন্দ্রবালিকে ॥
চতুর্দল মূলাধারে আছো মাগো সর্পাকারে
সাকারে কি নিরাকারে তোরে পূজিব জগৎপালিকে।
যোগীজনে যোগাসনে পায় না তোরে ধ্যানে জ্ঞানে
ভকতিবিহীন জনে রেখো চরণে গো মা কালিকে ॥

পূজিব না তোরে মাগো শুধু বনফুলে
চরণে অঞ্জলি দেবো মনোফুল তুলে।
এ দেহ নৈবেদ্য করে পদে করবো দান
কাম ক্রোধ ষড়রিপু দিব বলিদান
প্রেমভক্তি বিল্বদলে পূজিব চরণযুগলে
প্রাণ দিব মা পূর্ণাহুতি এ দীন নকুলে ॥

১০. শেখ গুমানী দেওয়ান
পুণ্যফলে আমি এলেম দশের চরণতলে।
ভরা ডিঙি উঠে ভাসে দশজনারই কৃপাবলে ॥
এতো যায় সহজে বুঝা, দশের লাঠি একের বোঝা।
সেই পথটি আরো সোজা, দশজন যে পথে চলে ॥
যখন পাপ দিলো দশজনা, গরুড় পাখির খসলে ডানা।
গরুড় পাখির হামাটানা, পড়লো কালীদহের কূলে ॥
এ কথা শুনিতে অদ্ভুত, দশচক্রে ভগবান ভূত।
দশের যদি হয় মনঃপূত, বিয়ে হয় ব্যঙ্গ-পিতলে ॥

১১. বিজয়কৃষ্ণ সরকার
কী দিয়ে পূজিব দেবতা তোমারে দেয়ার নাহি কিছু মোর।
করো পূজার উপযুক্ত সেবাতে নিযুক্ত মুক্ত করি বাঁধন-ডোর ॥

নানা পথ ঘুরে দিবসের শেষে ব্যথার ডালি নিয়ে দাঁড়ায়েছি এসে
আছি দ্বারদেশে দেউলিয়া বেশে খুলে দাও দেউল দোর।
পূজার কুসুম করি নাই আহরণ, কী দিয়ে পূজিব ও রাতুল চরণ
আছে এ দীন পূজারির পূজার উপকরণ ব্যাকুল আঁখির লোর ॥

জুড়াইব আমার এ পোড়া হিয়া প্রিয়তম তব নাম গাহিয়া
বহুদিন তোমারে হারা ঘুরে ঘুরে হলেম সারা এসেছি জীবনধারা বাহিয়া।
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি পদপ্রান্তে লহ টানি আশার বাণী পরানে দাও আসিয়া
মঙ্গল অভয়দানে শান্তি দাও অশান্ত প্রাণে আছি তব মুখপানে চাহিয়া।
পাগল বিজয় বলে চরিত্র মোর অপবিত্র হইল ঘোর তবু আশায় রয়েছি বুক বাঁধিয়া
পূতচরিত্র হবো পুণ্য পবিত্র তব করুণা-ঝরনায় অবগাহিয়া ॥

১২. স্বরূপেন্দু সরকার
ও মা উমাপতি জায়া শ্যামা মহামায়া লহো মা প্রণাম মোর।
তব এ দীন পূজারি দিতে কিছু নারি বিনে দুটি আঁখি লোর ॥
অতি হতভাগা সন্তান তোমার ব্যথা বুকে দ্বারে করে হাহাকার
তব কৃপা বিনে শকতি কি আর নাশে তারই তম ঘোর।
প্রতি পদে পদে সম্পদে বিপদে কতো অপরাধ করি তব পদে
সবংসহা সবই সহ নির্বিবাদে বুঝে নাকো এ পামর ॥

আমি আর কতো কাঁদিব মা বলো না, সহিতে না পারি এতো ছলনা
কাঁদাবে যদি আমারে শক্তি দিয়ো সহিবারে বারে বারে ঘোর আঁধারে ফেলো না।
এতোটা বেদনা দিলে তবে কেন পুত্র বলে পরিচয় দেহ ভব-ললনা
সন্তান যদি না থাকে মা কবে মা কে তোমাকে আজিকে আমাকে তাহা বলো না?
স্বরূপ কহে ও মা কালী কাঁদালি তো চিরকালই তবু তো মনের কালি গেলো না
সুখ যদি কাঁদায়ে তব কাঁদাও আমি কাঁদিব, তবু এ কামনা মোরে ভুলো না ॥

১৩. সুরেন্দ্রনাথ সরকার
তোমারে ডাকিতে হরিচাঁদ কী আছে আমার শকতি।
নাই তত্ত্ব জ্ঞানাদি ভজন সমৃদ্ধি অন্তরে নাই কো ভকতি ॥
আমার নাহি শুদ্ধ সাধন আদি মনোবল নাহি চিদানন্দ নাহি নয়নজল
কী দিয়ে ধোয়াবো চরণকমল কিসে হবে ভজনা-আরতি।
হরিবলে যেজন বাজায় নামের ডঙ্কা নিত্য যুক্ত নামে মুক্ত শমন শঙ্কা
আমার নাই প্রেমধর্ম শুধু ফলাকাঙ্ক্ষা ভকতি নাহি আছে যুকতি ॥

আমার যজ্ঞ পূজা ধ্যান নাহি বাহ্য অনুষ্ঠান, একমাত্র নাম-গান হরিসংকীর্তন
জলভরা আঁখিতে যেবা ডাকিতে পারে, দাসানুদাস হও প্রভু তাহারই দ্বারে
নইলে কি বাদাবনে গদাই বাওয়ালি সনে হরি পালে প্রাণ দানে দিলে দরশন।

হরিচাঁদ রূপে এসে মুছালে নয়ন
এ দীন সুরেন বলে এলে যদি ও হে বিধাতার বিধি
কৃপা ডোরে রেখো বাঁধি ছেড়ো না কখন ॥

১৪. রবীন্দ্রনাথ সরকার
আমি কী দিয়ে পূজিব শ্যামলকিশোর অনিন্দ্যসুন্দর শ্যাম।
শ্রীরাধিকা সনে হৃদি বৃন্দাবনে পুরাও এসে মনস্কাম ॥
কী আছে আমার করিব খুশি, প্রেমশূন্য দেহ কী দিয়ে তুষি
হয়েছি আমি শত দোষে দুষি, কুকর্মে লিপ্ত অবিরাম।
কোনো দিন শিখি নাই তোমারে ডাকিতে, ভক্তি প্রেমবারি নাই দুই আঁখিতে
দেখা দাও প্রভু এ জীবন থাকিতে ঘুচাও মোহমায়া ব্যারাম ॥

তুমি বিনে কে করিবে পরিত্রাণ, পতিত-পাবন আসিয়া করো কল্যাণ
অদোষদর্শী হও ক্ষমা করে তুমি লও শ্রদ্ধাবিহীন নিতান্ত আমি অজ্ঞান।
ভক্তবৃন্দ নিয়ে সাথে দুর্দিনে দীনের সভাতে বিজ্ঞানসহ প্রদান করো দিব্যজ্ঞান
উঠাও আনন্দলহরী প্রেমানন্দে বলি হরি, তুমিই তো নর ও নারীর প্রাণের প্রাণ।
কৃপালোকে আঁধার নাশো হেতুশূন্য ভালোবাসো, নাশো নাশো বিনাশো বিষয়ের ধ্যান
অহঙ্কারের কাঁধে চড়ি রবি কান্দে ফান্দে পড়ি দয়া করি দয়াল হরি করো ত্রাণ ॥

১৫. বিনয়কৃষ্ণ সরকার
তুমি জগৎ-জননী মুক্তিদাত্রী শ্যামা রেখো মা চরণতলে।
অপরাধ যদি করি ঐ চরণে ক্ষমিয়ো অভাগা বলে ॥
পেয়ে মা তোমার স্নেহ ভালোবাসা পূর্ণ বক্ষে তবু মিটে না পিয়াসা
অকৃতি সন্তানের চরণ ভরসা যাবে পাষাণ হৃদয় গলে।
কুসঙ্গে মাতিয়া দিবস-রজনী জীবনে ও পদ স্মরণ করিনি
মাতৃমহামন্ত্র পারের তরণী দিয়ো মা অন্তিমকালে ॥

ভক্তিতে হয় মুক্তি মাগো ভক্তি নাই আমার
মা তোমায় হইলে হারা সম্মুখে হইয়ে খাড়া
ধুলামাটি দিয়ে ঝাড়া কোল দিয়ো তোমার।
ভক্তি বিনা শক্তি ও মা, জীবে তোমার পায় না উমা
সংকটে শঙ্করী ক্ষমা করিয়ো এবার।
বিনয়ের মিনতি রেখো তুমি মোর মস্তকে থেকো
শেষ দিনে এ দীনে রেখো চরণে তোমার ॥

১৬. নারায়ণ সরকার
আমার এ শূন্য জীবনে সংসার গহনে এমনে কেমনে রবো কবে যে তোমায় পাবো।

কবে এসবে ফেলিয়া প্রেমেতে গলিয়া কান্দিয়া এ বুক ভাসাবো ॥
জনমে জনমে কতো দেশে দেশে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশির বেশে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার আসার আশে প্রবাসীর বেশেতে কাটাবো।
কতো পথ বেয়ে কতো গীতি গেয়ে দেখেছি কতো না মুখ
কারো পানে চেয়ে ভরিল না মোর বিরহেতে পোড়া বুক।
কতো দিনে শুনি তোমার বাঁশরি, জাতি কুল মান সকলি পাসরি
এ মুখে সদা বলে হরি হরি তোমাতে আমারে হারাবো ॥

দাঁড়ায়ে ভবের এ কূলে একা কান্দি ফুলে ফুলে কবে এসে তুলে তুমি লবে আমারে।
ফুরালো জীবনের মেলা শেষ হয়ে এলো বেলা অকূলে জীবনভেলা ভাসিল এবারে।
ও কূলে তুলিতে মোরে তুমি ছাড়া কেহ নাই, এ বিপদে তব পদে শরণ নিয়েছি তাই।
সব অপরাধ ক্ষমা করে তুমি না ধরিলে মোরে ডুবিয়ে অকূল সাগরে যাবো এবারে।
এ জীবনে যতো পাপ-করম হলো জমা, দীন বলে দীনবন্ধু না করিলে ক্ষমা
তবে তোমার এ নারায়ণ লইবে কার শরণ
মরণ-বারণ দুটি চরণ কে দেবে আর তাহারে ॥

১৭. নিখিলচন্দ্র সরকার

ও মা কালী কাত্যায়নী দুর্গতিনাশিনী অভয়া ভবানী বগলে রেখো মা চরণতলে।
এসে ভবের হাটে পড়েছি সংকটে ধুলা ঝেড়ে লহো কোলে ॥
যদি না আসিবে বিপদে বরদে কেন আনিলে সংসার গারদে
সম্পদে ভুলিয়া আছি মা শারদে ফেলো না অকিঞ্চন বলে।
জগৎপালিকে নগেন্দ্রবালিকে মোহ-মৃত্যু-দুঃখ-হরা
চণ্ডিলে চপলা চামুণ্ডা চঞ্চলা ছিন্নমস্তা শিবে তারা।
যোগারাধ্যা ও মা মহেশ্বরী উমা ভক্তিমুক্তিদাত্রী ক্ষেমঙ্করী শ্যামা
কুপুত্র বলিয়া করিয়ো ক্ষমা বিপথগামী হলে ॥

জেনেছি কুপুত্র হলে মাতা কভু দেয় না ফেলে ধুলা ঝেড়ে করে কোলে রাখে তার পায়
যদিও কুকর্ম করি মুখে বলে মা শঙ্করী সার করিয়া চরণতরী যাবো কিনারায়।
যাহা কিছু ধর্মাধর্ম দিলাম তোমার ঐ পদে ভুলায়ে রেখো না আমায় মোহমায়া সম্পদে
পুত্রকন্যা পরিবার সাজায়ে অসার সংসার সকলই মহিমা তোমার রেখেছো মায়ায়।
বেলা গেলো সন্ধ্যা হলো সম্মুখে অন্ধকার
প্রেমালোকে জ্বেলে মাগো করে দাও পথ পরিষ্কার
নিখিলের শেষ মিনতি পদে যেন থাকে মতি দীনহীন আমি অতি ফেলো না আমায় ॥

পরিশিষ্ট ৩

মালশি

(পরিশিষ্টে সংকলিত মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি গানের তুকসমূহের নাম বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রদান করা হলো। কালভেদে ও অঞ্চলভেদে তুকনামের নানা রকম হেরফের চোখে পড়ে। উনিশ শতকে কলকাতা পর্বের তুকনামের সঙ্গে এর নানা ধরনের অমিল চোখে পড়বে। যেমন প্রথম চিতান এবং প্রথম ফুকার সেখানে মহড়া নামে চিহ্নিত হতো। একইভাবে মিশ সেখানে খাদ, মুখ (ধুয়া) সেখানে ফুকা, প্যাঁচ সেখানে মেলতা, খোঁচ ও দ্বিতীয় ফুকার সেখানে চিতেন, ২য় মিশ সেখানে পাড়ন, অন্তরা সেখানে ফুকা ও মেলতা, ২য় চিতান সেখানে চিতেন ও পাড়ন, ২য় ফুকার সেখানে ফুকা ও মেলতা, শেষ মিশ সেখানে অন্তরা এবং শেষ মুখ সেখানে মেলতা নামে পরিচিত ছিলো। পূর্ববঙ্গের সব অঞ্চলেও যে এইসব তুকনাম এক রকমের ছিলো, তা মনে করারও কোনো কারণ নেই। এমনকি যে দক্ষিণবঙ্গের গান এই সংকলনে অধিক স্থান পেয়েছে, সেখানেও ১ম চিতান অনেকের নিকট ধরন-পাড়ন নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

১. তারকচন্দ্র সরকার

চিতান — সাধন করবো সুখী হবো মা সুখের দিন না পাই।
ভাবি একদিন সুখের সুদিন সম্মুখে সে দিনও মা দুর্ভিক্ষে কাটাই ॥

ফুকার — মাগো বারো শো বাহাত্তর সালে বৎসরের ভিতর প্রলয়ঙ্কর ঝড় হলো
মা মাগো
দৌলতখাঁ একবার ভাঙালে খণ্ড প্রলয় ষোলো সালে অন্নের কষ্ট হলো ॥

মিশ — মাগো কতোবার মন্বন্তর দেহঘরের দৌলত নাই মা ধনদৌলতদায়িনী।
আমার গুরুর ধনদৌলতের হানি করলো দুরন্ত শনি ॥

মুখ — বারে বারে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর আসে ঝড়বাতাসে বসত করলো খালি ॥

প্যাঁচ — মাগো কৈশোরে ঘর বাঁধিলেম ঝড়ে যৌবনে ঝড়ের ধুম বেড়ে
মটকার খসলো জোড়া, ঘরের আটকুঠুরির বাঁধন পড়ে খসলে বেড়া

একশত বিংশতি খুঁটি ক্রমে চললো ছুটি ছুটি
কবে ভৌতিকের ঘর হবে মাটি রক্ষা করো মা রক্ষেকালী ॥

মুখ বারে বারে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর আসে ঝড়বাতাসে বসত করলো খালি ॥

খোচ কাল বেটা ঘরের মালা নিতে মা হাতে দিচ্ছে তালি ॥

ফুকার বাঁধলো কোন কারিগর সাততলা ঘর আঠারো মোকাম
তারে চিনলি না সে বাম, মা মাগো
উঠেছে পাপের ধূমকেতু তাই দেখে আত্মারাম ভিতু
এ বিপদে রক্ষাহেতু মাগো তোমার শ্রীদুর্গা নাম ॥

মিশ ভাবি দুর্গা নামে অমঙ্গল যায় পলাইয়ে
এবার ছয় বেটা ঝড়ে যোগ দিয়ে ভুলাইল দুর্গা বুলি ॥

মুখ বারে বারে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর আসে ঝড়বাতাসে বসত করলো খালি ॥

অন্তরা ঘর রাখে বর্তমানে যে জানে বিবর্তের খেলা
ও তার ঘর পড়ার আর ভয় রবে না ঘরামি হয় মাতাল ভোলা।
আর নয় দরজা বন্ধ করে যে জন দেয় অজপা পেলা
কুলহংসিনী সর্পিণী হয়ে ভেদ করে দেয় সপ্ততলা ॥

চিতান ধর্মবাতি নিভে গেলো মা ঝড়ের আরম্ভে
এবার কুমতি কুসঙ্গ ঘরে অন্ধকার ঘর কিসে রাখা সম্ভবে ॥

ফুকার ছাউনি নাই সাধনে জ্ঞান নয়নে দৃষ্টি চলে না, বিপদ বৃষ্টি মানায় না মাগো
ছান্দন থাকলে কামগায়ত্রীর ঘরের ধন না হতো বাহির
থাকতো যদি ভক্তির প্রাচীর ঝড় প্রবেশ করতো না ॥

মিশ ঘর পেয়ে ঘুমায়ে রলি কুলদায়িনী শ্যামা
মা তোর তারক কান্দে জাগো গো মা, জাগো কুলকুণ্ডলিনী কালী ॥

মুখ বারে বারে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর আসে ঝড়বাতাসে বসত করলো খালি ॥

২. হরিচরণ আচার্য

চিতান তুমি জগদ্ধাত্রী জগন্মাত্রী জগতের জীব করো পালন।
এবার পূর্ববঙ্গের পূর্ব অঙ্গে মাগো মা হলো বিষম জলপ্লাবন ॥

ফুকার এবার গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ কালে অবিরত বৃষ্টি গেলো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি
লোকের ধর্মের সঙ্গে নাই সংসর্গ, সুখ নাইকো বিন্দু-বিসর্গ
উপদ্রপের উপসর্গ বিষম কোপগ্রহের দৃষ্টি ॥

মিশ গত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষের পরে এক বৎসর হয় শস্তা
সেও বস্ত্রাভাবে দুরবস্থা বড়ো দুঃখের কথা ॥

মুখ জগদম্বে মা কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা ॥

প্যাচ কতো দেশ যায় ভূকম্পনে মাগো কতো দেশ যায় জলপ্লাবনে
তুই কেমনে দেখিস অবিরত
যেমন মৎস্যের মায়ের পুত্রশোক নাই তুই কিগো সেই মাতা।
দুঃখ পেয়ে ঝরে আঁখি মা মা বলে কতো ডাকি
মা তুই বহু পুত্রের মা বলে কি নাই পুত্রের মমতা ॥

মুখ জগদম্বে মা কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা ॥

খোচ জীবগণের মা জীয়ন মরণ হলো সমান কথা ॥

ফুকার এবার ধান্য আদি শস্যের আশা গেছে জলের তলে
মানুষ ঠেকছে জঞ্জালে, আর তো রক্ষা নাই মা রক্ষাকালী
বক্ষে নেবো ভিক্ষার ঝুলি সুখের আশায় জলাঞ্জলি পেলো এক বছরের জলে ॥

মিশ মা তোর মা পাষাণী বাবা পাষাণ তুই পাষাণীর মেয়ে
তুই কি সেই পাষাণীর স্বভাব পেয়ে ভুলেছিস মমতা ॥

মুখ জগদম্বে মা কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা ॥

অন্তরা আবার কোন কীচকে কচুরির নাম রেখেছো জার্মানি পানা
মাগো কেহ কয় কচুরি কেহ কয় কচুটি আসল নামটি কেউ জানে না
মাগো বিপদের হদ্দ নদীনালা বদ্ধ অসাধ্যসাধনে নৌকা চলে না
আপদ জন্মিল কোন বংশে কোন দেশের কোন অংশে
রক্তবীজের বংশ ধ্বংস হয় না ॥

চিতান সদা ঘোর অনিষ্ট বিষম কষ্ট আমাদের অদৃষ্টের এই ফল
ভবে বেঁচে থাকা বিষম ঠেকা মাগো মা এখন মরণই মঙ্গল ॥

ফুকার আবার কলকাতায় এক জ্বর এসেছে সমরজ্বর তার আখ্যা
কারো ঔষধ নাই শিক্ষা
তাইতে দিবারাত্রি অবিরত মানুষ মরে শত শত
ভারতরক্ষা আইনের মতো জ্বরে ধরলে নাই রক্ষা ॥

মিশ কেন দেশে দেশে এক সমানে এতো মানুষ মরে
একটু দেখো দেখি মা তলব করে চিত্রগুপ্তের খাতা ॥

মুখ জগদম্বে মা কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা ॥

৩. মনোহর সরকার

চিতান তারা, জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে মা তোর কোলে পেলেম কতো সুখ।
কতো সুমিষ্ট রস খেয়েছি, শান্তির কুটির পেয়েছি

তারা তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ ॥

ফুকার আমার বাল্য আর যৌবন আরম্ভে ছিলাম মা তোর কোলে
শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে, কোল ছাড়া করিলে, মা মাগো
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে, বসবো মা তোর কোলের পরে
আধো আধো মধুর স্বরে, আর কি ডাকবো 'মা' বোল বলে ॥

মিশ আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখে কৃপানেত্রে
শেষে ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ভুলে গেলি পূর্বস্নেহ ॥

মুখ এত ভালোবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণজরা করলি আমার দেহ।

প্যাঁচ আমার ভোলা পিতার মন ভুলায়ে নিলি ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে
করলি আমায় সৃষ্টি।
ও তোর স্তনের দুগ্ধ দান করলি মা করে শুভ দৃষ্টি।
যখনেতে প্রসবিলে, আকাশের চাঁদ হাতে পেলে
এখন সে মমতা দূরে ফেলে কেন দিলি ত্রিতাপ-দাহ ॥

মুখ এত ভালোবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণজরা করলি আমার দেহ।

খোচ মা বিনে সন্তানের মায়া আর কি বুঝে কেহ ॥

ফুকার আমায় যখন যেভাবে রাখিস্ তাইতে থাকি রাজি
আমার নাইকো ভবে অন্য সম্বল চরণ মাত্র পুঁজি, মা মাগো
ও তোর মহামায়ায় পড়ে ধরা, বাহ্যচিন্তায় হলেম সারা
এখন দেখি ওমা তারা এসব তোরই ভোজের বাজি ॥

মিশ আমায় নানা রূপ ঐশ্বর্য দিয়ে রেখেছিস বন্ধনে।
শেষে বঞ্চিত করলি পিতৃধনে সেই চিন্তা মোর অহরহ ॥

মুখ এত ভালোবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণজরা করলি আমার দেহ।

অন্তরা পুত্রের প্রতি বাদানুবাদ এই বিসম্বাদ তারা তোর অন্তরে।
যদি এতো ছিলো মনে, প্রসবের দিনে মারলি না কেন সুতিকাগারে
ভেক ভুজঙ্গের মাতা যেমন প্রসবিয়ে করে গ্রহণ
সেই স্বভাব করেছিস ধারণ, তারা বহুদিন পরে।
থাকতে মাতা বর্তমানে পুত্র মলে প্রাণে
মা বলে কে মা ডাকবে তোরে ॥

চিতান আমার শৈশবের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত
এখন কী খেলা মা খেলেছিস, পূর্ব মায়া ভুলেছিস
ভবকূপে ডুবিয়ে দিছিস, হয়েছিস মা বিমাতার মতো ॥

ফুকার ও তুই পাষাণীর কন্যা ঈশানী পাষাণীর জঠরে
ও তোর পাষাণ প্রাণে পুত্রের মায়া টিকবে কেমন করে, মা মাগো
করে পঞ্চভূতে ভূতের কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড
বাপকে দিলি ছাগের মুণ্ড, তুই আর খাতির করবি কারে ॥

মিশ এসব দেখে শুনে মনোহরের যায় না মনের বিকার
যেন তারকব্রহ্ম নামে আমার রুচি থাকে অহরহ ॥

মুখ এত ভালোবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা জীর্ণজরা করলি আমার দেহ।

৪. রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান আমি অহোরাত্র ভাবি মা তোর সৃষ্টির বৈচিত্র্য।
মাগো যেখানে যা না সাজে তাই সাজালি কোন কাজে
বিশ্বমাঝে তোর কী কুচরিত্র ॥

ফুকার মা তুই কৃপণেরে দিয়ে ধন করলি ধনের মহাজন
তাতে মা তোর স্বার্থ কী, এইরূপ কতোশতো দেখি, মা মাগো
যারা পরহিতে সদাই রত তাদের নাই মা শক্তি ততো
দাতার যদি টাকা হতো ভবে সবাই হতো সুখী ॥

মিশ ভবে কিছু নাই সর্বাঙ্গসুন্দর দেখে শুনে জানি
হলে মহাজ্ঞানী মহাগুণী এক গুণে থাকে নিকৃষ্ট ॥

মুখ যা করিস তুই ভালোই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট ॥

প্যাঁচ কতো মিথ্যা মোকদ্দমা করে কেহ জয়ী হয়েছে রাজহুজুরে
টাকার জোরে মিথ্যা সাক্ষীর বলে
দেখি সতীর চেয়ে সুখসম্পত্তি বেশ্যাদের কপালে
দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভণ্ড সুখে ভুঞ্জে এ ব্রহ্মাণ্ড
যতো সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড মিথ্যাগ্রহী সন্তুষ্ট ॥

মুখ যা করিস তুই ভালোই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট ॥

খোচ মাকালেরে নাকাল করে আতায় দিলি মিষ্ট ॥

ফুকার খেটে কতো খাটনি দিতে রাতে ফসল হয় না জমিতে
বিনা যত্নে হয় উড়ি পড়ে চাষার মাথায় বাড়ি, মা মাগো
আরও ঘাস গুল্ম তো কতোই আছে কালস্বরূপ ফসলের কাছে
তার চেয়েও মান করেছে অজাত জার্মানি কচুরি ॥

মিশ — যেজন প্রাণপণ চেষ্টায় খেটে মরে তার ঘরে নাই ভাত
কতো লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মীসাক্ষাৎ প্রমাণ আছে যথেষ্ট ॥

মুখ — যা করিস তুই ভালোই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট ॥

অন্তরা — মা তোর সৃষ্টির অকৌশলে ভূমণ্ডলে ফলে আগাছায় বেশি ফল
মাগো ধান্য হয় দক্ষিণে লক্ষ্মীর বাস সেখানে
এমন সোনার দেশে কেন দিলি নোনা জল।
করলি পলাশ আর মাঁদার দেখিতে সুন্দর গন্ধ নাই নাই পরিমল
দিলি বাঁনরের বুদ্ধি অমানুষের বৃদ্ধি অসুরের গায় দিলি বল ॥

চিতান — মাগো সুর দিলি পাতিশৃগালেরে দিলি না তায় তাল
কতো তালিম লোকের রাঙা সুর এই হলো সৃষ্টির কসুর
মা তোর সব কাজের পাছে এক জঞ্জাল ॥

ফুকার — কতো ধনীর হয় মূর্খ সন্তান গরিবের ছেলে বিদ্বান
এই আর একটি অলগ্ন দেখে উৎসাহ হয় ভগ্ন, মা মাগো
যতো ভালো বৌ পায় বোকা লোকে জ্ঞানী লোকে প্রায়ই ঠকে
দম্পতির দাম্পত্যসুখে কেন ঘটায়ে দিস বিঘ্ন ॥

মিশ — ভোলা বাবার সনে তোর যে অমিল দুই মতে দুই জনে
ও তোর ভবের সৃষ্টি সেই ধরনে হায় রে মোদের অদৃষ্ট ॥

মুখ — যা করিস তুই ভালোই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট ॥

৫. নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — ব্রহ্মময়ী তোর এ ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখে মেনেছি বিস্ময়।
যতো সত্যবাদীর অপৌরুষ মিথ্যাবাদীর সুপৌরুষ
হলো পাপের জন্য পুণ্য পরাজয় ॥

ফুকার — মাগো কালস্য কুটিলা গতি উচ্চ লোকের অবনতি
তুচ্ছ লোকের উচ্চ বুকের পাটা, মানীর মানে পড়লো ভাটা, মা মাগো
এখন তুলসীপত্র অপবিত্র চা-পত্র অতি পবিত্র
থাকতে বেশ্যাবাড়ি অন্নক্ষেত্র বলো শ্রীক্ষেত্রে যায় কেটা ॥

মিশ — যতো বিদ্যাবন্তের বিদ্যার গৌরব গেলো ছারেখারে
যারা সরস্বতীর ধার না ধারে তারাই করে বাবুগিরি ॥

মুখ — মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার এ সংসারে শঙ্করী ॥

প্যাঁচ এখন হিন্দুদের নাই হিন্দু ধর্ম মিথ্যা বলা সাধুর কর্ম
বৈষ্ণব ধর্ম গেলো অধঃপাতে
তাদের ডুমনি গায় আর ডমরু বাজায় ঢেমনি মজাইতে।
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বন্ধ ল্যাবড়া শুক্তা না-পছন্দ
কিছু মৎস্য মাংসের না হলে গন্ধ আনন্দ নাই আখড়াবাড়ি ॥

মুখ মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার এ সংসারে শঙ্করী ॥

খোচ চরিত্রহীন গোঁসাই যতো মান্য তার ভারী ॥

ফুকার যতো সুপবিত্র দ্বিজপুত্র নাই তিলক কুশ পবিত্র
গুটিসুতার যজ্ঞসূত্র পরে, দিলো মন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে, মা মাগো
ছিলো বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব, সাম ঋক আর যজু অথর্ব
সকল গর্ব করলো খর্ব ঐসব অর্বাচীন বর্বরে ॥

মিশ করলো ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব নষ্ট পুরোহিত দর্পণে
এখন ধ্যান ধারণা শ্রাদ্ধ তর্পণে যেতে হয় না ব্রাহ্মণবাড়ি ॥

মুখ মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার এ সংসারে শঙ্করী ॥

অন্তরা নিষ্কামী বৈষ্ণবের ধর্ম নাই মা কলিকালে।
এমন নির্মল ধর্মে দাগ লাগালো কিশোরী ভজনের দলে।
বৈষ্ণবের নাই কপ্নি-কাছা সামনে দোলে লম্বা কোচা
ভোগের নামে অন্নবেচা ব্যবসা চলে।
দেখি আখড়া ভরা কাঁকড়ার চাড়া, ল্যাবড়া গেলো রসাতলে ॥

চিতান দেখি বর্তমান ব্রাহ্মণের কীর্তি ত্রিবিধা ফুৎকার বৃত্তি জীবিকা অর্জনের পসার
শিষ্যের কর্ণে ফুৎকার গুরুগিরি শঙ্খে ফুৎকার পূজাবাড়ি
চুলায় ফু পাচক, ত্রিধা বৃত্তি সার ॥

ফুকার আগে স্পর্শ করলে মদের পাত্র ব্রাহ্মণ হতো অপবিত্র
লাগতো তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা, এখন মদের মটকি তারা, মা মাগো
হলো মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বন্ধ
ধ্যান-ধারণা পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধ হয় না মদ্য ছাড়া ॥

মিশ করলো ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব নষ্ট পুরোহিত দর্পণে
এখন ধ্যান-ধারণা শ্রাদ্ধ তর্পণে যেতে হয় না ব্রাহ্মণবাড়ি ॥

মুখ মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার এ সংসারে শঙ্করী ॥

৬. বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান তোমায় নমো নমো বঙ্গমাতা স্নেহের আসন বুকে পাতা

পালিছ মা সাত কোটি সন্তান।
তোমার করুণা অসামান্য, মানুষ থাক দেবের মান্য
ধনধান্য সবই তোমার দান ॥

ফুকার কতো ভাঙাগড়া তোমার বুকে ওঠাপড়ার আঘাত ঠুকে জর্জরিত তব কলেবর
তবু অযাচিত স্নেহরাশি সন্তানের উপর, মা মাগো
কতো লাঙল কোদাল জোরে চালাই বক্ষ চিরে ফসল ফলাই
রাই সরিষা মুগ মটর কলাই, তব ধানে পূর্ণ করি ঘর ॥

মিশ থাকি ভ্রাতৃভাবে মাতৃবক্ষে মোরা হিন্দু-মুসলমান
আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান গৌরবে সৌভাগ্য মানি ॥

মুখ পূজির নয়ননীরে আমার এই মনমন্দিরে মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি ॥

প্যাঁচ মাগো তোমার অমল বিমল শোভা ধনী মানীর মনোলোভা
তোমার শোভায় সবাই চাহে মান, তোমার অনবদ্য সুখাদ্যাদি অফুরন্ত দান।
আম কাঁঠাল সুপারি নারিকেল আতা লিচু বেদানা বেল
কতো ফুল ফল ফেলেছো অঢেল কে করে তাহার বাখানি ॥

মুখ পূজির নয়ননীরে আমার এই মনমন্দিরে মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি ॥

খোচ ধনধান্যে নিঃস্ব নহ তুমি বিশ্বরানী ॥

ফুকার মোদের দিঘির জলে আছে মৎস্য গাভীর কোলে আছে বৎস
বৎসরে বৎসরে ফলে ধান
আরো নোনা জলে সোনা ফলে বিধাতার বিধান, মা মাগো
তাইতে লোকে কয় সোনার বাংলাদেশ প্রকৃতির পূর্ণ পরিবেশ
রূপবৈচিত্র্যের নাহি শেষ, চিত্ত মাঝে ভাসে চিত্রখান ॥

মিশ কাঙাল বেশে কতো দেশে ঘুরলাম কতো স্থানে
মাগো, তোমার মতো এমন টানে কেউ তো বুকে নেয় না টানি ॥

মুখ পূজির নয়ননীরে আমার এই মনমন্দিরে মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি ॥

অন্তরা বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলেরই এই বাংলাদেশই
জীবনানন্দের ছন্দে বহিছে বাংলা রূপসী।
পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী ব্রহ্মপুত্র নদী নদ
পশর শিবসা মধুমতী এই বাংলাদেশের সম্পদ।
পড়ে যখন পলিমাটি খেতখামার হয় পরিপাটি
সোনার বাংলা সোনা খাঁটি মহীমাঝে মহীয়সী।
দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যখন হই বিদেশবাসী
পোড়া বুক তো জুড়ায় না মা, তাই আবার ফিরে আসি।

সকল দেশের সেরা তুমি শরণ নিলাম চরণ চুমি
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

চিতান তোমার অপরূপ রূপ শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলা
সন্তানের বাৎসল্যা জননী।
প্রথম নামিয়া এই ধরার বক্ষে স্থান পেলাম মা তোমার কক্ষে
করলে রক্ষে দিবা-রজনী ॥

ফুকার এই যে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস আমার জন্মের পূর্ব আভাস
এ মাটিতে এই দেহের নির্মাণ
বাংলার অন্নজলে ফুলে ফলে তৃপ্ত মনপ্রাণ, মা মাগো
তাইতে নিবেদন ঐ চরণপ্রান্তে প্রার্থনা জানাই একান্তে
হয় যেন মোর জীবনান্তে দেশের মাটি আমার শেষের স্থান ॥

মিশ পাগল বিজয় বলে এই নিবেদন গ্রহণ করিস মাতা
যেন তোর বুকে ঠেকায়ে মাথা বলতে পারি বিদায়-বাণী ॥

মুখ পূজির নয়ননীরে আমার এই মনমন্দিরে মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি ॥

৭. স্বরূপেন্দু সরকার

চিতান মহামায়া কেটে মোহমায়া পদছায়া দেহ মা সন্তানে।
মাগো পেতে নিত্য বৃন্দাবন অকারণ ভজন-সাধন ত্রিভুবনে কে পায় কখন
তোর বিনা প্রেম প্রদানে ॥

ফুকার মা তুই মূলাধারে কুণ্ডলিনী প্রেমভক্তি প্রদায়িনী জানে সর্বলোক
আমার নাই দেখার সে চোখ, মা মাগো
করে ক'রে জ্ঞানের অসি আমার কালের বুকে দাঁড়া আসি
শেষে কেটে দে মোর অমানিশি পসুক আসি প্রেম সূর্যের আলোক ॥

মিশ কেউ তোরে না ডাকিলে কোনো কালে পায় না বিশ্বমাঝ
মা হয়ে কি করে না লাজ, সতাসত বিচার সুতে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বতে ॥

প্যাঁচ সুষুম্নায় বজ্রাখ্যা চিত্রিণী ভেদি আছে ব্রহ্মমুখে ব্রহ্মার বেদি
তৎসহ রয়েছে ডাকিনী
ভক্তে চিরকাল ডাকিছে কভু ভক্তকে ডাকোনি।
তাঁহার ঢাকনি ত্রৈপুর যন্তরে তুমি তার অভ্যন্তরে
পিয়ে সুধাদীপ্তি তোর অন্তরে না কাঁদলে যেতে দিসনে সে পথে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বতে ॥

খোচ বাক্য কাব্য প্রবন্ধ লাভ যদি কেহ সেবতে ॥

ফুকার মা তুই প্রথম দ্বার ছাড়বি যদি উঠে স্বাধিষ্ঠানের গদি হলে অধিষ্ঠান
জীব পেয়ে রাকিণীর সন্ধান, মা মাগো
তথা হতে মণিপুরে পেয়ে বৃদ্ধ ত্রিলোচনাসুরে যাবে অজ্ঞান তামসী দূরে
ক'রে ত্রিকোণে লাকিনী শ্যামার ধ্যান ॥

মিশ ভোলা প্রলয় শিঙ্গা করে অজপার ঘরে
কাকিনীরূপ তুমি ধ'রে জানলেম না অনাহতে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বতে ॥

অন্তরা বলো না মা ও মা শ্যামা তোমা পূজে হবে বা কি?
মাগো বাজলে ভোলার প্রলয় বিষাণ স্বরূপে রইতে পারো নাকি?
হংসরূপে দুজনাতে দ্বন্দ্ব করো দিবারাতে
জীবাত্মা পরমাত্মাতে করতে মাখামাখি।
কিন্তু একুশ হাজার ছশো বিংশতিতে ফুরায় শুভঙ্করের ফাঁকি।
তবে যদি খাবি পূজা মাগো পারের তরী সাজা
তোর ছেলে মা হলে রাজা তোর দুঃখ নাকি?
শেষে পার করলে নদী বিরজা রাখবো না পাড়ের কড়ি বাকি ॥

চিতান সবে জেনো খাঁটি এ দেহটি পরিপাটি পনেরো পোয়াতে
যে চোদ্দ পোয়া করলো সার সে কহে সংসার সং সার
যদি চাহো সোহং সার চড়ো সুষুম্নার খেয়াতে ॥

ফুকার মা তুই আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্রী ভবানী শিবানী
মূকের মুখে ফুটাস বাণী, মা মাগো
মোর উপায় কহো বিচারি, আমি যে ঘোর ব্যভিচারী
থেকে ব্রহ্মে নহি ব্রহ্মচারী, চিনির বলদ চিনির বস্তা টানি ॥

মিশ করি কৃতাঞ্জলি জলাঞ্জলি সব দিলাম তোর পায়
অধম নিরুপায় স্বরূপের উপায় করো মা স্বরূপেতে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বতে ॥

৮. রবীন্দ্রনাথ সরকার

চিতান মাগো জন্ম নিয়ে বিশ্বমাঝে, নিঃস্ব হলেম বাজে কাজে
কাঙাল সাজে করি নিবেদন।
তুমি দয়াময়ী কালিকে, এ ব্রহ্মাণ্ড পালিকে
মুণ্ডমালিকে ঘুচাও মোর বেদন ॥

ফুকার মা মা মাগো ত্রিতাপে দহিছে অঙ্গ করে শুধু অসৎ সঙ্গ
গেলো চিরকাল, ঘনায় জীবনসন্ধ্যাকাল, মা মা মাগো
অনিত্য সংসারে আমি গলায় নিলাম মায়ার ফাঁসি
(এখন) সদা নয়নজলে ভাসি দেখি চৌদিকে জঞ্জাল ॥

মিশ জ্ঞানরূপ খড়্গ হাতে নিয়ে দাঁড়াও গো জননী
যে জাল পাতায় মায়াবিনী কেটে করো পরিষ্কার ॥

মুখ শরণ নিলাম চরণতলে মাগো তোমার দয়া হলে পেতে পারি প্রেম পুরস্কার ॥

প্যাঁচ তোমার কৃপায় পায় রামপ্রসাদ, পূর্ণ করো তার মনোসাধ
গেলো বিষাদ, শাক্ত ভক্ত সেরা, ব্যক্ত আছে মর্ত্যভূমি
নিজের হাতে তারা তুমি, বাঁধ ফিরালে যখন বাঁধে বেড়া
ধন্য পুণ্যবান রামপ্রসাদ বাৎসল্য রস করে আস্বাদ
কুসন্তান বলে দিও না বাদ, দূর করো ষড়রিপুর বিকার ॥

মুখ শরণ নিলাম চরণতলে মাগো তোমার দয়া হলে পেতে পারি প্রেম পুরস্কার ॥

খোচ জগদম্বা জগতের মা সবাই করে এ কথা স্বীকার ॥

ফুকার মা মা মাগো, কুপুত্র কুকন্যা আদি জন্মে থাকে নিরবধি, জানে তা সবে
কুমাতা কুপিতা নাই ভবে, মা মা মাগো
অতুল্য সন্তান-মমতা, ভুলিবার নাহি ক্ষমতা
অন্যায় অপরাধ ক্ষমতা ভাসাও স্নেহ অর্ণবে ॥

মিশ মুক্ত করো মুক্তকেশী ভক্তিদাত্রী মা নাহি তোমার গুণের সীমা
বিপদে করো উদ্ধার ॥

মুখ শরণ নিলাম চরণতলে মাগো তোমার দয়া হলে পেতে পারি প্রেম পুরস্কার ॥

অন্তরা পুত্রের প্রতি পক্ষপাতী এ অখ্যাতি মা কী কারণে
যদি মনে ছিলো এতো কাঁদাবে মনোমতো, কী লাভ হলো গর্ভে ধারণে।
মুগ্ধ হয়ে দুগ্ধ দানে স্নিগ্ধ করলে শিশু সন্তানে
বড়ো করে কোন পরাণে রাখো না স্মরণে
তুমি মুক্তিদাত্রী জগদ্ধাত্রী লক্ষ দাও দুঃখ নিবারণে।
অন্নজল দাও ক্ষুৎপিপাসায়, নিজের হাতে খাওয়াও বামা ক্ষ্যাপা খায়
অন্নাভাবে কতো শতো প্রাণ যায়, অকাল মরণে।
করো তাদের জন্য সুব্যবস্থা এই মিনতি জানাই চরণে ॥

চিতান তুমি বিশ্বপ্রসবিনী তারা এই বিশ্ব সৃষ্টি তোমার দ্বারা
ভবদারা শুধাই সবিশেষ।
আমি যা করার তা করেছি জন্মের মতো মরেছি

চরণ ধরেছি এই বার সর্বশেষ ॥

ফুকার মা মা মাগো, সর্বহারা হয়ে আমি ঘর থুয়ে পথের পর নামি
বেদামি একজন, নরাধম অতি অভাজন, মা মা মাগো
ঘোর সংকটে হে শঙ্করী, অভয়চরণ সম্বল করি
বলে কালী প্রীতে হরি হরি দিব এ জীবন বিসর্জন ॥

মিশ এই প্রার্থনা শুনো মাগো জগৎ-জননী
রবি কয় চরণ তরণী দিয়ে করো ভবপার ॥

মুখ শরণ নিলাম চরণতলে মাগো তোমার দয়া হলে পেতে পারি প্রেম পুরস্কার ॥

পরিশিষ্ট ৪
সখীসংবাদ

১. রামগতি শীল

চিতান চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে বইলেন রসময়।
তাঁরই আশাতে বৃন্দে চিত্রে ললিতে মনোসাধে নিকুঞ্জ সাজায় ॥

ফুকার তুইলে চাঁপার কলি গন্ধরাজ ফুল সন্ধ্যামণি মালতী বকুল
তুইলে মনের সাধে বনফুল টগর বেলী শেফালিকে কৃষ্ণচূড়া কাঠমল্লিকে
কুঞ্জ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল ॥

মিশ না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা কাতরা হইয়ে
সখীগণের বদন চেয়ে বলতেছে ললিতের কাছে।

মুখ আর নিশি নাই প্রাণ সই গো শ্যামের আসার আশা কি আছে ॥

প্যাঁচ বন্ধু আসবে বইলে মনোসাধে কুসুম তুইলে গেঁথেছিলেম হার
মনে বাসনা ছিলো আমার
বকুল বেলী শেফালিতে হার গেঁথেছি বিনা সুতে
ভুলাইতে নন্দের সুতে গলে দিলেম তাঁর।
যাঁর আশাতে কুঞ্জে বসি জাগিয়ে পোহালেম নিশি
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই ॥ ...

মিশ আশা তরুতলে বসে, ছিলেন সখী ফুলের আশে
অভাগিনীর কর্মদোষে ডাল ভেঙে সব ফল নিয়েছে ॥

মুখ আর নিশি নাই প্রাণ সই গো, শ্যামের আসার আশা কি আছে ॥

অন্তরা করলেম কৃষ্ণপ্রেমের একাদশী, ঐ পোহালো নিশি
যার আশাতে করলেম শয্যা সে আইল না পেলেম লজ্জা হলেম উদাসী
আমার অঙ্গে নাই সে বল কী করিব বল
যে জ্বালা জ্বালাইল কালো শশী ঐ পোহাইল নিশি
করলেম কৃষ্ণপ্রেমের একাদশী ॥

২. তারকচন্দ্র সরকার

চিতান কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ব্যাকুল রাধে বৃন্দার প্রতি কয়।
শোনো গো বৃন্দা সখী আমার প্রাণপাখি দেখে আয় গিয়ে মথুরায় ॥

ফুকার আমি তোমার মুখে সংবাদ শুনি প্রাণবন্ধুর কথা
শুনে বাড়িল দারুণ ব্যথা, হায় গো
নাই সে বন্ধুর চূড়া বাঁশি কেউ ডাকে না বলে কালোশশী
আমার মতো সোহাগ বেশি কেউ কি মনে করে তার কথা ॥

মিশ তুই যা গো যা সহচরী দেখে আয় মোর প্রাণবন্ধুরে
সহ্য হয় না মোর অন্তরে ও প্রাণবন্ধু বিনে ॥

মুখ ওগো প্রাণসখী দেখে আয় মোর কমলাঁখি কোন সুখে আছে সেখানে ॥

প্যাঁচ বলিস বন্ধুর কাছে বিনয় করে বিরহিণী গেছে মরে
শ্যাম তোমা বিহনে আর চিন্তা নাই তোমার সনে
লইয়া এক নতুন রানী, সুখে থাকো নীলকান্তমণি
আমার যতো গোপগোপিনী শুনে সুখে রবো বৃন্দাবনে ॥

মিশ তুমি সুখপালঙ্কে কুজার সঙ্গে থাকো প্রেমরসে
গোকুল যাক অকূলে ভেসে তোমার বিচ্ছেদ তুফানে ॥

মুখ ওগো প্রাণসখী দেখে আয় মোর কমলাঁখি কোন সুখে আছে সেখানে ॥

খোচ বলিস সুখে আছে কলঙ্কিনী বৃন্দাবনে ॥

ফুকার বুঝি ত্যাগ করে রাখালের বেশ ধরেছে রাজার বেশ
তেমনি কুজা সুন্দরী হয়ে আছে পাটেশ্বরী
নীলগিরি আর কুজারই সে মিলন বেশ, হায় হায় হায়
ভোলে ভুলুক আমার কথা প্রাণের হৃষীকেশ
যেন না দেয় ক্লেশ নতুন রানীর প্রাণে ॥

মুখ ওগো প্রাণসখী দেখে আয় মোর কমলাঁখি কোন সুখে আছে সেখানে ॥

অন্তরা আমি মরিব সই বলে শ্রীকৃষ্ণ
আমার জীবন যাবার কালে সব সখী মিলে মুখে বলিস কৃষ্ণ কৃষ্ণ
আমার এ জীবনের কী প্রয়োজন যদি নিদয় হইল জগদীষ্ট
আমার সহে না যাতনা প্রাণেও বোঝে না তোরা বল তো মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

চিতান আমার মরণ হবার পূর্বে সখী যাবো মথুরায়।
আমার শেষ নিবেদন এই দুঃখের বেদন জানাস আমার প্রাণবন্ধুর পায় ॥

ফুকার বন্ধু তোমা বিনে রাই কমলী শুকিয়ে গেছে, বৃন্তচ্যুত হয়েছে, হায় গো
ধূলায় ধূসর কোমল অঙ্গ কেঁদে বলে শ্যাম ত্রিভঙ্গ

না পেয়ে শ্যাম তোমার অঙ্গ হলো মূর্ছাপ্রায়, মৃত্তিকায় পড়েছে ॥

মিশ তোমার নাম নিয়ে প্রাণে বেঁচে আছে
বুঝি এতোক্ষণ মরণ ঘটেছে, বলিস বন্ধুর সনে ॥

মুখ ওগো প্রাণসখী দেখে আয় মোর কমলাঁখি কোন সুখে আছে সেখানে ॥

৩. লাল মামুদ

চিতান সখীসনে স্বভবনে বসে আছেন রাই
এমন সময়কালে জয় রাধা শ্রীরাধা বলে বংশীধ্বনি করিলেন কানাই ॥

ফুকার শুনে সেই বাঁশরী ধৈর্যহারা রাইকিশোরী পড়িলেন ঢলে
অমনি ধেয়ে সখী সকলে কোলে তুলে রাই রতনে জিজ্ঞাসে মধুর বচনে
এমন হলো কী কারণে বলো গো মন খুলে ॥

মিশ ললিতার গলে ধরি কমলিনী কয়
নারীর প্রাণে আর কতো সয় নিদারুণ বাঁশির আকর্ষণ ॥

মুখ আর যেন বাজায় না বাঁশি শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ ॥

প্যাঁচ শুনলে শ্যামের মোহন বাঁশি আমি যে কী সুখে ভাসি তোরা জানিসনে
দারুণ শ্যামের বাঁশি পশিয়া প্রাণে
কুল-মান-কলঙ্কের ভয় লজ্জা-ধৈর্য আর যতো হয়
সকলি মোর কাড়িয়া লয় আমি হই পাগলীর মতন ॥

মুখ আর যেন বাজায় না বাঁশি শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ ॥

খোচ পরাধিনী নারী আমি ঘরে গুরুজন ॥

ফুকার যদি ননদিনী কৃষ্ণপ্রেমের বিবাদিনী শুনে এ সকল তবে হবে বড়ো অমঙ্গল
আমায় দেখলে ধৈর্যহারা অমনি হাতে লবে খাঁড়া
দায় হইবে রক্ষা করা জীবন কেবল ॥

মিশ দারুণ প্রেমের ফাঁসি বাঁশি নিদারুণ
কুলনারী করিতে খুন কোন বিধি করিল গঠন ॥

মুখ আর যেন বাজায় না বাঁশি শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ ॥

অন্তরা সখী আর সহিতে নারি, শ্যামের বাঁশি হইল প্রাণের বৈরী
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা ন'ই মানে, বলো না কী করি
শুনিলে সে ধ্বনি, শুনো গো সজনী, বুঝি না বাঁচি কি মরি ॥

চিতান সুধা বিষে আছে মিশে বাঁশরী রবে
আমার যে যন্ত্রণা প্রাণে জানে আর কেউ জানে না
বলো সখী কী উপায় হবে ॥

ফুকার বাঁশির মিঠাতে প্রাণ আকুলে করে থাকে না জ্ঞান
বিষে পুড়ে যায় এখন হবে বলো কী উপায়
মনে কয় যে দিবানিশি শুনি শ্যামের মধুর বাঁশি
মধুর সঙ্গে বিষে আসি পরান পোড়ায় ॥

মিশ পরাধিনী নারী আমি ঘরে গুরুজন ॥

মুখ আর যেন বাজায় না বাঁশি শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ ॥

৪. হরিচরণ আচার্য

চিতান পূর্বরাগের পূর্বে নবযৌবন গর্বে রাই আছে নবানুরাগে।
অতি নিকটে ললিতা চিত্র চম্পকলতা সবে প্রফুল্লিতা নবভাব অন্তরে জাগে ॥

ফুকার হায়রে সবার মনে খোঁজে মনের মানুষ নব যৌবনের সঞ্চার।
এসে বিশাখা ভুলাইতে বিশ্বসংসার চিত্রপটে করে রাইকে দেখায়
চিত্র হেরে রাধার চিত্ত উঠে নৃত্য করে নেত্রে ছুটে অশ্রুধার।
দেখে মনোহর মূরতি হয়ে ব্যাকুল অতি শ্রীমতি চঞ্চলমতি বলে বিশাখাকে ॥

মুখ বিশাখা বলো গো বলো উপায় কি বলো আমার প্রাণ বিহ্বল
চিত্রপটে চিত্রমূর্তি দেখে ॥

প্যাঁচ রূপে মুরছে অনঙ্গ মরি কি শ্রীভঙ্গ নিভঙ্গ মধুরাকৃতি
আহা কি সুন্দর নাসা কুলজার কুলনাশা নাসায় দোলে গজমতি
বিকে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে অঞ্জন মনোরঞ্জনে
কোন জনের রূপকুঞ্জে আনলি একে।
তিলকে ত্রিলোক আলো মরি কি ঝলকে।
হায় গো সখী যেজন যার চিত্র করে, চিত্তে চিন্তা করে লয় এরূপ
চিন্তিলে সচল দেহ অচল হয়, হায়
এমন মূর্তি চিন্তা করে কোন পাষাণী চিত্রকরে
তখন হলো না কি তার শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় ॥

মিশ ঐরূপ পশিল কেমনে আমার হৃদয়াসনে
কথা বলতেছে মনে মনে কতো হাসিমুখে ॥

মুখ বিশাখা বলো গো বলো উপায় কি বলো আমার প্রাণ বিহ্বল
চিত্রপটে চিত্রমূর্তি দেখে ॥

অন্তরা চিত্রপটে কী অপরূপ দেখি রূপসাগরে ডুবলো দুটি আঁখি
রূপটি উহার চিকনকালো রূপে করে ভুবন আলো
কালো রূপ যে এতো ভালো আগে তো জানি না প্রাণসখী।
অলকা তিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল, শোভিছে শ্রুতিযুগলে মকরকুণ্ডল

সৌন্দর্য মাধুর্য হেরে অধৈর্য হলেম অন্তরে
ভেঙে এই হৃদিপিঞ্জরে উড়ে যেতে চায় গো প্রাণপাখি ॥

চিতান বলো গো অকপটে কার রূপ চিত্রপটে কোন চিত্রকারিণীর চিত্র
মদন ছানিয়ে বদনখান কোন বিধির নির্মাণ
কুলজার কুলমান ভুলে যায় রূপদৃষ্টিমাত্র ॥

ফুকার সই গো ঐ দেখো শিরে চূড়া করে বাঁশি পদে পদে রেখেছে
এমন অপরূপ কোন রূপসী দেখেছে, হায়
কোন রসিকা প্রেমবাতুলী সুধাকরের সুধাতুলি
ও সেই করে তুলে রসের তুলি রসিকের রূপ এঁকেছে ॥

৫. বিজয়নারায়ণ আচার্য

চিতান নূতন স্বভাবের শোভা মরি কিবা শিশির অন্তে।
কিবা রসালে মুকুলের ভার দৃশ্য অতি চমৎকার নূতন বসন্তে ॥

ফুকার প্রকৃতির বনবাগানে ফুটলো কুসুম স্থানে স্থানে জুটলো অলিকুল
তুললো রোল কী অতুল পেয়ে ফুটন্ত ফুল।
বাসন্তী ফুল নানা জাতি শোভার সম্পদ সেসব অতি
মল্লিকা রঙ্গন মালতী জাতি যূথী গন্ধরাজ বকুল ॥

মিশ গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ
বহিছে মলয় পবন সুধীর গতি মন্থর ॥

মুখ বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে যে করে অন্তর ॥

প্যাঁচ ধরিয়া ললিতার গলে কমলিনী কেঁদে বলে শুনো গো প্রাণসই
দুরন্ত বসন্ত জ্বালা আর কতো সই।
কোকিল পাখি কুহুতানে হলাহল ঢেলে দেয় কানে
মদনের পঞ্চবাণে প্রাণে হানে নিরন্তর ॥

মুখ বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে যে করে অন্তর ॥

খোচ এ সুখ-বসন্তে আমার কান্ত দেশান্তর ॥

ফুঁকার বলেছিলো যাওয়ার কালে আসিব ফিরে সকালে ব্রজে পুনরায়
সেই আশায় দিন যায় এলো না শ্যামরায়।
আশার দিন তো হলো গত, আশার আশে থাকবো কতো
চাবো কতো আশাপথ পিপাসিতা চাতকিনীর প্রায়।
কতো জন্মে কতো কর্মে করেছি কি পাপ
না জানি ভুগিব সন্তাপ কতো জন্ম জন্মান্তর ॥

মুখ বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে যে করে অন্তর ॥

অন্তরা ও সই কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে আমি কেন প্রাণে বেঁচে আছি
মরে যাই ক্ষতি নাই আমি মরিলে পরানে বাঁচি।
সরল জানিয়ে তারে আমি সঁপেছিলাম সমাদরে
জীবন-যৌবন যাচি কুলমান করলেম দান, তার দোষগুণ নাহি বাছি ॥

চিতান দিনরজনী বিচ্ছেদ বিষে হা হুতাশে কিবা প্রয়োজন
আমার কাজ কি এ ছার জীবনে শ্যামকুণ্ডের জীবনে দিবো বিসর্জন ॥

ফুকার কোনো দিন আসিলে ফিরে দাসীর কথা মনে করে রসরাজ কানাই
বলে যাই তোমার ঠাঁই বোলো রাই বেঁচে নাই
বসন্ত বিচ্ছেদ অনলে শ্যাম বন্ধু শ্যাম বন্ধু বলে
ডুবিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে মইলো তোমার দীন-দুঃখিনী রাই ॥

মিশ গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ বহিছে মলয় পবন সুধীরগতি মন্থর ॥

মুখ বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে যে করে অন্তর ॥

৬. রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান কৃষ্ণ দর্শন করবার তরে সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে যমুনায় রাই জল আনিতে যায়
দেখে কদমতলায় মদনমোহন চোখে চোখে হলো মিলন
সখীর প্রতি শ্রীমতী সুধায় ॥

ফুকার সখী দেখলো আমার বন্ধুর রূপ, নাই লো এ রূপের স্বরূপ
কমল-নয়ন চাঁদবদন, করে সুধামধু বরষণ
আমার মনচকোর আর নয়ন-ভ্রমর রসে ডুবলো পেয়ে রসিক নাগর।
উথলিল রসের সাগর, আমার অচল হলো সখী দেহমন ॥

মিশ তখন বাড়াইতে কৃষ্ণপ্রেমের সুখ ইন্দুলেখা করে কৌতুক
রাইকে দিয়ে লাঞ্ছনা ॥

মুখ সুধাকর আর পদ্মের সনে বলো গো রাধে দিলি কেনে
হেন কৃষ্ণরূপের তুলনা ॥

প্যাঁচ ও যে শুধু প্রেমমূরতি বংশীমুখে প্রেম আরতি
প্রেমনয়নে বহে প্রেমধার।
বন্ধুর রূপে প্রেমরস যতো ওই ইন্দু যদি বিন্দু পেতো
সে তো রসের সিন্ধু হতো পূর্ণত্ব আর যেতো না ॥

মুখ সুধাকর আর পদ্মের সনে বলো গো রাধে দিলি কেনে
হেন কৃষ্ণরূপের তুলনা ॥

খোচ ও রূপের তুলনা কারো সঙ্গে চলে না ॥

ফুকার রাধে কোটি চন্দ্র আকাশে, যদি জ্যোতি বিকাশে চির দিন পূর্ণ থাকে
সে চাঁদ নিশি জেগে কে দেখে
আমরা ঐ রূপ দেখে গোপীকুলে নিদ্রা ক্ষুধা কুলমান গেলেম ভুলে
স্বরূপে ঐ রূপ দেখিলে বল গো ঘরে থাকতে পারে কে ॥

মিশ রাধে সূর্যোদয়ে শশী হয় মসী ঐ রূপের রূপ দিবানিশি
বাড়ে বই আর কমে না।

মুখ সুধাকর আর পদ্মের সনে বলো গো রাধে দিলি কেনে
হেন কৃষ্ণরূপের তুলনা ॥

অন্তরা কমল নয়ন নয় লো কমলিনী অতুলনীয় রূপখানি
নয়ন যদি কমল হতো কমলে কি জল জমিতো
প্রেমবারি পরিপূরিত প্রেমনয়নে প্রেমচাহনি।
যার পানে চায় আড়নয়নে প্রেমের দাগ তার লাগে প্রাণে
ছাই দিয়ে সে কুলমানে কুলজা হয় কলঙ্কিনী ॥

চিতান রূপক করলে রূপ সম্বন্ধে বর্ণনে হয় রূপের নিন্দে
অশুদ্ধ এই রূপবর্ণনা ভুল
যাহার তুলনা নাই ভুবন মাঝে তার কি লো উপমা সাজে
ভুল বুঝে সে অলিকুল আকুল ॥

ফুকার রাধে কমল হলে বিকশিত অলি হয় পুলকিত
নিঠুর ভাবে মধু খায়, আজ যে ভ্রমর ঠেকলো মমতায়
বন্ধুর মনোহর রূপ দরশনে দয়া হলো অলির কঠিন প্রাণে
জানিস মধু খায় না কেনে, ভাবে কোমলাঙ্গে যদি ব্যথা পায় ॥

মিশ সূর্যোদয়ে শশী হয় মসি ঐ রূপের রূপ দিবানিশি বাড়ে বই আর কমে না ॥

মুখ সুধাকর আর পদ্মের সনে বলো গো রাধে দিলি কেনে
হেন কৃষ্ণরূপের তুলনা ॥

৭. উমেশ শীল

চিতান বসে শ্যামের সনে একাসনে মনমিলনে সম্মিলনে
আনন্দিতা হয়ে মনে পাশা খেলে রাই।
বন্ধু তোমার ছক্কা আমার পাঞ্জা, দানে পাওয়া যাবে পাঞ্জা
সাক্ষী থাকিবে কুলজা দেখিবে সবাই ॥

ফুকার তখন সখীগণ মধ্যস্থ রেখে কৃষ্ণ গুণাধার
খেলে উভয় মিলে পাশা খেলা আনন্দ অপার, হায় হায়

রাই বলে হে প্রাণমাধব, হারিলে গলার হার দেবো
জিনিলে মুরলী নেবো প্রতিজ্ঞা আমার ॥

মিশ পাশা খেলায় হারলো হরি মরি কি আজগুবি
ব্যঙ্গ করে রঙ্গ দেবী শ্যামের প্রতি ডেকে কয় ॥

মুখ বলো বলো বংশীবদন কেন তোমার বিরস বদন
কী দুঃখে আর করো রোদন বাঁকা রসময় ॥

প্যাঁচ খেলিতে এসেছো পাশা, দান পড়ে না ভগ্নদশা
গেলো তোমার সকল আশা হলে বন্ধু অপমান।
ছিঃ ছিঃ নাগর একি করলে নারীর সনে খেলায় হারলে
কোন লাজে আজ এ গোকুলে মুখ দেখাবে কালাচাঁদ ॥

মিশ গেলো তোমার জাঁকদারি সব রাই নিলো মুরলী
দিয়ে সখীগণে করতালি বলে রাধারানীর জয় ॥

মুখ বলো বলো বংশীবদন কেন তোমার বিরস বদন
কী দুঃখে আর করো রোদন বাঁকা রসময় ॥

খোচ ভাবিলে কী হবে বন্ধু বিপদ মন্দ নয় ॥

ফুকার তোমার বাঁশির সঙ্গে হাসি গেলো লজ্জাতে মরি
যেমন চোরের বুদ্ধি সিঁধ কাটিতে ভেবেছো হরি, হায় হায়
বলো বলো কমলাঁখি কেন ছলছল আঁখি
নুনের জাহাজ ডুবলো নাকি বুঝিতে নারি ॥

মিশ পাশা খেলায় হারলো হরি মরি কি আজগুবি
ব্যঙ্গ করে রঙ্গ দেবী শ্যামের প্রতি ডেকে কয় ॥

মুখ বলো বলো বংশীবদন কেন তোমার বিরস বদন
কী দুঃখে আর করো রোদন বাঁকা রসময় ॥

অন্তরা আর বাঁশরী পাবে না কানাই
এখন বাঁশরী বিহনে শিক্ষা করো যতনে, বনে গিয়ে বাজাও সানাই।
ব্রজের যতো ব্রজনারী শোনে কুলনাশা বাঁশের বাঁশরী কুলবধূর গিয়েছে বালাই
তুমি যারে ভালোবাসিতে সাধিতে নাম বাঁশিতে, বামেতে আর বসবে না রাই॥

চিতান বন্ধু নারীর সনে খেলায় হেরে দাগ লেগেছে হাড়ে হাড়ে
এখন আর দোষ দিবে কারে পাপের প্রতিফল।
তুমি জানো নাকি পাপের গাছে সাপেতে বাসা করেছে
তাইতে এ বাঁশি গিয়াছে, বাঁকা নীলকমল ॥

ফুকার তুমি কাঁদলে আর বাঁশি পাবে না ওহে কালাচাঁদ

আছে তোমার ঐ বাঁশের নমুনা করি অনুমান, হায় হায়
রান্নাঘরে গিয়ে দেখি যদি না পোড়ায়ে থাকি
পেলে সে বাঁশ কমলাঁখি তোমায় করবো দান ॥

মিশ গেলো তোমার জাঁকদারি সব রাই নিলো মুরলী
দিয়ে সখীগণে করতালি বলে রাধারানীর জয় ॥

মুখ বলো বলো বংশীবদন কেন তোমার বিরস বদন
কী দুঃখে আর করো রোদন বাঁকা রসময় ॥

৮. নকুলেশ্বর সরকার

চিতান একদিন হয়ে কৃষ্ণ আশাহত ক্ষুধিতা বাঘিনীর মতো
চন্দ্রাবলী অবিরত পথপানে চায়
তখন গোষ্ঠ ছেড়ে যায় সুরভি, সাধকে সাধে পূরবী
সন্ধ্যার অন্ধকারে রবি আপনি লুকায় ॥

ফুকার তখন গোষ্ঠ অবসানে গোধূলি লগনে ভবনে চলিল শ্যাম
মধুর মুরলীর তানে পূরবীর গানে সুরভি মাগে বিশ্রাম
শুনে রুনু ঝুনু রুনু নূপুরের ধ্বনি, চন্দ্রাবলী বলে শুনো গো সজনী
ঐ বুঝি যায় মোর শ্যাম গুণমণি দুঃখিনীরে হয়ে বাম ॥

মিশ শুনে চন্দ্রার কাতর উক্তি পদ্মাসুন্দরী
শ্রীগোবিন্দের করে ধরি নিয়ে এলো চন্দ্রালয় ॥

মুখ পেয়ে শ্যাম সুধাকরে চন্দ্রাবলী সমাদরে
ধরে কৃষ্ণের দুটি করে সকাতরে কয় ॥

প্যাঁচ হৃদয় আসনখানি যতনে দিয়েছি আনি এসো হে হৃদয়সখা বসো হে
তৃষিতা হরিণী আমি আশা মরীচিকা তুমি মিটাইব মনের পিয়াস হে।
বন্দী করে বাহুপাশে রাখবো হৃদয় কারাবাসে
হেসে হেসে পাশে এসে বসো হে শ্যামরায় ॥

মুখ পেয়ে শ্যাম সুধাকরে চন্দ্রাবলী সমাদরে
ধরে কৃষ্ণের দুটি করে সকাতরে কয় ॥

খোচ ভাগ্যগুণে এতোদিনে হলো সুসময় ॥

ফুকার আমি বিনা সুতার মালা গাঁথিয়া দুবেলা পথপানে চেয়ে থাকি
তুমি ফিরিয়া না চাও রাধাকুঞ্জে যাও এ দাসীরে দিয়ে ফাঁকি।
আমার এ নবযৌবনে কুসুমবাগানে পেয়েছি তোমায় এ শুভলগনে
মালী হয়ে থাকো ফুলের বাগানে যতনে হৃদয়ে রাখি ॥

মিশ শুনে চন্দ্রার কাতর উক্তি পদ্মাসুন্দরী শ্রীগোবিন্দের করে ধরি

নিয়ে এলো চন্দ্রালয় ॥

মুখ পেয়ে শ্যাম সুধাকরে চন্দ্রাবলী সমাদরে
ধরে কৃষ্ণের দুটি করে সকাতরে কয় ॥

অন্তরা এসো বসো হে সান্ধ্য অতিথি আঙিনা তলায়
আমার এ দেহ পবিত্র করি তোমার শ্রীপদ-ধুলায়।
হায় গো, কামনা কুসুমকলি যতনে রাখিয়া তুলি
সাজায়ে রেখেছি ডালি বাসনা থালায়
আমি আশাসুতে মালা গেঁথে মালা পরাবো গলায় ॥

চিতান দিয়ে আসক্তি ধূপের ধূপতি জ্বালায়ে বিবেকের বাতি
করিব সান্ধ্য আরতি শ্রীকৃষ্ণপূজায়
দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা পূত বারি ভরিয়া নয়নঝারি
পদ প্রক্ষালন করি বসো শ্যামরায় ॥

ফুকার তোমার রূপের স্বরূপে মনের আরোপে গড়িয়া মূরতিখান
আমার হৃদয় আসনে বসাবো যতনে গড়িয়াছি পীঠস্থান
আমার কামনা বাসনা দুটি পাদ্য অর্ঘ্য
তোমারই চরণে করিয়াছি উৎসর্গ
ও হে যজ্ঞেশ্বর লহো দান-যজ্ঞ অযোগ্যা কিঙ্করীর দান ॥

মিশ শুনে চন্দ্রার কাতর উক্তি পদ্মাসুন্দরী শ্রীগোবিন্দের করে ধরি
নিয়ে এলো চন্দ্রালয় ॥

মুখ পেয়ে শ্যাম সুধাকরে চন্দ্রাবলী সমাদরে
ধরে কৃষ্ণের দুটি করে সকাতরে কয় ॥

৯. বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান কৃষ্ণ মিলন লাগি নিশি জাগি বাসর ঘরে।
মিলন নিশি হলো ভোর এলো না শ্যামকিশোর
কিশোরীর আঁখিলোর ঝরিয়া পড়ে অঝোরে ॥

ফুকার তখন সখীর প্রতি রাই শ্রীমতী কাতরে জানায়
করে বাসরশয্যা মরি বেদনায়, হায় হায় গো
কুঞ্জে আসবে বলে চিকনকালা সোহাগে গাঁথিলাম মালা
মালা হলো মরণজ্বালা মালা ভাসিয়ে দে তোরা যমুনায় ॥

মিশ সখী যে যারে ভালোবাসে সকল অন্তর দিয়ে
ওসে কেমনে নিদয় হয়ে হৃদয় দগ্ধ করে ॥

মুখ যার জন্য কাঁদে প্রাণ সেকি এমন পাষাণ

কলো তার পরান কাঁদে সখী কাহার তরে ॥

পঁ্যাচ সখী মন দিলে মনে মিলে না বুঝি বিধির বিধান
দারুণ বিধির কি নাহি ভালোবাসার বিধিজ্ঞান।
তবে কি শুধু শুধু ফুল গড়ে দিলো মধু
যদি না খুঁজে ফুলের মধু, ফুলে পড়ে মধুকরে ॥

মুখ যার জন্য কাঁদে প্রাণ সেকি এমন পাষাণ
কলো তার পরান কাঁদে সখী কাহার তরে ॥

খোচ মন বিনা মনের ব্যথা কে বুঝিতে পারে ॥

ফুকার সখী দেহের ক্ষত সারে প্রলেপ দিলে তার উপরে
পোড়া মনের ক্ষত সারে না আর, হায় হায়
আঘাতে সোনা ভাঙিলে জোড়া লাগে পোড়া দিলে
কোনো রূপে মন ভাঙিলে সেই ভাঙা মন জোড়ানো ভার ॥

মিশ সখী মনের দাগ সারে নাকো বুঝি এ জীবন গেলে
সে যে কী আগুন দিলো জ্বেলে আমার বুকের পরে ॥

মুখ যার জন্য কাঁদে প্রাণ সেকি এমন পাষাণ
কলো তার পরান কাঁদে সখী কাহার তরে ॥

অন্তরা যারে আপন ভাবিয়া সজনী গো মন-পরান দিলাম গোপনে
এমনভাবে ভালোবেসে আমারে সই ভুলিবে সে
একদিনও তাই ভাবি নাই স্বপনে, সজনী গো, হায় গো
এনে ভালোবাসার তীরে বিঁধিয়া পিরিতের তীরে
যুবতীরে এতো কাঁদায় কেনে
সে যে মানুষ এতো নিঠুর তবু কেন লাগে মধুর
আমার কেন যেন জাগে হেন মনে, সজনী গো, হায় গো
এতো যে কাঁদায়ে মারে, তবু কেন চাহি তারে
তারে তারে রেখেছে বন্ধনে
আমি একবার ভাবি ভুলিব তায়, ভুলের কথা ভুল পড়ে যায়
আমি কূল পাই না সই জীবনে মরণে, সজনী গো ॥

চিতান কেমন করে কহো ঘরে ফিরি সহচরী।
আমার ঘরের কুল পরের কুল ভেঙে গেলো দুকুল।
প্রাণের আশা মুকুল নিরাশায় শুকালো ঝরি ॥

ফুকার তারে সকল দিয়ে ব্যথা নিয়ে কেমনে বেঁচে রই
আমার সব গিয়েছে প্রাণের ব্যথা গেলো কই, হায় গো
মন চাহে মন মানুষ রতন, যদি মরে আমি পাই গো জীবন

যেন আমি তাহার মনের মতন হই ॥

মিশ সখী মনের দাগ সারে নাকো বুঝি এ জীবন গেলে
সে যে কী আগুন দিলো জ্বেলে আমার বুকের পরে ॥

মুখ যার জন্য কাঁদে প্রাণ সেকি এমন পাষাণ
কলো তার পরান কাঁদে সখী কাহার তরে ॥

১০. নিশিকান্ত সরকার

চিতান মধুর কৃষ্ণলীলা প্রেমের খেলা প্রেমিকে প্রেমে বিভোলা
প্রেমবিবাদী কালকুটিলা সে প্রেমে বাদী।
যেমন দেখে পাপী রত্নাকরে জল ছিলো না রত্নাকরে
অপ্রেমিক দেখিলে পরে শুকায় প্রেমনদী ॥

ফুকার একদিন গোষ্ঠখেলা অবসানে নাগর কালিয়া
কেলিকদম্বের ডালে খেলে হেলিয়া দুলিয়া, হায় হায় হায়
কালকুটিলা গিয়া জলে শ্যামকে দেখে কদম ডালে
জলভরা কলসী ফেলে ঘরে যায় পালিয়া ॥

মিশ ব্যস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বলে রাধিকারে
সোনাবউ তুই থাকিস ঘরে হয়ে শত সাবধান ॥

মুখ কালো ভূতের ভয় লেগেছে জলের ঘাটে কদম গাছে ভূতের বাসস্থান ॥

প্যাঁচ কালো ভূত এসেছে দেশে, কদমতলায় রলো বসে
ঘাড় ভেঙে খায় রক্ত চুষে কুলবধূ যদি পায়
ঘরের বাহির হলে পরে, কখন যেন ভূতে ধরে
জল আনিবার ছলা করে যাস না লো বউ যমুনায় ॥

মিশ কলসী কাঁখে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী
দৃষ্টি করে তাহার প্রতি নষ্ট করে কুলমান ॥

মুখ কালো ভূতের ভয় লেগেছে জলের ঘাটে কদম গাছে ভূতের বাসস্থান ॥

খোচ পড়লে সে ভূতের কবলে অকালে যায় প্রাণ ॥

ফুকার কুচকুচে বিদ্‌ঘুটে কালো সে ভূতের চেহারা
ও তার কটিতটে পীতধটি গলে গুঞ্জাছড়া, হায় হায় হায়
অধরে অমিয় ঝরে, হাসিতে উদাসী করে
কুলবধূ দেখলে পরে করে চোখ ইশারা ॥

মিশ কলসী কাঁখে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী
দৃষ্টি করে তাহার প্রতি নষ্ট করে কুলমান ॥

মুখ কালো ভূতের ভয় লেগেছে জলের ঘাটে কদম গাছে ভূতের বাসস্থান ॥

অন্তরা কালো ভূত দেখে যমুনার পারে পরান কাঁপে ভূতের ডরে
ও তুই একলা গেলে জলের ঘাটে গো রাধা, তোরে কখন যে ভূতে ধরে
রাধে গো রাধে, বারো ভূত তার সঙ্গে আছে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচে
মাঝে মাঝে কদম গাছে লাফ দিয়ে চড়ে।
তারে ঘরের বাহির করে ছাড়ে গো রাধে, ভূতে যার উপরে দৃষ্টি করে ॥

চিতান রাধে কদমতলা ভূতের থানা ভূত মিলেছে বারো জনা
তাইতে তোরে করি মানা ও পথে যেতে।
ও সে ভূতের দৃষ্টি পড়ে যদি হবে তোর অসাধ্য ব্যাধি
খাটবে না মন্ত্রৌষধি সে ভূত ছাড়াতে ॥

ফুকার রাধে নতুন ধরন নতুন গড়ন আঁখি বাঁকা বাঁকা
ও তার আজানুলম্বিত ভুজে নররক্ত মাখা, হায় হায় হায়
করেতে পাচনী ধরা, ঠোঁট দুটি তার রক্তে ভরা
ভূতের মাথায় মোহনচূড়া তাতে ময়ূরপাখা ॥

মিশ কলসী কাঁখে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী
দৃষ্টি করে তাহার প্রতি নষ্ট করে কুলমান ॥

মুখ কালো ভূতের ভয় লেগেছে জলের ঘাটে কদম গাছে ভূতের বাসস্থান ॥

১১. স্বরূপেন্দু সরকার

চিতান একদিন শ্রীরাধিকা কুঞ্জবাসে আঁখি মুদি ভাবাবেশে
কভু কাঁদে কভু হাসে মনপ্রাণ আকুল।
হেনকালে আসি ললিতে লাগিল সে বলিতে
রাধে লো তুই চলিতে পথ করেছিস ভুল ॥

ফুকার রাধে যাহার লাগি আহার ত্যাগী কাঁদিস একাকিনী
ও তুই জানিস না সে তোরে নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি, হায় হায় হায়
ব্রজপুরী পরিহরি, মথুরায় গিয়াছে হরি
আবার কুজা রেখেছে ধরি ঐশ্বর্যেতে কিনি ॥

মিশ শুনে সখীর মুখে শ্রীরাধিকা এ হেন সংবাদ
ভেঙে গিয়ে অন্তরের বাঁধ প্রাণে জাগে হা-হুতাশ ॥

মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥

প্যাঁচ শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যং বৃন্দাবন পরিত্যজ্যং
ন গচ্ছামি পাদমেকং জানো নাকি ললিতে।
শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত, মিথ্যা কভু হবার নাতো
যদিও হয় আমি তাতো মুখে নারি বলিতে ॥

মিশ প্রেমের ধর্ম ভক্তি বিশ্বাস জানি বিলক্ষণ
রাধার এ রবে ততোক্ষণ যতোক্ষণে আছে শ্বাস ॥

মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥

খোচ চিন্তা কি যার চিত্ত বিত্ত পিরিত মূল্যে খাস ॥

ফুকার সখী তবে কেন ভুলাতে চাস আমাকে অযথা
জানি ধেনুবৎস হতে তারে পাবে গুল্মলতা, হায় হায় হায়
চিত্তহারী বংশীধারী যে দেয় তারে ভক্তিবারি
তাহারে সে যায় না ছাড়ি তার সনে কয় কথা ॥

মিশ আমা হতে তোরা যারা গুণশালিনী
পাবি তারা নীলমণি অবিশ্বাসীর হাহুতাশ ॥

মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥

অন্তরা হারে বলো না ললিতা, কোথা কেমন করে যাবে কালা
আমি নিত্য যারে চিত্তে সাজাই দিয়ে বনফুলের মালা।
হারে ও সখীরে, বন্ধু আমার যাবে যথা আমাকেও নিবে তথা
এ কথা নহে অন্যথা কহে নন্দলালা।
ইহার অন্য হবে, দেখবে যবে বাসী হবে আমার ফুলমালা।
হারে ও সখীরে
যেমন উঠে নাকো পাষাণের দাগ জল কাটিলে হয় না দুভাগ
তেমনি কৃষ্ণ অনুরাগ, নয় ছেলেখেলা
কেমনে শ্যামশুকপাখি দিবে ফাঁকি রাখি নাই তো দুয়ার খোলা ॥

চিতান সখী ঐশ্বর্য থাকিতে প্রাণে, বন্ধু বাঁধন নাহি মানে
ললিতা তুই কোন পরাণে বলিলি এমন
জানি যথা পূর্ণ মধুর রস, তথা আমার বধুঁ বশ
রসানাং সমূহ রাস যথা গোপীগণ ॥

ফুকার সখী সাধারণী সামঞ্জসা আর সামর্থা রতি
সখী কোন রতিতে নিত্য বাধ্য রহে গোকুলপতি, হায় হায় হায়
রাধা ডুবে শ্যামসাগরে ধরতে তায় পারে বিকারে
কিন্তু তোর অবিশ্বাস বধুঁয়ারে তাহে মোর আপত্তি ॥

মিশ তোরা যতো করিস নিন্দে সবই বুঝি ভুল।
বন্ধু কি মোর ছাড়ে গোকুল গলে যাহার প্রীতি ফাঁস ॥

মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥

১২. রবীন্দ্রনাথ সরকার

চিতান মধুর ব্রজলীলা পরিহরি মথুরাতে গেলেন হরি কিশোরী অধীরা বেদনায়
তারে বুঝায় বৃন্দে সজনী, কেন কান্দিস দিবারজনী
ঘরের ঘরনি এটা তোর অন্যায় ॥

ফুকার রাধে এতো ভালোবাসলি যারে জীবনযৌবন দিয়ে
ও সে তোরে থুইয়ে বহু দূরে সুখী হয় গিয়ে, হায় হায় হায়
পুরুষ যে সই এতো কঠিন, আমি ভাবি নাই কোনো দিন
কেন তার জন্য তনু করিস ক্ষীণ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥

মিশ ব্রজ ছেড়ে যাবো না বন্ধু এক পদ দূরে
হারাইয়া সেই বন্ধুরে চিত্ত কেন এতো চঞ্চল ॥

মুখ বঁধুয়াকে দিব এনে চল সখি মোর কথা মেনে সেই মথুরাতে চল ॥

প্যাঁচ সেদিন বন্ধু গেলো চন্দ্রার কুঞ্জে সারা নিশি এলো ভুঞ্জে
পরাণবন্ধুর কতো গুণ যে সকলে জানি।
তারে পায়ে ধরিয়ে দিলো দাসখৎ, খতে রয় বন্ধুর দস্তখত
আমার সাথে হইয়ে একমত, চল যাই তারে ব্রজে আনি ॥

মিশ কুজি নাকি সুজি হলো প্রেমধনে ধনী
কুজের মধ্যে বংশীর ধ্বনি চলিতেছে অবিরল ॥

মুখ বঁধুয়াকে দিব এনে চল সখি মোর কথা মেনে সেই মথুরাতে চল ॥

খোচ পিরিতের কুরীতি এমন দুর্নীতি ভরা ছল ॥

ফুকার রাধে কলঙ্ক অলঙ্কার করে পরেছিস গলে
আসি বলে কালোশশী গিয়েছে চলে, হায় হায় হায়
দিনে দিনে দিন ফুরালো, মাসে মাসে বছর গেলো
এলো না শ্যাম চিকনকালো, গেলো কী বলে ॥

মিশ মুখে মধু ভরা শুধু বুকে ভরা বিষ, তবু কেন তারে ভাবিস
ঝরাইয়া দুই আঁখির জল ॥

মুখ বঁধুয়াকে দিব এনে চল সখি মোর কথা মেনে সেই মথুরাতে চল ॥

অন্তরা প্রেমাগুনে পুড়ে পুড়ে সোনার দেহ হলো কালা
ও তুই নারী বলে বেঁচে আছিস সই সহিয়া বিরহের জ্বালা।
রাধে গো রাধে, সুহৃদ চিনে করলে পিরিত, ঘটতো না হেন বিপরীত
এখন তোর বোঝা উচিত আসবে না কালা।
তবু কার আশাতে আপন হাতে গাঁথিস বিনে সুতার মালা ॥

রাধে গো, ছাড়িয়া তোর স্বীয় ধর্ম, ত্যাগ করেছিস গৃহকর্ম
দেখাতে পিরিতির মর্ম নিস দুঃখের ডালা।
এখন কান্নাকাটি হলো সার আর কুল হারালি কুলবালা ॥

চিতান ও তোর শাশুড়ি আর ননদিনী, অবাধে হয় বিবাদিনী
দিনযামিনী পোহাইস সেই আগুন।
ও তুই যা করলি যে আশাতে, পরে প্রেমের নেশাতে
ভালোবাসাতে সে জ্বালায় দ্বিগুণ ॥

ফুকার রাধে এখনো আমার কথা শোন কই তোর সদনে
ভুলে ঐ নিঠুরের কথা আনিস না মনে, হায় হায় হায়
তোর মুখে দিয়ে চুনকালি বিদায় নিলো বনমালী
এ নির্দয়ের পায়ে নয়নজল ঢালি কি লাভ জীবনে ॥

মিশ বৃন্দে বলে বিনোদিনী স্থির হইয়ে দাঁড়া
রবি কয় বঁধুয়া ছাড়া কে নিভাবে এই অনল ॥

মুখ বঁধুয়াকে দিব এনে চল সখি মোর কথা মেনে সেই মথুরাতে চল ॥

১৩. বিনয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান একদিন ব্যাকুলিতা রাধা কেন্দে ডেকে কহে ওহে বৃন্দে
এনে দেখা প্রাণগোবিন্দে নয়নাভিরাম।
আমি হারা হয়ে কৃষ্ণচান্দে আর কতো কাল মরি কেন্দে
এতোদিনের এই আনন্দের এই কি পরিণাম ॥

ফুকার বৃন্দে লো তমাল তলে বসে ছাড়ি হাই
আমি আঁখি মুঁদে শুনলাম বাঁশি বাজালো কানাই
হায় এমন মধুর বাঁশির তান, বিশ্ব শোনে পাতিয়া কান
সুরসাগরে ভাসায়ে প্রাণ, ও শ্রীগোবিন্দের সুরানন্দ পাই ॥

মিশ দেখবো বলে কৃষ্ণকালা খুঁজি তমালশাখা
শাখায় দেখি ফুলে ঢাকা, কৃষ্ণ নাই তমাল গাছে ॥

মুখ বল দেখি লো প্রাণসখী চাইলে কেন শূন্য দেখি
আমায় ছেড়ে কমলাঁখি কী সুখে আছে ॥

প্যাঁচ আসি বলে আর এলো না বৃন্দাবনে ফিরিয়া
আমায় বুঝি কাঁদাইবে এ জনম ভরিয়া ·
বৃন্দে আমার হলো এ কি, আমি কেন কিসের লাগি বকি
আমারই বেদনা জেনে গোবিন্দের যাও অন্বেষণে

মথুরার ঘরে ঘরে ফিরিয়া।
দেখা হলে বোলো তারে ভালোবেসেছিলো যারে
অভাগিনী কাঁদে তোমায় স্মরিয়া ॥

মিশ ফুলের বাসরে আমার নাহি গোবিন্দ
শুকনা ফুলে আজো গন্ধ মন্দ মন্দ বহিছে ॥

মুখ বল দেখি লো প্রাণসখী চাইলে কেন শূন্য দেখি
আমায় ছেড়ে কমলাঁখি কী সুখে আছে ॥

খোচ আমার ন্যায় দুঃখিনী ভবে আর কেউ কি আছে ॥

ফুকার বৃন্দে লো, পূর্বের কথা হইলে স্মরণ
আমর আঁখির জল ঝরিয়া পড়ে মানে না বারণ।
হায় এতো ভালোবেসেছি রে, প্রতিদান পাই নাই ফিরে
এমন ভালোবাসাটিরে ও কোন রমণী করেছে হরণ ॥

মিশ ফুলের বাসরে আমার নাহি গোবিন্দ
শুকনা ফুলে আজো গন্ধ মন্দ মন্দ বহিছে ॥

রমুখ বল দেখি লো প্রাণসখী চাইলে কেন শূন্য দেখি
আমায় ছেড়ে কমলাঁখি কী সুখে আছে ॥

অন্তরা আমায় দুখ সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ভুলে গেছে বনমালী।
আমি সুখের আশায় ঘর বাঁধিয়া শুধু রয়ে গেলাম ব্যথার ডালি।
সইরে, শ্যামকলঙ্ক অঙ্গে মাখি, এতো জ্বালা সয়ে থাকি
দয়া করে বলিস সখী কালা তো আসিবে কালই।
বলিস অভাগিনী প্রাণ ত্যেজেছে সইরে কুলের মুখে দিয়ে কালি ॥

চিতান তারে আর একটা দিন দেখতাম যদি ভরিত মোর জীবননদী
বিধি যাবে দেয় রে ব্যাধি বৃথা তার আশা।
আমার পূর্ণ শশী গেলো চলে হাসি মুখে মসি ঢেলে
আছি অমানিশার কোলে ভাগ্যের দুর্দশা ॥

ফুকার বৃন্দে লো, তোদের কথায় মানিনী হইয়া
ছিলাম বৃন্দাবনে মান বদনে কথা কইয়া
হায় আমার এই অভিমানের দায় কেঁদেছিলো ধরিয়া পায়
বুঝি অভিশাপ সে দিয়ে আমায় জন্মের মতো গেছে ছাড়িয়া ॥

মিশ ফুলের বাসরে আমার নাহি গোবিন্দ
শুকনা ফুলে আজো গন্ধ মন্দ মন্দ বহিছে ॥

মুখ বল দেখি লো প্রাণসখী চাইলে কেন শূন্য দেখি
আমায় ছেড়ে কমলাঁখি কী সুখে আছে ॥

পরিশিষ্ট ৫

কবি বা লহর কবি .

১. রামু সরকার: শরাঘাতের কবি

চিতান অর্জুন আমার নামটি বটে আমি হই পাণ্ডুরাজনন্দন।
একটি তত্ত্ব পেয়ে সত্য জানতে উন্মত্তের প্রায়, মরি হায়
এসেছি দ্বারকা ভুবন ॥

ফুকার হায় মরি হায়
কী সর্বনাশ ঘটালে এসে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত, হায় হায় রে
বিধি শিব নারদ নরে যে চরণ চিন্তা করে
সে পদে তুই কোন বিচারে কল্লে শরাঘাত ॥

মিশ তোর অঙ্গ কালো চক্ষু রাঙ্গা আমার যে দেখে করে ভয়।
তুই কোথায় ছিলি এথায় এলি বল শুনি তুই কার তনয় ॥

মুখ কেরে তুই জংলি মস্থা নাইরে তোর ধর্মে আস্থা
বুদ্ধি খাস্তা পেলেম পরিচয় ॥

প্যাঁচ যে কৃষ্ণ জগতের সার তারে তুই কল্লি সংহার
দুরাচার কেমন তোর অন্তর
লক্ষ্মী সেব্য বিধি ভাব্য কৃষ্ণ কলেবর।
তোর মতো দেখি না বর্বর জানলাম তোর পশু হৃদয় ॥

মুখ কেরে তুই জংলি মস্থা নাইরে তোর ধর্মে আস্থা
বুদ্ধি খাস্তা পেলেম পরিচয় ॥

খোচ তোর মতো দেখি না এমন দুষ্ট দুরাশয় ॥

ফুকার তোর জংলির ন্যায় জংলি স্বভাব, সর্বদা থাকিস জঙ্গলে
তোরে মানুষ কে বলে, হায় হায় রে
তীর ধনুক হাতে রাখি সর্বদা মারিস পাখি
পরমধন কমলাঁখি, তাঁরে মারলি কী বলে ॥

মিশ যে শরে প্রাণকৃষ্ণ মরে, কে তোরে দিলো এমন শর
জানতে চাই তোর আদত খবর ভেঙে বলরে সমুদয় ॥

মুখ কেরে তুই জংলি মস্থাঁ নাইরে তোর ধর্মে আস্থা
বুদ্ধি খাস্তা পেলেম পরিচয় ॥

অন্তরা মরি হায় কী উপায় কুলনারী অকূলেতে ভেসে যায়
কানতেছে কৃষ্ণশোকে সর্বদায়।
জীবনসর্বস্ব কৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকায় কৃষ্ণ সকলের উপায়
কেন সেই কৃষ্ণকে বধ করিয়ে জগৎ কল্লে নিরুপায় ॥

চিতান দয়ার সাগর শ্যাম নটবর কী তাহার ছিলো অপরাধ
তুই কী আক্রোশে কিবা দোষে ঘটালি প্রমাদ
তোর সঙ্গেতে কৃষ্ণের কী ছিলো মনোবাদ ॥

ফুকার দয়ার সাগর কৃষ্ণচন্দ্র নিদয় ক্যান হলি তার প্রতি
তোর একি কুমতি, হায় হায় রে
সাধে বিষাদ ঘটালে, পাপের তাপেতে জ্বলে
ঘটবে রে তোর অন্তকালে বিষম দুর্গতি ॥

মিশ যে শরে প্রাণকৃষ্ণ মরে কে তোরে দিলো এমন শর
জানতে চাই তোর আদত খবর ভেঙে বল সমুদয় ॥

মুখ কেরে তুই জংলি মস্থাঁ নাইরে তোর ধর্মে আস্থা
বুদ্ধি খাস্তা পেলেম পরিচয় ॥

২. তারকচন্দ্র সরকার: পাশাখেলার কবি

চিতান পাশাতে সর্বস্ব হারি ধর্ম নরবর
যতো দুষ্টগণে কষ্ট দিতে ধর্মের প্রাণে পাপের পথে হলো অগ্রসর ॥

ফুকার করে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে দুঃখানলে দুঃশাসন ভীষণ অত্যাচার
ভয়ে সতী করে হাহাকার, হায় হায় গো
কুরুসভায় ধরে এনে, দুর্বল অবলার বসন টানে
চেয়ে পঞ্চপতির পানে সতীর দুনয়নে বহে শতধার ॥

মিশ আর তো এ সময়ে কেউ নাই যে এসে রক্ষা করে
দুই বাহু উঁচু করে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বলে ॥

মুখ দীনবন্ধু হরি আর সইতে নারি বিপদকালে কোথায় র'লে ॥

প্যাঁচ বেঁধে ধর্মপুত্রে ধর্মসুতে চৌদিকে হাসে সব কৌরব
পাষণ্ডের পক্ষে হয় মহাগৌরব
আজ সেই ন্যায্য ধর্মের গৌরব বুঝি গেলো চলে ॥

মুখ দীনবন্ধু হরি আর সইতে নারি বিপদকালে কোথায় র'লে ॥

খোচ দয়াময় নামটি যাবে দুষ্টের কৌশলে ॥

ফুকার থাকতে পঞ্চপতি বর্তমান গেলো কুরুসভায় কুলমান
সইতে নারি আর দারুণ বিধাতার কী অবিচার, হায়
পরের দুঃখ দেখলে চক্ষে প্রাণ দিয়ে যে করে রক্ষে
কেউ নাই রে সে ধর্মের পক্ষে, বুঝলাম দুঃখের সময়ে কে বা কার ॥

মিশ ঐ বৃকোদর বসে আছে জড় বৃক্ষের মতো
মরমের দুঃখ যতো উঠছে জ্বলে জ্বলে ॥

মুখ দীনবন্ধু হরি আর সইতে নারি বিপদকালে কোথায় র'লে ॥

অন্তরা আমার এখনো যে প্রাণ দেহে আছে আর কতো আছে বাকি
আমার স্বামীগণ সম্মুখে, বস্ত্র নাই মস্তকে, হস্ত দিয়ে এখন বক্ষ ঢাকি।
এই কলঙ্ক কালিমা অঙ্গে মেখে কোন সুখে আমি বেঁচে আছি ॥

চিতান পড়েছি আমি এই ঘোর নরকে রক্ষক কি কেউ নাই
ভীষণ বিভীষিকা, নরকাগ্নির শত শিখা, হৃৎপিণ্ড হলো ছাই ॥

ফুকার তুমি নরক অন্তকারী শ্যাম, তোমার নরক-বারক হরিনাম, নয়ন মুঁদে লই
আর তো উপায় নাই হে তোমা বই, হায় গো
হরি তোমার কৃপা হলে, ত্রিলোক তরে অবহেলে
এ দাসীরে উপেক্ষিলে, তোমার দয়াময় নাম থাকে কই ॥

মিশ যা করো হে অন্তর্যামী তুমি হও প্রাণস্বামী
সুখ-দুঃখ সকল তুমি প্রাণের মধুসূদন
পাই যেন দেখা অন্তিমকালে ॥

মুখ দীনবন্ধু হরি আর সইতে নারি বিপদকালে কোথায় র'লে ॥

৩. হরিচরণ আচার্য: কাক-কোকিলের কবি

চিতান আর বসন্তকাল মাঘের শেষে আমগাছের ডালে বসে
সুরসে কোকিল দিলো ডাক।
তখন উড়িয়ে এসে জুড়িয়ে বসে
হুতাশ মনের আপশোসে বলতেছে দাঁড়কাক ॥

ফুকার বাছা বলবো কী, তুমি কোকিল আমি কাউয়া, পাওয়া ধন হারা হয়েছি
বড়ো কষ্টেতে আছি।
হায় প্রাণ আমার কেমন করে, সোনার চান জানিস নারে
কতো গু খাওয়াইয়া আমি তোরে পালন করেছি ॥

মিশ আমি তোর উদ্দেশে দেশে দেশে বেড়াই ঘুরে
বাছা অনেক দিনের পরে তোরে আজ বুঝি মিলাইয়াছে ভগবান ॥

মুখ বিচ্ছেদে ছিলাম কাতর, বাছা অনেক দিন পর

শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজখান ॥

প্যাঁচ আমার বাসা ঘরখান পেয়ে খালি তোর মা রাঙ্গাচক্ষি ফাত্রাশালী
তোরে তো গেলো প্রসব করে।
যখন পাখ জালাইল তোর উড়ে গেলো দেশান্তর।
আগে তোর বলে কুশল খবর, চান্দমুখে বাপ ডেকে আজ জুড়া প্রাণ।
আয় শিখাবো কাকচরিত্র রাখবো না অজ্ঞান।
বাছা শুনেছি নন্দালয়ে পালিত হইল বাসুদেব দৈবকীর কুমার
শেষে দুর্দশা অপার।
হায় দুই দিন পর শ্রীগোবিন্দ, ত্যজলেন ব্রজের সম্বন্ধ
যেমন নন্দ ঘোষের কপাল মন্দ, সে দশা আমার ॥

মিশ হায় হায় মনের খেদে তোর বিচ্ছেদে জীবন জ্বলে
পুত্র কাহা কাহা কাহা বলে আমি তো হিন্দি ভাষায় করি গান ॥

মুখ বিচ্ছেদে ছিলাম কাতর, বাছা অনেক দিন পর
শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজখান ॥

অন্তরা ছেড়ে দে কু-অক্ষর কুহু স্বর, আয় থাকি বাপবেটাতে একত্র
আমার কথা রেখে কাছে থেকে সর্বদা শিক্ষা কর কাকচরিত্র।
বাছা তুই রে আমার পোষ্যপুত্র, খুব স্নেহের পাত্র, আর তো নাই কন্যাপুত্র
মরি হায়রে যতো পায়খানার ও গাংপারের ও
তোর নামে লিখে দেবো দানপত্র ॥

চিতান ও তুই আমার মায়া ত্যাজ্য করে এই সোনার রাজ্য ছেড়ে
ছিলি কোন অধর্মের দেশে।
ও সে নাই রে ধর্ম নাই সে কর্ম নাই সে ভাব
হইল কুস্বভাব কু-এর বাতাসে করিস কুসঙ্গ
এক দুষ্ট সেই মলয় পবন পাপিষ্ঠ বসন্ত মাতাল
শালায় মানুষ করে কাল।
ভ্রমর এক বিষম পাজি সে ভুলায় কুলের বৌঝি
ও তুই সারা রাত মদ খাইয়া বুঝি চক্ষু করছিস লাল ॥

মিশ আমি তোর উদ্দেশে দেশে দেশে বেড়াই ঘুরে
বাছা অনেক দিনের পরে তোরে আজ বুঝি মিলাইয়াছে ভগবান ॥

মুখ বিচ্ছেদে ছিলাম কাতর, বাছা অনেক দিন পর
শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজখান ॥

৪. রাজেন্দ্রনাথ সরকার: গাঁজার কবি

চিতান একজন গাঁজাখোরের চালের বাতায় গাঁজা পেয়ে ইন্দুরে খায়

পেয়ে সে গাঁজার ভালো রস।
একদিন রাত্রে এসে কলকি ধরে মারে টান
হলো সে হতে গাঁজার নেশায় বশ ॥

ফুকার নিত্য গাঁজাখোরের খাবার পরে অন্ধকারে কলকি ধরে ইন্দুরে নিত্য গাঁজা খায়
একদিন গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে ইন্দুরনির কাছে যায়।
ডেকে কয় প্রিয়ার প্রতি, কই আমার হৈমবতী
এখন আমি হলাম পশুপতি, তুই আমার কালী সেজে আয় ॥

মিশ ইন্দুরনি তাই শুনতে পেয়ে গাঁজা কয় মন্দ
অমনি ইন্দুররূপী সদানন্দ ইন্দুরনিকে দেয় গালি ॥

মুখ গাঁজায় কয় মধুর গন্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ মুখছুঁচো শালী ॥

প্যাঁচ আমার মনে মনে ছিলো আশা, প্রাণ থাকতে ছাড়বো না তোর ভালোবাসা
আমি তো শিব হয়ে গিয়েছি
এখন তুই হলে পর আমার মতো সেই আনন্দে নাচি।
আমি দিয়ে গাঁজায় টান হয়ে আছি সটান-টান
যদি এই বুকে হবি অধিষ্ঠান, কথা মান, গাঁজায় টান দিয়ে সাজ কালী ॥

মুখ গাঁজায় কয় মধুর গন্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ মুখছুঁচো শালী ॥

খোচ এবার গাঁজা নিন্দা করে তুই দুকুল মজালি ॥

ফুকার ভবে গাঁজা মন্দ হলে পরে খাবে কেন যতন করে
দেবের দেব সদাশিব গোঁসাই।
গাঁজার নেশার ঝোঁকে কেমন ঠেকে কিসে বুঝবি তাই।
তুই শালী কালী হতে পারলি না কুবুদ্ধিতে
আমায় বিদায় দে আজ কলকি হাতে আমি আজ কৈলাসেতে যাই ॥

মিশ এখন আর কোনো সম্বন্ধ নাই লো তোর সাথে
আমি যাত্রা করলাম কৈলাসেতে, তুই কিন্তু ছাইগাদায় পড়ে রলি ॥

মুখ গাঁজায় কয় মধুর গন্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ মুখছুঁচো শালী ॥

অন্তরা দিয়ে আজ গাঁজায় টান, মজায় প্রাণ
সুন্দরী আমি তো আর আমি নাই।
যত্র জীব তত্র শিব শাস্ত্রে শুনতে পাই, আমার ঘটিয়াছে তাই
কেবল গাঁজার নিন্দা করলি বলে আজ আমি তোর কপালে মুতে যাই ॥

চিতান হায় হায় যে না বুঝে গাঁজার কলি
তারে কি আর মানুষ বলি, কলিতে বৃথা জন্ম তার।
আমি গাঁজা খেয়ে মজা পেয়ে নাচিয়ে পেলেম না চেয়ে জন্মমৃত্যু পার ॥

ফুকার ছিলাম এতোদিন গণেশের বাহন, আজ হলাম তার বাপ ত্রিলোচন
এখন তো গণেশ আমার ছেলে।
এখন দুর্গাদেবী ডাকবে আমায় প্রাণকান্ত বলে।
দুর্গার মস্তকে রবো, দু-এক দিন পূজা খাবো
তোরে মাঝে মাঝে দেখতে পাবো গণেশের দুই ঠ্যাঙের তলে ॥

মিশ আমি ববম বলে থাকবো পড়ে কালীর পা-র তলে
কভু আর আসবো না ইন্দুরকুলে, পূজাতে পাবো সব মেড়া বলি ॥

মুখ গাঁজায় কয় মধুর গন্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ মুখছুঁচো শালী ॥

৫. নকুলেশ্বর সরকার: জল ও কুম্ভের কবি

চিতান গোঁসাই নরোত্তমের ভক্তিকাব্য, শুনিবেন সভার সভ্য
যতো সব নব্য মনীষী।
মুচির অশুচি পরশে একদিন জলকুম্ভ মরে
অমনি জলের উপরে ঘৃণায় রাগ করে বলে কলসী ॥

ফুকার তখন কলসী হয়ে অসন্তুষ্ট জলকে বলে তুই কী দুষ্ট, পাপিষ্ঠ কমজাত
নইলে আমার মতো কাহার এতো উন্নত বরাত।
হায়, আমি এই কলসী বেশে পূজা পাই দেশে দেশে
তোরে আশ্রয় দিয়ে ভালোবেসে তোর দোষে গেলো আমার জাত ॥

মিশ তখন কলসীর বাক্য করে লক্ষ দুঃখে বলে জল
ও তোর মূর্খের মতো বাক্য সকল তোর সনে তর্ক করে স্বার্থ কী ॥

মুখ কলসী তুই কিসে বেশি ভবে তুই দোষী না আমি দোষী ভেবে দেখ দেখি ॥

প্যাঁচ তোরা কলসী গ্লাস হুঁকা পণ্ডিতে আমাকে আবদ্ধ করে গণ্ডীতে
সমাজে করলি কলুষিত।
নইলে নদীর জলে দধির জলে আমার মান্য কতো।
আমি গাঙে ছিলাম গঙ্গাজল সঙ্গদোষে হই নকল
নইলে অজ্ঞানান্ধ হিন্দুসকল, সচল জল অচল করতে পারতো কি ॥

মুখ কলসী তুই কিসে বেশি ভবে তুই দোষী না আমি দোষী ভেবে দেখ দেখি ॥

[illegible] জীবনস্বরূপ জীবনের জীবন মরে কি ॥

ফুকার [illegible]ন সাগরবক্ষে অসীম ছিলাম, সসীম জীব প্রণাম সেলাম করতো পায়
গঙ্গে [illegible] পাতক সংহন্ত্রী বলে মন্ত্রগীতি গায়, হায়
ভাণ্ড তোর [illegible]তে, জলের হয় দণ্ড পেতে
আমায় মুক্তি দে তো[illegible] গণ্ডী [illegible]তে, উঠি গে পণ্ডিতের মাথায় ॥

মিশ যখন উষ্ণ হয়ে গ্রীষ্ম এসে এ বিশ্ব পোড়ায়
সবার পোড়া দেহ জলে জুড়ায়, হোক সে পুণ্যাত্মা কি পাতকী ॥

মুখ কলসী তুই কিসে বেশি ভবে তুই দোষী না আমি দোষী ভেবে দেখ দেখি ॥

অন্তরা মাটি তোর খাঁটি জন্ম হলো এই জলের মলে
তাইতে তোয়ং উৎপদ্যতে মহী চিরদিন রহিস এই জলের তলে।
ডেকে অম্বু কহে পূর্ণ কুম্ভ মান্য দাও বটে
অম্বুশূন্য হলে কুম্ভ দম্ভ যায় ছুটে, দেখলে অযাত্রা ঘটে, মরি হায় হায় রে
ও তুই জলটানা মালটানা মুটে, তোর কি আর বড়াই খাটে ভূতলে ॥

চিতান ভবে জল মরে না ভাণ্ড মরে, না বুঝে অবিচারে আমার দোষ ধরে নাস্তিকে
আমি মর-অমর খেচর-ভূচরে সবারে বাঁচাই
করে মোর গুণ যাচাই, নিজে শিব গোঁসাই রাখেন মস্তকে ॥

ফুকার দেখি কলসী তুই ভ্রান্ত শ্রান্ত, জলের গতি অনন্ত, অন্ত পাওয়া ভার
আমার জাতি অন্ত করতে নারে ডোম মেথর চামার।
জল অচল বক্ষে ধরি পাপীর পাপ ক্ষালন করি
এখন সান্তের দায় অনন্তে মরি, ভ্রান্তের এই সিদ্ধান্ত বিচার ॥

মিশ যখন উষ্ণ হয়ে গ্রীষ্ম এসে এ বিশ্ব পোড়ায়
সবার পোড়া দেহ জলে জুড়ায়, হোক সে পুণ্যাত্মা কি পাতকী ॥

মুখ কলসী তুই কিসে বেশি ভবে তুই দোষী না আমি দোষী ভেবে দেখ দেখি ॥

৬. বিজয়কৃষ্ণ সরকার: পঞ্চপাণ্ডবের কবি

চিতান গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব গয়াধামে পিণ্ড দিতে পাণ্ডুর নামে
পাণ্ডার নিকটে দণ্ডায়মান।
তখন পিণ্ড করে পাণ্ডার ধারে বসলেন ধনঞ্জয়
শিবনাথ পাণ্ডা কয় তাহার বিদ্যমান ॥

ফুকার ডেকে শিবনাথ বলে কথা ধরো, কুশাগ্র করে করো
চিন্তা করো পরিণামে, তোমার পিতৃপুরুষ উদ্ধারিতে এলে এই ধরাধামে
হায় হায় গো, কও দেখি ইন্দ্রের বেটা, এই পিণ্ড পাবে কেটা
শেষে পাণ্ডু রাজার ঘটবে ল্যাঠা, পিণ্ড দেবা তোমার কোন বাবার নামে ॥

মিশ জানি ইন্দ্র আর সেই পাণ্ডু পিতা উভয় স্বর্গস্থ
আমি কী করি তাহার মধ্যস্থ, দায়ভাগে দায় ঠেকলাম খোলা কেটে ॥

মুখ ভেবে পেলেম না দিশে, দিবো কার পিণ্ড আজ কার উদ্দেশে
শেষে তোমার কোন বাবা চটে ॥

খোচ তুমি পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র সবে তাই রটে ॥

ফুকার করতে পুন্নামক নরক হতে ত্রাণ, তাই লোকে চাহে সন্তান
তোমার কেন ব্যবধান দেখি।
যদি ইন্দ্র করে পিণ্ড গ্রহণ পাণ্ডুর উপায় কি।
এই ভবে সবার জানা দুই পিতা সম্ভবে না
অর্জুন তোমার দেখি উলটা সানা, কও ইহার পালটা জবাব কি ॥

মিশ মোদের ধর্মনেতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশিষ্ট সবই
তাদের জন্মদাতা পিতার ছবি চিত্রিত রয়েছে চিত্রপটে।

মুখ ভেবে পেলেম না দিশে, দিবো কার পিণ্ড আজ কার উদ্দেশে
শেষে তোমার কোন বাবা চটে ॥

অন্তরা আমাকে কও অর্জুন বংশের গুণ পূর্ব প্রাচীন ইতিহাসের কথা
তোমার তিন পুরুষের পিণ্ড দিতে গো, আনো গোত্র গোষ্ঠী কোষ্ঠীর খাতা
তোমার বিধবা সেই পিতামহীর জন্মিল নন্দন
এ বড়ো অদ্ভুত বারতা, মরি হায় হায় রে
তোমার পিতামহের জন্মের পরে গো, কে হয় তোমার পিতার জন্মদাতা
তোমার প্রপিতামহ শান্তনু সে
শেষ বিয়ে করে কাহারই সুতা, মরি হায় হায় রে
দিলাম অল্প আভাস কৈবর্তধাম গো, হয় নাকি তার দ্বিতীয় পিতা ॥

চিতান পেয়ে কুন্তী মাদ্রী দুইটি জায়া, পাণ্ডু সাজলো ঢাকের বায়া
রাখে নাই পিতৃবর্ত্মের ধারা।
এই যে যম রাজার আর পবন অর্ক অশ্বিনীকুমার
সম্পর্কে তোমার কী হয় তাহারা ॥

ফুকার শুনি কর্ণ তোমার আর এক ভ্রাতা
আনো হিসাবের খাতা তারে কহে দিবাকরের সুত।
তারে কেউ বলে না পাণ্ডুপুত্র, এ সূত্র অতীব অদ্ভুত, হায় হায় গো
ভেবে কও ইন্দ্রের বেটা এই পিণ্ড পাবে কেটা
বুঝি পাণ্ডু বেচার ঘটবে ল্যাঠা, হবে সে শ্যাওড়া গাছের ভূত।

মিশ জানি ইন্দ্র আর সেই পাণ্ডু পিতা উভয় স্বর্গস্থ
আমি কি তাহার মধ্যস্থ, দায়ভাগে দায় ঠেকলাম খোলা কেটে ॥

মুখ ভেবে পেলেম না দিশে, দিবো কার পিণ্ড আজ কার উদ্দেশে
শেষে তোমার কোন বাবা চটে ॥

৭. অনাদিজ্ঞান সরকার: যোগতত্ত্বের কবি

চিতান কবির কাব্যকমল উঠলো ফুটে, জ্ঞানী ভ্রমর আসে ছুটে
আনন্দে মধু করে পান।
আমার ক্ষুদ্র মানস সরোবরে, নাহি তেমন ফুল
তবু প্রাণ আকুল গাইতে কবিগান ॥

ফুকার ভোলা যোগতত্ত্ব কয় দেবীর কাছে, দেবী ঘুমায়ে আছে
সুখ পাখি সায় দিচ্ছে ধীরে, ভোলা দেখে দেবী ঘুমায়
ভাবে কে ঐ যোগ শ্রবণ করে হায়
ত্রিশূল দেয় পাঠাইয়ে, আনো তায় বিনাশিয়ে
ত্রিশূল ব্যাসপত্নীর নিকটে গিয়ে বিমুখে আসিল ফিরে ॥

মিশ তখন নন্দী বলে ফন্দি করে বন্দিয়া চরণ
তুমি বলো হে পাগলা পঞ্চানন, বিপরীত রীতি কেন দেখা যায় ॥

মুখ যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়া পাছে গিরিজা ঘুমায় ॥

প্যাঁচ ছিলো শুক পাখির ডিম বাসার পরে
তোমার ঐ যোগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, হলো ডিম্ব ফেটে ছানা।
সে যে এমন তত্ত্ব পেয়েছে তায় বধ করতে পারলে না।
এতো তেজ রয় যে যোগে, থেকে সেই যোগের যোগে
কেন পার্বতী পড়লো দুর্যোগে, তম গুণ প্রভাবে কেন নিদ্রা যায় ॥

মুখ যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়া পাছে গিরিজা ঘুমায় ॥

খোচ নিদ্রা আলস্য প্রমাদ তম গুণে পায় ॥

ফুকার যিনি আদ্যাশক্তি জন্মদাতা, সত্যগুণেতে স্নাতা
তায় কেন হয় তম ব্যারাম, এই যোগ পাখি পায় বেশি আরাম, হায়
যে ছিলো বনের পাখি, সে এ যোগ নিলো শিখি
এখন দেবীর চেয়ে বলো দেখি পাখির কি হয় না বেশি দাম ॥

মিশ কেন অন্যেরে চাহ্ না দিতে তোমার এ যোগবল
হবে দেবীকে শুনায়ে কী ফল, হে ভোলা খুলে আজ বলো আমায় ॥

মুখ যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়া পাছে গিরিজা ঘুমায় ॥

অন্তরা বলো কোন যোগে করিতে পারে গর্ভেতে প্রবেশ
কোন যোগ সাধনে কেটে মায়া বাঁধনে পাবে নিত্যের দেশ।
তুমি জ্ঞানের গুরু যোগের গুরু জ্ঞান গণেশের বাপ
বলো পাখি হয়ে তোমায় কেন দিলো মনস্তাপ, মরি হায় হায় রে
ও তার অপরাধ না করিয়ে মাফ গো, শূলকে করিলে আদেশ

তোমার মনে হিংসা দ্বেষ, তাই তার পেলে না উদ্দেশ ॥

চিতান জানি নরদেহে রয় সপ্তপদ্ম, ফুটায়ে উঠায়ে সদ্য
বিশুদ্ধ পরমাত্মা পায়।
বলো পাখির দেহে কয়টি পদ্ম, কোন পদ্মে কার ঠাঁই
সত্য শুনতে চাই, বুঝাবে আমায় ॥

ফুকার যিনি জ্ঞানে ব্রহ্মযোগে আত্মা, এ কথা নয়কো মিথ্যা
তুমি তো যোগী হও প্রধান
বলো জীবাত্মা আর পরমাত্মা কতো ব্যবধান, হায়
পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, নিয়ে অষ্ট যোগাঙ্গ
বলো কোন যোগের করিয়া সঙ্গ, লভিবে মুক্তির সোপান ॥

মিশ কেন অন্যেরে চাহ না দিতে তোমার এ যোগ বল।
হবে দেবীকে শুনায়ে কী ফল, হে ভোলা খুলে আজ বলো আমায় ॥

মুখ যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়া পাছে গিরিজা ঘুমায় ॥

৮. স্বরূপেন্দু সরকার: নারী স্বাধীনতার কবি

চিতান মোদের জন্মভূমি স্বাধীন হয়েছে, অধীনতা দূরে গেছে
তাই নেচে উঠলো তরুণদল।
এখন সুখশান্তিতে এ বাংলাতে পেতে শীর্ষস্থান
পুরুষের সমান নারীদের কোলাহল ॥

ফুকার একজন সুশিক্ষিতা বঙ্গনারী তাই ডেকে স্বামীর প্রতি কয়
মোদের স্বাধীন বলে বড়াই করা মোটেই উচিত নয়।
হায় হায় দেশ স্বাধীন হলো কিসে আমরা তো পাই না দিশে
যদি সমান হয় নারী-পুরুষে, তবে সে খাঁটি স্বাধীন হয় ॥

মিশ তোমরা মুখে মুখে রমণীকে বাসো বেশ ভালো।
রেখে অন্তরের ভাব এলোমেলো, প্রকাশ্যে খেলো ভাবো নারীজাত ॥

মুখ কী তোমায় বলবো স্বামী ভবে রমণী যে কতো দামি করলে না দৃকপাত ॥

প্যাঁচ আবার শাস্ত্রের মাঝে প্রকাশ করো ভবে সতী নারীর পতি বড়ো
কামে তা না করো প্রমাণ।
বলো শক্তি ছাড়া শক্তি কোথা লভে শক্তিমান?
রাজা শাসে রাজ্যটা, রাজাকে শাসে কেটা
করে নারীকে ছেড়ে কোন বেটা, উন্নত স্তরে গেছে অকস্মাৎ ॥

মুখ কী তোমায় বলবো স্বামী ভবে রমণী যে কতো দামি করলে না দৃকপাত ॥

খোচ রমণীর কৃপা বিনা নাহি নরের হাত ॥

ফুকার দেখো নারীর গুণে বৃন্দাবনে ঠাঁই পেলো সে বিল্বমঙ্গল
আবার নারীর এঁটো খেয়ে হলো জয়দেবের মঙ্গল, হায় হায়
রাধাকে বাদ দিলে পর, শ্রীকৃষ্ণের থাকে না দর
লভে ঈশ্বরত্ব গৌরসুন্দর শাটীকন্যার পরশে কেবল ॥

মিশ তোমরা সেই নারীকে দিলে রেখে অন্দরমহলে
আমরা ধর্মঘট করে সকলে পুরুষের হাতে মিলাবো না হাত ॥

মুখ কী তোমায় বলবো স্বামী ভবে রমণী যে কতো দামি করলে না দৃকপাত ॥

অন্তরা ওহে স্বাধীন নর, নারীর পর অত্যাচার আর কোরো না
এবার মোরা আর থাকবো না নীচে গো, জেগেছে স্বাধীনতার প্রেরণা
রান্নাঘরে থাকবো না আর সয় না ঢেঁকির পাড়
আবার দিবানিশি কান্নাকাটি পুত্র ও কন্যার, মরি হায় হায় রে
আবার দেরি হলে ভাত রাঁধিবার গো, কী উৎপাত, দাঁতখিঁচুনি ঝারো না?
তোমরা যাও হাটে বাজারে থিয়েটার যাত্রায়
তবে সুখ পাওয়া মুখ ঢাকো কেন কলারই ফাতরায়, মরি হায় হায় রে
পুরুষ বিবেকহীন আঁধারে হাতড়ায় গো
বুঝলে না কার স্পর্শে হলে সোনা ॥

চিতান যতো পুরুষ মানুষ অফিস ছেড়ে ঢোকো নারীর রান্নাঘরে
নারী করে নেবে নরের কাজ।
নারী বীরবেশে জলস্থল আকাশে বেড়াবে ঘুরি
শাড়ি আর চুড়ি হোক পুরুষের সাজ ॥

ফুকার ছিঁড়ে বোরকা ভেঙে বেকি বেড়া বেড়াবো ফুলাইয়া বুক
নারী অন্ধকোঠার বধূ নাই আর, এ বিশ্ব দেখুক।
তাতে যদি কেহ বাইফোর্স করতে চাহো ডাইভোর্স
ছেড়ে কাম-কামনার যতো না সোর্স, ইনজেকশনে দেখবো পুত্রের মুখ ॥

মিশ আমি ভেবে দেখি ইনজেকশনে যদি মেলে ছেলে
যতো পুরুষ রেখে পশুশালে, নারীরা ঘুচাবো ভবের উৎপাত ॥

মুখ কী তোমায় বলবো স্বামী ভবে রমণী যে কতো দামি করলে না দৃকপাত ॥

৯. রবীন্দ্রনাথ সরকার: প্রতিমা পূজার কবি

চিতান কবির কল্পনা মোটে অল্প না যাহা কয় তাহা গল্প না বিবেচনা করে সব বিজ্ঞ।
এই যে হিন্দুদের প্রতিমা পূজা বিভিন্ন মূর্তি করে কতো ফুর্তি নানা যাগযজ্ঞ ॥

ফুকার আমি নরেন তুমি পরমহংস ভেঙে দাও আমার সব দ্বন্দ্ব
বুঝাইয়ে দিবে আনন্দ, হায় হায় হায়
কোন দেবের হস্তিশুণ্ড, কার নরদেহ সিংহ মুণ্ড
আবার শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড করো কেন এসব পছন্দ ॥

মিশ জানি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি বেদের এই ভাষ্য
কেন তোমাদের বহু উপাস্য, রহস্য ভেঙে ভাঙো আমার ভুল ॥

মুখ মহেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু বলো কে হলো বেশি সহিষ্ণু কেবা আদি মূল ॥

প্যাঁচ আবার কেহ পূজে দশভুজা কেহ করে কালী পূজা
বিচারে কোন পূজা খাঁটি
তোমার মায়ের পূজায় লাগে কেন বেশ্যার দ্বারের মাটি।
পূজে শিব শক্তির যোনী কিজন্য বলো শুনি
কেউ কয় শনি হলো বড়ো গুণী যার কোপে শ্রীবৎস হলো নির্মূল ॥

মুখ মহেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু বলো কে হলো বেশি সহিষ্ণু কেবা আদি মূল ॥

খোচ চার কোষের দেবের পীযূষ পেতে হও আকুল ॥

ফুকার বলো দেবগ্রহের কেন নয় মাথা, ত্রিপদ যুক্ত কেন বামন
কোন ভগবান কেমন, হায় হায় হায়
বাঁচি না গায়ের রাগে, এগুলো কিসে লাগে
পাবে কোন ভগবান পূজা আগে কে করবে শমন ও দমন ॥

মিশ ভগবানের বাগানে যদি দেওয়া যায় আগুন
হয়তো বোঝা যাবে কার কেমন গুণ, কে কতো ভাবেতে হলো মশগুল ॥

মুখ মহেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু বলো কে হলো বেশি সহিষ্ণু কেবা আদি মূল ॥

অন্তরা দেখে দেবদেবীর ছন্দ আমার তো পছন্দ হয় না মোটে।
দেখি শিব ব্রহ্ম চিত হয়ে আছে গো
কালী ব্রহ্মের জিভ কাটে পাড়ার চোটে।
আর ভগবানের নামে সারে কামকামনার ঢেউ
ষোলো হাজার একশত আটজন ভগবানের বউ, মরি হায় হায় রে
আবার রাধার কথা বলে কেউ কেউ গো
নিষ্কাম রস পান করে ফোটে ফোটে।
হরধনু ভঙ্গ করে বিয়ে করে রাম
খাওয়ার সময়ে ধাওয়া করে ভগবান পরশুরাম, মরি হায় হায় রে
একি দুরন্ত দুরারোগ্য ব্যারাম গো
পরশুরাম হেরে যায় রামের দাপটে।
আমার তো পছন্দ হয় না মোটে ॥

চিতান দেখি পঞ্চ মহা যজ্ঞ করে হিন্দুরা সব নারীনরে
এর ভিতরে কিবা রয় কারণ।
সাধ নামযজ্ঞে কিবা কার্য, বলো তাই খুলে
দুই বাহু তুলি কী করো আহরণ ॥

ফুকার বলো নামযজ্ঞে হয় কি উন্নতি, এ তত্ত্বের সত্যঅন্বেষী, মর্ম জানতে ধর্মবিদ্বেষী
সুধাকণ্ঠের মধুর নামে চিত্তে নিত্যের মধু নামে
শুষ্ক বিচারে হিসাব নামে, নামের চেয়ে সুরের দাম বেশি ॥

মিশ দ্বন্দ্ব ভুলে অনুভবানন্দে ভক্তিতে দেও মন
রবি কয় হলে নিমগন, মিলবে শাশ্বত নির্ভুল ॥

মুখ মহেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু বলো কে হলো বেশি সহিষ্ণু কেবা আদি মূল ॥

১০. নারায়ণ সরকার: নারী শিক্ষার কবি

চিতান দেখে সমাজকে দুর্দশাপূর্ণ কবিমন বেদনাক্ষুণ্ন আনতে চায় সমাজের কল্যাণ।
দেখি শিক্ষায়-দীক্ষায় জ্ঞানে গুণে প্রায় উন্নত, কিন্তু ব্যাহত বিবাহের বিধান ॥

ফুকার এক সুন্দরী যুবতীর পিতা কন্যা করে সুশিক্ষিতা সম্পত্তিরই সকলি খোয়ায়
হলো যৌতুকের অভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায়।
হায় কিনে পেন চশমা ঘড়ি আংটি বোতাম সাইকেল ছড়ি
বুড়া বাকি রেখে ভিটাবাড়ি আর সব বেচে দিলো বরের পায় ॥

মিশ হলো যথাকালে বিয়ের জোগাড় পিড়ায় গেলো বর
কন্যা যৌতুকাদি সভার ভিতর কন্যা কয় সকল দিয়ে বরের পায় ॥

মুখ ও বর্বর কই তোমাকে তুমি বিয়ে করো এইগুলিকে পাবে না আমায় ॥

প্যাঁচ তোমার দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী, সাইকেল ঘড়ি আংটি ছড়ি
করতে প্রেমের আলাপন
নিয়ে বাসরঘরে ট্রানজিস্টরটি করো গো শয়ন
আর হাত না দিয়ো আমার হাতে, কথা কইয়ো যন্ত্রের সাথে
আমায় বিয়ে করো যে লালসাতে, তাই নিয়ে সরে পড়ো অন্য জায়গায় ॥

মুখ ও বর্বর কই তোমাকে তুমি বিয়ে করো এইগুলিকে পাবে না আমায় ॥

খোচ এমন মূর্খ তোমার ন্যায় হয় না দুনিয়ায় ॥

ফুকার লাগে নরনারীতে মনের মিলন, করতে প্রেম অনুশীলন
তেমন তুমি চাওনি আমার ধার।
পেলাম তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহার, হায়
যৌতুকাদি না দেখিয়ে বসলে না পিড়ায় গিয়ে

তুমি আমাকে না করে বিয়ে, বিয়ে করো ঘড়ি ট্রানজিস্টর ॥

মিশ তুমি হীন বংশের অপদার্থ লোভী বেয়াকুব
নিয়ে পরের টাকার মাত্রা খুব, কোন জ্ঞানে পা দিতে চাও প্রেমের নায় ॥

মুখ ও বর্বর কই তোমাকে তুমি বিয়ে করো এইগুলিকে পাবে না আমায় ॥

অন্তরা আমাকে কও দেখি তোমরা কি সমাজে হয়েছ ঠিক উন্নত
তোমরা এমএ বিএ পাস করিয়া গো হলে আজ নারীর কাছে ঘৃণিত
তোমরা ভুলে গিয়ে পুরাকালের মিলনের ছন্দ, করো টাকার সম্বন্ধ
তোমাদের গায়ে আসে না মানষের গন্ধ গো
বিক্রি হও গরু আর ঘোড়ার মতো
দেখি বিশ্বমাঝে প্রেমপিরিতির দিয়ে গেলো মান, ও সেই বাদশা সাজাহান
আজ তাজমহল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গো
তার মতো আর দ্বিতীয় মেলে না তো ॥

চিতান এমনি কতো পিতা কন্যার দায়ে সব দিয়ে তোমাদের পায়ে
দেউলে হয়ে নামিল রাস্তায়।
তোমরা বিএ এমএ পাস করিয়ে গর্বিত অন্তর
বুঝলে না জীবনের দাম বিবাহের বেলায়।

ফুকার তোমরা শ্বশুরের টাকাতে পড়ি যখন ফিরে এলে বাড়ি
গেলে পরে স্ত্রীদের বিদ্যমান
ভাবে বাবার টাকার কেনা মানুষ, দেয় না স্বামীর মান, হায়
না বুঝিয়া পরিণাম নিজে কমাও নিজের দাম
সাজো টাকার লোভে বৌয়ের গোলাম
খোলবা কেমনে প্রেমরসের দোকান ॥

মিশ তুমি কর্মনাশা পিতলকাঁসার ছেঁড়া ব্যাপারী
নারীর প্রেমদোকানের দোকানদারি তোমার ঐ কেনা দেহে না মানায় ॥

মুখ ও বর্বর কই তোমাকে তুমি বিয়ে করো এইগুলিকে পাবে না আমায় ॥

১১. নিখিলচন্দ্র সরকার : পরিবার পরিকল্পনার কবি

চিতান দেখি সরকারের পরিকল্পনা পরিবার পরিকল্পনা, এ কল্পনা গল্প নয় কখন
কতো বিজ্ঞ লোকের মনের মধ্যে লেগেছে দ্বন্দ্ব
হয় না পছন্দ এসব নির্বাচন ॥

ফুকার একজন সরকারি লোক দুর্লভ বিশ্বাস, মনে তার বিপুল উল্লাস
গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র বলে
সুখের সংসার গড়তে জন্মাও এক মেয়ে এক ছেলে, হায়

তার বেশি হলে সন্তান নেমে আসবে অকল্যাণ
সরকারের আইন মোতাবেক এই বিধান, মেনে লও তোমরা সকলে ॥

মিশ গ্রামের বড়ো কর্তা বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধির নাই অন্ত
কহে এ কল্পনার যে সিদ্ধান্ত, ইহা তো বিধাতার ইচ্ছাতে নয় ॥

মুখ তোমার সরকারের এ কেমন ধরন
করলো স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ দেখে লাগে ভয় ॥

প্যাঁচ স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ সকল, তোমরা কেটে ছেটে করো বিকল
হলে নতুন দেবতা কি বিধাতা
দেখি গড়তে কিছু শক্তি নাহি ভাঙার বড়ো কর্তা।
কারো না জন্মিলে ছেলে দিতে পারো না কৌশলে
এইরূপ কতো লোককে ধরাতলে পুত্র হতে বিমুখ করলে নিশ্চয় ॥

মুখ তোমার সরকারের এ কেমন ধরন
করলো স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ দেখে লাগে ভয় ॥

খোচ কাণ্ড করো প্রকাণ্ড আশ্চর্যের বিষয় ॥

ফুকার দেখো জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ গেলে তোমাদের সাক্ষাৎ
আসতো না কভু বিশ্বকবি
যেমন মধ্যাহ্নের রবির কিরণ তেমন কবি রবি
হায়, তাহার লেখনীর চোটে গগন ভেদি ধ্বনি ওঠে
আবার বাঁশি বাজে কৃষ্ণের ঠোঁটে অষ্টম গর্ভে তাহাকে লভি ॥

মিশ দিয়ে রাজা কনডম মায়া বড়ি প্যানথার লাইগেশন
যতো রমণীরা কুপথে যান, জয় খেয়ে সতীত্বের হয় পরাজয় ॥

মুখ তোমার সরকারের এ কেমন ধরন
করলো স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ দেখে লাগে ভয় ॥

অন্তরা ওহে ভ্রান্তদল এ কৌশল ঈশ্বর রাজ্যে চলে না।
লোকে সাধনপথে না চলিলে গো, কোনো দিন নিয়ন্ত্রণ তো ফলে না
দেখো সাধন করলে ইন্দ্রিয়গণ প্রশমিত হয়
তোমার ভ্যাজকটমি ম্যাজিস্টিকে কাম উপজয়, মরি হায় হায় রে
ফলে দেহে আসে যক্ষ্মা কি ক্ষয় গো, সে ক্ষয় কোনো দিনে কমে না।
দেখো রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর করিলেন সাধন
লাগে নাই তার রাজা কনডম কিংবা লাইগেশন, মরি হায় হায় রে
তাদের নিম্নধারা উর্ধ্বে গমন গো, সেখানে কলাকৌশল লাগে না ॥

চিতান বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ দেখাতে আসিলে সমাজ জাগাতে

ফলে দেখা দিলো ব্যভিচার।
পূর্বে বিশ্বমাঝে রীতিনীতির ছিলো পদ্ধতি
তার উলটা গতি সরকারের আবিষ্কার ॥

ফুকার পূর্ববাংলায় ছিলো সাতকোটি লোক
শিক্ষার পেয়ে আলোক দশ কোটির উর্ধ্বে চলে যায়।
ফলে আর পাঁচ বছর হলে মোদের খাবার পাওয়া দায়, হায়
এখনো করি মানা, ছাড়ো আজব কারখানা
জন্মনিয়ন্ত্রণের যে আলপনা তোমাদের ঢুকবে না মাথায় ॥

মিশ দিয়ে রাজা কনডম মায়া বড়ি প্যানথার লাইগেশন
যতো রমণীরা কুপথে যান, জয় খেয়ে সতীত্বের হয় পরাজয় ॥

মুখ তোমার সরকারের এ কেমন ধরন
করলো স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ দেখে লাগে ভয় ॥

পরিশিষ্ট ৬

টপ্পা ও মালফুকার

ক. টপ্পা

১. বিভীষণ ও রাবণ

রাবণ—

চিতান: তুমি বললে নাকি রামের সীতা আনলাম কার কথায়।
বিভীষণ, তুমি জানো না কারণ, যখন ভগ্নি এসে জানালো আমায় ॥

মিল: তাঁর কাটা নাকে বসন থেকে দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কি?
আমি সেই রাগেতে হরণ করে আনলাম রামের জানকী।

অন্তরা: সূর্পনখার নাসা কান, কেটে কল্ল অপমান, রামের ভাই লক্ষ্মণ ধানুকী।
তুমি ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ মারো, বাজারের ভাও জানো কি ॥

(বিভীষণ হয়ে রামু মালীর প্রশ্নের জবাবে রামগতি শীল)

২. পূজার শাড়ির টপ্পা

পূজার বেলা, কুলবালা, সকলে করছে নূতন সাজ।
মরি হায়রে, একটি গরিব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর শাড়ির কারণ, পেলেন বড় লাজ ॥

শাড়ির লেগে উঠছে রেগে, ব্রাহ্মণী বাঘিনীর প্রায়।
গরিব ব্রাহ্মণ মরে ভাতের কারণ, বামনি ঠেকালো তারে দায় ॥

হৈল বকাবকি কতোক্ষণ, তারপরে বাঁধিল রণ অমনি দুজনায়।
(ঠাকুরের) কাছায় ধরে গায়ের জোরে ঠাকরানে শাড়ি করতে চায় আদায় ॥

(বিজয়নারায়ণ আচার্য)

৩. বিভীষণ ও শ্রীকৃষ্ণ

বিভীষণ—

আমি বিভীষণ নাম ধরি হরিসভাতে জানাই।
আমি বাস করি কনকলঙ্কা, কারুকে করি না শঙ্কা
মধুর রাম নামে মেরে ডঙ্কা, সুখে কাল কাটাই ॥

হরি অর্জুনকে পাঠায়ে দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের করলে নিমন্ত্রণ
পত্র পেয়ে শ্রীহরি করেছি যজ্ঞে আগমন।
আর যে দ্বারে সে দ্বারে যাই, বসিতে না আসন পাই, কিজনে বলো কৃষ্ণধন।
আবার যুধিষ্ঠির পায় প্রণাম দিতে, বারংবার আমায় বলো কী কারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—
তুমি ত্রেতা যুগের মিতা আমার রাজা বিভীষণ।
যখন কইরেছিলাম মিত্রতা, দুই জনার ছিল একতা
মিতা এতদিনে সে কথা হলো বিস্মরণ ॥

আছে রাজসূয় যজ্ঞে রাজার প্রণাম, সেই নিয়ম ভঙ্গ করতে চাও নাকি।
এস মিতা দুই মিতায় এই প্রিয় ভক্তের মান রাখি।
যখন তুমি আমার হও মিতা, মিতায় মিতায় সমতা, এ কথা জানতে নাই বাকি।
মিতা আমি যারে প্রণাম করি, কও শুনি তোমার দিতে বাধা কি ॥
(প্রশ্ন ও জবাব: নকুলেশ্বর সরকার)

৪. যোগেন মণ্ডল ও জহরলাল
যোগেন মণ্ডল—
পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তুমি প্রতাপে প্রবল।
আমি পাকিস্তানের মন্ত্রী হই, তোমার ন্যায় ধনীর দুলাল নই।
চাষির ঘরে জন্ম লই যোগেন্দ্র মণ্ডল ॥

তোমরা বর্ণহিন্দু মোদের প্রতি চিরদিন করিয়াছ অত্যাচার।
রেখেছ পায়ের তলায়, দাও নাই মানুষের অধিকার।
মোদের শোষণ করে তোমরা শেঠ, আমাদিগের খালি পেট
ছিন্ন বাস পাতার কুঁড়ে সার।
কেন মোদের ভাতে নুন জোটে না, তোমাদের দুধ-ঘিতে পূর্ণ ভাণ্ডার ॥

জহরলাল—
তোমার কল্পনায় জহরলাল আমি করে লই স্বীকার।
তুমি মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল, কুবুদ্ধি করেছ সম্বল।
পেয়ে মুসলমানের বল, হলে মিনিস্টার ॥

কেন দোষ দিয়ে বর্ণ হিন্দুকে ঢাকতে চাও নিজেদের অক্ষমতা।
শিক্ষা দীক্ষা না হলে হয় না মানুষের পূর্ণতা।
এই যে মনুষ্যত্ব মহত্ব আপনার করায়ত্ত, অন্যে কি দিতে পারে তা।
যার যার নিজের ডিমে তা না দিলে, অপরে দেয় নাকি সেই ডিমে তা ॥
(প্রশ্ন ও জবাব: নকুলেশ্বর সরকার)

৫. হনুমান ও রাম

হনুমান—

হনুমন্ত নামটি আমার থাকি আমি কিষ্কিন্ধায়।
মনে অন্য চিন্তা নাই কখন সর্বদায় ভাবি রামচরণ
পেয়ে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ এলেম অযোধ্যায় ॥

আমি রামসীতাকে দেখবো বলে প্রভু গো এই আশায় সদায় থাকি।
কার মন্ত্রণায় অশ্বমেধ করো রাম কমল-আঁখি ॥

তুমি সর্ব যজ্ঞেশ্বর কেহ নাই তোমার উপর
রাম নামে তরে পাতকী, একটি সোনার মূর্তি বামে দেখি
কোথায় মা স্বয়ং লক্ষ্মী জানকী ॥

রাম—

বড়ো দুঃখের কালে দেখা দিলে ভক্ত বাছা হনুমান।
বোধ হয় ছিলে ফলের বাগানে
অকস্মাৎ মনেরই টানে আসিলে বিদ্যমানে ভক্ত মতিমান ॥

আমি দুটি কর্ম সাধন করতে করেছি অশ্বমেধের আয়োজন।
হনুমান রে এই যজ্ঞের আছে বিশেষ প্রয়োজন ॥

সীতা দিয়ে বনবাস, সদায় করি হা-হুতাশ, প্রজার মন করিতে রঞ্জন।
লাগে সস্ত্রীক যজ্ঞে সোনার সীতা রয়েছে বশিষ্ঠের কথা মতন ॥

(প্রশ্ন ও জবাব: মদন আচার্য)

৬. চৈতন্যবালা ও তারকচাঁদ

চৈতন্যবালা—

আমি কল্পনায় চৈতন্যবালা কাব্যভূমিকায়
তুমি তারকচন্দ্র হলে আজ, উপাধি কবিরসরাজ
ভাবে তোমাকে বৈষ্ণবসমাজ মাথার মণি প্রায় ॥

লিখলে হরিলীলামৃত গ্রন্থে হরিচাঁদকে পূর্ণব্রহ্ম অবতার
প্রামাণ্য আর্ষ গ্রন্থে কী আছে পরিচয় তাহার।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম কলির তারকব্রহ্ম নাম, হিন্দু মাত্রে করে তা স্বীকার
কেন মতুয়া দলে সে নাম ফেলে হরি বলে গড়ি দেয় ধূলির মাঝার।
প্রামাণ্য আর্ষ গ্রন্থে কী আছে পরিচয় তাহার ॥

তারকচাঁদ—

কবির কল্পনায় সাজিলে তুমি চৈতন্য বালা,

তোমার কাব্যে তারক সরকার হই, হরিনামে সদা মত্ত রই
যেদিন হতে এ নাম লই নাই ত্রিতাপ জ্বালা ॥

লিখলাম হরিচাঁদকে পূর্ণব্রহ্ম আগে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে হবে কি
স্বচক্ষে যা দেখিলাম নিজ হস্তে তাই দিলাম লিখি।
আবার বললে সভার পর ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর এর মাঝে তো একটি নাম দেখি
যারা একটি নামকে ষোলো নাম কয়, সে মিথ্যা নাম নিয়ে আর হবে কি।
স্বচক্ষে যা দেখিলাম, নিজ হস্তে তাই দিলাম লিখি ॥

(প্রশ্ন ও জবাব: স্বরূপেন্দু সরকার)

৭. রানা কুম্ভ ও মীরা বাই
রানা কুম্ভ—
আমি কল্পনাতে রানা কুম্ভ কাব্যভূমিকায়
তুমি পরম ভক্ত মীরা বাই, তোমায় যবে পত্নীরূপে পাই
ভাবলাম আমার মতো কেহ নাই ভাগ্যবান ধরায় ॥

বললাম মা কালীকে প্রণাম দিতে তা না করে দাঁড়ালে ফিরায়ে মুখ
রমণীর স্বভাব জানি স্বামীর সুখে হয় তাহাদের সুখ ॥

তুমি তাহা দিয়ে বাদ রটাইলে অপবাদ সতীধর্মে হয়ে পরাঙ্মুখ
আমি রাজা হয়ে প্রজার কাছে কী করে দেখাব এ পোড়া মুখ।
রমণীর স্বভাব জানি স্বামীর সুখে হয় তাহাদের সুখ ॥

মীরা বাই—
তুমি কল্পনাতে রানা কুম্ভ বৈষয়িক মানুষ
আমি মীরা তোমার কল্পনায়, জোর করে নিতে চাও তোমার নায়
আমি ছাই দিয়েছি কামনায় পিয়ে প্রেম পীযূষ ॥

আমায় কালীকে কও প্রণাম দিতে, প্রণাম করার সামর্থ্য আমার কোথায়
আমার বলতে যা কিছু সব সঁপেছি গিরিধারীর পায়।
আর বললে রমণীর স্বভাব, স্বামীর লাভে স্ত্রীর লাভ
ইহার ব্যতিক্রম পেলে কোথায়।
যেজন সবার স্বামী বিশ্বস্বামী, আমি তো চলি সদা তার ইচ্ছায়।
আমার বলতে যা কিছু, সব সঁপেছি গিরিধারীর পায় ॥

(প্রশ্ন ও জবাব: স্বরূপেন্দু সরকার)

৮. ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম
ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
আমি ভূদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবির কল্পনায়।
তুমি পাহাড়পাড়ার গোয়ালগ্রাম জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম তোমার নাম
তোমার কাছে আসিলাম তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ॥

বলো কোন ধর্ম জয়যুক্ত হবে, কোন ধর্ম হবে ব্রহ্ম বহির্মুখ
কও দেখি কোন সাধনায় জীবগণে পায় আত্মায় নিত্যসুখ ॥

আর কোন প্রাণী জগতের নানা রূপ, কোন প্রাণী তাঁর স্বরূপ
যাঁর ইচ্ছায় চলে এই মুল্লুক।
বলো মানব আর ঈশ্বরের ইচ্ছা, এর মধ্যে ব্যবধান রয় কতোটুক ॥
(প্রশ্ন: সুভাষচন্দ্র সরকার)

জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম—
তুমি কল্পনায় ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, আমি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম
উপাধ্যায় পদবি ধরো, স্মৃতি-শ্রুতি পাঠ করো

কোরান-বাইবেল তাও পড়ো, কেন ভুলে যাও ধর্মের মর্ম ॥
মানুষের ধর্ম কভু বহু তো নয়, সব মানুষের এক ধর্ম হয়।
অসুর-পশুর ধর্মে সুখ নাই; নিত্যসুখী মানবধর্মের জয় ॥

এই জগতে মানুষই সার, নিরাকারও ধরে আকার, মানুষের ইচ্ছায় বিশ্ব চলে।
আলাদা নয় মানুষ-ঈশ্বর, মিশে আছে একে অপর, একের ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছা বলে ॥

(জবাব: গবেষক)

খ. মালফুকার
১. জগবন্ধু দত্ত ও হরিচরণ আচার্য
জগবন্ধু দত্ত—
বাবু গো শ্রীপঞ্চমীর নিয়মমতে বসন্ত গায় আসরেতে, তার ব্যতিক্রম কী কারণ।
যাত্রা করে এসে হরি, বসন্ত গান করলে চুরি।
ব্রজের ননি চুরি মাখন চুরি, এই চুরিও সেই মতন?

হরিচরণ আচার্য—
যাত্রা করে এসে হরি, বসন্ত গান করলে চুরি—
চুরির বলিহারি যাই।
হরির জন্ম চুরির জন্য, চুরি বিদ্যায় হরি ধন্য

কিন্তু জগবন্ধুর হাত-পা শূন্য, চুরি করতে কায়দা নাই ॥

২. বিজয় আচার্যের প্রশ্নের জবাবে রামগতি শীল—

তুমি বললে নাকি বিজয় ঠাকুর আমার বায়না নাই।
তুমি বিজয় ঠাকুর গুণবান, করতে পারো কবিগান
স্বীকার পাইলাম ধর্মসভার ঠাঁই ॥

উকিল মোক্তার বায়না করে ব্যারিস্টারে বসে খায়।
বিজয় ঠাকুর, সেইজন্য কি ব্যারিস্টারের বায়না যায়?
দ্বন্দ্ব করে দুই ভেড়ি, ঘৃণা করে কেশরী, বসে রঙ্গ চায়।
লজ্জা করে, মানের ডরে, সাধু যায় না চোরের নায় ॥

৩. পয়সা চুরি গেলে রামগতি শীল—

পুরাকান্দা গান করিয়া আইলাম সুগুন্দিয়া।
মোদের মনে ছিলো বাসনা, এখানে কবিগান করবো দুইজনা
বিধির কিবা ঘটনা, দিলো বেগুন দিয়া।
আমরা এবার গেলে, কোনো কালে ফিরে হবে না আসা।
দুঃখেতে বুক ফেটে যায়, সুগুন্দিয়া হইলো কি চোরের বাসা ॥

(আছেন) ব্রাহ্মণ, শূদ্র মজুমদার, তবে কেন অবিচার, আজব তামাশা।
আমার নিদ্রাকালে গাঁটি খুলে চোরে নিলো নয় পয়সা ॥

৪. নিবারণ সরকার ও কুসুমকুমারী
নিবারণ সরকার—
বল কুসুমকুমারী, মেয়ে হয়ে কোন সাহসে করতে এলি সরকারি।
লোকে কথার কথা কয়, চৌদ্দ হাত কাপড়ে নারীর কাঁধে কাছা রয়।
এসব রান্নাঘরের কান্না তো নয়—শাস্ত্র জানা দরকারি ॥

কবিগান ছেলেখেলা নয়
কেবল কাজল পরে চোখ ঠারিলে সে কি কবি হয়।
ও তোর শাস্ত্রের সঙ্গে নাই পরিচয়, রাঁধতে জানো তরকারি ॥

কুসুমকুমারী—
সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা হলো নারী
ভেবে তারণ-কারণ নারীচরণ বক্ষে ধরেন ত্রিপুরারি।
পাগল শিব তালে নাচে, গঙ্গা তার শিরে আছে
গঙ্গাধর নাম পেয়েছে শিরে গঙ্গা ধরি।

আবার রাধার পদে স্বনাম লিখে খাতক হলেন বংশীধারী ॥

৫. কাশী নট্ট ও নকুলেশ্বর দত্ত

কাশী নট্ট—

ওদের দলে আছে দুইটা ছুঁড়ি, ছুঁড়ি নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি, ওদের মধ্যে ক্ষুরধার।
থাকবেন একটু হুঁশিয়ার ॥

দেখি ঘাগরা পরে ছুকরি নাচে, ছোকরা থেকে পাছে পাছে নর্তকীদের মন জোগায় ॥

নকুলেশ্বর দত্ত—

বললে আমার দলে দুইটা ছুঁড়ি, ছুঁড়ি নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি—
তোমার ভাগ্যে ঘটবে না, ঘোলে দুধের তৃষ্ণা মিটবে না।
তোমার দলে দুইটা বুড়ি, বয়স হয়েছে দুতিন কুড়ি
এসব পাকা শ্রোতার পাকা দাড়ি ভোঁতা ক্ষুরে কাটবে না ॥

বললে ঘাগরা পরে ছুঁকড়ি নাচে, ছোকরা থেকে পাছে পাছে, নর্তকীদের মন জোগায়—
ও সে মন জোগায় না, গান জোগায়, কাশী বাঁচে না হিংসার জ্বালায় ॥

থাকে দুইটা বুড়ির সাথে, ছুঁড়ি জোটে না বরাতে
তাইতে দুধভাত দেখে পরের পাতে, নিজের গালে চাপড় খায় ॥

৬. নকুলেশ্বর দত্ত ও শরৎ বৈরাগী

নকুলেশ্বর দত্ত—

আগের লোকের মুখে তত্ত্ব শুনি, শরৎ আর রাঙা যামিনী
দল করেছেন বহুদিন, এখন আত্মদ্বন্দ্বে হলো ভিন।
দারুণ বিচ্ছেদ রবিকরে, নিষ্প্রভ চাঁদ পুড়ে পড়ে
হলো যামিনীর অভাবে পড়ে, শরৎচন্দ্র জ্যোতিহীন ॥

শরৎ সরকার—

দেখি ঐ দলের রাঙা যামিনী, নূতন দল করেছেন তিনি
পুরাণ লাগে না ভাল, তাইতে নতুন সরকার জোটালো।
দলে দুইটা ছুঁকড়ি আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে
থাকে ছোঁকড়া সরকার পাছে পাছে, সভাটা করলো আলো ॥

নকুলেশ্বর দত্ত—

বললে যামিনী বেশ দল করেছে, ছোঁকড়া সরকার ছুঁকড়ির পাছে, সভা আলো করেছে।
এলোকেশীর এলো চুলে শরৎবাবু গেছেন ভুলে
তাইতে ছোঁকড়া সাজতে বুড়াকালে, কচি সালসা ধরেছে ॥

পরিশিষ্ট ৭

ধুয়া ও ধুয়া গান

ক. ধুয়া

১. অবোধ মন আমার মাইট্যা দেহের গুমার কইরো না ॥

২. আম গাছে সুপারি ফলে ভাইরে, নারকেল গাছে তাল
দৈয়াল পাখির নাচনা দেখে ব্যাঙে মারে ফাল গো ॥

৩. আমার সোনার চাঁদ পাখি, আমারে ভুলাইয়া বন্ধুরে তুমি ঘুমাইছ নাকি ॥

৪. আর কতো কান্দিব আমি পারঘাটায় দাঁড়াইয়া, দীনবন্ধুরে
আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া ॥

৫. কানার হাতে কুড়াল দিয়ো না, গাছের জাম্বুরা থাকবে না ॥

৬. কালো কোকিল তুই ডাকিস না তমালের ডালে ॥

৭. গোঁসাই রে নি দেখছ খাজুর গাছতলায়, গোঁসাই খাজুর খায় আর লেজ নাড়ায় ॥

৮. তোমরা আমায় দুষো না সজনী
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমণি ॥

৯. দিলের গোঁসাই বিনে কে জানে, ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে ॥

১০. পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজ গোপীর ভাব বিনে ॥

১১. পাখি আমায় ছেড়ে গেলি উড়ে অনন্ত আকাশের গায়
পাখি ফিরে আয়, ফিরে আয় রে ॥

১২. প্রেম করস তো খালই লইয়া আয়, লো সুন্দরী ॥

১৩. মন তুই বইসে রইলি কার আশায়, আমার ভাঙা বাড়ি ভাঙিল ঘোলায় ॥

১৪. মন-ভ্রমরা বলি তোরে শোন
এমন সুরসের বন ত্যাজ্য করে যাস না রে কুরসের বন ॥

১৫. মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না ॥

১৬. মরি হায় রে হায় এই ছিল কপালে
এমন সাধের পাল্লা নষ্ট করলো ভাং খাওয়া মাতালে ॥

১৭. মরি হায় রে হায় এই ছিল কপালে
হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচ সিকার ছাগলে ॥

১৮. মরি হায় রে হায় মনোদুঃখে মরি
ভেদা মাছে নষ্ট করলো বেগুনের তরকারি ॥

১৯. রসিক জানে রসের মর্ম, অন্যে জানে না ॥

২০. হরি বলে ডাকলে পরে রাখেন হরি রাঙা পায় ॥

খ. ধুয়া গান

১. তারকচন্দ্র সরকার

(ক)

কাজ কি আমার মন্ত্রবীজে।
হরিচাঁদ ছবি রবির কিরণে উথলিল মধু হৃদসরোজে ॥

যে অমৃত পিয়ে পিয়ে রসে ডগমগ হয়ে
গেছে আত্মারাম মাত্তা লাগিয়ে মন সরে না গৃহকাজে ॥

যতো ছিলো বৈদিক ক্রিয়া সে ক্রিয়া হলো অক্রিয়া
ছিলো অষ্টপাশে মা মহামায়া সে মা গেছে পুত্র ত্যেজে ॥

যতো ছিলো যাগযজ্ঞ সে যজ্ঞ ছিলো অযজ্ঞ
কলৌ নামসংকীর্তন মহাযজ্ঞ অর্ঘ্য দিলাম তারি মাঝে ॥

ভুক্তি মুক্তি দুই পৈশাচী, তারা হলো ভক্তির দাসী
আমার জাত মেরেছে সর্বনাশী বিবর্ত বিলাস খুঁজে ॥

ডেকে বলে মহানন্দ উদয়গিরি গোলোকচন্দ্র
ও তা দেখলি নারে তারক অন্ধ রলি উলূকের সঙ সেজে ॥

(খ)

দয়াময় সাধন ভজন জানবো কতো, সাধন ভজন জানবো কতো।
হলেম না কাজের কাজি কোনো কাজেই সব দেখি ভোজবাজির মতো ॥

মিছে সব শাস্ত্র জানা, আসল পথ ঠিক হলো না
যে জন যার উপাসনা, সেই বলে তার মত ॥

শুনি [illegible]না মুনি শাস্ত্র, বকে বনপর্ব ভারত বকে
কঃ পন্থা [illegible] বকে, ধর্ম বকে ধর্মসূত ॥

শিব ভজে শৈব যারা, শাক্ত কয় কালী তারা
সূর্য কয় সৌর যারা, গণেশ কয় গাণপত্য ॥

জপে কৃষ্ণমন্ত্র জোলা নকিব, তোর কৃষ্ণবীজ নাজামের কলিম
শক্তিবীজ রহিম করিম, অসীম মতের মূল এক পথ ॥

নাস্তিকে কয় নিরাকার, ধর্ম কয় ঠিক মানি কার
মূল ব্রহ্ম কে কার কে কার, যে যার সে তার মতো ॥

তোমায় খ্রিস্টে বলে কই জিশুজি, বৌদ্ধ বলে বুদ্ধ ভজি
তোরে কয় বদর গাজি মাল্লা মাঝি নেয়ে যতো ॥

এক ব্রহ্ম নয় বিভিন্ন, ভিন্ন ভেদ ভক্তের জন্য
শ্যামা শ্যাম শিব অভিন্ন, গণেশ আদিত্য ॥

তোমায় সাধন করে যে সাধকে, যেভাবে যে তোমায় ডাকে
সেইভাবে দয়া তাকে, হও দেখি তার বশীভূত ॥

হীরামনের মনভরা, গোলোকচাঁদের মনোহরা
মহানন্দ কয় আমরা ঐ রূপের আশ্রিত ॥

কিসের পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চব্রহ্ম, তুই দয়াল আমার আব্রহ্ম
তারক তার পায় না মর্ম, হয় না রূপের অনুগত ॥

২. হরিচরণ আচার্য
(ক)
আমার মন বাঁধা রাধা চরণে।
আমার ধ্যানেতে রাধিকা জ্ঞানেতে রাধিকা, রাধিকা জীবনে মরণে ॥

নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি, সম্মোহনী সুরে মুরলী আলাপি
সংলাপে বিলাপে রাধামন্ত্র জপি, থাকি রাধা নাম স্মরণে ॥

ষড়জ ছেড়ে যবে গান্ধারেতে যাই, ঋষভেতে রা আর ধৈবতে ধা পাই
এই দুটি অক্ষরে রাধামন্ত্র গাই বিশ্বের সন্তাপ হরণে ॥

লোকে বলে আমায় সচ্চিদানন্দ, সৎ সত্যানন্দ চিৎ জ্ঞানানন্দ
আনন্দ স্বরূপে হ্লাদিনীর আনন্দ শ্রীগোবিন্দের নাম পুরাণে ॥

(খ)
মন আয় একটু আসি গে বেড়ান দিয়া।
গ্রামের নামের পাছে আছে যতো সব 'দিয়া' ॥

নিবো ঘোড়াদিয়া হাতিদিয়া নারানদিয়া পুরানদিয়া

আর একটু ঘুরান দিয়া নিব রামদিয়া।
পথে শালদিয়া দিয়া লক্ষার পাড় ভিড়িনদিয়া
শেষে যাত্রা করে চলে যাবি মাত্রা আমদিয়া ॥

নিবো পাতরদিয়া সম্মানদিয়া পোড়াদিয়া মাইজদিয়া
পরে যাবি সেনোয়াদিয়া, অমানীকে মান দিয়া চলে যাও চন্দনদিয়া
এখন হরিচরণ শেষের যাত্রা করো নদীয়া ॥

৩. অশ্বিনী সরকার

(ক)

কী ধনে তুষিব গুরু দিবানিশি ভাবি হৃদয়।
আমি তোমার ধন তোমাকে দিয়ে বসে আছি তোমার আশায় ॥

আমার বলতে নাইকো হেন ধন, হারে কী ধনে তুষিব গুরু তোমার ঐ চরণ।
তুমি আমার সর্বস্ব ধন, জীবন-যৌবন দিলাম তোমায় ॥

এ দেহের মালিক তুমি হও, দিতে যে ধন বাকি থাকে সে ধন তুমি লও।
তোমার শীতল প্রেমসাগরে ডুবাও এই বাসনা করি সদায় ॥

এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে যতো ধন, সকল ধনের কর্তা তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
তুমি বায়ুরূপে জীবের জীবন রক্ষা করো দীন দয়াময় ॥

অনন্ত মহিমা তোমার জীবে কি বুঝিতে পারে শিবের বোঝা ভার।
তুমি কখন সাকার হও নিরাকার অব্রহ্ম ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় ॥

হরিচাঁদ রূপে অবতার, মহানন্দ রূপে গুরু নিলেন দেহের ভার।
গোঁসাই গুরুচাঁদের বাঞ্ছা এবার অশ্বিনী যেন ডুবে রয় ॥

(খ)

তোরে বলবো কী, মায়া তেঁতুল গাছে কোন সাহসে বাসা বেঁধে রলি।
ঐ দেখ কালব্যাধে শর হানিল, তবু না তোর হুঁসর হলো, পাখিরে
এই সময়ে মন উড়ে চলো, নইলে প্রাণ হারালি ॥

গুরুকল্পতরুমূলে বাসা বাঁধো হরিবলে পাখিরে
তবে শঙ্কা নাই তোর কোনো কালে কালের ভয় এড়ালি ॥

ত্রিবেণী এক নদী আছে যাস নারে সেই নদীর কাছে
তথায় মদনা চোরা ফাঁদ পেতেছে বাধবি অমনি গেলি ॥

প্রেমসাগরের নিষ্কাম চরে, বেড়াও রে আনন্দ ভরে

তথায় চরা করো নিহার ধরে, ঘুচবে মনের কালি ॥
আমার গুরুগোঁসাইর পোষা পাখি হৃদয়-পিঞ্জরে থাকি
এবার অশ্বিনীর মন করো সুখী বলে হরি বুলি ॥

৪. রমেশ শীল

(ক)

মানুষ বাঁচবে কেমন করে মানুষ বাঁচবে কেমন করে।
জাঁতা কলে পিষে মারে চাষি আর মজুরে ॥

মজুর ভাতা বোনাস চায় অমনি লাঠির বাড়ি খায়।
আর কতোক্ষণ যদি দাঁড়ায় বুকে গুলি পড়ে ॥

এবার শুনে পাটের দর চাষির গায়ে এসেছে জ্বর
সূর্য পাটে পাটের উপর বসালো চাষিরে ॥

ভাইয়ে দুঃখ সয় না গায় জোঁকে যতো রক্ত খায়
পাটের মন পাঁচ টাকা বিকায় বিদেশির পেট ভরে ॥

পাট সোনার সুতা কয় এখন রাঙের মূল্যও নয়
পাট চাষির বংশ হবে ক্ষয়, ভাতে আর কাপড়ে ॥

যারে বলি দেশের ভাই, তার বিচার-বুদ্ধি নাই
বিদেশির পেট দিলো ভরাই আপন ভাইকে মেরে ॥

(খ)

ওরে পরানের বন্ধুরে এই লিখা কি ছিলো মোর কপালে।
ওরে পরানের বন্ধুরে এই লিখা কি ছিলো মোর কপালে ॥

তোমার নাম যারা লয় দোজাহানে তারা জয়
ডংকা বাজে তোমার নামের বলে ॥

তুমি বিশ্ব রিজিকদাতা সবাই বলে সত্য কথা
আমার কেন অন্ন নাহি মিলে ॥

সমুদ্রের কূলে বাস জলকষ্ট মোর বারো মাস
কী বলিবে লোকে তা শুনিলে ॥

দুঃখে কিবা সুখে রাখো সকল জানো সকল দেখো
রমেশের জায়গা রেখো পাক কদমের তলে ॥

৫. নকুলেশ্বর দত্ত

(ক)

ভাঙন নদীর কূলে রে মন ঘর বাঁধিলি কী সাহসে।
মায়া নদীর তুফান উঠি ভিটির মাটি পলো খসে ॥

দুই খুঁটির পর ঘর ছিলো খাড়া, দুই সারি তার রুয়া মাঠাম একখানি আড়া।
ভোগ বাসনা বাঁশের বেড়া, ছিলো ঘরের চারি পাশে।
পাপের ঘুণে খেয়ে করলো সারা, কোন সাহসে আছিস বসে ॥

চর্ম ছনের ছাউনি আঁটি, বেতের বাঁধন দিয়েছিলি সাড়ে তিন কোটি।
কাম ইঁদুরে দিলো কাটি, বাঁধন এঁটে রাখবি কিসে।
ঘরের বাঁধন খুলে পড়লো ঝুলে নদীর কূলে ভাঙন আসে ॥

ঈশান কোণে উঠলো ভীষণ ঝড়, কখন জানি উড়ে যায় তোর জরা জীর্ণ ঘর।
বান ডেকে আসিল জোয়ার, সকল তোমার গেলো ভেসে।
অধম নকুল বলে এ ঘর ফেলে দেশের মানুষ চলো দেশে ॥

(খ)

ও তুই কী সাহসে ঘর বেঁধেছিস দুকূল ভাঙা নদীর চরে।
ও তোর এতো সাধের আশার বাসা, ও মন কখন জানি ভেঙে পড়ে ॥

ভাঙন নদীর এমনি ধারা, স্থিত হয়ে থাকে না তারা, জোয়ার-ভাটায় কমে বাড়ে।
জানি স্বভাব তাহার ভাঙাগড়া একূল ভাঙে ওকূল গড়ে ॥

পড়লে ভাঙন নদীর পাকে, সর্বহারা করে তাকে, ভাসায়ে দেয় নদীর নীরে।
শেষে স্মৃতির আগুন বুকে নিয়ে, সদা ভাসতে হয় তার নয়ন ধারে ॥

তোর মতো কতো প্রবাসী এই নদীতে গেলো ভাসি, কূল কিনারা পেলো না রে।
দারম্নণ নদী হয়ে সর্বগ্রাসী, ও তার সব নিয়ে উদাসী করে ॥

করে শীতল জলের আশা, নদীর কূলে বাঁধলি বাসা, আগে ভেবে দেখলি নারে।
ও মন মিটবে না তোর সে পিপাসা, সদায় মরতে হবে জ্বলে পুড়ে ॥

নকুল বলে মন রে ভোলা, এখনও তোর আছে বেলা, সময় থাকতে সামলে নে রে।
নইলে আসিলে ভাঙনের পালা ও তুই পালাতে পথ পাবি না রে ॥

৬. শেখ গুমানী দেওয়ান

শোষণপথে তোমরাই সাজো অজ্ঞজাতির প্রাণনাথ।
দানের বেলা সাজো তখন হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ।

বুঝলেন ইংরেজ বণিক গেলো শোষণবন্ধু ধনিক এলো।
খড়ের ধনীর মালিক গেলো, খানিকটা আর রবে না ॥

স্বার্থ হরে মুগ্ধ হতে ভাঙলো না কেন ঘুমঘোর।
শহরবাসী থাকলো সেজে মত্তমাতাল গাঁজাখোর।
পল্লির আসে মৃত্যু আবর, তার পাশেই তোমার কবর।
নামের বেলা বাদশা বাবর দেশের খবর নেবে না ॥

৭. বিজয়কৃষ্ণ সরকার

(ক)

পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।
ও সে যে আমায় ভুলবে জীবনে ॥

থাকতো পাখি সোনালি খাঁচায়, কতো কি বলিত আমায়, বসে রুপালি আড়ায়।
ফটিকের বাটি ভরে, কতো খাবার দিতাম থরে থরে, পাখি খেতো আনমনে ॥

জংলা পাখি করলো সর্বনাশ, এখন শুধু হায় হুতাশ, করি কোন বনে তালাশ।
বনের পাখি বনে গেলো, আমার বুকে দিয়ে দারুণ শেল
নিঠুর পাখি গেলো কোন বনে ॥

পাখির মায়ায় পড়ে কতো লোক, পেলো আমার মতো শোক
তাদের জলভরা দুই চোখ।
কে এমন দরদি আছে, বলে দেবে আমার কাছে, পাখি আমার গেলো কোন বনে ॥

আগে যদি জানতাম পাখির মন, তারে দিতাম না এ মন, সে আমায় করিবে এমন।
অসীম গগনের পাখি, তারে আপন বলে কেন ডাকি
পাগল বিজয় কাঁদে বসে বিরলে ॥

(খ)

তুমি জানো না, জানো না রে প্রিয়, তুমি মোর জীবনের সাধনা।
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না ॥

ফাগুন দোলপূর্ণিমায় মৃদুল মিঠেম বায় ফুলবনে পুলকের আলপনা।
কতো মধুর মাধবী রাতে, বঁধুয়া তোমারই সাথে
আমি করেছিলাম সে যামিনী যাপনা ॥

যেমন কাষ্ঠযোগে দাবানল, পোড়ায়ে মারে বনজঙ্গল
মন পোড়ানো আগুন বন্ধ তাহা না।
কতো বিরহীর অন্তরতলে, বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে

জলে গেলেও জ্বলে একি যাতনা ॥

তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে, কী আগুন মোর বুকে জ্বেলে
একদিনও দেখিতে মোরে এলে না।
তোমায় পেতাম যদি মোর কুটিরে দেখাইতাম বক্ষ চিরে
বুকের ব্যথা মুখে বলা চলে না ॥

আমি ঘুরি জনমে জনমে, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে
খুঁজে ফিরি আমি তাহার ঠিকানা।
পাগল বিজয় বলে চিতচোর, আসবে কি জীবনে মোর
বুকে রইলো ব্যথাভরা বাসনা ॥

৮. অনুকূল রায়
ও ভাই বাঙ্গালি তুই কাঙ্গালি কিসে।
থাকতে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা মরিস মনের আফসোসে ॥

আমরা ভারতমাতার দুটি ছেলে হিন্দু মুসলমান।
এর মধ্যে কেবা ছোটো কেবা বড়ো দুই এক সমান।
তুলে উচ্চ কণ্ঠে তান গাও ভারতমাতার গান।
উড়াও মোদের বিজয় নিশান উভয়ে মিশে ॥

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে বসবে সবাই।
সবারই সমান অধিকার বেশি-কমি নাই।
আর নাই বিদেশির ভয় দূরে গেছে রে সে বালাই।
আজ সকল ব্যথা যাবে দূরে মায়ের স্নেহ পরশে ॥

৯. নিশিকান্ত সরকার
(ক)
নয়নে যাহারে সুন্দর দেখি, সে মোর লুকিয়ে রয়েছে অন্তরে।
নীরবে নিঝুমে যেন অবিরত মানস সলিলে সন্তরে ॥

ফুলবনে জাগে রূপের দেওয়ালি, নাচিয়া সিন্ধু দেয় করতালি
রবি শশী তারা ধূপদীপ জ্বালি, আরতি করিছে অম্বরে ॥

মরমের মাঝে চরম শান্তি পরাণে পরমপ্রিয়
যতো রূপে চাহি নির্ণয় নাহি অনির্বচনীয়
যুগযুগান্তে নিশিদিনমান, মিলন-বিরহে শুনি তারি গান
চাহে কতো শত ভকতের প্রাণ জনম জনমান্তরে ॥

(খ)
নিজে গেয়ে নিজে শোনো নিজের গান।
তোমার আশে পাশে কী করে কে সেদিকে দিয়ো না কান ॥

হৃদয় দুয়ার রাখো খোলা, হয়ে যাও আত্মবিভোলা
ভবসাগরে দিয়ে দোলা ধরো করুণ সুরের গান ॥

গান গেয়ে যাও আপনমনে, না শুনুক তা যে না শোনে
চরম তত্ত্ব পরম ধনে অন্তরে করো সন্ধান ॥

দিয়ো না তাল-মানে দৃষ্টি, কথায় করো রসসৃষ্টি
নামে যদি প্রেমের বৃষ্টি গলে যাবে মনপ্রাণ ॥

তোমার পথ-ভোলানো রিপু যতো, সবে হবে সুসংযত
ভক্ত সে যে অনুগত, রসামৃত করবে পান ॥

বাহিরে দিয়ো না লক্ষ্য, থাক যতো বিরুদ্ধ পক্ষ
ধর্মজ্ঞানে কর্মদক্ষ হয়ে থাকো মূর্তিমান ॥

পরিহাসের বাক্যবাণে যেই বা যতো আঘাত হানে
যেতে হবে সম্মুখপানে আসে আসুক ঝড়তুফান ॥

ডুবলে মহাভাব আবর্তে ঝরবে আলো মোহগর্তে
কল্পনাকে স্বর্গলোকে করতে হবে অভিযান ॥

ত্যাগ করিলে বিলাস-ব্যসন, তবে হবে রিপুর শাসন
স্মরণ মনন নিধিধ্যাসন শিখে লও যোগের বিধান ॥

১০. ফণী বড়ুয়া
(ক)
ধর্ম নিয়ে কর্মজীবন হবে না গঠন।
বাঁচার মতো বাঁচতে হলে মুক্তবুদ্ধির প্রয়োজন ॥

সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঘেরায় মন থাকে যার বদ্ধ কারায়।
অন্ধমোহে গোলকধাঁধায় ফোটে না তার জ্ঞান-নয়ন ॥

এই হৃদয় অনন্ত আকাশ, মিলে মুক্ত আলো বাতাস।
ঘুচাইবে অন্ধ বিশ্বাস মুক্ত করো তোমার মন ॥

অদৃষ্ট আর ভাগ্য মানে বুদ্ধিহারা অন্ধজনে।
জীবনযুদ্ধে বুদ্ধির গুণে মিলে শান্তি সুখের ধন ॥

বিচার করো আগে পিছে, স্বর্গ নরক কোথায় আছে।
মানুষ কেন নাহি বাঁচে না করিলে উৎপাদন ॥

পাপী থাকে সুখের স্বর্গে ধার্মিক কেন নরক ভোগে।
পাপ পুণ্য কী মনোযোগে করো সত্য উদ্‌ঘাটন ॥

(খ)
আয়রে ভাই দেশবাসী মিলি একতায়।
সমাজতন্ত্রের ঢেউ লেগেছে সারা দুনিয়ায় ॥

মেহনতি পয়দা করি এই দুনিয়ার নরনারী
ধনতন্ত্র ধ্বংস করি সমাজতন্ত্র চায় ॥

ধনতন্ত্রের অত্যাচারে কৃষক শ্রমিক বাঁচতে নারে
সমাজতন্ত্র আনিবারে অভিযান চালায় ॥

আমরা খাই আটা রুটি শোষকগণ সাততলায় উঠি
মোদের অন্ন বস্ত্র লুটি তোশকে ঘুমায় ॥

চলে কলকারখানা রেল স্টিমার পরিশ্রমে তোমার আমার
খাদ্য বস্ত্র করি তৈয়ার কাঁদি অসহায় ॥

দিয়ে অদৃষ্ট আর ভাগ্যের ধোঁকা গরিবকে বানায় বোকা
সমাজতন্ত্রে যায় রে দেখা গরিবে সুখ পায় ॥

সমাজতন্ত্রে থাকিবে না ব্যক্তিগত কলকারখানা
জমির উপর মালিকানা শোষণের উপায় ॥

১১. রসিকলাল সরকার
(ক)
আমি চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে
আশা করি পরান বন্ধু আছো কুশলে।
প্রথম নিয়ো ভালোবাসা বুঝিয়ো মোর মনের ভাষা
আমার গোপন আশা ভিজিয়ে দিলাম নয়নের জলে ॥

যে বাসরে আসি হাতে মিলাইলে হাত
ফুটালে মোর ভাঙা বুকে প্রেমের পারিজাত।
যে বাসরে শূন্য হিয়া বসে থাকে পথ চাহিয়া
কাঁদে মন পাপিয়া গুমরিয়া এ বুকের তলে ॥

যে বকুলের তলায় বসি বাজিয়েছিলে বাঁশি
সে বকুলের মুকুলে আজ গন্ধ আলো হাসি।
আমার ছিঁড়ে গেছে গাঁথা মালা, বুকে জাগে দারুণ জ্বালা
কাঁদি একলা ঘরে কুলবালা বসে বিরলে ॥

ভুলে যাওয়া পথটি ধরে ভুল করে এসে
পারো যদি দেখে যেয়ো দিবসের শেষে।
কেমন আছি পরের ঘরে, বন্ধু দেখতে পাবে নয়ন ভরে
কাঁদে বনবিহগী কেমন করে বাঁধা শিকলে ॥

কী যে লিখি কী যে বাকি পাই না খুঁজিয়া
অবলার না-বলা-কথা নিয়ো বুঝিয়া।
চিঠি আমার করি ইতি, বন্ধু নিয়ো আমার মনের প্রীতি
এ দীন রসিক বলে শেষ মিনতি চরণ-কমলে ॥

(খ)
তোমার আগে আমি যদি যাই, দরদি গো
আবার যেন তোমায় আমি পাই।
যেন মরণপরে এক বাসরে দুইজনে পাই ঠাঁই ॥

হয়তো এক অশুভ সাঁঝে তোমায় হারা হয়ে
অচিন দেশে ধরবো পাড়ি বুকে ব্যথা লয়ে।
যেন বিধি আমায় দেয় মিলায়ে যদিও হারাই ॥

সুনীল আকাশে আমি একলা বসে রবো
দক্ষিণা বাতাসে এসে মনের কথা কবো।
তোমায় জীবনে মরণে পাবো, আশায় আছি তাই ॥

সাঁঝের আকাশে আমি হবো সাঁঝের তারা
তোমা পানে চেয়ে রবো হয়ে আপনহারা।
যেন দুই জীবনের দুইটি ধারা এক দেশে মিলাই ॥

রসিক বলে আসা-যাওয়া তোমারই দুয়ারে
জীবন-মরণের টানে চলবো বারে বারে।
যেন জীবন-বীণার ছিন্ন তারে তোমার নামটি গাই ॥

১২. অনাদিজ্ঞান সরকার
(ক)
পশর নদীর ভাটির শেষে আসিয়া এই জংলা দেশে হায়
বসে আছি সাগর-কিনারায়।
আমার আপন বলে যারা ছিলো, তারা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো
একা আমায় ফেলে গেলো নদীর মোহনায় ॥

রাসপূর্ণিমা যোগে হেথায় মিলেছিলো মেলা
বন্ধুবান্ধব মিলে করতে এলেম কতো খেলা

এসেছিলেম পানসি করে, আমার নৌকা দিলো নোনায় মেরে
একা পড়ে বালুচরে করি যে হায় হায় ॥

দুদিন পরে ভাঙলো মেলা, দেখতে পেলাম শেষে
যাদের সহায় সম্পদ ছিলো তারা ফিরে গেলো দেশে।
আমি একা সাথে নাই কেউ, সম্মুখে ওই সাগরের ঢেউ
আমার পিছনেতে ডাকিছে ফেউ, কী করি উপায় ॥

কেমন করে ফিরবো আমি আপন-ভবন
সম্মুখে অকূল বারিধি পিছে বাদা-বন।
শূন্য হেরে সাগরের তীর, ভয়ে প্রাণ হলো অস্থির
উপরে বাঘ জলে কুম্ভির, যাবো কোন জায়গায় ॥

অনাদি কয় এমন দেশে আসিয়াছি বটে
এতো সুন্দর পানি তবু পিপাসা না মেটে।
কূলহারা এই সাগরের কূলে বসে আছি আপন ভুলে
কেউ যদি রও আমার বলে উদ্ধারো আমায় ॥

(খ)
মানুষ হয়ে জন্ম ধরি বাঘেরহাট ক্যান করবি বাস।
নাগের বাজার হবে মাজার ছাড়বি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ॥

নিজের থানা থেকে কেন এলি ফকিরহাটে
রূপসা লাইনে রাঙা বগি পলি তাতে উঠে।
ও তুই চড়নদার বিনা টিকিটে, তোরে চেকারে করছে তালাশ ॥

ঘরজামাই বাপ মামার বাড়ি মার ঘরে জন্মি
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ ভাবলে তুমি
পেলে পিতৃধন আর মাতৃভূমি, সেদিন নিত্যধাম হবে প্রকাশ ॥

মধুমতীর জোয়ার ফেলে রূপসা হয়ে পার
যশোর ছেড়ে রাজধানীতে ছুটে চল এবার
ও তুই গণেশ ভুটকরা ব্যবসাদার, তোর ভিটেমাটি হলো খাস ॥

অনাদি কয় হায়রে আমি হারালেম দিশা
পাসপোর্ট আছে খুঁজে পাই না জীবনের ভিসা
এবার শ্রীগুরুচরণ ভরসা, হই যেন তার পায়ের দাস ॥

১৩. দ্বিজবর সরকার
(ক)
এ বিশ্ব তোমার করুণায়, আমি করুণার নিদান

আমি তোমার কী গাহিব গান।
তোমার সঙ্গীতের লহরি মাঝে শুনি প্রেমিক ভক্ত করে স্নান ॥

সঙ্গীতের সিন্ধু মাঝে গভীর রাগরাগিণী
অযোগ্য দুর্ভাগ্য বলে কিছুই শিখিনি।
এখন আমার কণ্ঠে তুমি গেয়ে দয়াল তুমি শোনো তোমার গান ॥

রামপ্রসাদের কণ্ঠসুরে অনুরাগ ভরা
তাইতে আমার মা শঙ্করী বাঁধলো তার বেড়া।
আমি কপালপোড়া লক্ষ্মীছাড়া তোমার দরশ-পরশ পাবো ক্যান ॥

তারক গোঁসাই গান করেছে হরিচাঁদ ভাবি
জন্মান্ধ অশ্বিনী গোঁসাই রইলো সেই ভাবে ডুবি।
হরিবর মনোহর সবই গুরুচাঁদের কোলে পেলো স্থান ॥

বড়ো রাজেন্দ্র নকুল নিশি আরো নন্দলাল
পরান খুলে তোমার গীতি গাইল রসিকলাল
পাগল বিজয়ের শুনলে ভাটিয়াল, শুকনা গাঙে ছোটে বান ॥

ছোটো রাজেন অনাদি কালা রবি নারায়ণ
স্বরূপও অরূপে ডুবে হলো মহাজন।
অধম দ্বিজবরের মনের বেদন, গুরুচাঁদ শুনবে কি ভিক্ষুকের গান ॥

(খ)

তোমারে দেখিতে প্রাণে চায় পরান-বন্ধুরে
তোমারে দেখিতে মনে চায়।
আমার মন-ভুলানো প্রাণ-জুড়ানো দরদিয়ায় ॥

বিরলে বসিয়া ভাবি তোমায় আর দেখবো না
নয়নে মানে না মানা পরানে বোঝে না
করি কার লাগিয়া আনাগোনা, সে রইলো কোথায় ॥

ভুলি ভুলি মনে করি ভোলা নাহি যায়
তবু পরান কেঁদে ওঠে অজানা ব্যথায়
যেমন বুকের ব্যথা নাহি লুকায় যুক্তিতর্কের মীমাংসায় ॥

দ্বিজবর কয় মনের খাদ্যের বেশি হয় ওজন
না পেলে পর ঘটে তাহার অকালে মরণ।
যেমন শীতকালে জলে সন্তরণ গোধূলি বেলায় ॥

১৪. সুরেন্দ্রনাথ সরকার

(ক)

তোমার নামে নাও ভাসায়ে চলেছি ভেসে ও কাণ্ডারী
বেহাল দেখে হাল ধরো এসে।
আমি জানি না এই স্রোতের টানে আমায় নিয়ে যাবে কোন দেশে ॥

কালো মেঘে ঘিরেছে, চারিদিক অন্ধকার
দৃষ্টিপথ হয়েছে অন্ধ দেখি না কিনার।
ও দয়াল একমাত্র ভরসা তোমার ॥

ছেঁড়া বাদাম ভাঙা মাস্তুল নাহি দাঁড়ি দাঁড়
মালকোঠায় মাল ছয়চোরা সব করেছে সাবাড়।
নৌকায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙেছে ঘাড়, বাই চোয়ায়ে জল আসে ॥

স্রোতের টানে চলে নৌকা বাতাসের উজান
জল সেঁচে পারি না আমার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
আমি কোন ফাঁকে বৈঠায় দেবো টান, সব দিকে হারাই দিশে ॥

এ দীন সুরেন বলে আগে পাছে, কোনো দিক মোর নাই
যেদিকে চালাবে তুমি সেইদিক যেন যাই।
শুধু দিয়ে গুরুচাঁদের দোহাই, সব ছেড়ে থাকলাম বসে ॥

(খ)

তোমারে বলবো কী হে মন্ত্রী বিধান রায়, ও প্রধানমন্ত্রী মহাশয়।
বাস্তুহারার দুঃখ সারা তোমার পক্ষে হলো দায় ॥

ক্যাম্পে শুয়ে মাঠে ঘাটে আর কতো দিন জীবন কাটে
দেখে মোদের দুঃখ-কষ্ট শেয়াল-কুকুর লজ্জা পায় ॥

এমন সোনার বাংলাদেশে মানুষ বেড়ায় ভেসে ভেসে
হলেম বাস্তুহারা লক্ষ্মীছাড়া কার কলমের এক খোঁচায় ॥

তোমারে বলবো কী হে বিধান রায়, চাই না মোরা দালানকোঠা
মোরা চাই ভাত আর কাপড় মোটা
তাও যদি না মিলবে তবে মোদের বাঁচার কী উপায় ॥

আমরা যদি বাঁচি তবে আমার সোনার বাংলা হবে
গোড়ায় যদি রস না থাকে, গাছ বাড়ে না ফল শুকায় ॥

তোমার অফিস কাছারিতে শুনেছি আছে রাঙ্গা ফিতে
ওষুধ দিতে সয় কি দেরি নাভিশ্বাসের কলেরায় ॥

জগন্নাথের ভক্ত মোরা যার বিধান জগৎজোড়া
তাঁর বিধানেই সসম্মানে বাস্তুহারা বাঁচতে চায় ॥

১৫. আসমত আলি বয়াতি

(ক)

দয়াল গুরুরে আমি আপন দেশে যাবো কেমনে।
যে দেশে নাই জনম-মরণ রে, সেথায় যাইতে চায় মনে ॥

সাধন দেশ হয় কতো জেলার পর, কয় দরিয়া পাড়ি দিলে মেলে সেই শহর।
জানতে চাই সে দেশের খবর গো, দয়াল বাসনা আমার মনে ॥

সেই দেশেতে রাজত্ব হয় কার, সেই খানেতে আমি গেলে পর
সেই দেশে কি কর্ম আমার জানিবো তা কেমনে ॥

সাধুগণ সেই দেশের লাগি, শ্মশানে জঙ্গলে তারা যায় রাজ্য ত্যাগী।
তারা কোন যোগের যোগী, অধম আসমত কয় এই ভিক্ষা মাগি গো
প্রভু রেখো তোমার চরণে ॥

(খ)

প্রাণের কোকিল আর ডেকো না
ও তোর কুহু ডাক যে সয় না প্রাণে, লাগে প্রাণে বেদনা।
যে সুরে ডাকিলে কোকিল, ও সুর আমার সহে না ॥

তোর সুরে প্রাণ উদাস করে, কোকিল রইতে নারি ঘরে
বসন্তে দক্ষিণ হাওয়া উদাস করে মোরে
গেছে প্রাণের বন্ধু প্রাণকালিয়া রে, কোকিল ফিরে আর এলো না
আমার ফুটফুটে ফুল ঝরে পইলো গো, ভ্রমর মধু পান করিলো না ॥

আমার শ্যাম কালো আর তমাল কালো, কালো কালো দুটি আঁখি
আমার কালো চক্ষু দিয়া রে কোকিল তোর কালো রূপ দেখি
যদি ডাকবি তুই তমালের ডালে রে, দিবি বন্ধুর খবর মোরে
তোরে বিধাতা দিয়াছে পাখা রে, পাখা আমায় কেন দিলো না ॥

ফাগুন এলে ফুটে উঠলো নানা জাতি ফুল
ভুঁইচাঁপা আর জুঁই চামেলি গোলাপ আর বকুল
বকুলে করেছে আকুল দুকুল নে ভাঙিয়া
অঝোরে ঝরেছে আঁখি রে, কেউ দিলো না সান্ত্বনা ॥

যার জ্বালায় সেই জ্বলে রে ভবে, যার মনে আগুন
জ্বলে পুড়ে হলো সারা, তবু আগুন জ্বলে রে দ্বিগুণ

আসমত বলে আর কেঁদো না রে, ফল কিছু হবে না
প্রেমের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ গো, আগুন এ জীবনে নেভে না ॥

১৬. স্বরূপেন্দু সরকার
(ক)
ভবের হাটে দোকান পেতে সার হলো বেচাকেনা
জীবনে কী লোকশান হলো বুঝলি না মোনা।
দিলি জিরার দরে হীরামণি কাঁচের বিনিময়ে সোনা ॥

তুই হতে পারিতি মহাজন, নিজের না বুঝে ওজন
অধিক লাভের আশে আসল দিলি রে দাদন।
এর পরিণামে শুধুই কাঁদন, জানিস নারে দিনকানা ॥

আছে জমানো মাল যাহা গুদামে, বেচে দিসনে বেদামে
ফুসলাইবে ছটি দালাল আছে মোকামে।
তারা সর্বক্ষণে ডাইনে বামে করিছে আনাগোনা ॥

পড়িলে দালালের পালাতে কেহ নারে পালাতে
যাদুকরের গুটির মতো পারে চালাতে।
আগে মনলোহা পারলে গালাতে তার দলে ষোলো আনা ॥

স্বরূপ কহে ওহে মোনারাম, আগে সার মনের ব্যারাম
যা আছে সামলায়ে পাবি অন্তিমে আরাম।
হাতে কাজ করিয়া মুখে নে নাম, দেহজমিতে ফলবে সোনা ॥

(খ)
জানিতে চাই গোঁসাই তোমার ভগবান কেমন।
তারে কেউ কয় হরি কেউ গড আল্লা চোখে কি দেখে কখন ॥

তোমার সে ঈশ্বরের স্বরূপ কী, সে রূপ আসল না মেকি
শুধু বোকা লোক বুঝাতে কবির কল্পনা নাকি
বুঝি কল্পনার জাল বুনে রাখিয়াছ ঢের নামকরণ ॥

ভাববাদী কি অবতার নবি, যেভাবে আঁকিল ছবি
তাতে বুঝি সবে চাঁদ দেখেছে কেহ দেখেনি রবি।
তাদের এক এক জনের ভাব আজগুবি, ডুবে নাকো জ্ঞানীর মন ॥

কোরান পুরাণ বাইবেল কিংবা বেদ, পড়ে যায় না মনের ক্লেদ
যতো পড়ি ততো গড়ি বিশ্বপ্রেম বিচ্ছেদ।
দেখে সাধু পোপ আর পিরের বিভেদ নাস্তিকতায় ডুবলো মন ॥

স্বরূপ কয় সে রূপ যদি পাবি, জগৎ আপন নে ভাবি
সেবা ধর্মের মাঝে পাবি প্রেমরাজ্যের চাবি।
শেষে মিটবে সকল চাওয়ার দাবি, ঘটবে তোর আত্মদর্শন ॥

১৭. রবীন্দ্রনাথ সরকার

(ক)

খ্যাপারে পাগলরে কলির তাজব খেলা হায় রে কী ভীষণ।
দোষী পায় না শাস্তি সাজা নির্দোষীর পুরা শাসন ॥

ভালোবেসে বুকের বাসার ধারে দিছি ঠাঁই
সে দিবে তোর বুকে আগুন কলির খেলা তাই
পরনিন্দা পরচর্চা কলিকালের দাখিলা পর্চা
করে সুপ্ত ঘরে গুপ্ত খরচা চালায় কলি প্রশাসন ॥

দুঃখের অশ্রু যে মোছাবে অযাচিতভাবে
তার পুরস্কার কাঁটার মালা পরিণামে পাবে
যে নিভায় যার বুকের আগুন, তার বুকে তা জ্বলে দ্বিগুণ
কলিকালের এই হলো গুণ, নিদারুণ সব প্রহসন ॥

ষড়যন্ত্রে ভরা শুধু কলির রাজত্ব
অগণিত মানুষ আছে নাই মনুষ্যত্ব
সৎ লোকের জোটে না ভাত, লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী সাক্ষাৎ
সতের পর অসতের উৎপাত, দুশমনের পায় সিংহাসন ॥

রবি বলে সুখে থাকুক জগতের সব লোক
যতো আছে দুঃখ কষ্ট মোর কপালে হোক
এই আশাতে দিবাযামী বুক পেতে দিয়েছি আমি
দাম ছাড়া হইয়ে বেদামি নির্জনে নিলেম আসন ॥

(খ)

পাগল বিজয় তোমার দেশে যাওয়ার শেষের বাঁশি বাজিল আজি।
তোমায় ভুল করে যে কেড়ে নিলো নিষ্ঠুর তার মতো নাহি বুঝি ॥

বাংলা ১৩৯২ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার
অন্তিম যাত্রায় দেশবাসী করে হাহাকার
কবিরা ঝরায় নয়নধার হারাইয়া মাঝি ॥

কাব্যরূপ সমুদ্রের মাঝে ভাসাইয়া তরি
কাণ্ডারী বিহনে বুঝি আমি ডুবে মরি

আমি বুঝি না, কী যে করি বিরহে পাগল সাজি ॥

জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাই পাগল হয়
একটি মাত্র কথা বলে, কই বিজয় বিজয়
তোমায় বিদায় দিতে কেউ বাধ্য নয় হিন্দু খ্রিস্টান মোল্লা কাজি ॥

রবি বলে পাগল বিজয় তোমায় না পেলে
পোড়া বুক কে জুড়াবে বাৎসল্য ঢেলে
গেলে জন্মের মতো আমায় ফেলে কার কথায় হয়ে রাজি ॥

১৮. শ্রীনিবাস সরকার
(ক)
নিঝুম রাতে জেগে কেন ডাকিস রে পিয়া পিয়া
কী ব্যথায় তোর ঘুম ভেঙেছে বলরে পাপিয়া।
ডাকিস রে তুই যাহার আশে, সে কি তোরে ভালোবাসে রে
তোর সুর ভেসে এসে বাতাসে উঠল হৃদয় কাঁপিয়া ॥

সে কি ভালোবাসতো তোরে থাকিস যার আশায়
জনমভরে কাঁদায় কিরে তার ভালোবাসায়
তাইতে জেগে রাত দুপুরে ডাকিস পিয়া বলে ব্যথার সুরে
সাথীহারা কাননপুরে আছিস ব্যথা চাপিয়া ॥

চাপা কান্নায় পিয়া বলে ডাকিলি এতো
জানিস কিরে সেই বেদনার বাকি আর কতো।
কাঁচা ঘুম ভাঙায়ে তোরে ভাসায় বুঝি আঁখিলোরে রে
যেমন বিরহ নদী ভাদরে উঠলো দুকূল ছাপিয়া ॥

গাছের ডালে পিয়া বলে পোহালো এ জ্বালা
চোখের জলে ভরলি বুঝি বেদনার ডালা।
বলতো তোরে কী দিয়েছে, কী দিয়ে কী নিয়ে গেছে রে
মনবনে আগুন লেগেছে পড়েছিস তায় ঝাঁপিয়া ॥

(খ)
প্রকৃতির বাগানে ফুটল কাব্যগন্ধী ফুল।
যেন ভুঁইচাঁপা চামেলি বেলী গোলাপ চাঁপা জুঁই বকুল ॥

তারকচাঁদ যশোর জয়পুরে পেয়ে হরিচাঁদ প্রাণের ঠাকুরে
গাইলেন কবি প্রাণের সুরে মনপরান করিয়া আকুল ॥

কবি সুন্দর হরি আচার্য নাম ঢাকা জিলায় নরসিংদী গ্রাম

গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর প্রাণারাম এঁরাই তাঁর কাব্যমূল ॥

দু-ভাই হরিবর মনোহর ফরিদপুরে দুর্গাপুর ঘর
বাড়াইল এই কাব্যের দর, কাব্যরস সাগরে দোদুল ॥

কাব্যপরাগ শ্রীঅঙ্গে মাখি, পাগল রাজেন খুলনার বৈঝাকি
তত্ত্বসুধার মাখামাখি ধন্য করলেন কবিকুল ॥

বরিশালে সুয়াকাঠি কাব্যে সুন্দর পরিপাটি
ধন্য করলেন ধরার মাটি রসসুন্দর কবি শ্রীনকুল ॥

ভাঙ্গার সেই অম্বিকা সিদ্ধান্ত, কুমুদবরণ আর চন্দ্রকান্ত
কাটাদুরার মহিম শান্ত স্রোতস্বিনীর কুলুকুল ॥

যশোহরে ডুমদি গ্রামে এলেন পাগল বিজয় নামে
কী আনন্দ ধরাধামে ভক্তিমার্গে প্রকৃত বুলবুল ॥

ফরিদপুর সেই ভৈরব নগর, কাব্যরসের বিশুদ্ধ সাগর
শ্রীনিশিকান্ত ভাবে বিভোর সরস্বতীর কানের দুল ॥

অনাদিজ্ঞান ভোরের পাখি মধুর সুরে উঠলো ডাকি
খুলনা জেলার বৈঝাকি, কাব্যবনে ফুটিল মুকুল ॥

খুলনা জেলার সেই ভাগা গ্রামে রসিকশেখর শ্রীরসিক নামে
নামল যেন ধরাধামে কাব্যসংসারের দেউল ॥

আবার ফরিদপুরের ডাইনা গ্রামে হরষিত মনোরঞ্জন নামে
এক বৃন্তে দুটি ফুল দু নামে, শ্রীভগবান তাঁদের অনুকূল ॥

ছোটো রাজেন কবি কালিদাস, ফরিদপুর উত্তরপাড়ায় বাস
এক বৃন্তে দুফুলের প্রকাশ চন্দ্র সমতুল ॥

কবি খোরশেদ আলীর বাড়ি বরিশাল শুনালো মধুর ভাটিয়াল
মেঘনা পদ্মা আর আড়িয়াল তাঁহার গানে সেজেছে বাউল ॥

ঢাকা বিক্রমপুরের কবি অমূল্য কাব্যবাজার করলো উৎফুল্ল
যেন ভ্রমর গুনগুনানি তুল্য কাব্যকুলের লাগায় দোল ॥

খুলনা জেলার উমাজুড়ি স্বরূপ সরকার কাব্যের ঘুড়ি
বিনয় সরকার ফরিদপুরি, সাতপাড় গ্রামে সম্পদ তার বিপুল ॥

যশোর ডুটকুড়াতে নারায়ণ বালা সরস্বতীর কাব্যের পাঠশালা
শরৎ বিনোদ কবিওয়ালা যশোর জেলায় দিব্বুল ॥

ফরিদপুরে গোয়ালন্দ নারায়ণ বালা জাগায় ছন্দ
বরিশাল আচার্য নন্দ কাব্যে সাজায় শ্রীনন্দের গোকুল ॥

ফরিদপুরে সুরেন্দ্রনাথ কান্দি গ্রামে নিবাস কাশীধাম
খুলনা চালনায় প্রিয়নাথকে পেলাম কাব্যে হয়েছে মশগুল ॥

বরিশালের সাতলার রবি শ্রীগুরুর করুণা লভি
আঁকিতেছে কবির ছবি দিয়েছে সে এ দেশের মাশুল ॥

নিখিল নিশি শ্রীসুখদেব সরকার সন্ধ্যারানীর বাগেরহাট ঘর
অসীম তমাল বিপদ কালার ভাবের গাঙ্গে দোল মৃদুল ॥

এমন সুন্দর কবিগানে শুকনা গাঙে জোয়ার আনে
তখন ফুটল এই বাগানে গন্ধবিহীন পূজাহীন শিমুল ॥

কান্দি গ্রামে ফরিদপুর জিলার শ্রীনিবাসের তরী শরৎ বায়
নাও লাগালো বিজয়ের চড়ায় চাই গুরুর চরণ-রাতুল ॥

১৯. নারায়ণ সরকার
(ক)
কতো দিনে ধ্বংস হবে জাতপাতের বালাই।
যে সমাজনীতি দুর্নীতি ভাই, তার মুখেতে পড়ুক ছাই ॥

বর্ণবিচার গীতায় গুণকর্ম অনুসারে
ইসলাম বলে সবাই আমরা সকলের তরে
আবার বুদ্ধ কয় হিংসার ভিতরে নির্বাণ মুক্তি কভু নাই ॥

বেশ্যাপুত্র সত্যকাম যে ঋষি জগতে
বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্ম যে জাতে
এদের ঘৃণ্য কয় যে সমাজেতে সেই সমাজের মৃত্যু চাই ॥

হিন্দুগণে যাহারে কয় পূর্ণ ভগবান
সেই কৃষ্ণ যে গোয়ালিনীর দুগ্ধ করে পান
ও তার ভগবতত্ব হলো না ম্লান, আমাদের কেন শুচি নাই ॥

নারান বলে এরই মূলে টিকিধারীর দোষ
তারা পরের মাথায় কাঁঠাল থুয়ে খেয়ে গেছে কোষ
আমার মনে রইলো মনের আক্রোশ, বলার মানুষ পাই না ভাই ॥

(খ)
হলো জাতাজাতির জাঁতাকলে মানবজাতি শেষ।
সবাই নামে মানুষ কামে অসুর বুক ভরা হিংসা বিদ্বেষ ॥

হিংসা নিন্দায় হয়ে উন্মত্ত ভুলেছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব
কতো দিনে ধ্বংস হবে এই আভিজাত্য
কবে মানুষ পাবে চরম তত্ত্ব সত্য তথ্য সবিশেষ ॥

আমরা মানুষ সকলে সমান তার মাঝে কেন ঘৃণ্য ব্যবধান
কে জানে এর কতো দিনে হবে অবসান
কবে সব মানুষ হয়ে একপ্রাণ এক ঘরে করবে প্রবেশ ॥

ছোটো বড়ো সবাই আমার ভাই
যতো দিন এই জ্ঞান না আসে তাই
ততো দিন এই ধ্বংসযজ্ঞের বিরাম কভু নাই।
কবে ভাববো সব এক মার পেটের ভাই, জাতিধর্ম নির্বিশেষ ॥

দীন নারানের ব্যথায় কান্দে প্রাণ
কবে ভাঙবে জাতির ব্যবধান
সবাই বুঝবো সবাই আমরা এক বাবার সন্তান
কবে সবাই গাইবো এই সাম্যের গান
কতো দূরে সেই পরিবেশ ॥

২০. অসীম সরকার

(ক)

জলভরা মোর নয়নতারা আজও আছে চেয়ে।
কবে সখা দিবে দেখা ময়ূরপঙ্খী বেয়ে ॥

প্রথম যেদিন হলো দেখা ছিলো আঁধার রাতি
তুমি নিজের হাতে সেই নিশিতে লয়ে এলে বাতি
কেউ ছিলো না আমার সাথি, তুমি আপন হয়ে বন্ধু
তোমার প্রীতির ডোরে সেদিন মোরে রেখেছো জড়ায়ে ॥

নিরজনে বসি যখন তখন পড়ে মনে
আমার মনভ্রমরা কাঁদে বসে হৃদয় ফুলবাগানে।
বসন্তের কোকিলা আনে বাসন্তী সুর বয়ে বন্ধু
সাথি লয়ে পথে চলে কুলবতী মেয়ে ॥

সকলের সকল আছে, কেহ নাই আমার
তোমার লাগি নিশি জাগি কাঁদি অনিবার।
যেদিকে চাই সেদিক আঁধার, তোমায় নাহি পেয়ে বন্ধু
পথ হারায়ে কেঁদে ফিরি ব্যথার গানটি গেয়ে ॥

অসীম বলে বন্ধু তুমি মিনতি নিয়ো
জীবনশেষে তোমার দেশে ঘর বেঁধে দিয়ো
আপন করে টেনে নিয়ো প্রীতির পরশ দিয়ে বন্ধু
সকল জ্বালা যাবে ধোয়া, তোমার পরশ দিয়ে ॥

(খ)

আর কি ফিরে যাবো রে, আমার শেষের দেখা আসিব দেখে।
সেই মূরতি মধুর স্মৃতি গো, রেখেছি যতনে হৃদয়ে এঁকে ॥

জীবনের সেই প্রভাতবেলায় উঠে কতো নামেরও ভেলায়
যেতাম ওড়াকান্দির মেলায়।
সেদিন চলে গেছে অবহেলায় রে, সে সুর শুনায় না আর কেউ ডেকে ॥

যে পেয়েছে তাঁর কৃপাকণা, বাহ্যিক জ্ঞানে হয় সে আনমনা
আঁকে শুধু নামের আলপনা, গতি নাই তার চরণ বিনা রে, চলে জীবনপথ এঁকেবেঁকে ॥

হরি আমার প্রেমের অবতার, কলির জীবের করতে ভবপার
জয়ের ডঙ্কা সৃজিল এবার
নামসাগরে যে দেয় সাঁতার গো, ভব পার হয়ে যায় যে পুলকে ॥

অসীম বলে রইলো নিবেদন, যে কটা দিন থাকিবে জীবন
তোমায় যেন ভুলি না কখন
জীবনসন্ধ্যায় দিয়ে চরণ গো ভবপার করে দিয়ো আমাকে ॥

পরিশিষ্ট ৮

কবিয়ালদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(নানা ধরনের সহায়ক উপকরণের উপরে ভিত্তি করে এই পরিচিতি তৈরি করা হয়েছে। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে কবিগান বিষয়ক বই ও আলোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবিয়ালদের জীবনী প্রভৃতি। এই পরিচিতির বড়ো একটি অংশ সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। সহায়ক উপকরণের উপরে নির্ভর করে তৈরি করা পরিচিতিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। যেমন অনেক সময়ে পুরনো লেখার মধ্যে কবিয়ালদের জন্মস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বৃহত্তর জেলার নাম করা হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর জেলাটি বর্তমানে ঠিক কোন জেলার মধ্যে পড়ে, তার ইঙ্গিত সবসময়ে না পাওয়ায়, পরিচিতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর জেলার নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে জন্মতারিখ উদ্ধার করা নিয়ে। যেসব ক্ষেত্রে আনুমানিক সালও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে কোন শতকে কবিগান করেছেন, শুধু সেই শতকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গভীর নৈকট্য বিবেচনায় এই তালিকায় কবিয়ালের পাশাপাশি কয়েকজন বাঁধনদার, বিচারগায়ক এবং জারিগায়ককেও স্থান দেওয়া হয়েছে।)

অক্ষয় আচার্য (উনিশ-বিশ শতক)। নোয়াখালী জেলার পাইনালা গ্রামে জন্ম।

অক্ষয় চন্দ্র সরকার (বৈরাগী) (উনিশ-বিশ শতক)। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার বলাবুনিয়া গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। তাঁর বংশের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মানস বৈরাগী একজন কবিয়াল।

অক্ষয়া কাটানি (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কলকাতা অঞ্চলের কবিয়াল। অক্ষয় কাটানির অন্য নাম অকা বাঈ। দাশরথি রায়ের কবিগানের গুরু।

অজয় কুমার হালদার (জ. ১৯৭৭)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার কারফা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মনোহর হালদার, মাতার নাম খোলসা হালদার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এমএ বিএড কাব্যব্যাকরণতীর্থ। কবিগানের গুরু রবীন্দ্রনাথ সরকার।

অজিউল্লাহ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ থানার উত্তর সন্দীপ হারামিয়া গ্রামে জন্ম।

অধরচাঁদ সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার উজানচর গ্রামে জন্ম।

অধর মালো (উনিশ-বিশ শতক)। যশোর জেলায় জন্ম।

অনন্ত মালাকার (জ. ১৯৪২)। খুলনা জেলার বলরামপুর গ্রামে জন্ম। পিতা যাদবচন্দ্র মালাকার, মাতা অভিলাষী মালাকার। কবিগানের গুরু বিজয়কৃষ্ণ সরকার। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়ে মালদহ জেলার গাজোল থানার শংকরপুর গ্রামে বসবাস।

অনঙ্গ সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। কুমিল্লা জেলার কুড়পাই গ্রামে জন্ম।

অনন্ত সরকার (বিশ শতক)। পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া থানার তারাবুনিয়া গ্রামে জন্ম।

অনাদিজ্ঞান সরকার (১৯২৮–২০০৬)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার মেহেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃক বাড়ি নিকটবর্তী চুনখোলা গ্রাম। পিতা লোকগীতিকার কুঞ্জবিহারী সরকার (১৮৯৪–১৯৮৯) মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁর একটি বইয়ের নাম 'অষ্টোত্তর শতম'। মাতার নাম জহরমণি দেবী। পিতামহ নদীয়ার চাঁদ সরকার এবং জ্যেষ্ঠতাত রাজেন্দ্রনাথ সরকার খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। অনাদিজ্ঞান সরকারের খুল্লতাত গৌরপ্রিয় সরকার শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছেন এবং একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। জ্যেষ্ঠতাত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নিকটে কবিগানের হাতেখড়ি হলেও কবিগানে অনাদিজ্ঞানের গুরু ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ সরকার। ১৯৫১ সালের দিকে দল গঠন করে কবিগান গাইতে শুরু করেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, গৌরপদ সরকার, নকুল সরকার, বিজয় সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালিদাস সরকার, রসিক সরকার, বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নিতাই সরকার, বৃন্দাবন সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বসন্ত সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সরোজ সরকার, নারায়ণ সরকার, কানাইলাল সরকার, ছোটো বিনয় সরকার, সঞ্জিত পাল সরকার, চারুনাথ সরকার, কৃষ্ণদাস সরকার প্রমুখ অন্যতম। ১৯৮০ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমীতে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে কবিগানের সুযোগ পান।

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৭–২০০১)। মেহেরপুর জেলার আলমপুর গ্রামে জন্ম। পিতা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা দয়ালদাসী দেব্যা। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়ে নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার উত্তর বহিরগাছি গ্রামে বসবাস করেন। হরিনারায়ণ দে ও সৃষ্টিধর কোটালের কবির লড়াই শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হরিণারায়ণ দের নিকটে কবিগান শেখেন।

অনিল ধর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার উজিরা ভিটা গ্রামে জন্ম।

অনিল শীল (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার কয়রা গ্রামে জন্ম। আবদুল গনি সরকার, আব্দুল সরকার, কালাচাঁদ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

অনিল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহিরা গ্রামে জন্ম।

অনুকূল রায় (জ. ১৯০৮)। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার সিঙ্গার গ্রামে জন্ম। পিতা ইন্দ্রদমন রায়, মাতা কুসুমকামিনী রায়। শ্বশুর জানকীনাথ রায় একজন কবিয়াল ছিলেন। জানকীনাথই তাঁর কবিগানের গুরু। শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর

চক্রবর্তী, দেবেন দাস, হরেকৃষ্ণ দাস, কিশোরী কোনাই, কাশীকান্ত দেবনাথ, শিবশঙ্কর পাল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। জীবনে অনেকবার স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক পেয়েছেন।

অন্নদাচরণ নট্ট (উনিশ-বিশ শতক)। নোয়াখালী জেলার নরোত্তমপুর গ্রামে জন্ম।

অন্নদাচরণ বসাক (জ. ১৯৪৭)। খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার রূপরামপুর গ্রামে জন্ম। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

অবিনাশ চক্রবর্তী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলায় জন্ম। তারিণীচরণ সরকারের বিপক্ষে গান করেছেন।

অবিনাশ পাটনী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার সিলামতপুর গ্রামে জন্ম। মাগুরার বৃন্দাবন সরকার তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

অবিনাশ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়িতে জন্ম।

অভয়চরণ বৈরাগী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। খুলনা জেলায় জন্ম।

অভয় সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ থানার ঘিওর থানার শিলগুড়ি গ্রামে জন্ম। ভীম সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

অমর সরকার (জ. আ. ১৯৪০)। মানিকগঞ্জ জেলায় উজয়মারীর কাছে তরা গ্রামে জন্ম। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। জগদীশ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

অমল সরকার (জ. আ. ১৯৫০)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার হুড়কা গ্রামে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সরকার একজন কবিয়াল ছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

অমল সরকার (জ. আ. ১৯৫০)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার ঘোষালকান্দি গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু বিনয়কৃষ্ণ সরকার।

অমিয় সরকার (বিশ শতক)। রমেশ শীলের অন্যতম শিষ্য।

অমূল্যচরণ সরকার (বিশ শতকের শেষ)। সিরাজগঞ্জ জেলার চর তারাবাড়িয়া (ডাক—চরনবিপুর) গ্রামে জন্ম।

অমূল্যরতন সরকার (জ. ১৯৩৪)। মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর থানার গাংডুবি গ্রামে জন্ম। পিতা ডাউরীমোহন সরকার (কাপালি), মাতা দিব্যসুন্দরী। কবিগানের গুরু উপেন্দ্রনাথ সরকার। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার পরে সেখানে নদীয়া জেলায় বেথুয়াডহরির নিকটবর্তী যুগপুর গ্রামে বসবাস করেন। নকুলেশ্বর সরকার, গোপাল সরকার, হরেন্দ্রনাথ সরকার, রাধাবল্লভ সরকার, শের আলী সরকার, জগদীশ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

অমূল্য সরকার (১৯৪১–২০১০)। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ থানার বয়ারশিঙ্গা গ্রামে জন্ম। পিতা নলিনীকান্ত হালদার, মাতা কমলা দেবী হালদার। কবিগানের গুরু স্বরূপেন্দু সরকার। ডাকাতের আক্রমণে ডান হাত কাটা যায়।

অম্বিকাচরণ বালা (উনিশ-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার গোহালা গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশ্বর বালা খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। সহোদর মথুরানাথ বালা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণচন্দ্র বালাও খ্যাতিমান কবিয়াল।

অম্বিকাচরণ বিশ্বাস (উনিশ-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার বাটিকামারী গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

অম্বিকা সরকার (পাটনী) (জ. ১৮৮২)। গাজীপুর জেলার বেণুপুর গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের অন্যতম শিষ্য। গুরুর বিপরীতে বহু কাল জোট গঠন করে কবিগান পরিবেশন করেছেন। ঝালোকাঠিতে বড়ো মনোমোহিনীর দলের সরকার হিসেবে নিযুক্ত থেকে কয়েক বছর কবিগান করেন। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি শ্রেণীর গান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। টপ্পা-পাঁচালিতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিলো অসাধারণ।

অম্বিকা লোধ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার করটখিল গ্রামে জন্ম।

অরবিন্দ সরকার (জ. ১৯৬৩)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার তালপুকুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম অলক বিশ্বাস। কবিগানের গুরু সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং শ্রীনিবাস সরকার।

অরুণ গোঁসাই (জ. ১৯৩৮)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার হাচলা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শরৎচন্দ্র বিশ্বাস এবং মাতার নাম সরোজিনী দেবী। বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়ে নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার বহিরগাছি রেলস্টেশনের নিকটে প্রতাপগড় গ্রামে বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে তিনি সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। প্রতাপগড় গ্রামে নিজ বাড়িতে তিনি কবিগান শিক্ষাকেন্দ্র নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

অরুণ বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার আবদুল্লাহপুর গ্রামে জন্ম।

অর্কেন্দুভূষণ রায় (১৯২২–১৯৯৪)। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার সর্বশীডাঙা গ্রামে জন্ম। পিতা জ্যোতিষচন্দ্র রায়, মাতা নরেশনন্দিনী। ম্যাট্রিক পাস করার পরে স্কুল শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৫২ সালের দিকে কবিগান গাইতে শুরু করেন। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান করেন। বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

অর্জুনচন্দ্র সরকার (দেবনাথ) (জ. ১৮৮১)। কুমিল্লা জেলার আন্দিকোট গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের প্রথম জীবনের খ্যাতিমান শিষ্য। ডাক-মালশি-সখীসংবাদ-কবিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হরিচরণ আচার্য, তারিণীচরণ সরকার প্রমুখের বিপরীতে গান করতেন। সিলেটের মাধবপুর কাচারিতে, কুমিল্লায় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে, রায়পুরা দীননাথ সাহার বাড়িতে, ময়মনসিংহের কুলিয়ারচরে গান গেয়েছেন।

অর্জুন সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার পুঁইছড়ি গ্রামে জন্ম।

অর্জুন ধুবী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

অশ্বিনী দাশ (জ. ১৯৪৯)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার পশ্চিম গুজরা গ্রামে জন্ম। পিতা মনোমোহন দাশ, মাতা জ্ঞানদা দাশ। কবিগানের গুরু ফণী বড়ুয়া। ফণী

বড়ুয়া, রাইগোপাল দাশ, এস এম নূর-উল আলম, মানিক শীল, শামসুল আলম প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

অশ্বিনী সরকার (গোঁসাই) (১৮৭৭–১৯২৭)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার গঙ্গাচন্না গ্রামে জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তাঁর একটি চোখ অন্ধ ছিলো। তারকচন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। মহানন্দ পাগলের নিকটে মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হন এবং অচিরে তিনি এই ধর্মসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারকে পরিণত হন। প্রথম দিকে তারকচন্দ্র সরকারের দলে দোহার হিসেবে কাজ করতেন। চিতলমারী থানার কালীগঞ্জ বাজারের কালীখোলায় (অধুনালুপ্ত) আয়োজিত কবিগানের আসরে বিপক্ষের কবিয়াল গোবিন্দ তাঁতির অনুপস্থিতিতে তারকচন্দ্রের নির্দেশে কবিয়াল জীবনের সূচনা হয়। তাঁর রচিত ধুয়া গানগুলো মতুয়াসঙ্গীত হিসেবে জনপ্রিয়। তাঁর এই জাতীয় গানের একটি সংকলন 'শ্রীহরিসঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

অশ্বিনী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার বল্লভপুর গ্রামে জন্ম।

অসীমকুমার দাস (জ. ১৯৫৯)। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার দোহালিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা ধনঞ্জয় দাস, মাতা গীতারানী দাস। কবিগানের গুরু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। চাঁদ মহম্মদ, কাশীকান্ত দেবনাথ, শ্যামসুন্দর তেওয়ারি, দ্বিজপদ হালদার, আফাজুদ্দিন আহমেদ, রিয়াজুদ্দিন, বৈদ্যনাথ দেবনাথ, সনৎ বিশ্বাস, সনৎ পান প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

অসীম সরকার (জ. ১৯৬০)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার সাতপাড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রাজবল্লভ সরকার (বিশ্বাস), মাতার নাম হেমলতা সরকার। অসীম সরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। কবিগানের দোহার প্রফুল্ল গাইনের নিকট কীর্তন ও রামায়ণ গান শেখার হাতেখড়ি হয় এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিতা ও ভাইবোনকে নিয়ে রামায়ণ গানের দল গঠন করেন। প্রথম বার দেশ ত্যাগ করেন ১৯৬৯ সালে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৬ সালে পুনরায় দেশ ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। বর্তমানে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগ্রামের নিকটবর্তী নয়া গোপালগঞ্জ গ্রামে বসবাস করেন। মাতৃসাধক ভবা পাগলার নিকটে দীক্ষিত অসীম সরকারের কবিগানের গুরু রসিকলাল সরকার। অমূল্য সরকারের নিকটেও কবিগান শিক্ষা করেন। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী সরকারও একজন কবিয়াল। নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, নারায়ণ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, ছোটো মনোরঞ্জন সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমূল্য সরকার, প্রভাত সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তমাল সরকার, প্রভাত সরকার প্রমুখ প্রধান।

আকরাম বয়াতি (বিশ-একুশ শতক)। নড়াইলের জারিগায়ক।

আজগর আলী (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার খাগরিয়া গ্রামে জন্ম।

আজহার আলী বয়াতি (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম। মূলত বিচার গানের গায়ক। কবিগানও করেন। টেনু বয়াতি নামেও পরিচিত।

আজিজুর রহমান (জ. ১৯৫২)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা হেদায়েত আলী, মাতা আমেনা খাতুন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় কবিগান পরিবেশন করেন।

আদিত্য সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

আদ্যনাথ চক্রবর্তী (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। আদু ঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার পাঁচপাড়া গ্রামে জন্ম।

আনন্দকিশোর চক্রবর্তী (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার চন্দনকান্দি গ্রামে জন্ম।

আনন্দচন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার চরবদু গ্রামে জন্ম।

আনন্দ সরকার (১৮৩৩–১৯২৬)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গোঁসাই দাস সরকার। তাঁর কবিগানের গুরু বেচারাম সরকার। মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের নিকটে আনন্দ সরকার মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হন। আনন্দ সরকারের পুত্র হরিবর সরকার একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। আনন্দ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর সরকারও তাঁর সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তারকচন্দ্র সরকার, নদীয়ারচাঁদ সরকার প্রমুখের বিপরীতে আনন্দ সরকার গান গাইতেন। নদীয়ারচাঁদ সরকার ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা।

আনন্দ সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। শেরপুর জেলার শিলা গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

আফাজ উদ্দিন (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। টাঙ্গাইল জেলার খ্যাতিমান কবিয়াল। তাঁর শিষ্য শান্তিরঞ্জন সেন টাঙ্গাইলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। টাঙ্গাইল জেলার মুসলমান সমাজে কবিগানকে জনপ্রিয় করে তুলতে আফাজউদ্দিনের বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

আবদুর রহমান বয়াতি (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বেতৈর গ্রামে জন্ম। বিচারগায়ক।

আবদুর রাজ্জাক। চুয়াডাঙা জেলার এনায়েতপুর, বারাদি গ্রামে জন্ম।

আবদুল আজিজ (জ. ১৯৬০)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানার পদুয়া গ্রামে জন্ম। পিতা নূর আহমদ সরকার একজন কবিয়াল। মাতা সাকেরা খাতুন। পিতাই তাঁর কবিগানের গুরু। নিরঞ্জন সরকার, মানিক শীল, এয়াকুব আলী প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

আবদুল গনি সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার গোড়াই পাহাড় গ্রামে জন্ম।

আবদুল গফুর শেখ (জ. ১৯২৭)। বর্ধমান জেলার চাণ্ডলি গ্রামে জন্ম। পিতা আহম্মদ শেখ কবিয়াল ছিলেন, মাতার নাম মেহেতুন্নেসা। শিবশঙ্কর পালের কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতার নিকটে কবিগান শেখেন। শেখ ওমানী

দেওয়ান, রাঘব সরকার, তারা কাহার, আবদুল জব্বার, দেবেন চাঁই, কিশোরী কোনাই, কিশোরী রায়, ভগীরথ মণ্ডল, মধু ঘোষাল, বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। জীবনের স্মরণীয় পালা শিবশঙ্করের বিপক্ষে, বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত এই গানের প্রধান শ্রোতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

আবদুল জব্বার (১৯০৩–১৯৮৭)। জুব্বারি কবিয়াল নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার যশোহরি আনুখা অঞ্চলে মুনিগ্রাম গ্রামে জন্ম। পিতা বিল্লাত মোল্লা, মাতা জয়নার। লেটো গান দিয়ে সঙ্গীতজীবনের সূচনা। জোবেদ শেখের নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ। পরে হরিশচন্দ্রপুরের কবিয়াল জিসোমুদ্দির নিকটেও কবিগান শেখেন। শ্রোতাদের নিকট থেকে 'রসরাজ কবিয়াল' উপাধি পান। শেখ গুমানী দেওয়ান, দেবেন ডোম প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। ১৯৪৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে বিধায়ক বিমলচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান গেয়ে অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ প্রচারে ভূমিকা রাখেন।

আবদুল মান্নান (জ. ১৯৫৪)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার দৌলতপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মাহমুদুর রহমান, মাতা সোলেমান খাতুন। ইয়াকুব আলী কবিগানের গুরু।

আবদুল লতিফ (জ. ১৯৪৫)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার সরফভাটা গ্রামে জন্ম। পিতা বাদশা মিয়া সওদাগর, মাতা সাজেদা বেগম।

আবদুল শহীদ (জ. ১৯৪৮)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার দেওয়ানপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত, মাতা বিবিজান খাতুন।

আবদুল শাহ ফকির (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার বাগুটিয়া গ্রামে জন্ম। কবিয়াল গৌরাঙ্গ সরকারের গুরুস্থানীয়।

আবদুল সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার খোদ নিকলা গ্রামে জন্ম।

আবু বক্কর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বৈলতলী গ্রামে জন্ম।

আবুল সরকার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার বেতাটি গ্রামে জন্ম।

আলতাপ মিয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার পোমরা গ্রামে জন্ম।

আলী হোসেন সরকার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার বুড়িঝুড়ি গ্রামে জন্ম।

আশীষ কুমার ধর (জ. ১৯৪৮)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বৈলগাঁও গ্রামে জন্ম। পিতা নীরদবরণ ধর, মাতা মোক্ষদাবালা ধর। কবিগানের পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন।

আশুতোষ মধু সরকার (১৯৩২–আ. ২০০০)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার সন্তোষপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রাইচরণ মধু। বিজয় সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

আশুতোষ সরকার (জ. ১৯৭৩)। মাগুরা জেলার মাগুরা থানার চেঙারডাঙা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নিখিলচন্দ্র বিশ্বাস, মাতার নাম সবেদা বিশ্বাস। কবিগানের গুরু নিশিকান্ত সরকার (ছোটো)।

আশুতোষ সাহা (বিশ শতক)। বীরভূম জেলার হারিমোড়া গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

আসমত আলী বয়াতি (১৯২৭–২০০০)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার কচুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম খেরাজউদ্দিন হাওলাদার। জারিগানের গুরু কচুরিয়ার গফুর শেখ। কবিগানের গুরু নিশিকান্ত সরকার। কবিগানের পাশাপাশি জারিগান গাইতেন। টপ্পা ও পাঁচালিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকার, দ্বিজবর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। এছাড়া খোরশেদ আলী বয়াতি, আবদুল কাদের বয়াতি, উকিল উদ্দিন বয়াতি, ইদ্রিস আলী বয়াতি ও আবদুস সত্তার বয়াতি প্রমুখের বিপক্ষে জারিগান গাইতেন।

আহমদুর রহমান (১৯২৪–)। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী গ্রামের ধলাই গ্রামে জন্ম।

আহাদ গায়েন। চুয়াডাঙা জেলার কুলচারা গ্রামে জন্ম।

আহাম্মদ সেখ (১৮৭৫–১৯৬৫)। তরজা গায়ক। বর্ধমান জেলার চাগুলি গ্রামে জন্ম। পিতা সাতকড়ি সেখ, মাতা মাখন বিবি। নিমাই বসু তাঁর তরজা গানের গুরু। প্রপিতামহ কীর্তনিয়া মুকুন্দদাস বৈরাগী প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (আ. ১৭৭০–১৮৩৬)। আসল নাম হেন্‌সম্যান অ্যান্টনি। পিতার নাম অ্যান্টনি। পর্তুগিজ খ্রিস্টান বংশে শ্যামনগরে জন্ম। ফরাসি অধিকৃত ফরাসডাঙা ও চন্দননগরে তিনি বেড়ে ওঠেন। সেখানকার সৌদামিনী ওরফে নিরুপমা নাম্নী এক হিন্দুবিধবার সঙ্গে তিনি ঘর বাঁধেন। অ্যান্টনি যখন কবির দল করেন, তখন গোরক্ষনাথ নামে তাঁর একজন নির্ধারিত বাঁধনদার ছিলেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর রচিত গানও অ্যান্টনি পরিবেশন করতেন। অচিরে তিনি নিজেই গান রচনার যোগ্যতা অর্জন করেন। রাম বসু, ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ, রামসুন্দর কর্মকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কবিগান করতেন।

ইদ্রিস আলী বয়াতি (জ. ১৯৫৪)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার কচুরিয়া গ্রামে জন্ম। জারিগায়ক। পিতা আবদুল গফুর শেখও জারিগান গাইতেন। পিতার নিকট জারিগান শেখেন। আসমত আলী বয়াতি, লেহাজউদ্দিন বয়াতি, ঝাহেরউদ্দিন বয়াতি, সাহাবউদ্দিন বয়াতি, তৈয়ব আলী বয়াতি, নূর মহম্মদ বয়াতি, মুজিবর রহমান বয়াতি, সত্তার খান বয়াতি, আলকাছ বয়াতি প্রমুখের বিপক্ষে জারিগান করেন।

ইব্রাহীম সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার বড়ো হাতিয়া গ্রামে জন্ম।

ইয়াকুব আলী (১৯৩১–১৯৯৫)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বিলপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর পিতার নাম রহিম বখ্‌শ এবং মাতার নাম মায়মুনা খাতুন। ছাবের সরকার তাঁর কবিগানের প্রথম গুরু। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সব কবিয়ালের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছেন। ১৯৫৮ সালে বাংলা একাডেমী গান করেন। ১৯৬৪ সালের পরে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কবিগান পরিবেশন করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চার। এর মধ্যে 'কবিগান' নামে একটি

গ্রন্থে তিনি জনপ্রিয় কিছু কবিগানের পালা সংকলন করেন, যাতে উভয় পক্ষ ইচ্ছা করলে মুখস্থ করে কবিগান পরিবেশন করতে পারে। ঢাকার বাংলা একাডেমীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন। ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাক ভাষা সম্মেলনে 'সহজ বাংলা বনাম কঠিন বাংলা' শীর্ষক কবিগানে তিনি কবি খান মুহাম্মদ মঈনদ্দীন কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কবিয়াল তাঁর নিকটে একটি 'কবিয়াল একাডেমী' করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আবদুল মান্নান, জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীলকান্তি দাশ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইলিয়াছ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার বড়ো হাতিয়া গ্রামে জন্ম।

ইসমাইল কারিগর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দে জন্ম।

ইসমাইল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বুরুমচড়া গ্রামে জন্ম।

ঈদু বিশ্বাস (উনিশ-বিশ শতক)। মাগুরা জেলার বন্যাতল গ্রামে জন্ম। গুরু পাগলা কানাই। প্রধানত জারিগায়ক। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

ঈশান দত্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম।

ঈশান দত্ত পাঠক (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। হবিগঞ্জ জেলায় জন্ম।

ঈশান সামন্ত (উনিশ শতকের শেষ ভাগ)। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার কাকনান গ্রামে জন্ম। এঁর কবির দলে শশিমুখী নামে একজন মহিলা কবিয়াল ছিলেন এবং এঁদের বিপক্ষে প্রায়ই মনোমোহিনী দাসীর কবিগান হতো।

ঈশ্বর আচার্য (উনিশ শতক)। বৃহত্তর ঢাকা জেলায় জন্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২–১৮৫৯)। কবিগানের সংগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং বাঁধনদার। চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত। মাত্র বারো বছর বয়সে সখের দলে কবিগান রচনা করেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক (পরে দৈনিক) পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান। কবিগান রচনা করতে গিয়ে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রাচীন কবিয়ালদের জীবনী সংগ্রহ করে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। কবিগানের প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে স্মরণীয়। তাঁর রচিত মালশি ও সখীসংবাদ উন্নত মানের।

ঈশ্বর বালা সরকার (১৮৩৮-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার গোহালা গ্রামে জন্ম। কৌলিক উপাধি দে। কবিগানের গুরু নড়াইল জেলার পাঁচু দত্ত। পুত্র মথুরানাথ বালা ও অম্বিকা বালা এবং পৌত্র নারায়ণ বালা (মথুরানাথ বালার পুত্র) সকলেই কবিয়াল ছিলেন।

উত্তম সরকার (১৯৬৫)। হুগলি জেলার শ্যাওড়াফুলিতে জন্ম। উমা সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেন।

উদয় ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার ধানুকা গ্রামে জন্ম।

উদ্ধব সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

উপেন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার বাওনচিতনা গ্রামে জন্ম।

উপেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মানিকগঞ্জ জেলায় কাপালী পরিবারে জন্ম।

উপেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার নরসিংহপুর গ্রামে জন্ম।

উপেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানায় জন্ম।

উমা সরকার (জ. ১৯৫১)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার হিরণ গ্রামে জন্ম। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত থানার বামুনগাছি মুক্তিপাড়া গ্রামে বাস করেন। পিতা পল্টু বিশ্বাস। মাতা নিভা বিশ্বাস। স্বামী রঞ্জিত মজুমদার কবিগানের দলে হারমোনিয়ম মাস্টার। রসিক সরকার এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর কবিগানের গুরু। মনোরঞ্জন সরকার, কৃষ্ণপদ সরকার, অসীম সরকার, সন্ধ্যা সরকার, নিরঞ্জন সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে কবিগান করেন। গণমাধ্যমেও তিনি একজন জনপ্রিয় কবিয়াল।

উমেশ শীল (উনিশ-বিশ শতক)। ঝালোকাঠি জেলার গরঙ্গা গ্রামে জন্ম। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ শীল। মামা ভারত শীল ছিলেন উমেশ শীলের কবিগানের গুরু। কালা যামিনীর কবির দলে সরকার হিসেবে উমেশ শীল কাজ করতেন। দলটি উমেশ-যামিনীর দল হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পায়। মাতুল ভারত শীল, কুঞ্জ দত্ত, কুমিল্লার হরকুমার শীল প্রমুখের বিপরীতে প্রায়ই কবিগান করতেন। ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনার বিখ্যাত আসরগুলোতে তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন।

এজাহার মিয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার নিদ্দারপাড়া গ্রামে জন্ম। বিশ শতকের প্রথম দিকে মায়েনমারের রেঙ্গুন শহরে কবিগান করতেন।

এম আর আলী শেখ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বাণীগ্রাম অঞ্চলে জন্ম।

এস এম নূর-উল-আলম (১৯৫১–)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কচুয়াই গ্রামে জন্ম। পিতা এস এম আলা মিয়া সওদাগর, মাতা ইসলাম খাতুন। নিরঞ্জন সাধু তাঁর কবিগানের গুরু। নিরঞ্জন সাধু, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস, এয়াকুব আলী প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। ২০০৩ সালে 'চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান' শিরোনামে তাঁর একটি বই ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

কমল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলায় জন্ম।

কমলাকান্ত মণ্ডল (১৯১৪–১৯৮১)। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার জাগলাই গ্রামে জন্ম। শেখ গোমানী দেওয়ানের বাড়ি এই গ্রামের পাশের গ্রামে। পিতা গোপালচন্দ্র মণ্ডল, মাতা ত্রিপথগামিনী মণ্ডল। লম্বোদর চক্রবর্তী তাঁর কবিগানের গুরু। শেখ গোমানী দেওয়ানের বিপক্ষে জোট বেঁধে কবিগান করতেন। ১৯৭৫

সালে শেখ গোমানী দেওয়ানের বিপক্ষে বাংলাদেশের রাজশাহীতে কবিগান করেন এবং সেখানে সংবর্ধনা পান।

কমলাক্ষ সরকার (১৯৩১–২০০২)। ছবি ঠাকুর নামে পরিচিত। বীরভূম জেলার নলহাটি গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে জন্ম। পিতা হেমচন্দ্র সরকার, মাতা সত্যকালী দেবী। বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত রাধারমণ দাস তাঁর কবিগানের প্রথম গুরু। পরে শেখ গোমানী দেওয়ানের দলে দোহারি করেন এবং তাঁর নিকট থেকে কবিগান শেখেন। হরেকৃষ্ণ দাস, চাঁদ মহম্মদ, অনাদিভূষণ মণ্ডল, কমলাকান্ত মণ্ডল, কাশীকান্ত দেবনাথ, দেবেন চৌধুরী, দেবেন দাস, আফাজুদ্দিন আহমেদ, রিয়াজুদ্দিন, অনুকূল রায় প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

করিম বখশ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার বৈলতলী গ্রামে জন্ম। রমেশ শীলের বিপক্ষে কবিগান করতেন। কবিগান করার অপরাধে গ্রাম্য ফতোয়ায় তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়।

কল্পতরু ভট্টাচার্য (জ. ১৯৪৭)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার চন্দঘোনা গ্রামে জন্ম। পিতা হিমাংশুবিমল ভট্টাচার্য, মাতা অমিয়বালা ভট্টাচার্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চক্রপাণি ভট্টাচার্যও একজন কবিয়াল। কবিগান পেশার পাশাপাশি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর ও ভারতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের কবিগান পরিবেশন করার সুযোগ পান। ২০০৬ সালে মিডিয়া জার্নালিস্ট ফোরাম ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে কবিয়ালকে সংবর্ধনা প্রদান করে।

কাঙ্গালী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার নান্দীপাড়া গ্রামে জন্ম।

কাজল ভট্টাচার্য (জ. ১৯৬৭)। চট্টগ্রাম জেলার দোহাজারী থানার ধর্মপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য, মাতা মুকুল রানী ভট্টাচার্য। বিভূতিরঞ্জন নাথ ও নূর আহম্মদ সরকারের কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কাঞ্চন (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলায় জন্ম।

কাঞ্চনকুমার মণ্ডল (জ. ১৯৫০)। মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর থানার তারানগর গ্রামে জন্ম। পিতা সত্যনারায়ণ মণ্ডল তরজা-গায়ক ছিলেন। মাতার নাম করুণাময়ী মণ্ডল। পিতামহ বেদকণ্ঠ মণ্ডল যাত্রার দলে বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। পিতৃব্য চাঁদগোপাল মণ্ডলও তরজাগায়ক ছিলেন। পিতৃব্যের নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ। দিলীপ চ্যাটার্জি, সঞ্জয় চ্যাটার্জি, অনিল ব্যানার্জি, দ্বিজপদ হালদার, কাশীকান্ত দেবনাথ, আফাজুদ্দিন শেখ, বৈদ্যনাথ দেবনাথ, সনৎ বিশ্বাস প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

কাতর বয়াতি। চুয়াডাঙা জেলায় জন্ম।

কানাই নাথ (উনিশ-বিশ শতক)। কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার দগদগা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আশারাম নাথ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলাই নাথও কবিয়াল ছিলেন। উভয়ে অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত কবিগান করেছেন। ঢাকা, সিলেট, পাবনা, ফরিদপুর অঞ্চলে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

কানাইলাল জয়ধর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার সইলদহ গ্রামে জন্ম।

কানাইলাল দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার ফুকুরহাটি গ্রামে জন্ম।

কানাই মালী সরকার (উনিশ শতকের শেষ)। মুন্সীগঞ্জ জেলার হাসারা/কুকুটিয়া গ্রামে জন্ম। জয়চন্দ্র মজুমদার, চণ্ডী ঠাকুর প্রমুখের বিপরীতে কবিগান করেছেন।

কানাইলাল শীল (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামে জন্ম।

কানাকড়ি পণ্ডিত (উনিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলায় কংস নদীর তীরে আসমা গ্রামে জন্ম। কবিগান ব্যতীত হোলিগানেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

কামাল উদ্দিন (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার বড়ো দুয়ারা গ্রামে জন্ম।

কামিনী কুমার কবিয়াল (উনিশ শতকের শেষ ভাগ)। সংক্ষেপে কবেল কামিনী নামেও পরিচিত। খুলনা জেলার জাপুসা গ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম। তিনি প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন। তাঁর ভগিনীপুত্র তারাচাঁদের দলের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের কবিগান রচনা করে দিতেন।

কামিনী ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল (?) জেলার মুন্সীরহাট গ্রামে জন্ম।

কামিনী ভেণ্ডার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার চাঁদগাঁও থানার মোহরা গ্রামে জন্ম।

কামিনী মোহন দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার মোজাফ্‌ফরাবাদ এলাকায় জন্ম।

কামিনী মোহন নাথ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্ম।

কামিনী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভোলা জেলায় জন্ম।

কামিনী সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার কুড়ালতলা গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। তিনি মনোহর সরকারের প্রথম দিককার ছাত্র ছিলেন। প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং অত্যন্ত সচ্ছল এই কবিয়াল ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। অভিন্ন কারণে বর্ণহিন্দু এক নায়েবের সঙ্গে তাঁর চরম দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তাঁর রচিত ও পরিবেশিত ধুয়া গান সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে কবিগান করতেন।

কার্তিক পাত্র (মৃ. ১৯৫৬)। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার মাড়গ্রাম গ্রামে জন্ম। পিতা সুশীল পাল এবং মাতার নাম সুশীলা পাত্র। হুগলি জেলার অবিনাশচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁর কবিগানের গুরু। নিতাই পাল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

কার্তিক পাল (বিশ-একুশ শতক)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার কার্তিকদিয়া গ্রামে জন্ম। সৎসঙ্গের একজন ঋত্বিক। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘরে প্রবাসী।

কার্তিক প্রামাণিক (জ. ১৯৫৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়েঞা থানার সুন্দরপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র প্রামাণিক, মাতা কাত্যায়নী দেবী। গৌরীনগর গ্রামের

গোলোকপতি ঘোষের নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ। দ্বিজপদ হালদার, কাশীকান্ত দেবনাথ, নন্দকিশোর চ্যাটার্জি, বৈদ্যনাথ দেবনাথ প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

কালাচাঁদ সরকার (বিশ শতকের মাঝামাঝি)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার কয়রা গ্রামে জন্ম।

কালাচাঁদ সরকার (বিশ শতক)। যশোর জেলায় জন্ম। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

কালাম মিয়া ফারুকী (জ. ১৯৪৬)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কালিয়াইশ গ্রামে জন্ম। পিতা আবদুর রহমান, মাতা হাবীবা খাতুন। নিরঞ্জন সাধু ও মণীন্দ্রলাল সাধু তাঁর কবিগানের গুরু। ভারত এবং মায়ানমারে গিয়েও কবিগান পরিবেশন করেন।

কালীকুমার দত্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার চালতাতলী গ্রামে জন্ম।

কালীকুমার ধর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার বেতাটি গ্রামে জন্ম।

কালীকুমার দে ওরফে কালীকুমার মাস্টার (উনিশ-বিশ শতক)। কালীকুমার মাস্টার ওরফে কালীকুমার দে নোয়াখালী জেলার বচৈর বা বচুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিগানে তাঁর গুরু ছিলেন জয়চন্দ্র মজুমদার। হরিচরণ আচার্য, জগবন্ধু দত্ত প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেন।

কালীচরণ দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর জেলার আউড়িয়া গ্রামে জন্ম।

কালীচরণ দে (মৃ. আ. ১৯১৫)। নেত্রকোনা জেলার আইথর গ্রামে জন্ম। রামু মালী, রামগতি শীল, শম্ভু ঝালো প্রমুখের বিপরীতে কবিগান করেছেন। মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি শ্রেণীর গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কালীচরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। খুলনা জেলার মান্দারতলী গ্রামে জন্ম।

কালীচরণ সরকার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার ইছাপুর গ্রামে জন্ম।

কালীদাস সরকার (১৯৩৫–২০০৮)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার বাগান উত্তরপাড় গ্রামে জন্ম। পিতা অশ্বিনী সরকার (গাটিয়া) তারকচন্দ্র সরকারের কবির দলে দোহার ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। কালীদাস সরকারের অগ্রজ ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকারও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। সুকণ্ঠের জন্য কালীদাস সরকার খ্যাত। রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। কালীদাস সরকারের শিষ্যদের মধ্যে প্রশান্ত সরকার, রুহিদাস সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কালীদাসের দুই ভাগিনেয় মণিলাল সরকার এবং স্বপন সরকার কবিয়াল। ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী (উনিশ-বিশ শতক)। জয়দেবপুরের রাজা। তিনি সখের কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।

কালীপদ ভুঁই (১৮৮৩–১৯৬৮)। বীরভূম জেলার শালজাড়া গ্রামে মাহিষ্য পরিবারে জন্ম। কবিগানের গুরু মহানন্দ মণ্ডল। রাধামাধবপুরের যুগল আঘুলি, ভৈরবপুরের তুষ্টপদ বাউরি, মনোহরচন্দ্র দাস প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

কালীপদ মণ্ডল (জ. ১৯৫৭)। খুলনা জেলার দাকোপ থানার ধোপাদি গ্রামে জন্ম।

কালীমোহন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার পারুলিয়া গ্রামে জন্ম।

কালোশশী চক্রবর্তী (জ. ১৯২৫)। চাঁদপুর জেলার বাবুরহাটের নিকটবর্তী এনায়েতপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী। রমেশ আচার্য, শচীন্দ্র শীল, গোবিন্দ ধুপী, যোগেশ সরকার, অবিনাশ চক্রবর্তী, তারিণীচরণ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখের সঙ্গে কবিগান করেছেন।

কাশীকান্ত দেবনাথ (জ. ১৯৪৮)। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়েঞা থানার সাবলদহ গ্রামে জন্ম। পিতা হরিপদ দেবনাথ, মাতা সাবিত্রী দেবনাথ। লম্বোদর চক্রবর্তীর দোহার হিসেবে কবিগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং তাঁর নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিপক্ষের কবিয়ালদের মধ্যে চাঁদ মহম্মদ অন্যতম।

কাশীনাথ কোনাই (জ. ১৯৪৪)। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার দাঁড়কা গ্রামে জন্ম। পিতা কিশোরীমোহন কোনাই একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। মাতার নাম কালীদাসী দেবী। পিতাই তাঁর কবিগানের গুরু। ভগীরথ মণ্ডল, মধুসূদন ঘোষাল, সুবলচন্দ্র কোনাই প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

কাশীনাথ নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার মহিষদিয়া গ্রামে জন্ম। প্রধানত বাঁধনদার হিসেবে হরিচরণ আচার্যের দলে কাজ করেছেন। প্রধানত বাঁধনদার হিসেবে হরিচরণ আচার্যের দলে কাজ করেছেন। বৃদ্ধাবস্থায় হরিচরণ আচার্যের দল ভেঙে গেলে কাশীনাথ নোয়াখালী ফিরে আলাদা কবির দল গঠন করেন।

কাশীনাথ সরকার (মৃত্যু ১৮৫৯)। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার জয়পুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম জয়কৃষ্ণ কাঁড়ার। পৈতৃক পেশা ছিলো মৎস্য-ব্যবসায়। নবীন বসু, সূর্যনারায়ণ এবং কালীচরণ ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট দোহার। পুত্র কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার পূর্ববঙ্গ পর্বের অন্যতম প্রধান কবিয়াল।

কাশীনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভাঙ্গা কাশী নামে পরিচিত। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার কান্দি গ্রামে জন্ম।

কাশীনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

কাশেম আলী শেখ (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার শিয়ারকোল গ্রামে জন্ম। প্রধানত বিচার-গায়ক।

কিঙ্কর শীল (মৃ. ১৯১৪)। নেত্রকোনা জেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে জন্ম। কণ্ঠ সুমধুর না হলেও টপ্পা-পাঁচালি রচনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অভিন্ন কারণে তিনি প্রধানত বাঁধনদার হিসেবে কাজ করতেন।

কিবরিয়া বয়াতি (বিশ-একুশ শতক)। যশোরের কবিয়াল ও জারিগায়ক।

কিশোরীমোহন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালীর কবিয়াল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগান গাইতেন।

কিশোরীমোহন কোনাই (১৯০৫–১৯৬৮)। কিশোরী কোঁড়া নামেও পরিচিত। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার দাঁড়কা গ্রামে জন্ম। পিতা হরিশচন্দ্র কোনাই কীর্তন গানের মূল গায়েন ছিলেন। মাতার নাম মেগনবালা দাসী। কেনারাম দে তাঁর কবিগানের গুরু। পুত্র কাশীনাথ কোনাইও একজন কবিয়াল। জীবনে নয়টি সোনার মেডেল, চারশো রুপার মেডেল এবং এগারোখানা প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, রজনী দাস, সাহেবজান, আহম্মদ সেখ, হরিনারায়ণ, হরিমাখন, বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর পাল প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের মূল নায়ক এই কিশোরীমোহন।

কুচিল ডোম (বিশ শতক)। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

কুঞ্জবিহারী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার নাথারকান্দি গ্রামে জন্ম।

কুঞ্জমোহন বড়ুয়া (জ. ১৯৪৫)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার উত্তর জলদী গ্রামে জন্ম। পিতা ময়ূরধন বড়ুয়া একজন যন্ত্রশিল্পী। মাতার নাম পাখিবালা বড়ুয়া। কবিগানের গুরু নিরঞ্জন সরকার। আনোয়ারার মুরালীঘাটের বৌদ্ধ মন্দিরে প্রতি বছর ১২ই চৈত্র তাঁকে কবিগান করতে হয়।

কুঞ্জলাল দত্ত (উনিশ-বিশ শতক)। কুঞ্জ দত্ত নামে অধিক পরিচিত। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামে জন্ম। বিধুভূষণ দেব তাঁর কবিগানের গুরু। প্রথম জীবনে কুঞ্জ দত্ত তাঁর গুরুর দলে দোহারের কাজ করতেন। 'বীণাপাণি কবিপার্টি' নামে কবিগানের দল গঠন করার পরে ঝালোকাঠি শহরে একটি স্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। কুঞ্জ দত্তের শিষ্যদের মধ্যে নকুলেশ্বর সরকার, চন্দ্রকান্ত দাস, হরিচরণ নাথ, অশ্বিনী সরকার, অনন্ত সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হরিচরণ আচার্য, শরৎ বৈরাগী প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

কুমুদরঞ্জন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার কুসুমহাটি গ্রামে জন্ম। তাঁর কবিগানের গুরু মদন শীল। বাগেরহাট অঞ্চলে নকুলেশ্বর সরকারের বিপক্ষে গান করেন।

কুমুদ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

কুমুদিনী সরকার (বিশ শতক)। হবিগঞ্জ জেলার মহিলা কবিয়াল।

কুসুমকুমারী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুসুমকুমারীর পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার লালচন্দ্রপুর গ্রাম। পিতা বিধুভূষণ দেব এবং জ্যেষ্ঠতাত মথুর দেব ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল। এঁদের মধ্যে পিতা বিধুভূষণ দেব ঢাকার হরিচরণ আচার্যের বিপরীতে এবং জ্যেষ্ঠতাত মথুর দেব যশোরের তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতে কবিগান করেছেন। ঝালোকাঠিতে কুসুমকুমারীর কবিগানের দল ছিলো। বরিশালের সখের কবিয়াল নিবারণ বসু সহ সমকালের বিখ্যাত সব কবিয়ালের বিপক্ষে কুসুমকুমারী কবিগান করেছেন।

কৃষ্ণকান্ত সরকার (জ. ১৯৫৮)। খুলনা জেলার তেরখাদা থানার ভূজনিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নিতাই চন্দ্র রায়, মাতার নাম গৌরীদাসী রায়। কবিগানের গুরু স্বরূপেন্দু সরকার। ১৯৭৫ সালের দিকে তিনি কবিগান শিক্ষা করেন এবং অল্প কালের ব্যবধানে নিজেই কবির দল গঠন করেন। কবিগানের দল গঠনের পর তিনি গুরু স্বরূপেন্দু সরকার ছাড়াও দ্বিজবর সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, বিনয় সরকার, নারায়ণ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, মীরা সরকার, নিখিল সরকার, সদানন্দ সরকার, সঞ্জয় মল্লিক সরকার, গৌর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করতে থাকেন। তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের মধ্যে মনোরঞ্জন সরকার, শ্যামপদ সরকার, সমীরণ সরকার, শঙ্কর সরকার, লতা চৌধুরী সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (উনিশ-বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলায় জন্ম।

কৃষ্ণদাস সরকার (জ. ১৯৫০)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার ভেকটমারী (বেলাই) গ্রামে জন্ম। পিতার নাম অনন্ত পাগল। মাতার নাম আবেশমণি দেবী। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

কৃষ্ণগোপাল সরকার (জ. ১৯৫২)। ঢাকা জেলার সাভার থানার নয়ারহাট পালপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ব্রজগোপাল পালচৌধুরী, মাতার নাম উষারানী পালচৌধুরী। কবিগানের গুরু ননীগোপাল সরকার। স্বরূপেন্দু সরকার, জগদীশ সরকার, মনীন্দ্রনাথ সরকার, দুই সুবল সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। কবিয়াল রণজিৎ সরকার তাঁর শিষ্য। তাঁর রচিত ডাক, মালশি ও ধুয়া গান রয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী (বিশ শতক)। পাবনা জেলার গোবিন্দপুরের কবিয়াল।

কৃষ্ণধন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার কবিয়াল।

কৃষ্ণমোহন মালী (উনিশ-বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলায় জন্ম।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য (উনিশ শতক)। প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন। কবিয়াল ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর পমুখ কবিয়াল তাঁর রচিত গান পরিবেশন করতেন।

কৃষ্ণলাল (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

কৃষ্ণ সরকার (জ. ১৯৫৯)। নদীয়া জেলার ধানতলা থানার প্রতাপগড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মাতার নাম সুখী বিশ্বাস। কবিগানের গুরু অরুণ গোঁসাই এবং উমা সরকার। স্ত্রী বীথিকা বিশ্বাস স্কুলশিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে উমা সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

কেশবলাল দত্ত (উনিশ-বিশ শতক)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর ভাই কুঞ্জলাল দত্ত একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন।

কেষ্টা মুচি (আ. ১৭২৫–১৭৯০)। ভালো নাম কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার। কবিয়াল ও বাঁধনদার হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। সমকালের অন্যতম সেরা কবিয়াল হরু ঠাকুরের বিপক্ষে গান করেন। গান রচনায় তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে জানা গেলেও তাঁর রচিত গানের মধ্যে মাত্র একটি গান ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

কৈলাসচন্দ্র ঘটক (১৭৯৮–১৮৭৩)। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী মল্লিকপুর গ্রামে জন্ম। এক পর্যায়ে কচুজোড় গ্রামে বসবাস। পিতার নাম হরমোহন ঘটক এবং পিতামহের নাম সর্বানন্দ সরস্বতী। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই কবিয়াল আগমনী ও গোষ্ঠ গানে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বলহরি রায়, নিতাই দাস, সৃষ্টিধর, বিষ্ণুচন্দ্র, রাজারাম প্রমুখের বিপক্ষে গান করেছেন। কৈলাসচন্দ্র ঘটকের পুত্র চণ্ডীকালী ঘটকও দল গঠন করে কবিগান পরিবেশন করতেন।

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮–১৮৯৯)। মুন্সীগঞ্জ জেলার তন্তর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতার নাম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম শান্তমণি দেবী। শখের কবির দল ও হোলি গানের দল গঠন করেছিলেন। সখীসংবাদ, গোষ্ঠ, রাম-বনবাস, নিমাই সন্ন্যাস, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি শ্রেণীর গান রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।

কৈলাস শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

কোদাই বালা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার পাঁচ আইল গ্রামে জন্ম।

ক্ষিতিমোহন কর্মকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মুন্সীগঞ্জ জেলার হাসারা গ্রামে জন্ম।

ক্ষিতীশচন্দ্র বর সরকার (জ. ১৯৫৫)। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার কুমোরডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ক্ষীরোদচন্দ্র বর, মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। বর্তমান বাসস্থান নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার বহিরগাছি রেলস্টেশনের নিকটে বিশ্বনাথপুর গ্রাম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এমএ পাস ক্ষিতীশচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। সুরেন্দ্রনাথ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, নারায়ণ সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, অমূল্য সরকার, অরুণ গোঁসাই, তমাল সরকার, নিখিল সরকার, অসীম সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, শুকদেব সরকার, কালাচাঁদ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

ক্ষেত্রমোহন শীল (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার ত্রিমোহনী গ্রামে জন্ম।

খগেন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার গোলকপুরা গ্রামে জন্ম।

খগেন্দ্রলাল দে (জ. ১৯৩৯)। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার দেওয়াননগর গ্রামে জন্ম। পিতা জগবন্ধু দে, মাতা সাবিত্রী দে। কবিগানের গুরু ব্রজহরি সরকার। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গৌহাটির স্বরভোগ ক্যাম্পে কবিগান করেছেন। হাটহাজারীর দেওয়ান রক্ষাকালীমায়ের মন্দিরে নিয়মিত গান করেন।

খায়ের আহমদ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার ভীমরুল গ্রামে জন্ম।

খুকী রানী শীল (জ. ১৯৪৯)। চট্টগ্রাম জেলার চাঁদগাঁও থানার পুরান কালুরঘাট গ্রামে জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিএ পাস। পিতা যুধিষ্ঠির শীল, মাতা ব্রজবালা শীল। স্বামী মানিক শীল একজন কবিয়াল। কবিগানের গুরু ফণী বড়ুয়া। ফণী বড়ুয়া, মানিক শীল, মোস্তাক আহমদ, এস এস নূর-উল-আলম, মিলন শীল, রাখাল দাশ, কালাম মিঞা ফারুকী, সাধন আচার্য, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তিনি কবিগান পরিবেশন করেন।

খোদাবক্স বিশ্বাস (১৮৯৩–১৯৫৮)। মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার আমতলা গ্রামে জন্ম। পিতা জমিরউদ্দিন বিশ্বাস, মাতা পিয়ারজান বিবি।

খোরশেদ আলী বয়াতি (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানার বারোপইকা গ্রামে জন্ম। মোসলেম বয়াতি, আবদুল গনি বয়াতি, আসমত আলী বয়াতি, আবদুল কাদের বয়াতি প্রমুখের বিপক্ষে জারিগান গাইতেন। জারিগানের পাশাপাশি সমকালীন কবিয়ালদের বিপক্ষেও তিনি কবিগান পরিবেশন করেন। ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীদাস সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে বহু আসরে কবিগান পরিবেশন করেছেন। খোরশেদ আলী বয়াতির কণ্ঠ ছিলো অসাধারণ। তাঁর পরিবেশিত জারিগানের উপস্থাপনশৈলী কবিগানের নিকটবর্তী।

গঙ্গাচরণ আচার্য (উনিশ-বিশ শতক)। ঢাকা জেলার রাজদি গ্রামে জন্ম।

গঙ্গাচরণ সরকার (জ. আ. ১৯১৪)। ফরিদপুর জেলার গজারিয়া গ্রামে জন্ম। এর ভ্রাতা বসন্তকুমার সরকারও কবিয়াল ছিলেন।

গণেশ রক্ষিত (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার শাঁখারিয়া গ্রামে জন্ম।

গদাধর মুখোপাধ্যায় (১৭৪৬–১৭৯৬)। চব্বিশ পরগনায় জন্ম। প্রধানত বাঁধনদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভোলা ময়রা, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী প্রমুখ কবিয়াল তাঁর রচিত গান ব্যবহার করতেন। কালীঘাটের এক শখের দলে গান রচনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিয়াল জীবনের সূচনা হয়।

গনজম আলী (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার ভূমিরখীল গ্রামে জন্ম।

গয়ালি সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানার জহরের কান্দি গ্রামে জন্ম।

গুরুচরণ রক্ষিত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার দেবপাড়া গ্রামে জন্ম।

গুরুচরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার দোললাই গ্রামে জন্ম।

গুরুদয়াল চৌধুরী (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

গুরু দুম্বো (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

গোঁজলা গুঁই (আ. ১৭০০–১৭৬০)। কবিগানের আদি কবিয়াল। গোঁজলা গুঁইয়ের প্রধান শিষ্য লালু নন্দলালের জন্মস্থান বিচার করে মনে হয় তিনি হুগলি থেকে বীরভূমের মধ্যকার কোনো অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গোঁজলা গুঁইয়ের অপর দুই শিষ্যের নাম রঘুনাথ দাস ও রামজী দাস। গোঁজলা গুঁইকে কবিগানের আদিকবি বলা হয়। তাঁর সময়কার কবিগানের তুক ছিলো টপ্পার মতো—প্রথমে মহড়া এবং পরে চিতান ও অন্তরা। গোঁজলা গুঁইয়ের দুইটি গানের অংশবিশেষ পাওয়া যায়।

গোকুল হাজরা (জ. ১৯৭০)। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার সুজাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কানু হাজরা, মাতা বাসন্তী হাজরা। কুটির পাহান গ্রামের বাদলচন্দ্র দাস কবিগানের গুরু। বামপন্থি আদর্শে বিশ্বাসী।

গোপাল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলার কবিয়াল।

গোপাল চক্রবর্তী (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালী থানায় জন্ম।
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।
গোপাল নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্ম।
গোপাল শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার রাজখাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা মদন শীল খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন।
গোপাল সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার মেমানিয়া গ্রামে জন্ম।
গোবিন্দ আচার্য (মৃ. ১৯১৩)। নেত্রকোনা জেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে গোবিন্দ আচার্য ওরফে গোবিন্দ ঠাকুরের জন্ম। রাগরাগিণীর উপরে তাঁর অসাধারণ দখল ছিলো। বেহালা, সারিন্দা, সানাই, এস্রাজ, খোল, ঢোল, ঢোলক, খমক, খঞ্জরী, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাগরাগিণী ব্যবহার করার ফলে তাঁর পাঁচালি অংশ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হতো। কিঙ্কর শীল, রামু মালী, রামগতি শীল, রামদয়াল নাথ, বিজয়নারায়ণ আচার্য প্রমুখের বিপরীতে কবিগান গাইতেন।
গোবিন্দ তাঁতি (উনিশ-বিশ শতক)। মাগুরা জেলার ভাঙ্গুরা গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।
গোবিন্দ তাঁতি (উনিশ শতক)। চব্বিশ পরগনা জেলার গুমো হাবরা গ্রামে জন্ম।
গোবিন্দ বালা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার পাঁচ-আইল গ্রামে জন্ম।
গোবিন্দ মালী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার বাড়তি গ্রামে জন্ম।
গোবিন্দ ধুপী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার খলিলপুর গ্রামে জন্ম।
গোরক্ষনাথ যোগী (উনিশ শতক)। চব্বিশ পরগনায় জন্ম। প্রথম জীবনে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির দলের বাঁধনদার ছিলেন। পরে রামানন্দ নন্দীর বিপক্ষে কবিগান করতেন।
গোরাচাঁদ সরকার (জ. ১৯৬৮)। মাগুরা জেলার শালিখা থানার বাউলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস, মাতা সরস্বতী বিশ্বাস। তাঁর কবিগানের গুরু গৌরপদ সরকার। সঞ্জয় মল্লিক, শ্যামল সরকার, মীরা সরকার প্রমুখের বিপরীতে কবিগান করেন।
গোলোকমণি (উনিশ শতক)। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতায় কবিগান করতেন। নেড়ি কবি হিসেবে পরিচিত।
গোলক সরকার (জ. ১৯৭৮)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগানগাঁ গ্রামে জন্ম।
গোলাম সোবহান (জ. ১৯৫০)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ছদাহা গ্রামে জন্ম। পিতা নেজামত আলী, মাতা মুছলেম খাতুন। চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রে কবিগান করেছেন।
গৌতম সরকার (জ. ১৯৭৪)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার হুড়কা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মনোরঞ্জন মণ্ডল। মাতার নাম দুলালী মণ্ডল। মনোরঞ্জন বসু (ছোটো) তাঁর কবিগানের গুরু।
গৌতম মজুমদার (জ. ১৯৭৩)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার খড়মখালী গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু নারায়ণ সরকার।

গৌর কবিরাজ (আ. ১৭৫১–১৮২১)। প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন। কলকাতা পর্বের কবিয়াল নিত্যানন্দ বৈরাগীকে গান সরবরাহ করতেন।

গৌরচাঁদ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার কাজীগ্রাম গ্রামে জন্ম।

গৌরপদ সরকার (১৯০৪–আ. ১৯৮৫)। বাগেরহাট জেলার মংলা থানার কাইনমারী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সনাতন সরকার। মাতার নাম ফুলরানী সরকার। প্রথম জীবনে যাত্রাগানের প্রতি মনোযোগী হলেও অচিরেই তিনি কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কবিগানে তাঁর প্রথম গুরু পূর্ণানন্দ সরকার। তাঁর গানে স্বদেশি প্রসঙ্গ থাকায় খুলনায় তাঁকে আটক করা হয়। কলকাতার আলীপুর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর খুলনার শিববাড়িতে প্রসন্ন স্মৃতিতীর্থের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এরপর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে এসে তাঁর শিষ্য হন এবং নতুন করে কবিগানের দল করেন। ১৯৬৪ সালে দেশত্যাগ করে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মানা ক্যাম্পে এবং পরে উড়িষ্যার দণ্ডকারণ্য ক্যাম্পে পুনর্বাসিত হন। শেষোক্ত ক্যাম্পেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উড়িষ্যার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে কবিগান পরিবেশন করেছেন। খ্যাতিমান কবিয়াল রসিক সরকার ছিলেন তাঁর কৃতী শিষ্যদের একজন। তাঁর গানের মধ্যে মতুয়া ধর্মাদর্শের প্রভাব ব্যাপক।

গৌরপদ সরকার (১৯১৮–২০০৫)। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার লাঙ্গলবন্দ বন্দরের নিকটবর্তী টিকারবিলা গ্রামে জন্ম। মাগুরার হরিচরণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। গোরাচাঁদ সরকার তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

গৌর সরকার গোলোক (উনিশ শতক)। কুমিল্লা জেলার খলিলপুর গ্রামে জন্ম।

গৌরাঙ্গ সরকার (১৯৪৫–২০১১) ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার দোলকুণ্ডি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ননীগোপাল বিশ্বাস, মাতার নাম গিরিবালা দেবী। কবিগানের গুরু টাঙ্গাইল জেলার সুবল সরকার। প্রথম জীবনে কয়েক বছর ভারতের কুচবিহার দার্জিলিং অঞ্চলে, কয়েক বছর টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কবিগান পরিবেশন করেন। বর্তমান বাসস্থান মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার মাদারবাড়ি গ্রাম। টাঙ্গাইল জেলার দুইজন সুবল সরকার, রওশন সরকার, আবদুল সরকার, শান্তি সরকার, হরেন্দ্রনাথ সরকার, বঙ্ক সরকার, হেমন্ত সরকার, আফাজউদ্দিন সরকার, মানিকগঞ্জের চাঁদমোহন সরকার, আবদুল গনি সরকার, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, সায়েদ আলী সরকার, ঢাকার কৃষ্ণ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে প্রথম জীবনে তিনি প্রচুর গান করেছেন। বর্তমানে মাদারীপুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বৃহত্তর খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা এবং ঢাকায় তিনি বেশ জনপ্রিয় কবিয়ালে পরিণত হয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার মাহরুগঞ্জের নারায়ণ সরকার, কুচবিহার জেলায় বিমল সরকার ও জিতেন সরকার, টাঙ্গাইল জেলায় জিতেন সরকার, ফরিদপুরের চাঁদমোহন সরকার, মানিকগঞ্জের সহদেব সরকার, বরিশাল তেতলার নিখিল সরকার, ফরিদপুর বোয়ালমারীর শ্যামপদ সরকার। গৌরাঙ্গ

সরকারের মধ্যম পুত্র সম্রাট সরকার কবিগানের পেশায় আসতে আগ্রহী এবং শিক্ষার্থী। মৃত্যু, ৮ জানুয়ারি ২০১১।

গৌরী ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

গৌরী দাস (উনিশ-বিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

চক্রপাণি ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫৪)। চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম। পিতা হিমাংশুবিমল ভট্টাচার্য, মাতা অমিয়বালা ভট্টাচার্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্নাতক এবং জনতা ব্যাংকে চাকরি করেন। পিতার নিকটে কবিগানের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। লন্ডনে, সিঙ্গাপুরে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ আসরে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

চণ্ডী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলায় জন্ম।

চণ্ডী আচার্য (উনিশ শতকের শেষদিক)। চণ্ডী ঠাকুর নামেও পরিচিত। মুন্সীগঞ্জ জেলার মাওয়া গ্রামে জন্ম। ভৈরব মজুমদার, রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য, রসিক আচার্য প্রমুখের সমসাময়িক। হরিচরণ আচার্যের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সত্ত্বেও মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে কবিগান করেন।

চণ্ডী জোলা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার তারাচাঁদপুর গ্রামে জন্ম।

চন্দ্রকান্ত আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলায় জন্ম।

চন্দ্রকান্ত দাস (১৮৯৯–১৯২৭)। ভোলা জেলার সৈয়দপুর গ্রামে জন্ম। স্বল্পায়ু এই কবিয়ালের গুরু ছিলেন কুঞ্জ দত্ত। খুব অল্প বয়সেই তিনি হরিচরণ আচার্য, তারিণী সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিয়াল হিসেবে নাম করেন।

চন্দ্রনাথ চৌধুরী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলার মঙ্গলসিধে গ্রামে জন্ম।

চন্দ্রমণি সরকার (বিশ শতক)। রমেশ শীলের শিষ্য।

চন্দ্র সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

চপলা ভট্ট (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ঊনসত্তর পাড়ায় জন্ম।

চরণ মণ্ডল (বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার তালাই গ্রামে জন্ম। চরণ মণ্ডলের গুরু জিয়াগঞ্জের সফেসুদ্দিন। সফেসুদ্দিন বাংলাদেশে অভিবাসী। দুলালী চিত্রকর এঁর নিকটে কবিগান শিক্ষা করেন, তাঁর বিপক্ষে কবিগান করেন, বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে এঁরা কবিগান পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছেন।

চাঁদ মহম্মদ (১৯৩৬–১৯৯১)। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার চাণ্ডুলি গ্রামে জন্ম। পিতা সাহেবজান শেখ, মাতার নাম আরজিয়া বিবি। পিতা কবিয়াল ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত আহম্মাদ শেখ, এবং জ্যাঠতুতো ভাই গফুর শেখ কবিয়াল। গফুর শেখ তাঁর কবিগানের গুরু। দেবেন চাঁই, কাশীকান্ত দেবনাথ, শ্যাম তেওয়ারি, মধুসূদন ঘোষাল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। পুত্র মেহের শেখও একজন কবিয়াল।

চাঁদমোহন সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলার কবিয়াল।

চাকর যুগী (আঠারো-উনিশ শতক)। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী পুরন্দরপুর গ্রামে জন্ম। সৃষ্টিধর কোটাল তাঁর কবিগানের গুরু।

চারুনাথ সরকার (জ. ১৯৫৭)। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানায় জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিএ পাস। কবিগানের গুরু অনাদিজ্ঞান সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার।

চিত্ত সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার কলিগ্রাম গ্রামে জন্ম।

চিত্তরঞ্জন সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর থানার বাইটকা গ্রামে জন্ম।

চিন্তামণি ময়রা (উনিশ শতক)। কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল।

চিন্তাহরণ সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়াল। উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রায়ই তিনি মোহনবাঁশী সরকারের বিপক্ষে কবিগান করতেন। তাঁদের দুজনের কবিগান শোনার পর পরবর্তী কালের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

চূড়ামণি সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার বড়ো মগরা গ্রামে জন্ম।

চৈতন্য শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার সকদি গ্রামে জন্ম। পুত্র শচীন্দ্র শীল একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। চৈতন্য শীলের শ্বশুর হরকুমার শীলও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন।

ছাড়ু নাথ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার সতরশ্রী গ্রামে জন্ম।

ছাবের সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার খইয়াখালী গচ্চি গ্রামে জন্ম।

জগৎ আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

জগৎ ঘোষ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার পিওর গ্রামে জন্ম।

জগদীশ চক্রবর্তী (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেউছিয়া গ্রামে জন্ম।

জগদীশচন্দ্র বসু (জ. ১৯৪৭)। চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ বসু এবং পিতামহ নীলাম্বরচন্দ্র বসু কবিয়াল ছিলেন। মাতার নাম প্রমিলাবালা দেবী। বিনোদ সরকার ও ইয়াকুব আলী তাঁর কবিগানের গুরু। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টাটানগরে, বর্ধমান জেলায়, ভারতের বিহার রাজ্যে, মায়ানমারে, আমেরিকার শিকাগোতে এবং জাপানের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

জগদীশ দে (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার ছাপড়া গ্রামে জন্ম।

জগদীশ সরকার (জ. ১৯৩৩)। মানিকগঞ্জ জেলার বাইতরা গ্রামে কাপালী পরিবারে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুরে অভিবাসী। সেখানে মুকুন্দলাল সরকারের বিপক্ষে গান করেন।

জগবন্ধু দত্ত (উনিশ-বিশ শতক)। চাঁদপুর জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। তাঁর কবিগানের গুরু জয়চন্দ্র মজুমদার। কবির জবাবে এবং টপ্পা-পাঁচালিতে জগবন্ধু অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। হরিচরণ আচার্য, হরকুমার শীল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

জগা বেনে (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

জনার্দন কর্মকার (উনিশ-বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার বন্যেশ্বর গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের কবিগানের গুরু।

জন হ্যালহেড (উনিশ শতকের সূচনা)। আঠারো শতকের শেষে কলকাতায় জন্ম। পূর্ণ নাম নাথানিয়েল জন হ্যালহেড। পিতৃব্য নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ছিলেন প্রথম প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা। পেশাগত জীবনে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক ছিলেন। বর্ধমানের রাজবাড়িতে তিনি কবিগান পরিবেশন করেন বলে জানা যায়।

জয়চন্দ্র মজুমদার (উনিশ শতকের শেষার্ধ)। চাঁদপুর জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। তাঁর সমকালীন এক কবির নাম গৌর সরকার। কুমিল্লা অঞ্চলে এঁরা প্রথম দিকের কবি। জয়চন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে পাইকপাড়ার জগবন্ধু দত্ত, হোসেনপুরের হরকুমার শীল, নোয়াখালীর বচের গ্রামের কালীকুমার মাস্টার (দে) প্রমুখের নাম জানা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে জয়চন্দ্র তাঁর অন্যতম দোহার দয়ারামকে নিয়ে কলকাতায় যান এবং সেখানে একাধিক পালা কবিগান পরিবেশন করেন।

জয়নদ্দি সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার গঙ্গানগর গ্রামে জন্ম।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল। ভবানীপুরের দাঁড়াকবির দলের জন্য তিনি গান রচনা করে দিতেন।

জয়ন্তকুমার নাথ (জ. ১৯৫৮)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মুরংগা গ্রামে জন্ম। পিতা সুরেন্দ্রনাথ শীল একজন কবিয়াল। মাতার নাম বসুধাবালা নাথ। পিতার নিকটেই কবিগানের প্রাথমিক শিক্ষা ঘটে।

জয়হরি গোপ (মৃ. আ. ১৮৭০)। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার গোলকান্দাইল গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের পূর্বসূরি, হরিচরণ কবিগান শুরু করার পূর্বেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জয়হরির অন্যতম শিষ্যের নাম ভগবান আচার্য। জয়হরির কণ্ঠস্বর ছিলো সুমধুর।

জলধর ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার পাঁচ আইল গ্রামে জন্ম।

জলধর পাটারী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। খুলনা জেলার রামজীবনপুর গ্রামে জন্ম।

জান্দার আলী বিশ্বাস (জ. ১৯৪০)। নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার জিতপুর গ্রামে জন্ম। পিতা নিয়ামত বিশ্বাস, মাতা হালেজান বিশ্বাস। চাঁদ মহম্মদ ও দেবেন চৌধুরীর কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কবিগানের গুরু মহম্মদ আছেলউদ্দিন শেখ। চাঁদ মহম্মদ, শ্যামসুন্দর তেওয়ারি, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মদন চক্রবর্তী, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ পান প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

জালাম শেখ (জ. ১৯৫৪)। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার নতুনগ্রাম গ্রামে জন্ম। পিতা দুকড়ি শেখ, মাতা উলফাতুন্নেসা। বিকম পাস। দিলীপ চ্যাটার্জি তাঁর কবিগানের গুরু। আফাজুদ্দিন, কাশীকান্ত দেবনাথ, চাঁদ মহম্মদ, দিলীপ চ্যাটার্জি প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

জিতেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলার কবিয়াল।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (জ. ১৯৫৭)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার কাপকো গ্রামে জন্ম। পিতা মোহাম্মদ আলতাফ মিঞা, মাতা বেগম জহুরুন্নিসা। চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় কবিগান পরিবেশন করেন।

জীবনকৃষ্ণ উড়ে (বিশ শতক)। বীরভূম জেলার সিউড়ি অঞ্চলের সোনাতোড় গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

জীবনকৃষ্ণ দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার কানুনগোপাড়া এলাকায় জন্ম।

জীবন মজুমদার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার ভবানীপুর গ্রামে জন্ম।

জীবন সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বাঘিল গ্রামে জন্ম।

জুবেদ আলি (বিশ-একুশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার নতুনগঞ্জ গ্রামে জন্ম। বিশ শতকের শেষ দশকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে জনপ্রিয়। ১৯৯৪ সালে মুর্শিদাবাদের অন্য এক মহিলা কবিয়াল দুলালী চিত্রকরের বিপক্ষে বাংলাদেশের রাজশাহীতে কবিগান করেন।

জেকের উদ্দিন (বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদের কবিয়াল। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর বাংলাদেশের রাজশাহীর বিনোদপুরে অভিবাসী হন এবং সেখানে মারা যান। তাঁর শিষ্য সেখ আফাজ উদ্দিন আহমেদ একজন খ্যাতিমান কবিয়াল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, বড়ো (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানায় কাঁঠালিডাঙা গ্রামে জন্ম। বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো (জ. ১৯৫৬)। মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার টিকারবিলা গ্রামে জন্ম। গৌরপদ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় কবিগান পরিবেশন করেন।

জ্ঞানেন্দ্র পাটনী (উনিশ-বিশ)। গাজীপুর জেলার বেণুপুর গ্রামে জন্ম।

জ্যোতিন্দ্র গণ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার ধর্মপুর গ্রামে জন্ম।

টুনু মিঞা সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার উখিয়া থানার ভাল্লুকিয়া পালং গ্রামে জন্ম।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (জ. ১৮০২)। নদীয় জেলায় জন্ম। পিতার নাম রামদয়াল চক্রবর্তী। প্রধানত বাঁধনদার হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীর কবিগান রচনা করতেন। তাঁর রচিত গান যাঁরা পরিবেশন করতেন, তাঁদের মধ্যে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রমুখের নাম জানা যায়।

ঠাকুরদাস সিংহ (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাঁর নাম সুপরিচিত। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষেও কবিগান করেছেন।

ডিএল দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে জন্ম।

তন্ময় কুমার সরকার (একুশ শতক)। সাতক্ষীরা জেলার মুন্সীগঞ্জ গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

তমাল সরকার (জ. ১৯৪৮)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানায় জন্ম। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর কবিগানের গুরু। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

তরণীসেন দেয়ারী (জ. ১৯১৩)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কেউচিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা অখিলচন্দ্র দেয়ারী একজন কবিয়াল ছিলেন, পাশাপাশি কীর্তনও গাইতেন। মাতার নাম মনোরমা দেবী। পুত্র হরিপদ দেয়ারীও একজন কবিয়াল। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় জয়কালী মন্দিরে যশোদা কর্মকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

তারকচন্দ্র সরকার, কবিরসরাজ (১৮৪৫–১৯১৪)। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার জয়পুর গ্রামে নমঃশূদ্র কাঁড়ার পরিবারে জন্ম। পিতা কাশীনাথ সরকার একজন কবিয়াল ছিলেন। মাতার নাম অন্নপূর্ণা। পিতার নিকটে কবিগানের তালিম নেন। পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেছেন। হরিচরণ আচার্য, অম্বিকাচরণ সরকার, বেচারাম সরকার, বিষ্ণুপদ সরকার, আনন্দ সরকার (দুর্গাপুর), আনন্দ সরকার (শেরপুর), গোবিন্দ তাঁতি, নবীনচন্দ্র তাঁতি, মথুরদেব সরকার, দ্বারিক বিশ্বাস, মনোহর সরকার, নবীনচন্দ্র বসু, নদীয়ারচাঁদ সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, রজনী সরকার, পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস, ফজর আলী বয়াতি, রাইচরণ সরকার, হাকিমচাঁদ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। অশ্বিনী গোঁসাই, সূর্যনারায়ণ শিকদার, কাঙ্গালীচরণ, কালীচরণ, ভোলানাথ, মধুসূদন সরকার, নবীনচন্দ্র বসু, রাধাচরণ মণ্ডল, অশ্বিনী সরকার (গাটিয়া) প্রমুখ তাঁর দোহার হিসেবে কাজ করেছেন। কবিয়াল জীবনের এক পর্যায়ে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার মল্লকান্দি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের নিকটে মতুয়া ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসও সমকালের একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস তারকচন্দ্রকে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের নিকটে নিয়ে যান। এর পর থেকে তারকচন্দ্র মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান প্রচারকে পরিণত হন। তারকচন্দ্রের অন্যতম প্রধান দুই শিষ্য ছিলেন হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার। যশোরের কালিয়ার পণ্ডিতবর্গ তারকচন্দ্র সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'কবিরসরাজ' উপাধি প্রদান করেন। তারকচন্দ্র সরকারের রচিত ধুয়া গানের সংকলন 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন' ১৯১০ সালে কলকাতা থেকে এবং মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' ১৯১৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অসংখ্য কবিগানের মধ্য থেকে অনেকগুলো গান ওড়াকান্দি গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'মতুয়া সুহৃদ' পত্রিকায় পত্রস্থ হয়েছে এবং বহু গান পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

তারক পণ্ডিত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার ওগলি গ্রামে জন্ম।

তারাচাঁদ সরকার (উনিশ শতকের শেষ)। খুলনার নিকটবর্তী জাপুসা গ্রামের কবিয়াল কামিনীকুমারের ভাগিনেয়। তারাচাঁদের নিজস্ব কবির দল ছিলো। অনেক সময়ে এই দলের বাঁধনদার হিসেবেও কামিনীকুমার কাজ করতেন।

তারাচাঁদ দে (১৮৪০-১৯২০)। নেত্রকোনা জেলার রামপুর-চন্দনকান্দি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বলরাম দে। ১৬/১৭ বছর বয়সে বসন্ত রোগে অন্ধ হয়ে যান।

আনন্দকিশোর চক্রবর্তী ও জীবন মজুমদারের গান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। চন্দনকান্দি গ্রামের ভূস্বামী সূর্যকান্ত নন্দীচৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় পান এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই তারাচাঁদ কবিগানের দল গঠন করেছিলেন। রামু মালী, রামগতি শীল, কুমুরউড়ার গোবিন্দ আচার্য প্রমুখের বিপক্ষে তারাচাঁদ কবিগান পরিবেশন করেন।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

তারিণীচরণ নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার কল্যাণপুর গ্রামে জন্ম।

তারিণীচরণ সরকার (১৯০৩–আ. ১৯৬৫)। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসাবো গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। পিতার নাম রামকমল সরকার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন সরকার ছিলেন হরিচরণ আচার্যের অন্যতম ধরতা দোহার। এই পরিচয়ের সূত্রে হরিচরণ আচার্য তারিণীচরণ সরকারকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সাল নাগাদ তারিণীচরণ সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি—সব ধরনের গান রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। গুরু হরিচরণ আচার্য, অম্বিকাচরণ পাটনী, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেন।

তালেব সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল সদরে বাড়ি। প্রধানত বিচার গায়ক।

তিমির সরকার (জ. ১৯৭৯)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার কচুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম চিত্তরঞ্জন ঘরামী। কবিগানের গুরু স্বরূপেন্দু সরকার। মণিলাল সরকার, শ্যামল সরকার, প্রশান্ত সরকার, সুশীল বৈদ্য প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

তুষ্টপদ বাউরি (১৯০০–১৯৭৫)। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার ভৈরবপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কুঞ্জ বাউরি, মাতা কাদম্বিনী দেবী। কবিগানের গুরু নিমাইচন্দ্র ডোম। নিমাইচন্দ্র ডোম, কালীপদ বাগদি, ভূতনাথ ডোম, রাখহরি ডোম প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

তেজেন্দ্রলাল দে (জ. ১৯৫০)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বাণীগ্রাম গ্রামে জন্ম।

তৌহিদ আলী মল্লিক (জ. ১৯৪৩)। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার ছোটো কুলবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা হুজুর আলী মল্লিক শব্দগান গায়ক ছিলেন। মাতার নাম সারেজাহান মল্লিক। কবিগানের গুরু চাঁদ মহম্মদ। শেখ গুমানি দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

দয়া ধুবী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

দয়ামণি (উনিশ শতক)। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতায় কবিগান পরিবেশন করতেন। নেড়ি কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

দর্পনারায়ণ কবিরাজ (উনিশ-বিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

দাশরথি রায় (১৮০৬–১৮৫৭)। বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পাঁচালিকার হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও প্রথম জীবনে কবিয়াল ছিলেন। তাঁর কবিগানের গুরু অক্ষয় কাটানি ওরফে আকা বাঈ। নিধিরাম সাহা, নীলকণ্ঠ

হালদার, রামপ্রসাদ স্বর্ণকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। জানা যায় যে, নীলকণ্ঠ হালদারের অশ্লীল ভাব-ভাষা পুষ্ট কবিগানের বিপক্ষে তিনি মার্জিত রুচির কবিগান রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া জনশ্রুতি এই যে, রামপ্রসাদ স্বর্ণকারের বিপক্ষে কবিগানে পরাজিত হয়ে তিনি কবিগান ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাঁচালি নামক একটি সঙ্গীতশাখার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর পাঁচালি গানের মধ্যেও কবিগানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোরের ভঙ্গি বর্তমান।

দিগেন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯৩৪)। দিগেন সরকার নামে সমধিক পরিচিত। বাগেরহাট জেলার মংলা থানার নিকটবর্তী বুড়িরডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। পিতা হরিবর সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। পিতার নিকট কবিগানের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ সরকারকে আনুষ্ঠানিক গুরু নির্বাচন করেন। কবিগানের অন্যতম অঙ্গ ধুয়া গানে তিনি নানা ধরনের সুরের মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে সেগুলোকে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর করে তোলেন, অনেক সময়ে যা আধুনিক গানের সঙ্গে তুলনীয়। কবিগান ছাড়া তিনি কীর্তন, যাত্রা, শ্যামাসঙ্গীত, রামায়ণ গানেও দক্ষ। অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী দিগেন্দ্রনাথ সরকারের রচিত আঞ্চলিক ভাষার গানও বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। স্বরূপেন্দু সরকার, হরিদাস সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৬)। বর্ধমান জেলা পূর্বস্থলী থানার পলাশবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুবর্ণলতা চট্টোপাধ্যায়। কবিগানের গুরু শিবশঙ্কর পাল। চাঁদ মহম্মদ, শিবশঙ্কর পাল, হরেকৃষ্ণ দাস, তারাপদ আদিত্য, দেবেন্দ্র চৌধুরী, মধুসূদন ঘোষাল, অনুকূল রায় প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

দিলীপকুমার ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫২)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য, মাতা পুষ্প ভট্টাচার্য। কবিগানের গুরু অ্যাডভোকেট শিশির নন্দী। স্ত্রী মাধুরী ভট্টাচার্যও একজন কবিয়াল। দোল উৎসব উপলক্ষে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে কবিগান পরিবেশন করতে যান।

দিলীপ দাশ (জ. ১৯৪৮)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার পশ্চিম গুজরা গ্রামে জন্ম। পিতা কমলকৃষ্ণ দাশ, মাতা জ্ঞানদাবালা দাশ। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেছেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের একজন নিয়মিত শিল্পী।

দীননাথ ঘোষ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার বাজাপ্তি গ্রাম জন্ম।

দীননাথ দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

দীনবন্ধু সরকার (বিশ শতক) । নড়াইল জেলার কালিয়া থানার রায়গ্রাম গ্রামে জন্ম।

দীপঙ্কর মজুমদার (জ. ১৯৮৫)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার অশোকনগর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম পুলিন মজুমদার, মাতার নাম সন্ধ্যারানী মজুমদার। কবিগানের গুরু মণিলাল সরকার।

দুর্গাচরণ ধুপী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার ভাসখোলা গ্রামে জন্ম। কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের বিখ্যাত সব কবিয়ালের সঙ্গে গান করেছেন। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি গান রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর পুত্র রাইচরণ সরকারও কবিয়াল ছিলেন।

দুর্গাচরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার জয়ডিহি গ্রামে জন্ম।

দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার তারাচাঁদপুর গ্রামে জন্ম।

দুলাল মিয়া (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার নূরপুর গ্রামে জন্ম।

দুলালী চিত্রকর (জ. ১৯৬৬)। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার গণকর গ্রামে জন্ম। পিতা শঙ্কর চিত্রকর যাত্রাগানের মাস্টার ছিলেন। মাতার নাম উর্মিলা চিত্রকর। পিতৃবন্ধু শ্রীচরণ মণ্ডল তাঁর কবিগানের গুরু।

দেবেন ডোম (বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার বলাসপুর গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

দেবেন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার জারিয়া গ্রামে জন্ম।

দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯১১–১৯৮৮)। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার বদলমাটি গ্রামে জন্ম। পিতা বাহাদুরলাল চৌধুরী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথও কবিয়াল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের নিকটে কবিগান শেখেন। বাংলাদেশের রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, রংপুর জেলায় কবিগান করেছেন। নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, কেদারনাথ সরকার, ভূগোলচন্দ্র সরকার, শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, কিশোরী কোনাই, কিশোরীমোহন রায়, মদনমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ দাস, রাঘব সরকার, আবদুল জাব্বার, অনুকূল রায়, শিবশঙ্কর পাল, সুদর্শন মণ্ডল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। পুত্র সুদর্শন চৌধুরী এবং সনৎ পান তাঁর খ্যাতিমান দুই শিষ্য।

দেবেন্দ্রনাথ দাস (১৮৯৮–১৯৭৬)। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার বলাশপুর গ্রামে ডোম সম্প্রদায়ে জন্ম। পিতা বনমালী দাস, মাতা যশোমতী দাস। নাথু প্রামাণিক তাঁর কবিগানের গুরু। রামকমল মার্জিত, জানকী রায়, শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, আবদুল জাব্বার, রাঘব, হরিনারায়ণ, হরিচরণ, শিবশঙ্কর, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কিশোরী কোনাই, চাঁদ মহম্মদ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক শিল্পী সম্মেলনে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সরকার, দাস (উনিশ-বিশ শতক)। মুন্সীগঞ্জ জেলার হাসারা গ্রামে জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ রামকানাই আচার্যের অন্যতম শিষ্য অর্থাৎ হরিচরণ আচার্যের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ছিলেন। হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে, এমনকি শিষ্যতুল্য নকুলেশ্বর সরকারের বিপক্ষেও তিনি কবিগান করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার হুড়কা গ্রামে জন্ম। কানে কম শুনতে পেতেন বলে তিনি কালা দেবেন হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্যামল সরকার একজন কবিয়াল।

দেবেন্দ্র শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ গ্রামে জন্ম।

দ্বারকা ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

দ্বারিক জেলে (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর জেলায় জন্ম।

দ্বারিক বিশ্বাস (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার ধোপড়া গ্রামে জন্ম।

দ্বারিক বিশ্বাস (উনিশ-বিশ শতক)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার পাটগাতি গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

দ্বারিকা সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের প্রথম দিককার শিষ্য। অল্প বয়সে মারা যান।

দ্বারিকা সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার কালিয়াচাপড়া গ্রামে জন্ম।

দ্বিজপদ হালদার (১৯৩১–১৯৯৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার ভাটরা গ্রামে জন্ম। পিতা যতীশ হালদার, মাতা সন্তোষী হালদার। কবিগানের গুরু অনুকূল রায়।

দ্বিজবর সরকার (১৯১৯–২০০০)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার কাঠালিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নীলমাধব শিকদার। মাতা গঙ্গামণি দেবী (পিতা জগদীশ মিস্ত্রি) অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে মতুয়া-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর কবিগানের গুরু বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিজবর সরকারের জ্যেঠতুতো ভাই বিশ্বেশ্বর সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। দ্বিজবর তাঁর পাঁচালি ও গানের কথায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতেন। সমকালের খ্যাতিমান অনেক কবিয়ালের নাম ব্যবহার করে লেখা দ্বিজবর সরকারের একটি ধুয়া গান রয়েছে। বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয় সরকার, অনাদি সরকার, কালীপদ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বিশ্বেশ্বর সরকার, নন্দলাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছেন।

ধর্মনারায়ণ রক্ষিত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার দেবপাড়া গ্রামে জন্ম।

ধীমান পাল (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলায় জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গানগর গ্রামে বসবাস। শ্রীনিবাস সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯২৭)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার শুভদিয়া গ্রামে জন্ম। তাঁর কবিগানের গুরু নিশিকান্ত সরকার।

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্ম।

নকুল সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নড়াইল জেলায় জন্ম।

নকুলেশ্বর সরকার (১৮৯৪–১৯৮৭)। নকুল দত্ত নামে সমধিক পরিচিত। ঝালোকাঠি জেলার নলছিটি থানার সুয়াকাঠি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বেচারাম দাস। মাতার নাম কামিনীসুন্দরী। ঝালোকাঠির কুসুমকুমারীর দলের সঙ্গে নিবারণ বসুর শখের দলের কবির লড়াই শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বরিশালে ছয়আনির জমিদার বাড়িতে শরৎ বৈরাগীর বিপরীতে কুঞ্জ দত্তের গান শুনে কিশোরবয়স্ক নকুল দাস কবিগান শিখতে আগ্রহী হন। এক পর্যায়ে অপুত্রক কুঞ্জ দত্ত নকুলকে

পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই নকুল দাস নকুল দত্তে পরিণত হন। নোয়াখালী জেলার দালালবাজারে যদুবাবুর বাড়িতে প্রথম কবিয়াল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে নরসিংদী বাজারে কুঞ্জ দত্তের সঙ্গে হরিচরণ আচার্যের গান হয়, সেখানে নকুলের কণ্ঠ শুনে হরিচরণ নকুলকে তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানান। ১৯১৪ সালে হরিচরণ আচার্যের দলে থেকে কোল-সরকারি করেন। ১৯১৫ সালে ঝালোকাঠি রাঙা যামিনীর দলে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে গুরু কুঞ্জ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'বীণাপাণি কবিপার্টি'-কে পুনর্গঠন করেন। স্বদেশি গান গাওয়ার অপরাধে ১৯৩০ সালে নকুলেশ্বরকে আটক করা হয় এবং পরবর্তী পাঁচ বছর তাঁর গানের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিলো। এই সময়ে তিনি কবিগানের বদলে কীর্তনযাত্রা পরিবেশন করেছেন। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি—সব ধরনের গান রচনা ও পরিবেশনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে দেশ ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে কবিগান করেন। বিশ শতকের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে তিনি গান করেছেন। গবেষক দীনেশচন্দ্র সিংহের একাধিক গ্রন্থে তাঁর কবিজীবনের বহু তথ্য এবং তাঁর রচিত নানা ধরনের গান সংকলিত হয়েছে।

নগরবাসী শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার খাগারতা গ্রামে জন্ম।

নগেন্দ্রনাথ নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার আলমপুর গ্রামে জন্ম।

নজরুল ইসলাম (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার শাঁখারিয়া গ্রামে জন্ম। প্রধানত বিচার গায়ক।

নজু মিয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার আশিয়া গ্রামে জন্ম।

নটবর ঘোষ (উনিশ শতকের শেষ)। বর্ধমান জেলায় গোপ পরিবারে জন্ম। পিতার নাম অক্ষয়কুমার ঘোষ। প্রধানত চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে সমকালের খ্যাতিমান কবিয়ালদের বিপক্ষে গান করতেন।

নদীয়ারচাঁদ সরকার (১৮৪৯–১৯৩৪)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার বৈঝাকি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বিষ্ণুকান্ত সরকার। গোপালগঞ্জের বিখ্যাত কবিয়াল আনন্দ সরকার ছিলেন নদীয়ারচাঁদ সরকারের গুরু এবং শ্বশুর। কবিগান ছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি রামায়ণ গান গাইতেন। নদীয়ারচাঁদ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকারও ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। নদীয়ারচাঁদ সরকার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে 'স্বদেশী সাত ভেজাল', 'স্বদেশী হিতোপদেশ', 'স্বদেশী হিতজ্ঞান', 'সদুপদেশ', 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম জানা যায়। এসব বইয়ের মধ্যে সমকালীন রাজনীতিতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্নমতের প্রতিফলন ঘটে। তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যেও তিনি অভিন্ন আদর্শ প্রচার করেন। এই আদর্শ অনুযায়ী স্বদেশি অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলন ছিলো বর্ণহিন্দুদের স্বার্থের অনুকূল এবং অ-বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থের প্রতিকূল। পর্যাপ্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

নদীয়ারচাঁদ সরকার, ছোটো (উনিশ শতকের শেষার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার বোড়াশী গ্রামে জন্ম।

ননীগোপাল আচার্য (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানায় জন্ম।

ননী কাপালী (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার কয়রা গ্রামে জন্ম।

ননীগোপাল দে (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার দাইনা গ্রামের অধিবাসী। গুরুর নাম শান্তিরঞ্জন সেন।

ননীগোপাল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার চন্দ্রঘোনা গ্রামে জন্ম।

নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯৪৯)। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে জন্ম। পিতা সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুবর্ণলতা চট্টোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়ও একজন কবিয়াল। প্রথম জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কবিগানের দলে দোহারি করেন। চাঁদ মহম্মদ তাঁর কবিগানের গুরু। আবদুর রহিম বক্স মণ্ডল, শিবশঙ্কর পাল, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ মহম্মদ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

নন্দকুমার দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার চরবদু গ্রামে এক মাহিষ্য পরিবারে জন্ম। সমকালে নোয়াখালী জেলার প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছেন। সন্দ্বীপ ও হাতিয়া দ্বীপে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিলো। তিনি একটি যাত্রার দলও গঠন করেছিলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

নন্দকুমার মাঝি (জ. ১৯৫৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার মোক্তারপুর গ্রামে জন্ম। পিতা অনুকূলচন্দ্র মাঝি যাত্রাদলে অভিনয় করতেন, মনসা পূজা উপলক্ষে ঝাপান গান গাইতেন, এক পর্যায়ে কবিয়ালও হয়েছিলেন। মাতা বীণাপাণি দেবী। প্রথম জীবনে পিতার কবিগানের দলে দোহারি করেন। জান্দার আলী, চাঁদ মহম্মদ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

নন্দলাল চৌধুরী (উনিশ শতক)। বীরভূম জেলার সিউড়িতে জন্ম। খোঁড়া নন্দ নামে পরিচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর কবিগান রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়।

নন্দলাল সরকার (১৯০৩–আ. ১৯৯০)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার লড়া গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। পারিবারিক পদবি ছিলো আচারিয়া (আচার্য?)। তাঁর কবিগানের গুরু হরিচরণ আচার্য।

নবকুমার সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

নবাই ঠাকুর (আ. ১৭৫০–১৮২০)। পশ্চিমবঙ্গের বাঁধনদার। নিত্যানন্দ দাসের সমসাময়িক। নিত্যানন্দ দাসকে গান সরবরাহ করতেন।

নবাই ময়রা (জ. ১৭৯২)। বর্ধমান জেলার সাহেবগঞ্জ থানার খেরুর গ্রামে জন্ম। শাক্ত সঙ্গীত রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

নবীনচন্দ্র তাঁতি (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর অঞ্চলের কবিয়াল। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে গান করেছেন।

নবীনচন্দ্র বসু (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বাগেরহাট জেলার ঘষিয়াখালী গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

নবীন ঠাকুর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার কধুরখীল গ্রামে জন্ম।

নবু সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। পূর্ববঙ্গের কবিয়াল।

নরহরি সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলায় জন্ম।

নলিনী সরকার (বিশ শতকের শেষার্ধ)। খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার রূপরামপুর গ্রামে জন্ম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কবিগানের গুরু বিনয়কৃষ্ণ সরকার।

নাদেরুজ্জামান (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কচুখাইন অঞ্চলে জন্ম।

নারায়ণ চক্রবর্তী (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা (?) গ্রামে জন্ম।

নারায়ণচন্দ্র দাস (জ. ১৯৩৫)। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার সিনি গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু মহাদেব পাল। মহাদেব পাল, নিমাইচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

নারায়ণচন্দ্র বালা (১৯০৫–১৯৮৪)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার গোহালা গ্রামে জন্ম। পিতা মথুরানাথ বালা, পিতৃব্য অম্বিকা বালা, এবং পিতামহ ঈশ্বর বালা সকলেই কবিয়াল ছিলেন। কৌলিক উপাধি ছিলো দে। বংশানুক্রমে বসন্ত রোগের ঝাঁড়ফুক করার জন্য লোকমুখে পদবি বালা হয়ে যায়। রয়ানি গান করাও ছিলো এঁদের বংশানুক্রমিক পেশা। পিতা এবং পিতামহকে নারায়ণচন্দ্র বালা গুরু হিসেবে মানতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ঢাকা অঞ্চলের হরিচরণ আচার্য, মদন শীল, পূর্ণ সরকার, অম্বিকা পাটনী, দেবেন্দ্র দাস, শেখ জয়নুদ্দিন, রেবতী ঠাকুর, কুমুদ সরকার, গোপাল সরকার, তারিণীচরণ সরকার; ত্রিপুরা অঞ্চলের অর্জুন দেবনাথ, দুর্গাচরণ ধুপী; চট্টগ্রাম অঞ্চলের রমেশ শীল; ফরিদপুর অঞ্চলের শশী সরকার, হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, ছোটো রজনী, বড়ো রজনী, রাসবিহারী সরকার, গঙ্গাচরণ সরকার, নিশিকান্ত সরকার; যশোর অঞ্চলের যোগেন শীল, রাজেন্দ্র মালো, রসময় সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার; বরিশাল অঞ্চলের শরৎ বৈরাগী, নকুল দত্ত; খুলনা অঞ্চলের রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের বিপরীতে গান করেছেন। টাঙ্গাইল জেলার ভাদ্রা দৌলতপুরে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত কবিগানে তিনি গোপাল শীলের বিপক্ষে গান করেন। ব্রিটিশবিরোধী টপ্পা গাওয়ার অপরাধে নারায়ণচন্দ্র বালাকে পুলিশে আটক করে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ময়মনসিংহ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। ১৯৫০ সালে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। সেখানে নকুল দত্ত, শেখ গোমানী দেওয়ান প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান অব্যাহত রাখেন।

নারায়ণ সরকার (জ. ১৯৪৪)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ডুটকুরা গ্রামে জন্ম। পিতা দুর্গাচরণ বালা গাজির গানে কালুর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। ১৯৭৪ সালে স্বতন্ত্রভাবে কবির দল গঠন করে কবিগান গাইতে শুরু করেন। এর আগে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকার ও অনাদিজ্ঞান সরকারের দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করতেন। বাংলাদেশ

বেতার ও টেলিভিশনে তিনি একাধিক বার কবিগান করেছেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী এবং সেখানে চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগরে বসবাস করেন।

নিকুঞ্জ বণিক (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলায় জন্ম।

নিকুঞ্জ শীল (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার চকরিয়া থানার বানিয়ারছড়া গ্রামে জন্ম।

নিকুঞ্জ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার নাথারকান্দি গ্রামে জন্ম। তাঁর পুত্র রসময় সরকারও একজন কবিয়াল।

নিকুঞ্জ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানার বড়ো হাতিয়া গ্রামে জন্ম।

নিখিল সরকার, ছোটো (বিশ শতকের শেষার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার নিজড়া গ্রামে জন্ম। বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

নিখিল সরকার, বড়ো (বিশ শতকের শেষার্ধ)। খুলনা জেলার রূপসা থানার শিয়ালি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শশীভূষণ মালাকার। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

নিতাই দাস (আ. ১৭৯৮–১৮৭৩)। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী বরুল গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণ দাস।

নিতাই পাল (১৯২১–১৯৬৫)। মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্ম। পিতার নাম রসময় পাল, মাতার নাম ইন্দ্রাণী পাল। কার্তিক পাত্র তাঁর কবিগানের গুরু। কবিয়াল শক্তিপদ ঘোষ তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের অন্যতম।

নিতাই সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

নিতাই সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার বিজয়নগর গ্রামে কাপালী পরিবারে জন্ম।

নিত্যগোপাল সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার ফলসী গ্রামে নমঃশূদ্র জেলে পরিবারে জন্ম। বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

নিত্যানন্দ দাস (১৭৫১–১৮২১)। সমকালে নিতাই দাস বা নিতাই (নিতে) বৈরাগী নামে সমধিক পরিচিত। পিতা কুঞ্জ দাস ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব। জন্মস্থান হুগলি জেলার চন্দননগর। কবিগানের গুরু লালু নন্দলাল। ভবানী বেনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই গানের লড়াই হতো। সখীসংবাদ শ্রেণীর কিছু গান তিনি রচনা করেছিলেন। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙা, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান দুই বাঁধনদার।

নিত্যানন্দ সরকার (জ. আ. ১৯৩৬)। ফরিদপুর জেলার গজারিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা বসন্ত সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। নিতাই সরকারের শিষ্যদের মধ্যে ছোটো নিশিকান্ত সরকার অন্যতম।

নিত্যানন্দ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার মাহতা গ্রামে জন্ম।

নিধিরাম সাহা (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বর্ধমানের জামড়া গ্রামে জন্ম। দাশরথি রায়ের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

নিবারণ শীল (বিশ শতক)। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মায়নমারের রেঙ্গুন শহরে কবিগান করতেন।

নিবারণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলায় জন্ম।

নিমে শুঁড়ি (আ. ১৭৩০–১৭৯০)। পশ্চিমবঙ্গে জন্ম। এঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, "নিমে শুঁড়ি একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি, হাড়ি এতদ্রূপ সৎ কবি, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরও কত উত্তম হইবেন।"

নিরঞ্জন চক্রবর্তী (জ. ১৯৪৯)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাতা বনমালা চক্রবর্তী। মীরসরাই, পটিয়া, সাতকানিয়া, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী প্রভৃতি এলাকায় নিয়মিত কবিগান পরিবেশন করেন।

নিরঞ্জন দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ছনহরা গ্রামে জন্ম।

নিরঞ্জন সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ধর্মপুর গ্রামে জন্ম।

নিরঞ্জন সাধু সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার জলদি গ্রামে জন্ম।

নিরঞ্জন সরকার (জ. ১৯৫২)। খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে খুলনায় একটি জুটমিলে চাকরি করতেন। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। ১৯৮৫ সালে স্বতন্ত্র দল গঠন করে কবিগান গাইতে শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। সেখানে তিনি অনাদিজ্ঞান সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীনিবাস সরকার, অমূল্য সরকার, নারায়ণ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, অসীম সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

নির্মলকান্তি হীরা (জ. ১৯৭৪)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার চরবানিয়ারি দক্ষিণপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বসন্তকুমার হীরা। মাতার নাম সুরধুনী হীরা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিমল হীরা মতুয়াসঙ্গীত পরিবেশনে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা গণিতে বিএ অনার্সসহ এমএসসি। স্কুলশিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। গুরু স্বরূপেন্দু সরকার।

নিশান আলী বয়াতি (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বেরাবোছনা গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক।

নিশি অগ্রদানী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার গাড়ুলিয়া গ্রামে জন্ম।

নিশিকান্ত সরকার, সিদ্ধান্তবিশারদ (১৯১৩–১৯৯৩)। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার ভৈরবনগর গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রকান্ত সরকার (রায়) একজন রামায়ণ-গায়ক ছিলেন। মাতার নাম সহচরী দেবী। তাঁর কবিগানের গুরু মনোহর সরকার। ১৯৩০ সালের দিকে তিনি কবিগানের দল গঠন করেন। কবিয়াল জীবনের

অধিকাংশ সময়ে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে গান করেছেন বলে যশোর-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে নিশি-বিজয় জুটি কবিগানের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, হরিচরণ নাথ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার পরে নকুলেশ্বর দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, রসিক সরকার প্রমুখের সঙ্গে জোট গঠন করে গেয়েছেন। এছাড়া মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অনাদিজ্ঞান সরকার, অমূল্য সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, কালীদাস সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, সন্ধ্যা সরকার, নারায়ণ সরকার প্রমুখের বিপক্ষেও কবিগান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ও দিল্লির বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। গানে, টপ্পায়, পাঁচালিতে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় তিনি সমকালের সকল কবিয়ালকে ছাড়িয়ে যান। বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের উপরে তাঁর অসাধারণ দখল ছিলো। তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের মধ্যে ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, উদ্ধব সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ সতীশ শীল, নগেন্দ্রনাথ মাস্টার, সতীশ মণ্ডল, ক্ষীরোদ মজুমদার, কালাকেষ্ট, মনোহর বৈরাগী, শশধর মাস্টার, রসিক সানদার, রাম হীরা প্রমুখ তাঁর খ্যাতিমান দোহার। অক্ষয় ঢুলি বহুদিন তাঁর দলে ঢোল বাজিয়েছেন। ১৯৯২ সালে তাঁর ধুয়া গানের একটি সংকলন 'নিশিকাব্যসঙ্গীত' নামে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

নিশিকান্ত সরকার, ছোটো (জ. ১৯৫৬)। মাগুরা জেলার গোপালগ্রাম গ্রামে জন্ম। বর্তমান বাসস্থান বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার আটটাকি গ্রাম। পিতার নাম নবদ্বীপ সরকার। মাতার নাম সরস্বতী সরকার। পিতা নবদ্বীপ সরকার বিনোদ সরকারের দোহার ছিলেন। কবিগানের গুরু নিত্যানন্দ সরকার।

নিশি সূত্রধর (মৃ. ১৮৫৯)। বর্ধমান জেলার পীলা গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। অল্প অনুপ্রাসযুক্ত তাঁর লহর কবিতে অশ্লীল ভাব ও ভাষা থাকতো বলে অভিযোগ উঠেছিলো। দাশরথি রায়ের বিপক্ষে কবিগান করেন।

নীলমণি চক্রবর্তী (উনিশ শতক)। ঢাকা জেলার ভুলতা গ্রামে জন্ম। গোলকান্দাইলের জয়হরি গোপের দলে পাঁচালি গাইতেন। পরে কবিগানের দল করেন।

নীলমণি ঠাকুর (আ. ১৭৪৪–১৮২৫)। নীলু ঠাকুর বা নীলমণি চক্রবর্তী নামে সমধিক পরিচিত। জন্মস্থান কলকাতার শিমুলিয়া। তিনি হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ছোটো ভাই রামপ্রসাদকে নিয়ে কবির দল গঠন করেন। অসাধারণ জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর নিজস্ব রচনা খুব বেশি ছিলো না। হরু ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখের নিকট থেকে গান সংগ্রহ করতেন। ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। ১৮২৫ সালের ১০ই নভেম্বর ডায়রিয়ায় মারা যান।

নীলমণি পাটনী (আ. ১৭৩৮–১৮২৫)। হুগলি জেলার চন্দননগরে জন্ম। নীলমণির পিতা লক্ষ্মীকান্ত পাটনীও একজন কবিয়াল ছিলেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়,

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী প্রমুখ বাঁধনদারের গান তিনি পরিবেশন করতেন। হরু ঠাকুরের বিপক্ষে গান করেন। ১৮২০ সালের ১৪ই নভেম্বর মারা যান।

নুরুল হক (জ. ১৯৪৭)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার ভিংরোল গ্রামে জন্ম। পিতা সেকান্দর আলী, মাতা ছফুরা খাতুন। এয়াকুব আলী তাঁর কবিগানের গুরু।

নূরুল হুদা (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার পুঁইছড়ি গ্রামে জন্ম।

নৃসিংহ রায় (১৭৩৮–১৮০৯)। হুগলি জেলার চন্দননগরে জন্ম। পিতা আনন্দীনাথ রায় ফরাসিদের সামরিক বিভাগে মুহুরির কাজ করতেন। বাল্যকালে চুঁচুড়ায় অবস্থিত মাতুলালয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাসু রায়কে নিয়ে ১৭৫০ সালের দিকে কবিগানের দল গঠন করেন এবং নিয়মিতভাবে কবিগান গাইতে থাকেন। নিত্যানন্দ দাস প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। নৃসিংহ রায় রচিত সখীসংবাদ ও বিরহ পর্যায়ের বেশ কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

নেপাল সরকার (বিশ শতকের শেষার্ধ)। নড়াইল জেলার রূপগঞ্জ থানা সদরে জন্ম। কবিগানের গুরু বিজয়কৃষ্ণ সরকার।

পঙ্কজ সরকার (আ. জ. ১৯৬৫)। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানায় জন্ম। তাঁর কবিগানের গুরু রসিক সরকার।

পঞ্চানন আচার্য (উনিশ শতক)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার আলগী গ্রামে জন্ম। এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাকানাই আচার্য ছিলেন হরিচরণ আচার্যের গুরু।

পঞ্চানন দত্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর জেলায় জন্ম।

পরাণ কর্মকার (উনিশ-বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার মদনের ফতেপুর গ্রামে জন্ম।

পরিতোষ বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার পাঁচখাইন গ্রামে জন্ম।

পরীক্ষিৎ বালা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার পাঁচ আইল গ্রামে জন্ম।

পরেশ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর জেলায় জন্ম।

পাঁচকড়ি সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলায় জন্ম।

পাঁচু দত্ত সরকার (উনিশ শতক)। নড়াইল জেলায় জন্ম।

পাগলা কানাই (১৮০৯–১৮৮৯)। ঝিনাইদহ জেলার লেবুতলা গ্রামে জন্ম। জারিগায়ক হিসেবে খ্যাত। তবে কখনো কখনো কবিগান পরিবেশন করেছেন। জারিগানের মধ্যে কবিগানের প্রকরণ অনুপ্রবেশে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার তাঁর বিপক্ষে কবিগান করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইদু বিশ্বাস, কালাচান, হাকিমচান, করিম বিশ্বাস, কমরউদ্দিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল।

পুলিন বিশ্বাস। সুরেন সরকারের শিষ্য।

পুলিনবিহারী পাল (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রামু থানার ঈদগাঁও গ্রামে জন্ম।

পুলিন সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার ডেউয়াতলা গ্রামে বসবাস। যশোর জেলার কোদলা গ্রামে জন্ম।

পূর্ণচন্দ্র চাকমা (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঘাইছড়ি থানার জীবতলী মরিশ্যা গ্রামে জন্ম।

পূর্ণচরণ সূত্রধর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গাজিপুর জেলার কালিয়াকৈর গ্রামে জন্ম।

পূর্ণানন্দ সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলায় জন্ম।

প্রকাশ শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলায় জন্ম।

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস (১৯০০–১৯৭২)। প্রফুল্ল গোঁসাই নামে পরিচিত। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ছোটো কালিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গগনচন্দ্র বিশ্বাস, মাতার নাম লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস। গোপাল ফৌজদারের নিকটে ধুয়া গান পর্যায়ের সঙ্গীত রচনায় দীক্ষা গ্রহণ। তবে তারকচন্দ্র সরকারের ভাবশিষ্য। নিজে কবিগান না করলেও তাঁর রচিত অনেক ধুয়া গান কবিয়ালরা ব্যবহার করতেন। তাঁর ধুয়া গানের বড়ো একটি অংশ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত।

প্রফুল্ল শীল (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার কদমতলী গ্রামে জন্ম।

প্রভাত সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলায় জন্ম। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

প্রমথ অধিকারী (বিশ শতক)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

প্রশান্ত চৌধুরী (জ. ১৯৫৯)। চট্টগ্রাম জন্মস্থান। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বামুনগাছি স্টেশনের কাছে ফুলবাড়িয়া গ্রামে বসবাস। কবিগানের গুরু উমা সরকার।

প্রশান্ত সরকার (জ. আ. ১৯৬৫)। মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার শশীকর গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু কালীদাস সরকার।

প্রসন্নকুমার চন্দ (বিশ শতক)। পূর্ববঙ্গের কবিয়াল।

প্রসন্ন নলি সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম।

প্রহ্লাদ সরকার (বিশ শতক)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

প্রহ্লাদ সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। নরসিংদী জেলা সদরে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের অন্যতম শিষ্য। কবিগানের দল গঠন করে হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষেও গান করেছেন। টপ্পা ও পাঁচালিতে তিনি হরিচরণ আচার্যের সমকক্ষ ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার হুদ্রাখালী গ্রামে জন্ম। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলে কবিগান করেছেন।

প্রিয়নাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার ঘাগর গ্রামে জন্ম। পরে খুলনা জেলার দাকোপ থানার চালনা গ্রামে বাস করেন।

ফজর বিশ্বাস (১৮৬০–১৯৪৫)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার বাগডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। প্রধানত জারিগায়ক ছিলেন। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

ফজল আহমদ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কেলিশহর খিল্লাপাড়ার জন্ম।

ফণী বড়ুয়া (জ. ১৯১৫–)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার পাঁচখাইন গ্রামে জন্ম। পিতা নন্দকুমার বড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, মাতার নাম শ্যামা বড়ুয়া। ষোলো বছর বয়সে রেঙ্গুনে যান এবং সেখানে মতিলাল বড়ুয়ার নিকটে

কবিগানের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। পরে দেশে ফিরে রমেশ শীলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্রমে রমেশ শীলের প্রধান শিষ্যে পরিণত হন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস প্রমুখের নামে হুলিয়া জারি হলে কিছুকালের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে কবিয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করেন, বিপক্ষে ছিলেন রাইগোপাল দাস। চিত্রটির পরিচালক ছিলেন শান্তি চৌধুরী। বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র কবিয়াল।

ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। পূর্ববঙ্গের কবিয়াল।

বঙ্কু গোঁসাই (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ঘারিন্দা গ্রামে জন্ম। কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন।

বঙ্কুবিহারী বসাক (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার গোঁসাই জোয়াইর গ্রামে জন্ম।

বঙ্গচন্দ্র নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্ম।

বড়হরি সরকার (উনিশ শতকের মাঝামাঝি)। ঢাকা জেলায় জন্ম। হরিচরণ আচার্যের পূর্বসূরি।

বনওয়ারি চক্রবর্তী (উনিশ-বিশ শতক)। বীরভূম জেলার ইসলামপুর থানার কুড়মিঠা গ্রামে জন্ম। বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ তাঁর কবিগানের গুরু।

বরদাকান্ত সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত কবিয়াল আনন্দ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। অল্প বয়সে মারা যান।

বরদা সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রামের কবিয়াল। রমেশ শীলের শিষ্য।

বলরাম দেবনাথ (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার ঘরিয়াল গ্রামে জন্ম।

বলরাম সরকার (জ. ১৯৭৬)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পাতুলিয়া গ্রামে জন্ম। অসীম সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

বলহরি রায় (১৭৪৩–১৮৪৯)। বীরভূম জেলার বরুল গ্রামে বাঙালি রাজপুত পরিবারে জন্ম। পিতার নাম আলমচাঁদ রায়। লালু নন্দলালের অন্যতম শিষ্য। এঁর রচিত আগমনী, বিজয়া, ও সখীসংবাদ জাতীয় কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। বলহরির পুত্র রাধাচরণ রায়ও কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের মধ্যে নিতাই দাস, রাইচরণ দাস উল্লেখযোগ্য।

বলাইচন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার দেবাসুর গ্রামে জন্ম।

বলাইদাস বৈরাগী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার চরসিন্ধু গ্রামে জন্ম।

বলাই নাথ (উনিশ-বিশ শতক)। কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার দগদগা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আশারাম নাথ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাই নাথও কবিয়াল ছিলেন। দুই ভাই অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত কবিগান করেছেন। ঢাকা, সিলেট, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান করেছেন।

বলাই বৈষ্ণব (মৃ. ১৮৯৪)। বলাইচাঁদ সরকার নামেও খ্যাত। হুগলি জেলার পিয়াসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ পরিবারে জন্ম। পিতার নাম রামকমল সরকার। পিতামহের নাম কৃষ্ণকমল সরকার। বলাইয়ের প্রপিতামহ বংশীবদন সরকারও

একজন কবিয়াল ছিলেন। ভোলা ময়রার বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছিলেন বলে জানা যায়।

বসন্তকুমার ধানুকী (বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান এলাকার হাঁসুপুর গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

বসন্ত লোধ (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার চলটা গ্রামে জন্ম।

বসন্ত সরকার (জ. ১৯১৭)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার নইলতলা গ্রামে জন্ম। নকুলেশ্বর সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

বসন্ত সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার পীরেরপাড় গ্রামে জন্ম।

বসন্ত সরকার (জ. ১৯১৬)। ফরিদপুর জেলার গজারিয়া গ্রামে জন্ম। পুত্র নিত্যানন্দ সরকার একজন কবিয়াল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাচরণ সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন।

বাদলচন্দ্র দাস (জ. ১৯৫৫)। মুর্শিদাবাদ জেলার কুঠির পাহার গ্রামে জন্ম। পিতা বিরু দাস, মাতা সরোজিনী দাস। কবিগানের গুরু দ্বিজপদ হালদার।

বাবুল কান্তি দাশ (জ. ১৯৫৪)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার শীলক গ্রামে জন্ম। পিতা ধীরেন্দ্রলাল দাশ, মাতা রেণুবালা দাশ। ফণী বড়ুয়া তাঁর কবিগানের গুরু। বাংলাদেশ ও ভারতের বহু আসরে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

বাবুল ঠাকুর (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা গ্রামে জন্ম।

বাবুল বিশ্বাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানায় জন্ম।

বাবুলাল সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানার বাইটকা গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার।

বাসন্তী সরকার (বিশ-একুশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল অসীম সরকার তাঁর স্বামী এবং কবিগানের গুরু।

বিএম ফরিদ জামান (জ. ১৯৫৬)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কচুখাইন গ্রামে জন্ম। পিতা নাজির জামান একজন পুথি-রচয়িতা ছিলেন। মাতার নাম চম্পা নাজির।

বিজন সরকার (বিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

বিজয়কৃষ্ণ সরকার (১৯০৩–১৯৮৫)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ডুমদি গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। পিতার নাম নবকৃষ্ণ অধিকারী। মাতার নাম হিমালয়কুমারী। প্রথম জীবনে নেপাল পণ্ডিতের যাত্রাদলে বিবেক চরিত্রে অভিনয় ও গান করেন। ১৯২৬ সালে মনোহর সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একই বছর কবিগান শেখার আগ্রহে মনোহর সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবিয়াল জীবনের প্রথম দিকে গোপালগঞ্জের ঘোষালকান্দি গ্রামে শ্যামলাল রায়ের বাড়ির পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সুযোগ পান। ১৯২৯ সালের দিকে বিজয়কৃষ্ণ সরকার নিজে কবিগানের দল গঠন করেন এবং গোপালগঞ্জ জেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামে মহিম সরকারের বিপক্ষে প্রথম অবতীর্ণ হন। নগেন মাস্টার সদানন্দ

মল্লিক, রসিক সানদার প্রমুখ ছিলেন তাঁর দলের খ্যাতিমান দোহার। তাঁর ঢুলির নাম ছিলো পবন ঢুলি। দলের ম্যানেজার ছিলেন মতি বাবু। হারমোনিয়াম বাজাতেন ধীরেন্দ্রনাথ রায়। ১৯৩০-এর দশকে প্রায় প্রতি বছর বর্ষাকালে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সহযোগী হিসেবে তিনি এবং নিশিকান্ত সরকার কলকাতায় গিয়ে কবিগান পরিবেশন করতেন। তখন তাঁদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পল্লিকবি জসীমউদ্দীন। এই সময়ে বিজয় সরকার পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দীন প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে, ১৯৫৯ এবং ১৯৭৯ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমীতে, এবং ১৯৮১ সালে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে তিনি কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮২ সালে তিনি স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান এবং ১৯৮৪ সালে মৃতুবরণ করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে যাঁদের বিপক্ষে কবিগান গেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মনোহর সরকার, হরিবর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, রাখাল আচার্য, হরিচরণ নাথ, নকুলেশ্বর দত্ত, নিশিকান্ত সরকার, কামিনী সরকার, রাজেন্দ্র মালো, শেখ গুমানী দেওয়ান, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, কালীদাস সরকার, কালোশশী চক্রবর্তী, রসময় সরকার, চিত্ত সরকার, গৌর সরকার, নিতাই সরকার, নারায়ণচন্দ্র বালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমূল্য সরকার, সরোজ সরকার, শরৎ সরকার, কুমুদবিহারী সরকার, বড়ো রজনী সরকার, ছোটো রজনী সরকার, বরদা সরকার, মোহিনী সরকার, নারায়ণ সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনাদিজ্ঞান সরকার, রসিকলাল সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিগেন্দ্রনাথ সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিমল সরকার, নিখিল সরকার, শ্রীনিবাস সরকার প্রমুখ তাঁর খ্যাতিমান শিষ্য। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি সব ধরনের গানের রচয়িতা হিসেবে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে ধুয়া গানে তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাঁর রচিত ধুয়া গানের কথা ও সুর অত্যন্ত উন্নত মানের। তাঁর এই জাতীয় প্রায় চার শত গানের সংকলন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তদের নিকট থেকে তিনি কবিরসরাজ উপাধিতে ভূষিত।

বিজয়কৃষ্ণ হালদার (জ. ১৯৭২)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার কারফা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মনোহর হালদার, মাতার নাম খোলসা হালদার। অনুজ অজয় কুমার হালদারও একজন কবিয়াল। কবিগানের গুরু রবীন্দ্রনাথ সরকার।

বিজয়নারায়ণ আচার্য (১৮৬৯–১৯২৭)। নেত্রকোনা জেলা শহরের নিকটবর্তী সহিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রামলোচন আচার্য, মাতার নাম বিশাখা দেবী। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। লোকনাথ চক্রবর্তী তাঁর কবিগানের গুরু। ধারিয়া গ্রামে রামেশ্বরপুরের প্রবীণ কবিয়াল রাজকিশোর আচার্যের বিপরীতে প্রথম কবিগান করেন। পরে রামু মালী, রামগতি শীল, হরিহর আচার্য, হরিচরণ আচার্য, মদন শীল প্রমুখের বিপক্ষে গান করেছেন। সখীসংবাদ, আগমনী, বিজয়া, বসন্ত প্রভৃতি

শ্রেণীর কবিগান রচনায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর রচিত গদ্যরচনার মানও বেশ উন্নত। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে কবিগান বিষয়ক আলোচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী', এবং 'আনন্দ' পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন। 'উপদেশামৃত', 'প্রার্থনা শতক', এবং 'শ্রীশ্রীগৌর-গীতাবলী' নামে তাঁর তিনটি পুস্তক নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত হয়।

বিদ্যুৎ সরকার (জ. ১৯৮৩)। উড়িষ্যা প্রদেশের মালকানগিরি জেলার কালীমেলায় জন্ম।

বিধুভূষণ দেব সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার লালচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মথুর দেব সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। হরিচরণ আচার্যের বিপরীতে বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। বিধুভূষণ দেবের কন্যা কুসুমকুমারী ঝালোকাঠিতে কবিগানের দল করেছিলেন এবং কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বিনন্দ সাধু (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার কৈইনপুরা অঞ্চলে জন্ম।

বিনয়কৃষ্ণ সরকার (১৯৩৫–২০০০)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার সাতপাড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রসিকলাল বাগচী, মাতার নাম মালতী দেবী। বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। বিনয় সরকারের ধুয়া গানে ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে আধুনিক গানের সুরের মিশ্রণ লক্ষণীয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নলিনী সরকার, অমল সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ সরকার, রসিকলাল সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, ছোটো রাজেন মালো সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

বিনয় সরকার, ছোটো (বিশ-একুশ শতক)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার শুভদিয়া গ্রামে জন্ম। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

বিনোদ সরকার (বিশ শতক)। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানায় জন্ম। মৃত্যুঞ্জয় সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

বিনোদ সরকার, ছোটো (বিশ শতক)। যশোর জেলায় জন্ম।

বিন্দু বৈরাগী (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানায় জন্ম।

বিপিন ঠাকুর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কচুখাইন গ্রামে জন্ম। রমেশ শীলের শিষ্য।

বিপিন পাল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। সিলেট জেলায় জন্ম।

বিপিন সরকার (বিশ শতক)। নোয়াখালী জেলার করপাড়া গ্রামে জন্ম।

বিপিন সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার পালেরখণ্ড গ্রামে জন্ম।

বিমল সরকার (বিশ-একুশ শতক)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার হুড়কা গ্রামে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সরকার একজন কবিয়াল ছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

বিমল সরকার (বিশ শতক)। ফরিদপুর জেলার কুমারিয়া গ্রামে জন্ম।

বিশ্বম্ভর ঠাকুর (বিশ শতক)। পূর্ববঙ্গের কবিয়াল।

বিশ্বেশ্বর সরকার (বিশ শতক)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার নাজিরপুর গ্রামে জন্ম। বিশ্বেশ্বর সরকারের খুড়তুতো ভাই দ্বিজবর সরকার একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতের উপরেও বিশ্বেশ্বরের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। হারমোনিয়াম, বেহালা, খিলে বাঁশি, আড় বাঁশি, ঢোল, কাঁসি, একতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজাতে পারতেন। বিশেষভাবে একতারা যন্ত্রে তিনি গিটারের মতো সুর তুলতে পারতেন। শম্ভুনাথ বৈদ্য সরকারের বিপক্ষে জোট বেঁধে বহু কাল কবিগান করেছেন। রূপচাঁদ সরকারের বিপক্ষেও গান করতেন।

বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ (উনিশ শতক)। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী মঙ্গলডিহি গ্রামে জন্ম।

বিষ্ণুপদ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। সিলেট জেলায় জন্ম।

বিষ্ণুপদ সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার জিকাবাড়ি গ্রামে জন্ম। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করতেন।

বিষ্ণুপদ সরকার (জ. ১৯৫৪)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার উত্তর ভুর্ষি গ্রামে জন্ম। পিতা প্রাণহরি সরকার এবং দুই ভাই রোহিণী সরকার ও সন্তোষ সরকার কবিয়াল ছিলেন। পুত্র সুবল সরকারও একজন কবিয়াল। মাতার নাম শান্তিবালা সরকার। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন আসরে কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। ভারতের আসাম প্রদেশের ডুমডুমা, ডিগবাই, ডিব্রুগড়ে কবিগান করেছেন।

বিহারী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলায় জন্ম।

বৃন্দাবন ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার লক্ষ্মীবিলাস গ্রামে জন্ম।

বৃন্দাবন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

বৃন্দাবন সরকার (১৯০৯–১৯৮০)। মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার ফলসিয়া গ্রামে রাজবংশী পরিবারে জন্ম। পিতার নাম মদনমোহন মালো। ফরিদপুরের অবিনাশ পাটনী তাঁর কবিগানের গুরু। বড়ো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুলেশ্বর সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, গোপাল সরকার, গৌর সরকার, হরষিত সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, অমূল্য সরকার, নিত্যগোপাল সরকার, হরিচরণ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। কবি জাতীয় গান রচনায় তিনি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং সেখানে নদীয়া জেলার চাকদহ থানার কালীগঞ্জ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

বৃহস্পতিকুমার রায় (জ. ১৯৪৮)। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার বুনারাবাদ গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ছত্রধর রায়। কবিগানের গুরু অনাদিজ্ঞান সরকার। বিজয় সরকারের নিকটেও কবিগান শেখেন। অনাদিজ্ঞান সরকার, কালীদাস সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, নারায়ণ সরকার, সঞ্জিত পাল, সনজিত সরকার, কৃষ্ণকান্ত সরকার, নিখিল সরকার, শংকর সরকার, সুকুমার সরকার, শ্যামল সরকার,

শিবানন্দ সরকার, রুহিদাস সরকার, ছোটো হরিবর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

বেচারাম সরকার (জ. আ. ১৮১০)। গোপালগঞ্জ জেলায় জন্ম। বেচারাম সরকারের অন্যতম শিষ্য আনন্দ সরকার অত্যন্ত খ্যাতিমান কবিয়াল হয়েছিলেন।

বেণীমাধব সরকার (বিশ শতক)। খুলনা জেলার তেরোখাদা থানার আজোগড়া গ্রামে জন্ম।

বেদানা আকতার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কলমাইদ গ্রামে জন্ম। বিচার গানের বয়াতি।

বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী (উনিশ শতকের শেষভাগ)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার পারুলিয়া গ্রামে জন্ম। রায়পুরা পাদরি সাহেবের এস্টেটে নায়েবের কাজ করতেন। প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন। তাঁর রচিত টপ্পাগুলোর মধ্যে শিবলিঙ্গের টপ্পা, অগ্নিদেবের ঘরজামাইয়ের টপ্পা, বসুমতীর টপ্পা, শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলায় চন্দন দানের টপ্পা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্বিজদাস ছদ্মনামে তিনি বাউল আঙ্গিকের কিছু গানও রচনা করেছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার সাঁইতলা গ্রামে জন্ম।

ব্রজহরি সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বাড়িয়ারহাট এলাকায় জন্ম।

ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার (জ. আ. ১৯৫০)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার আহুতিবাটরা গ্রামে জন্ম। ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার জামধলা গ্রামে জন্ম। মদন আচার্য তাঁর কবিগানের গুরু।

ব্রহ্মচরণ সরকার (বিশ শতক)। খুলনা জেলায় জন্ম।

ভগবতী ভুঁইয়া (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। নোয়াখালী জেলার দয়ারামদি গ্রামে জন্ম। প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন। তাঁর রচিত ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি শ্রেণীর গান সমকালের কবিয়ালদের নিকটে জনপ্রিয়তা পায়। কবিয়াল হরকুমার শীল তাঁর রচিত বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করতেন।

ভগবান আচার্য (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। নরসিংদী থানার পলাশ থানার পলাশ গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের সমসাময়িক। গয়েশপুর জমিদার বাড়িতে হরিচরণের সঙ্গে তাঁর পাল্লা হয়েছে।

ভগবান দে (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার পিওর গ্রামে জন্ম।

ভগবান সেন (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলায় জন্ম।

ভগীরথ মণ্ডল (১৯০৩–১৯৯৪)। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার পাঁচঘরা গ্রামে জন্ম। পিতা সতীশচন্দ্র মণ্ডল, মাতা বাসন্তী মণ্ডল। কবিগানের গুরু কিশোরীমোহন কোনাই। কিশোরীমোহন কোনাই, শিবশঙ্কর পাল, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মধুসূদন ঘোষাল, চাঁদ মহম্মদ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর তেওয়ারি প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

ভবানীচরণ বণিক (আ. ১৭৩২–আ. ১৮২০)। ভবানী বেনে নামে পরিচিত। বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা এলাকায় সাতগেছে গ্রামের গন্ধবণিক পরিবারে জন্ম। পরবর্তী জীবনে কলকাতার বরাহনগরে বাড়ি করেছিলেন এবং জোড়াসাঁকোতে এঁদের পারিবারিক ব্যবসা ছিলো। কবিগানের গুরু রামজী দাস। প্রথম জীবনে ভবানী বেনে হরু ঠাকুরের দলে 'জিল' দিতেন। ভবানী প্রায়ই নিতাই বৈরাগীর সঙ্গে কবির লড়াই করতেন এবং এঁদের লড়াই উপভোগ করার জন প্রচুর জনসমাগম হতো। হরু ঠাকুরের বিপক্ষেও তিনি গান গাইতেন। তাঁর নিজস্ব রচনার সংখ্যা কম। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি বাঁধনদার দিয়ে গান লেখাতেন বলে জানা যায়।

ভারত শীল (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। বরিশাল জেলার নবগ্রাম বা গরঙ্গা গ্রামে জন্ম। ভারত শীলের ভাগিনেয় উমেশ শীলও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। ভারত শীলের রচিত ডাক গান বিশ শতকের প্রথমার্ধের অনেক কবিয়াল ব্যবহার করতেন।

ভারত সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

ভাসানী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

ভীম সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলায় জন্ম। আসামের গড়পাতা, ডিব্রুগড়ে অভিবাসী।

ভুবন বৈরাগী (উনিশ শতকের মাঝামাঝি)। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেছেন। তিনি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসতেন বলে স্থানীয় কবিয়ালদের চেয়ে তাঁর বায়নার পরিমাণ ১০ টাকা বেশি হতো। পশ্চিমবঙ্গীয় অথবা যশোর অঞ্চলের কবিয়াল বলে সন্দেহ হয়।

ভৈরব মজুমদার (উনিশ শতকের শেষ)। মুন্সীগঞ্জ জেলার জয়পাড়া গ্রামে জন্ম। রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য, চণ্ডী আচার্য, রসিক আচার্য প্রমুখের সমসাময়িক। গাজিপুর জেলার কালিয়াকৈরের রাইচরণ সূত্রধর তাঁর খ্যাতিমান শিষ্য।

ভোলা ময়রা (১৭৭৫–১৮৫১)। ভোলা ময়রার আসল নাম ভোলানাথ নায়ক। পিতার নাম কিপু (কৃপারাম) ময়রা, মাতার নাম গঙ্গামণি। চব্বিশ পরগনা জেলার গুপ্তিপাড়ায় জন্ম। এক পর্যায়ে কলকাতার বাগবাজারে বসবাস করেন। হরু ঠাকুর তাঁর কবিগানের গুরু। প্রথম জীবনে হরু ঠাকুরের দলে 'জিল' দিতেন। তৎকালীন বাংলার প্রায় সব জেলাতেই ভোলা ময়রা গান করেছেন। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে আয়োজিত কবিগানের আসরে কলকাতার ও স্থানীয় কবিয়ালদের বিপক্ষে তাঁর কবিগান পরিবেশনের তথ্য জানা যায়। তাঁর প্রতিপক্ষ কবিয়ালদের মধ্যে রাম বসু, যজ্ঞেশ্বরী, বলাই সরকার, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হোসেন শেখ, যজ্ঞেশ্বর ধোপা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কবির লহর রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে সখীসংবাদ, মাথুর, বিরহ প্রভৃতি

শ্রেণীর গানের জন্য তিনি বাঁধনদারদের সহায়তা নিতেন। তাঁর প্রিয় বাঁধনদারদের মধ্যে গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সাতু রায় প্রমুখের নাম জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর একটি রচনায় সমকালীন কবিয়ালদের মধ্যে ভোলা ময়রাকে প্রতিনিধিস্থানীয় রূপে বর্ণনা করেছিলেন।

মকবুল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ভাটিখাইনে জন্ম।

মকরম আলী (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার নূরপুর গ্রামে জন্ম।

মগল সাহা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

মঙ্গল সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলায় চরকালেখাঁ গ্রামে জন্ম।

মণিবালা সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার মস্তাননগর গ্রামে জন্ম।

মণিলাল সরকার (জ. ১৯৫৯)। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার হোগলা চাঁদকাঠি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শরৎচন্দ্র মণ্ডল, মাতার নাম আমোদিনী মণ্ডল। দুই মামা ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং কালীদাস সরকার খ্যাতিমান কবিয়াল। কবিগানের গুরু ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার।

মণিশঙ্কর সরকার (জ. আ. ১৯৬২)। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার ঝড়ভাঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতার নাম রসিকলাল সরকার। মাতা বীণারানী সরকার একজন খ্যাতিমান রামায়ণ-গায়ক। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

মতিলাল বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রামের করুলডাঙার আমুচিয়ায় জন্ম। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মায়ানমারের রেঙ্গুন শহরে কবিগান করতেন।

মতিলাল সরকার (বিশ শতক)। রাজবাড়ি জেলায় জন্ম।

মতি সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার পদ্মবিলা গ্রামে জন্ম।

মথুর দেব সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার লালচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধুভূষণ দেব সরকারও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। তাঁরা দুই ভাই কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর বিপক্ষে গান গাইতেন।

মথুরানাথ বালা (১৮৬৩–১৯১৫)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার গোহালা গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশ্বর বালা খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। সহোদর অম্বিকা বালা এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র বালাও খ্যাতিমান কবিয়াল।

মদন বালা (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার গোহালা গ্রামে জন্ম।

মদন শীল (উনিশ-বিশ শতক)। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার রাজখাড়া গ্রামে জন্ম। টপ্পা, পাঁচালি ও ধুয়া গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিলো। হরিচরণ আচার্য, নারায়ণচন্দ্র বালা প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেন। পুত্র গোপাল শীলও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। টাঙ্গাইলের আফাজউদ্দিন তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের একজন।

মদন সরকার (আচার্য) (১৯১৭–২০১১)। নেত্রকোনা জেলার সহিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা শশী আচার্য বাউল গান করতেন। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের

প্রথমার্ধের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর শিষ্য। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন বিশেষ খ্যাতিমান। কন্যা বিভা রানী চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে তিনি আবুল সরকার, আলী হোসেন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

মধু মোল্লা (বিশ শতক)। পাবনা জেলার সুজানগরের মোল্লাকান্দি গ্রামের কবিয়াল।

মধুসূদন ঘোষাল (১৯৩০–১৯৯৬)। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার খাজুরডিহি গ্রামে জন্ম। পিতা তারাপদ ঘোষাল, মাতা গতিদাসীবালা ঘোষাল। কবিগান ছাড়াও বোলান গান ও ভাদু গানে দক্ষ। দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মণ্ডল, শিবশঙ্কর পাল, কিশোরীমোহন কোনাই প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

মধুসূদন নাথ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানায় জন্ম।

মধুসূদন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার লোহাগড়া গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু তারকচন্দ্র সরকার। তারকচন্দ্র সরকারের মতো তিনিও মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হন। শাক্ত বিষয়ক ডাক গানের পরিবর্তে তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের সহধর্মিণী শান্তিদেবীর উদ্দেশে ডাক গান লিখেছেন।

মধুসূদন সাহা (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার রহিমাবাজ গ্রামে জন্ম।

মধুসূদন সিংহ (১৮১৩–১৮৬৩)। চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অধীন দত্তপুকুর গ্রামে কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহেশ কানা খ্যাত মহেশপুর গ্রামে এই গ্রামের নিকটবর্তী। খেউড় গানের জন্য মধুসূদন সিংহ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মনমোহিনী দাসী (উনিশ শতকের শেষ)। মোহিনী দাসী নামেও পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার থাঞ্জাপুর-মনোহরপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর গুরুর নাম সর্বানন্দ পারিয়াল।

মনীন্দ্র দে (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার কৈইনপুরা অঞ্চলে জন্ম।

মনীন্দ্রনাথ সরকার (জ. আ. ১৯৫৫)। মানিকগঞ্জ জেলার কেওখারজানি গ্রামে জন্ম। টাঙ্গাইলের শের আলী সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

মনীন্দ্র লাল সাধু (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার বৈলতলী গ্রামে জন্ম।

মনোমোহন সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলার বাতুয়া গ্রামে জন্ম।

মনোমোহিনী সরকার (বিশ শতক)। বরিশালের ঝালোকাঠি অঞ্চলের মহিলা কবিয়াল।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (উনিশ শতকের শেষভাগ)। ঢাকা শহরের দয়াগঞ্জে জন্ম। মহিমচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের সমসাময়িক।

মনোরঞ্জন বসু (জ. ১৮৪৫)। চব্বিশ পরগনা জেলার জাগুলিয়া গ্রামে জন্ম। কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন। নাট্যকার হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'মধ্যস্থ'।

মনোরঞ্জন বসু সরকার, বড়ো (জ. ১৯৬২)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার ডুমুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা রতিকান্ত বসু ছিলেন প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক। পিতামহ অম্বিকা বসুও লোককবি ছিলেন। কালীদাস সরকার তাঁর কবিগানের গুরু

পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়ে চব্বিশ পরগনা জেলার নিউ বারাকপুরের নিকটবর্তী তালবান্দা গ্রামে বসবাস করেন। তাঁর স্ত্রী কানন সরকারও একজন সুগায়িকা। বাংলাদেশে তিনি ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীদাস সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার প্রমুখের বিপরীতে গান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তিনি সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমূল্য সরকার, সন্ধ্যা সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, অসীম সরকার, কালাচাঁদ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, তমাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (জ. ১৯২৩)। গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার মহাটালি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম জনার্দন ভট্টাচার্য। মাতার নাম বিনোদিনী দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরষিত ভট্টাচার্যও একজন কবিয়াল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে কবিগানের প্রাথমিক তালিম গ্রহণ। কবিগানের গুরু বিজয়কৃষ্ণ সরকার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দেশত্যাগের পরেও তিনি কয়েক বছর বাংলাদেশে থেকে কবিগান পরিবেশন করেছেন। শেষ ১৯৬০-এর দশকে তিনি দেশত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং সেখানে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন।

মনোরঞ্জন সরকার, ছোটো (জ. আ. ১৯৬৫)। সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার মেষারডাঙা গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

মনোহর সরকার (১৮৭৯–১৯৩৯)। গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নাগরচাঁদ সরকার। কবিয়াল আনন্দ সরকার তাঁর পিতৃব্য। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। উজ্জ্বল ফর্সা রং ও সুন্দর চেহারার জন্য সকলে তাঁকে রাঙা কর্তা নামে অভিহিত করতেন। সমকালের বিখ্যাত প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সরকার এবং নিশিকান্ত সরকার পরবর্তী কালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মনোহর সরকারের পুত্র ব্যারিস্টার সুরেশ বিশ্বাস কবি হিসেবে নাম করেছিলেন। সুরেশ বিশ্বাসের সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিলো।

মফিজউদ্দিন বয়াতি। মানিকগঞ্জ জেলার বিচার গায়ক।

মফিজর রহমান (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানায় জন্ম।

মহম্মদ হামজার আলী (জ. ১৯৪৬)। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার খুরন্দরপুর গ্রামে জন্ম। পিতা হাইতুল্লা সেখ, মাতা জৈগুন বিবি। দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর কবিগানের গুরু। ছদু সেখ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

মহসিন হোসাইন (জ. ১৯৫৪)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা আবদুর রাজ্জাক মিয়া, মাতা শাহেদা খানম। কবিগানের গুরু বিজয়কৃষ্ণ সরকার। বর্তমানে ঢাকায় একটি পত্রিকায় চাকুরিরত। ফোকলোর বিষয়ক অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা।

মহাদেব পাল (উনিশ-বিশ শতক)। বর্ধমান জেলার বারাবনিতে জন্ম। প্রশিষ্য মানিকচন্দ্র দাস বিশ শতকের শেষার্ধে কবিগান ও তরজা গানের গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

মহাদেব সরকার (জ. ১৯৪৮)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার ঘোড়াশাল গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ সরকার। মাতার নাম অবলাসুন্দরী সরকার। পিতা সুরেন্দ্রনাথ সরকার বৈঠকি গানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যোগেশচন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। মণিলাল সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

মহাদেব সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার খালিশপুর গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু মনোহর সরকার।

মহিমচন্দ্র নন্দী (উনিশ শতকের শেষভাগ)। ঢাকা জেলায় জন্ম। ঢাকা শহরের দয়াগঞ্জের মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, নরসিংদির পলাশ থানার পারুলিয়ার বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক।

মহিম শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ গ্রামে জন্ম।

মহিম সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার বেথুরিয়া গ্রামে জন্ম।

মহিমাচরণ সরকার (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার কাটাদুরা গ্রামে জন্ম। গোপালগঞ্জ জেলার বাগুরিয়ার বিখ্যাত সাধুপুরুষ রাই রসরাজের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে গান করেন।

মহেন্দ্র মজুমদার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার সোমপাড়া গ্রামে জন্ম।

মহেন্দ্রলাল দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার থানা মহিরা অঞ্চলে জন্ম।

মহেন্দ্র শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ গ্রামে জন্ম।

মহেন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। খুলনা জেলার পাইকগাছা থানায় জন্ম।

মহেন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। যশোর জেলার শার্শা থানায় জন্ম।

মহেশ কানা (১৮০৩–১৮৫৮)। জন্মান্ধ মহেশ কানার জন্মস্থান চব্বিশ পরগনার বারাসত। তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে আশুতোষ দেব ওরফে ছাতুবাবু এবং প্রমথনাথ দেব ওরফে লাটুবাবু নামে কলকাতার ধনাঢ্য দুই ব্যবসায়ী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন।

মহেশচন্দ্র সেন (১৮৫৪–১৯১৪)। মহেশচন্দ্র কবিভূষণ নামেও পরিচিত। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কুষ্টিয়া সেনবাড়ি জমিদার পরিবারে জন্ম। নিজে কবিয়াল না হলেও কবিগানের বাঁধনদার ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাত। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি সব ধরনের কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তর রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচিত 'আদর্শ কবি' পুস্তকটি ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'সঙ্গীত প্রেমাঞ্জলি' নামেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মহেশ ঢালী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলায় জন্ম।

মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মহেশ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। ঢাকা জেলায় জন্ম।

মাখন ঠাকুর (বিশ শতক)। ফটিক ঠাকুর নামেও পরিচিত। কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার কয়রা গ্রামে জন্ম।

মাখন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকায় বসাক পরিবারে জন্ম।

মাছেম সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। আসামের কবিয়াল।

মাধব ময়রা (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান করতেন।

মাধব মিয়া সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ গ্রামে জন্ম।

মাধুরী ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫৫)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার উত্তর আমিরাবাদ এলাকায় জন্ম। স্বামী দিলীপকুমার ভট্টাচার্য একজন কবিয়াল। কবিগানের গুরু মানিক শীল এবং স্বামী দিলীপকুমার।

মানস বৈরাগী (জ. ১৯৬৮)। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার বলাবুনিয়া গ্রামে জন্ম। উচ্চমাধ্যমিক পাস। পিতার নাম অনিলকৃষ্ণ বৈরাগী। মাতার নাম হাজারী দাসী বৈরাগী। কবিগানের গুরু সদানন্দ সরকার। হরিবর সরকার প্রমুখের বিপরীতে গান করেন।

মানিকচন্দ্র দাস (জ. ১৯৫০)। বাঁকুড়া জেলার সুবিয়াড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাধাই দাস, মাতা প্রমীলা দাস। মাতুল নারায়ণচন্দ্র দাস খ্যাতিমান কবিয়াল। মাতুলের কবিগানের দলে দোহারি করেন, ক্রমে কবিয়াল হিসেবে আবির্ভূত হন। তরজাগায়ক হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মানিক শীল (জ. ১৯৪৬)। চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানার মোহরা গ্রামে জন্ম। পিতা সাচিরাম শীল, মাতা সুখেন্দিবালা শীল। কামিনী বেঙার তাঁর কবিগানের গুরু। স্ত্রী খুকীরানী শীলও একজন কবিয়াল। রাইগোপাল দাশ, ফণী বড়ুয়া, এয়াকুব আলী, যজ্ঞেশ্বর শীল, মণীন্দ্র সাধু, ছাবের আহম্মদ, রাইমোহন বড়ুয়া, বিভূতিরঞ্জন নাথ, নূর আহম্মদ সরকার, সুনীল দাশ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে, বিশেষভাবে বেতার ও টেলিভিশনে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

মাহতাব গাইন। চুয়াডাঙা জেলার বগাদির ভোগাইল গ্রামে জন্ম।

মিঞাজান (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলায় জন্ম।

মিয়া উল্লাহ (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বেরাবোছনা গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক।

মিলন শীল (জ. ১৯৪৮)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার পাঁচখাইন গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বসন্ত শীল, মাতা স্বর্ণারানী শীল। কবিগানের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নোয়াপাড়ার শামসুল আলমের নিকট। পরে ফণী বড়ুয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর পরিবেশিত কবিগানের একটি অডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। কবিগান বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে কবিগান পরিবেশনের ডাক পান। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মিলন সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার চাম্বল গ্রামে জন্ম।

মীরা সরকার (জ. ১৯৭৭)। বাগেরহাট জেলার মংলা থানার হলদিবুনিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রবীন্দ্রনাথ মল্লিক। মাতার নাম গোলকমণি মল্লিক। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। রামপাল থানার ছোটো দুর্গাপুর গ্রামের বিপল সরকার তাঁর স্বামী। তিনিও কবিগান করেন। উনিশশো নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কবিগান শেখেন। সে সময়ে অনাদিজ্ঞান সরকারের সঙ্গে তিনি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আন্দামান, নেপালের মহেন্দ্রনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। কবিগান শেখা শেষ হলে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

মীর্জা হুসেন আলী (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। কুমিল্লা জেলার নারায়ণপুর গ্রামে জন্ম। জমিদার হুসেন আলী একজন কালীর সাধক ছিলেন। সরাসরি কবিয়াল ছিলেন না, তবে বেশ কয়েকটি মালশি গানের রচয়িতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গাজিপুর জেলার কালিয়াকৈর গ্রামে জন্ম।

মুকুন্দলাল সরকার (জ. ১৯৩২)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার সাতলা গ্রামে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুরে অভিবাসী এবং সেখানে কবিগান করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাইন সব ধরনের গানের সঙ্গে হারমোনিয়ামে বাজাতে পারতেন। অনুজ রবীন্দ্রনাথ সরকার বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। ছোটো ভাই সুবল সরকার একজন দোহার। ছোটো রাজেন্দ্রনাথ তাঁর কবিগানের গুরু।

মুকুন্দ সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার মংলা থানায় জন্ম।

মুসলিম সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার ভাবলা গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক।

মুহাম্মদ ছৈয়দ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার শিলাইগড়া গ্রামে জন্ম।

মৃগেন্দ্র আচার্য (১৮৯০–১৯৬৫)। মেদিনীপুর জেলার চন্দকোনা থানার টুকুরিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা মহেন্দ্রনাথ আচার্য, মাতা মোক্ষদারানী আচার্য। পুত্র নিতাইচন্দ্র আচার্যও একজন কবিয়াল।

মৃণাল সরকার (জ. ১৯৫৬)। নদীয়া জেলার ধানতলা থানার রূপদিয়া গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু অরুণ গোঁসাই।

মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী (উনিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার মল্লকান্দি গ্রামে জন্ম। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের গুরু।

মৃত্যুঞ্জয় সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার নাথারকান্দি গ্রামে জন্ম। রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগানের প্রথম গুরু। টপ্পা-পাঁচালিতে দক্ষ ছিলেন।

মোবারক সরকার (বিশ শতক)। খুলনা জেলার ফুলতলার নিকটে জন্ম।

মোসলেম মোল্যাহ বয়াতি (১৯০৩–১৯৮৭)। মোসলেম বয়াতি নামে বিশেষ পরিচিত। নড়াইল জেলার তারাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ওয়াহেদ মোল্যাহ। ভাবগান গায়ক মোক্তাদের ফকিরের নিকট গানের তালিম নেন। রঘুনাথপুর গ্রামের রাহাতুল্লাহ বয়াতির নিকট জারিগানের দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রধানত জারিগায়ক

ছিলেন। তিনি বিশ শতকের জারিগানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকার, রসিকলাল সরকার, নিশিকান্ত সরকার, শরৎ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগানও করতেন।

মোস্তাক আহমেদ (জ. ১৯৫২)। চট্টগ্রামে জেলার আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে জন্ম। পিতা হাজী আলতাফ মিয়া, মাতা লায়লা বেগম। কবিগানের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী গানও পরিবেশন করে থাকেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয়-অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মোহনবাঁশী কর্মকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার রাজখাড়া গ্রামে জন্ম।

মোহনবাঁশী সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। নোয়াখালী জেলায় জন্ম। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগান করতেন। রমেশ শীল তাঁর প্রথম জীবনে এই কবিয়ালের বিপক্ষে তাঁর জীবনের প্রথম গান করেছিলেন।

মোহন সরকার (উনিশ শতক)। মোহনদাস বৈরাগী নামেও পরিচিত। চব্বিশ পরগনা জেলার বনগ্রামের নিকটবর্তী গোপালনগর গ্রামে জন্ম। মোহনদাসের পুত্র যদুনাথ দাসও একজন কবিয়াল।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ (জ. ১৯৫৮)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় জন্ম। চাকুরি জীবনের অবসরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ সরকার (জ. ১৯৩১)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার রশিদের ঘোনা গ্রামে জন্ম। পিতা ইব্রাহীম সরকার একজন কবিয়াল। মাতার নাম আমির খাতুন। মহেশখালীর গোপাল ঠাকুরের বিপক্ষে কবিগান করেন।

মোহাম্মদ হোসেন পণ্ডিত (জ. ১৯২৮)। চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া থানার কচুখাইন গ্রামে জন্ম। পিতা হাজী মোহাম্মদ মিঞা সওদাগর, মাতা রওশন আরা। রমেশ শীল ও মোহনবাঁশীর কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

মোহিনী দাসী (উনিশ শতক)। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে কলকাতায় কবিগান করতেন। মহিলা কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরী ও শশীমুখীর বিপক্ষে কবিগান গাইতেন। তাঁর কবিগানের গুরু ছিলেন সর্বানন্দ পারিয়াল।

যজ্ঞেশ্বর (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার কয়রা গ্রামে জন্ম। কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর শীল (বিশ শতক)। কবিয়াল রমেশ শীলের পুত্র এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি।

যজ্ঞেশ্বরী (আ. ১৭৯০–১৮৫০)। কলকাতার নিকটে জন্ম। গুরুর নাম অজ্ঞাত। প্রথম দিকে বাঁধনদার হিসেবে কবিগানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সমকালের বিখ্যাত কবিয়াল রাম বসুর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়। সমকালীন খ্যাতিমান কবিয়ালদের বিপক্ষে এমনকি রাম বসুর বিপক্ষেও কবিগান করেন। তাঁর রচিত সখীসংবাদ জাতীয় একাধিক গান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে নারীহৃদয়ের আন্তরিক আকুতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

যতীন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো (জ. আ. ১৯৫০)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার ছিটকিবাড়ি গ্রামে জন্ম। ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং সুরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

যাদব গুহ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

যামিনী দত্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। সিলেট জেলায় জন্ম।

যুগল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নাটোর জেলায় জন্ম।

যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার ইন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম।

যোগেন্দ্র দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার চরবদু গ্রামে জন্ম।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার (বিশ শতক)। গাজিপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার কলাপাতুয়া গ্রামে জন্ম। হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিগানের গুরু।

যোগেন্দ্র শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার যোগানিয়া গ্রামে জন্ম।

যোগেন্দ্র সূত্রধর (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার বকশিয়া গ্রামে জন্ম।

যোগেশ সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

যোগেশচন্দ্র সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার ফরকাবাজ গ্রামে জন্ম।

যোগেশচন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। গাজিপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার সুপাইর গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু যোগেন্দ্রনাথ সরকার। যোগেশচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য মহাদেব সরকার।

রওশন আলী সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার ঘুনি শালাংকা গ্রামে জন্ম।

রওশন বয়াতি (বিশ-একুশ শতক)। নড়াইল জেলার তারাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা বিখ্যাত মোসলেম মোল্যাহ বয়াতি ওরফে মোসলেম বয়াতি। পিতার মতোই জারিগান এবং কবিগান উভয় মাধ্যমে দক্ষ।

রক্ষাকর চক্রবর্তী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলায় জন্ম।

রঘুনাথ দাস (১৭২৫–১৭৯০)। হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় তাঁতি পরিবারে জন্ম। গোঁজলা গুঁইয়ের অন্যতম শিষ্য। দাঁড়াকবির জনক হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকেন। প্রধান শিষ্য হরু ঠাকুর। রঘুনাথের রচিত সখীসংবাদ, ভবানীবিষয়, ও কবির লহর জাতীয় বেশ কিছু গান পাওয়া যায়। রঘুনাথ দাসের বংশধর নবীনচন্দ্র দাস ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি শিক্ষক। রঘুনাথ দাস রচিত তিনটি কবিগান পাওয়া যায়।

রজনী তালুকদার (মৃ. ১৯৪২)। গোপালগঞ্জ জেলার ডালনা গ্রামে জন্ম। মনোহর সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। টপ্পা রচনায় দক্ষ ছিলেন।

রজনী দে (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার খোলামুড়া গ্রামে জন্ম।

রজনী শীল (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার খাগারতা গ্রামে জন্ম।

রজনী সরকার, বড়ো (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচানি গ্রামে জন্ম।

রজনী সরকার, ছোটো (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার নিজড়া গ্রামে জন্ম।

রণজিৎ সরকার (জ. আ. ১৯৬৫)। মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর থানার নিমতা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম দলু। কৃষ্ণগোপাল পাল তাঁর কবিগানের গুরু।

রতন কুমার দাশ (জ. ১৯৬৫)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার আজিমপুর গ্রামে জন্ম। পিতা নিরঞ্জন দাশ, মাতা রানীবালা দাশ। পিতামহ নতুনচন্দ্র দাশ কবিয়াল ছিলেন।

রতন বড়ুয়া (জ. ১৯৬২)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কদলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা বুদ্ধকিঙ্কর বড়ুয়া, মাতা শান্তিরানী বড়ুয়া। কবিগানের গুরু শামসুল আলম।

রত্নমণি (উনিশ শতক)। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতার কবিয়াল। নেড়ি কবি নামে পরিচিত।

রন্‌জিত কুমার কর (জ. ১৯৪৮)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার দৌলতপুর গ্রামে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রবিজয় কর কবিয়াল ছিলেন। মাতার নাম মণিমালা কর। হারমোনিয়ম, জুরি, কাঁসি, অর্গান, পারকিউশন প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ এই কবিয়াল চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন আসরে কবিগান করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ সরকার (বাইন) (জ. ১৯৩৪)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার সাতলা গ্রামে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাইন হারমোনিয়ম-বাদক ছিলেন। মাতা মহারানী বাইন সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। অগ্রজ মুকুন্দলাল সরকারও একজন কবিয়াল এবং পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুরে অভিবাসী। ছোটো ভাই সুবল সরকার একজন ভালো মানের দোহার। কবিগানের প্রথম গুরু ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার। পরে ঝিনাইদহের শৈলকুপার বিনোদ সরকার এবং আরো পরে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের নিকটেও কবিগান শেখেন।

রবীন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো (জ. ১৯৫৯)। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার লালচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নগেন্দ্রনাথ রায়, মাতার নাম পদ্মবালা রায়। নারায়ণচন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। স্বরূপেন্দু সরকারের নিকটেও কবিগান শেখেন। স্বরূপেন্দু সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকান্ত সরকার, শঙ্কর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

রমণীমোহন দেব (১৯০৫–১৯৭১)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কাটগর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র দেব। লোহাগাড়া থানার কালাউজান গ্রামের মনীন্দ্র সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

রমাপতি চট্টোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা গ্রামে জন্ম। বর্ধমানের মহারাজার প্রিয় কবিয়াল ছিলেন।

রমেশচন্দ্র আচার্য (১৯০৭–১৯৭৪)। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার শিবপুর গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের শেষ জীবনের শিষ্য। মৌলিক গান রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও টপ্পা, পাঁচালি, জবাব রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নকুল দত্ত, হরিচরণ নাথ, তারিণী সরকার, দুর্গাচরণ সরকার, রাইহরণ সরকার, কালোশশী চক্রবর্তী, গোবিন্দ ধুপী, শচীন্দ্রকুমার শীল, কাশীনাথ নট্ট, তারিণী নট্ট,

বিপিন সরকার, অক্ষয় আচার্য, যতীন্দ্র গণ প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মারা যান এবং ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে অনাহারে এই কবিয়ালের মৃত্যু ঘটে।

রমেশচন্দ্র শীল (১৮৭৭–১৯৬৭)। রমেশ শীল নামে অধিক পরিচিত। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম চণ্ডীচরণ শীল। কবিয়াল মোহনবাঁশী ও চিন্তাহরণের কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি এবং বামপন্থি রাজনীতিতে দীক্ষাগ্রহণ। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তি। পশ্চিমবঙ্গের শেখ গোমানী দেওয়ান এবং লম্বোদর চক্রবর্তী প্রমুখের বিপক্ষে সাম্যবাদী চেতনার গান পরিবেশন করেন। দেশভাগের পরে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আটক ও এক বছর কারাভোগ। এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী শরিফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং প্রচুর মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে 'রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া', 'চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি', 'দেশের গান', 'লোককল্যাণ', 'আশেকমালা', 'নূরে দুনিয়া' প্রভৃতি।

রমেশ সরকার (বিশ শতক)। পাবনার জেলার কবিয়াল।

রসময় মালো সরকার (বিশ শতক)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার হাড়িয়ারঘোপ গ্রামে জন্ম। কবিগানের পাশাপাশি যাত্রাগানের পালা-রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। রসময় সরকার রচিত 'নাদির শাহ' অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি যাত্রাপালা।

রসিক আচার্য (উনিশ শতকের শেষদিক) মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্ম। রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য, চণ্ডী আচার্য, ভৈরব মজুমদার প্রমুখের সমসাময়িক।

রসিক ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার পিপুলবুনিয়া গ্রামে জন্ম।

রসিকলাল সরকার, বড়ো (১৯০১–১৯৮১)। বাগেরহাট জেলার মংলা থানার মালগাজী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বাউল বৈরাগী, মাতার নাম যশোদা বৈরাগী। তাঁর গুরু রাজেন্দ্রনাথ সরকার। হরিবর সরকার, গৌরপদ সরকার প্রমুখের সঙ্গে কবিগান করতেন। স্ত্রীর নাম মালাবতী। ১৯৫২ সালে 'পকিস্তান গীতাঞ্জলি' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফলের নাম, গ্রামের নাম নিয়ে লেখা তাঁর একটি ছড়ার বইও রয়েছে। তাঁর পুত্র সুশীল সরকার মংলা কলেজের অধ্যাপক।

রসিকলাল সরকার (১৯২৮–১৯৯০)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার ভাগা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রাজমোহন সরকার, মাতার নাম ফুলমতী দেবী। প্রথম জীবনে কবিয়াল রাজেন মালোর রামায়ণের দলে হারমোনিয়ম বাজাতেন। কবিগানে তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন বাগেরহাটের কাইনমারীর গৌরপদ সরকার। পরবর্তী কালে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ কণ্ঠের জন্য তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হন। তাঁর ধুয়া গান বিজয়কৃষ্ণ সরকারের ধুয়া

গানের সমতুল্য। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং নিউ বারাকপুরের নিকটবর্তী আগাপুরে বাড়ি নির্মাণ করেন। ১৯৭৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিগান পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের গণসঙ্গীত শিল্পী আবদুল লতিফের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে কবিগান পরিবেশন করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কালাচাঁদ সরকার, অসীম সরকার, ছোটো মনোরঞ্জন সরকার, নারায়ণ সরকার, অমূল্যকুমার সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্র মণিশঙ্কর সরকার একজন কবিয়াল।

রাইগোপাল দাস (বিশ শতক)। চট্টগ্রামের কবিয়াল। রমেশ শীলের শিষ্য।

রাইচরণ রায় (উনিশ শতক)। বীরভূম জেলার কবিয়াল।

রাইচরণ সরকার (মালো) (উনিশ-বিশ শতক)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার হাড়িয়ারঘোপ গ্রামে জন্ম।

রাইচরণ সূত্রধর (উনিশ-বিশ শতক)। গাজিপুর জেলার কালিয়াকৈর গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু ভৈরব মজুমদার। পুত্র পূর্ণচরণ সূত্রধরও একজন কবিয়াল।

রাইচরণ সরকার (বিশ শতক)। খুলনা জেলার রূপসা থানার ডোবা গ্রামে জন্ম। এই গ্রামের একজন বিখ্যাত দোহারের নাম আশুতোষ।

রাইহরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার ভাসখলা গ্রামে জন্ম।

রাখাল দাশ (জ. ১৯৩৯)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গশ্চি গ্রামে জন্ম। পিতা রমণীমোহন দাশ, মাতা ননীবালা দাশ। পিতৃব্য রজনীকান্ত দাশ একজন কবিয়াল ছিলেন। কবিগানের গুরু ফণীভূষণ বড়ুয়া।

রাখালদাস বায়েন (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। বীরভূম জেলার পরোটা গ্রামে চর্মকার পরিবারে জন্ম। কবিগানের গুরু আহমেদ হোসেন ওরফে হামদু। রাখালদাসের দু-একটি গানে গান্ধীভক্তি ও স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন রয়েছে।

রাখাল আচার্য সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার টেমারগ্রাম গ্রামে জন্ম। তাঁর কবিগানের গুরু ষষ্ঠীচরণ করাতী।

রাঘবচন্দ্র চক্রবর্তী (জ. ১৯৬২)। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার শালিন্দা গ্রামে জন্ম। পিতা শিবদাস চক্রবর্তী, মাতা ক্ষেমঙ্করী চক্রবর্তী। কবিগানের প্রথম গুরু রাঘবনাথ সরকার, পরে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে কবিগানের দীক্ষা নেন। চাঁদ মহম্মদ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায়, সুবল মাঝি, নন্দ মাঝি, কাঞ্চন মণ্ডল, বৈদ্যনাথ দেবনাথ প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

রাঘবনাথ সরকার (১৯০৭–১৯৮৪)। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর গ্রামে জন্ম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথ সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন এবং তাঁর নিকটে কবিগানের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। হৃষীকেশ মণ্ডল তাঁর কবিগানের গুরু। জ্যোতিষ কোনাই, বসন্ত সরকার, আবদুল জাব্বার, অনুকূল রায়, উপেন্দ্র কবিদার, সৃষ্টিধর কোটাল, শেখ গুমানী দেওয়ান, রমেশ শীল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান ছাড়াও রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মুন্সীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, দর্শনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, বরিশাল, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি

স্থানে কবিগান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর উপরে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে।

রাজকিশোর আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। পূর্ববঙ্গের কবিয়াল।

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

রাজকুমার সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার দেবাসুর গ্রামে জন্ম।

রাজমোহন তাঁতি (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নড়াইল জেলার মাইজপাড়া-মাগুরা গ্রামে জন্ম।

রাজমোহন সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলায় জন্ম।

রাজারাম গণক (উনিশ-বিশ শতক)। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী বাঁশশঙ্কা গ্রামে জন্ম।

রাজারাম সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ধর্মপুর গ্রামে জন্ম।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২–১৯৭৪)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার বৈঝাকি গ্রামে জন্ম। পরে একই থানার চুনখোলা গ্রামে বসবাস। পিতা নদীয়ারচাঁদ সরকার এবং মাতামহ আনন্দ সরকার কবিয়াল ছিলেন। মাতার নাম মন্দাকিনী দেবী। মাতুল হরিবর সরকার এবং মনোহর সরকারও কবিয়াল ছিলেন। কবিগানে তাঁর প্রথম গুরু হরিবর সরকার এবং দ্বিতীয় গুরু হরিচরণ আচার্য। হরিবর সরকারের দলে ছুট সরকার হিসেবে এবং হরিচরণ আচার্যের দলে কোল-সরকার হিসেবে কবিয়াল-জীবনের সূচনা হয়। ১৯১৩-১৪ সালের দিকে নিজেই কবির দল গঠন করেন। হরি, মনা, মনোহর, সুধন্য প্রমুখ ছিলেন তাঁর দোহার। তাঁর ঢুলির নাম ছিলো পবন, তাঁর দলে সানাই বাজাতেন শীতল, বেহালা বাজাতেন ক্ষীরোদ, হারমোনিয়ম বাজাতেন সদানন্দ, এবং কাঁসি বাজাতেন অধর। স্বতন্ত্র দল গঠন করার পরে প্রথম কবিগান করেন চন্দ্রকান্ত সরকারের বিপক্ষে বরিশালে। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি—সব ধরনের গান রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিলো অসাধারণ। রাগরাগিণীর উপরে তাঁর দখল ছিলো অসাধারণ। সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও তিনি পটু ছিলেন। তাঁর যাবতীয় গানের মধ্যে সমাজসংস্কারমূলক মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কবিগান পরিবেশন করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র পান। এই গানে তাঁর বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ সরকার। রাজেন্দ্রনাথ সরকার রাজেন পাগল বা বড়ো রাজেন নামেও পরিচিত। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের অসংখ্য কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কালীদাস সরকার, গৌরপদ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, দ্বিজবর সরকার, নিত্যগোপাল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় সরকার, রসিকলাল সরকার (বড়ো), শুকচাঁদ সরকার, হরষিত ভটাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো (১৯২৩–২০০৯)। ছোটো রাজেন হিসেবে সমধিক পরিচিত। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার বাগান উত্তরপাড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম অশ্বিনী সরকার। মাতার নাম হৈমন্তী সরকার। নিশিকান্ত সরকার সিদ্ধান্তবিশারদ তাঁর কবিগানের গুরু। কনিষ্ঠ সহোদর কালীদাস সরকার এবং দুই ভাগিনেয় মণিলাল সরকার ও স্বপন সরকার কবিয়াল। শেষ জীবনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মাসিক এক হাজার টাকার একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। অন্যতম শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, যতীন্দ্রনাথ সরকার। ২০০৯ সালের ১৯শে জুন তিনি নিজ গ্রামে মারা যান।

রাজেন্দ্র ভুঁইমালী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্ম।

রাজেন্দ্র মালো (বিশ শতক)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানার হাড়িয়ারঘোপ/বসিরাবাদ গ্রামে জন্ম।

রাজেন্দ্র মালো সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার বসিরাবাদ গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে রসিকলাল সরকারের বিপক্ষে গান করেন। কবিগান ছাড়াও তাঁর রামায়ণ-গানের দল ছিলো।

রাধাকান্ত সরকার (বিশ শতক)। ঝালোকাঠি জেলায় জন্ম।

রাধানাথ (উনিশ শতক)। বীরভূমের কবিয়াল।

রাধাবল্লভ সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলার বাইতারা জন্ম। তাঁর রচিত প্রচুর ইসলামি গান জনপ্রিয়।

রামকমল (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

রামকানাই আচার্য (উনিশ শতকের শেষার্ধ)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার আলগী গ্রামে জন্ম। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চানন আচার্যও একজন কবিয়াল ছিলেন। হরিচরণ আচার্য তাঁর খ্যাতিমান শিষ্য। ডৌকাদি গ্রামের হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, পারুলিয়ার জয়হরি সরকার, শিবচন্দ্র দাস, পলাশের ভগবান আচার্য, সাটিপাড়ার স্বরূপ কবিরাজ প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। শিষ্য হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষেও গান করেছেন।

রামকানাই নাথ (উনিশ-বিশ শতক)। ময়মনসিংহে জন্ম। বিজয়নারায়ণ আচার্যের সমসাময়িক। ভগবান আচার্য প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

রামকানাই ভুঁইমালী (উনিশ শতকের শেষদিক)। মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্ম। মুন্সীগঞ্জ জেলার হাসারা গ্রামনিবাসী দেবেন্দ্র দাস ছিলেন রামকানাইয়ের অন্যতম শিষ্য। ভৈরব মজুমদার, রামরূপ আচার্য, চণ্ডী আচার্য, রসিক আচার্য প্রমুখের সমসাময়িক।

রামকুমার সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। গাজিপুর জেলার জয়দেবপুরে জন্ম। ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরীর কবির দলে বাঁধনদার হিসেবে কাজ করেন। তাঁর কণ্ঠ মধুর ছিলো না, তবে সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি শ্রেণীর গান রচনায় এবং টপ্পা-পাঁচালিতে তিনি অসাধারণ পটুত্ব অর্জন করেছিলেন। কলকাতার

কবিয়াল সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। তাঁর রচিত গানের একটি সংকলন ভাওয়াল রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়।

রামগতি শীল (আ. ১৮৪০–১৯০১)। কিশোরগঞ্জ জেলার গাঙ্গাইল গ্রামে জন্ম। দারিদ্র্যের কারণে পরবর্তী জীবনে কখনো সুকুন্দি গ্রামে, কখনো নেত্রকোনা জেলার কৈলাটি-ফতেপুর গ্রামে, আবার কখনো আঠারোবাড়িতে বসবাস। শেষ জীবনে কিশোরগঞ্জের বড়াইল বাজারের এক পর্ণকুটিরে বসবাস। প্রথম জীবনে ঢাকা থেকে আসা এক ঝুমুরওয়ালির দলে শিক্ষানবিসি হন। পরে কবিগানের দল গঠন করেন। সমকালের ময়মনসিংহ অঞ্চলে সবচেয়ে খ্যাতিমান কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। সুসং, দুর্গাপুর, গৌরীপুর, আঠারোবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারবাড়িতে তিনি কবিগান পরিবেশন করতেন। রামু মালী, শম্ভু ঝালো, প্রাণকৃষ্ণ কর্মকার, বিজয়নারায়ণ আচার্য, রামকানাই নাথ, পরাণ কর্মকার, কালীচরণ দে প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। এঁদের কারো কারো সঙ্গে তিনি হোলির গানও গাইতেন।

রামচন্দ্র মাস্টার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার কুড়পাই গ্রামে জন্ম।

রামজয় (উনিশ বিশ শতক)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

রামজী দাস (আ. ১৭২৫–১৭৯০)। গোঁজলা গুঁইয়ের অন্যতম শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় উল্লেখ করেন যে, রামজী দাস বীরভূম অঞ্চলে কবিগান করতেন। বীরভূমের মুড়ামাঠ এলাকা থেকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রামজী দাসের অনেকগুলো গান সংগ্রহ করেন। এতে মনে হয়, রামজী দাস বীরভূমেরই সন্তান। রামজী দাসের লেখা অনেকগুলো সখীসংবাদ ও কবির লহর পাওয়া গেছে। নিতাই দাস বৈরাগী, ভবানী বণিক, এবং রাম বসু ছিলেন এঁর শিষ্য।

রামদয়াল নাথ (উনিশ-বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার সদর থানার দুগ্‌গিয়া গ্রামে জন্ম।

রামদাস কৈবর্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার ন্যায়মস্তি গ্রামে মাহিষ্য পরিবারে জন্ম। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলে কবিয়াল হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১–১৮৩৯)। নিধু বাবু নামে সমধিক পরিচিত। প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত কবিয়াল। হুগলি জেলার চাপতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতার নাম হরিনারায়ণ কবিরাজ। বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক হিসেবেও বিশেষ খ্যাত। ইংরেজি ও হিন্দুস্তানি ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মুসলমান ওস্তাদের নিকট থেকে হিন্দুস্তানি টপ্পা আত্মস্থ ও রপ্ত করেন। তাঁর টপ্পা গানের বিখ্যাত চরণ : "নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনা স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা।"

রামপ্রসাদ ঠাকুর (উনিশ-বিশ শতকের সন্ধি)। হরু ঠাকুরের শিষ্য। বড়ো ভাই নীলু ঠাকুরের দলে কবিয়াল জীবনের সূচনা। নীলু ঠাকুর অকালে মারা গেলে নিজেই কবির দলের নেতৃত্ব দান। রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

রাম বসু (১৭৮৬–১৮২৮)। হাওড়া জেলার শালকিয়া ওরফে শালিখা গ্রামে কায়স্থ পরিবারে জন্ম। পিতার নাম রবিলোচন বসু। জোড়াসাঁকোয় ভগিনীপতির বাড়িতে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। প্রথম জীবনে সদাগরি অফিসে কেরানির চাকরি করতেন। ভবানী বেনে তাঁর কবিগানের গুরু। রাম বসুর সৃজনীশক্তি ও কবিপ্রতিভা ছিলো অসাধারণ। ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকর'-এ রাম বসুর রচিত ১৪৮টি গান প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের কবিগানের সংকলনগুলোতে তাঁর গানের সংখ্যা সর্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সখীসংবাদের ইংরেজি অনুবাদ করেন। ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, সপ্তমী, আগমনী, খেউড়, লহর, টপ্পা প্রভৃতি নানা ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। হরু ঠাকুর, ভবানীচরণ বণিক, নীলমণি ঠাকুর প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

রামমোহন দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। যশোর জেলায় জন্ম।

রামরূপ আচার্য (উনিশ শতকের শেষদিক)। মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্ম। ভৈরব মজুমদার, রামকানাই ভুঁইমালী, চণ্ডী আচার্য, রসিক আচার্য প্রমুখের সমসাময়িক।

রামরূপ আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভোলা জেলায় জন্ম।

রামসুন্দর আচার্য (মৃ. ১৯২৫)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম। রামু মালী ও রামগতি শীলের বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও তাঁদের বিপক্ষে গান করেছেন।

রামসুন্দর রায় (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

রামসুন্দর স্বর্ণকার (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কলকাতার হাড়কাটা গলিতে জন্ম। ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেন। তাঁর অন্যতম বাঁধনদার ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। অশীতিপর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রামানন্দ চক্রবর্তী (আঠারো-উনিশ শতক)। রামাই ঠাকুর নামে পরিচিত। বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী রায়পুর গ্রামে জন্ম। কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক।

রামানন্দ নন্দী (আ. ১৭৭৩–১৮৫৩)। চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি থানার রাহুতা গ্রামে কায়স্থ পরিবারে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র নন্দী। বংশীধর, ধরণীধর পোদ, চণ্ডীচরণ ধোবা প্রমুখ কবিয়ালের জন্মও এই গ্রামে। কবিগানের গুরু নিত্যানন্দ দাস ওরফে নিতাই বৈরাগী। নীলমণি ঠাকুর, ভবানীচরণ বণিক প্রমুখের নিকটেও তালিম নেন। প্রধানত গোরক্ষনাথ যোগীর বিপক্ষে গান করতেন।

রামু মালী (১৮৪১–১৯১৪)। কিশোরগঞ্জ জেলার আউটপাড়া গ্রামে ভুঁইমালী পরিবারে ১২৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে জন্ম। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি কবিগানের দলে যোগ দেন এবং একুশ বছর বয়সে কবিগানের দল করেন। পিতার নাম রামপ্রসাদ, মাতার নাম রায়মণী। সঙ্গীতের গুরু ছিলেন অমরনাথ ভট্টাচার্য। রামগতি শীল, রামকানাই, বিজয়নারায়ণ, শক্তিরাম, বড়হরি, মিএগজান, নবু সরকার, গোবিন্দ মালী, বিশ্বম্ভর ঠাকুর, মদন শীল প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা রেখে তিনি ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফাল্গুন পরলোকগমন করেন।

রায়মোহন বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রামে জন্ম।

রাসবিহারী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার জানদি গ্রামে জন্ম।

রাসমোহন সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। নড়াইল জেলায় জন্ম।

রাসু রায় (১৭৩৫–১৮০৭)। হুগলি জেলার চন্দননগরের গোন্দলপাড়া গ্রামে কায়স্থ পরিবারে জন্ম। পিতা আনন্দীনাথ রায় ফরাসিদের সামরিক বিভাগে মুহুরির কাজ করতেন। বাল্যকালে চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে অবস্থান ও শিক্ষালাভ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ দাসের নিকটে গমন এবং তাঁর নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ। অল্প কালের মধ্যেই দুই ভাইয়ের কবিগানের দল গঠন। এঁদের রচিত সখীসংবাদ ও বিরহ পর্যায়ের বেশ কয়েকটি গান পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

রিয়াজুদ্দিন সেখ (জ. ১৯৩২)। মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানার হনুমন্তনগর গ্রামে জন্ম। পিতা ইব্রাহিম সেখ, মাতা মহরনি বিবি। ফটিকচন্দ্র মৈত্র তাঁর কবিগানের গুরু। মফেজুদ্দিন সরকার, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শিবশঙ্কর পাল, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ মহম্মদ, গফুর সেখ, দ্বিজবর হালদার, কাশীকান্ত দেবনাথ, যশোদানন্দন রায়, শ্যামসুন্দর তেওয়ারি, কাশীনাথ চক্রবর্তী, আফাজুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেছেন।

রুহিদাস সরকার (বিশ-একুশ শতক)। কালীদাস সরকারের শিষ্য।

রূপচাঁদ সরকার (জ. আ. ১৯২২)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার বেতবাড়ি গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু বানারিপাড়া থানার গাভা গ্রামের ষষ্ঠী খরাতি। হরিবর সরকারের নিকটে মতুয়া আদর্শে দীক্ষিত হন। বিশ্বেশ্বর সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেন।

রূপ বৈরাগী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ গ্রামে জন্ম।

রেবতী ঠাকুর (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলার কামারকান্দা গ্রামে জন্ম।

লক্ষ্মীকান্ত পাটনী/বিশ্বাস (আঠারো শতকের শেষ)। হুগলি জেলার চন্দননগরে জন্ম। তাঁর পুত্র নীলমণি পাটনীও একজন কবিয়াল ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "শ্লেষ ও খেউড় বর্ণনায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহাতে আশ্চর্য শক্তি ও চমৎকার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

লক্ষ্মীকান্ত সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলায় জন্ম।

লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী (উনিশ-বিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

লতা রানী সরকার (একুশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার নিজড়া গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

লম্বোদর চক্রবর্তী (১৯০৫–১৯৬৯)। বীরভূম জেলার গোয়ালগ্রামে জন্ম। পিতা উপেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, মাতা শরদিন্দু বা নিভাননী। শ্যালক সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তীর কবিগানের দল ছিলো, সেই দলের বাঁধনদার হিসেবে কাজ করে কবিগানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সত্যকিঙ্করের নিকটেই কবিগানের দীক্ষা

নেন। শেখ গুমানী দেওয়ানের সঙ্গে বহুকাল যাবৎ জোট বেঁধে গান করেন। কবিগানকে পৌরাণিক আবহ থেকে মুক্ত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

লালচাঁদ সরকার (বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার লাটেঙ্গা গ্রামে জন্ম।

লাল মাহমুদ (১৮৬০–১৮৯৭)। নেত্রকোনা জেলার বাগুইডহর গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে গাজির গান করতেন, পরে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচিত গানগুলোতে বৈষ্ণবীয় আদর্শ প্রতিফলিত।

লালু নন্দলাল (আ. ১৭২৫–১৭৮৫)। গোঁজলা গুঁইয়ের অন্যতম প্রধান শিষ্য। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অনুযায়ী জন্মস্থান হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা তাঁর জন্মস্থান বীরভূম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এঁর একটিমাত্র সখীসংবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিতাই বৈরাগী ও বলহরি রায় তাঁর প্রধান দুই শিষ্য।

লালু নন্দী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার সুন্দরকাঠি গ্রামে জন্ম।

লিটন সরকার (জ. ১৯৭৮)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার তালদি রামকৃষ্ণ কলোনিতে জন্ম। কবিগানের গুরু অসীম সরকার।

লিয়াকত আলী (জ. ১৯৫৩)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা জমির আলী, মাতা নজুমা খাতুন। মূল পেশা টেক্সটাইল মিলের চাকরি, অবসরমতো কবিগান করেন।

লোকনাথ চক্রবর্তী (আ. ১৮৩০–১৮৯৫)। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার কাশীপুর গ্রামে জন্ম। প্রধানত কবিগানের দলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দলে দয়া ধুপী এবং অর্জুন ধুপী নামে দুই জন কবিয়াল কবিগান করতেন। উভয় কবিয়ালকে তিনি গান রচনা করে দিতেন। অকৃতদার লোকনাথ চক্রবর্তী বিজয়নারায়ণ আচার্যেরও গুরুস্থানীয় ছিলেন বলে জানা যায়।

লোকনাথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

লোচন কর্মকার (উনিশ শতকের মাঝামাঝি)। নেত্রকোনা জেলার আমতলা গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্যের অনেক পূর্ববর্তী। মালশি, সখীসংবাদ, মান, যোগী, সন্ন্যাস, গোষ্ঠ, প্রভাস, মিলন, বিজয়া, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি পর্যায়ের বহু গান রচনা করেছিলেন। তাঁর নামে প্রচলিত কিছু ছড়া ছাড়া এসব গানের কোনো নমুনা সংগৃহীত হয়নি।

শক্তিরাম কাপালি (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার কাশীপুর গ্রামে জন্ম।

শঙ্কর আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার দারোগা গ্রামে জন্ম।

শঙ্কর সরকার (একুশ শতক)। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানায় জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

শচীন্দ্রকুমার শীল (১৯১১–১৯৭৫)। কুমিল্লা জেলার সকদি গ্রামে জন্ম। পিতা চৈতন্য শীল কবিয়াল ছিলেন। শচীন্দ্র শীলের নিজস্ব রচনার সখীসংবাদ বা কবি না

থাকলেও এই জাতীয় গানের জবাব রচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বিপক্ষের কবিয়ালদের মধ্যে তারিণী সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শচীন্দ্রনাথ বর্মণ (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার মাদ্রাসাপাড়ায় জন্ম।

শম্ভু মালী (উনিশ-বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলায় জন্ম।

শম্ভুনাথ বৈদ্য (আ. ১৯১৫–আ. ১৯৬৫)। বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানার জোবাই গ্রামে জন্ম। বিশ্বেশ্বর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করতেন।

শরৎ বৈরাগী (উনিশ বিশ শতকের সন্ধি)। ঝালোকাঠিতে জন্ম। বৈষ্ণবীর সন্তান। ঝালোকাঠিতে রাঙা যামিনীর আদর্শ কবিপার্টিতে সরকার হিসেবে নিযুক্ত থেকে কবিগান পরিবেশন করতেন। রাঙা যামিনীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটার ফলে নতুন দল গঠন করেন। বরিশাল শহরের ছ-আনি জমিদার বাড়িতে নিয়মিত গান গাইতেন। বিপক্ষের কবিয়ালদের মধ্যে হরিচরণ আচার্য, কুঞ্জ দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শরৎ সরকার (জ. আ. ১৯২৫)। খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার কেটলা গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু কাইনমারীর গৌরপদ সরকার। ভাগার রসিকলাল সরকারের বিপক্ষে জোট বেঁধে কবিগান শুরু করেন।

শশধর সরকার (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার গঙ্গাচন্না গ্রামে জন্ম।

শশিভূষণ মুচি (বিশ শতক)। বীরভূম জেলার দুমকা গ্রামে জন্ম। শেখ গুমানী দেওয়ানের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

শশী দে (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার পিওর গ্রামে জন্ম।

শশীমুখী (উনিশ শতকের শেষভাগ)। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার কাকনান গ্রামের বাশিন্দা। কবিয়াল ঈশান সামন্তের কোল সরকার ছিলেন। মোহিনী দাসীর বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

শশী সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার ঘাগর বাজারে জন্ম। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কবিগানের আসরে আত্মপরিচয় প্রদান করার সময়ে বলতেন, "আমার মায়ের নাম রাশি, পিতা জগৎবাসী, আমি ঘাগরের শশী।" এতে অনেকে মনে করেন যে, তিনি গণিকার সন্তান ছিলেন। শশী সরকারের কবিগানের দলের ম্যানেজার ছিলেন অশ্বিনী সরকার। এই অশ্বিনী সরকারের দুই পুত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও কালীদাস সরকার কবিয়াল হন।

শশী সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কেলিশহর খীল্লাপাড়া গ্রামে জন্ম।

শান্তিরঞ্জন সেন (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার পানান গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু আফাজউদ্দিন। হেমন্ত সরকার, সুবল সরকার, ননী সরকার তাঁর খ্যাতিমান তিন শিষ্য।

শান্তি সরকার (বিশ-একুশ শতক)। খুলনা জেলার ফুলতলা থানার রাড়ুলি গ্রামে জন্ম। রসিকলাল সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

শামসুল আলম (জ. ১৯৫৪)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নিয়ামিশপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা আবদুর রহিম, মাতা মোস্তাফা খাতুন। অন্যতর পেশা ঘড়ি মেরামত।

শিবচন্দ্র (উনিশ শতক)। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের জমিদার। এর শখের কবির দল ছিলো। সাতু রায় ছিলেন এঁর দলের বাঁধনদার। সাতু রায় নিজে এই জমিদারের কর্মচারী ছিলেন। সাতু রায় ওরফে সাতকড়ি রায়ের গানের গুণগত মান এতো ভালো ছিলো যে, ভোলা ময়রাও তাঁর রচিত গান পরিবেশন করতেন।

শিবশঙ্কর পাল (১৯০৪–১৯৭৯)। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার চৌহাট্টা গ্রামে জন্ম। পিতা রাধারঞ্জন পাল, মাতা কিরণশশী পাল। কবিগানের গুরু কেনারাম মোদক। শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

শিবানন্দ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলায় জন্ম।

শিবানন্দ সরকার (জ. ১৯৫৮)। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় জন্ম। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সোধপুরে বাস করেন। অমূল্য সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

শিমুল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার আঁধারমানিক গ্রামে জন্ম।

শিশির নন্দী (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেউছিয়া গ্রামে জন্ম।

শুকচাঁদ সরকার (জ. ১৯৪৮)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার আড়ুয়াকান্দি গ্রামে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটের নিকটস্থ ঘোলা গ্রামে অভিবাসী। পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর সেন এবং মাতার নাম অমূল্যরানী সেন। নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কবিগানের প্রথম গুরু। পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নির্দেশে ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণ। সন্ধ্যা সরকারের বিপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারি প্রচার কার্যক্রমে কবিগান করেন।

শুকদেব সরকার (জ. আ. ১৯৫০)। নড়াইল জেলায় জন্ম। রসময় সরকারের শিষ্য।

শুভানন্দ সরকার (১৯৩৩–১৯৯৫)। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার রোঙ্গাকাঠি গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে রামায়ণ-গান গাইতেন। কবিগানের দোহারিও করতেন।

শেখ গুমানী দেওয়ান (১৮৯৫–১৯৭৬)। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদিঘি থানার জিনদিঘি গ্রামে জন্ম। পিতা মালিয়াত দেওয়ান, মাতা আসমানি ওরফে আরমানি বিবি। জনার্দন কর্মকার তাঁর কবিগানের গুরু। কবিগানকে যাঁরা বামপন্থি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ গুমানী দেওয়ান অন্যতম। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, কুশাসন, মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর গানের বিষয়বস্তু। জীবন উড়ে, আশুতোষ সাহা, শশিভূষণ মুচি, জীবনকৃষ্ণ উড়ে, কুচিল ডোম, বসন্তকুমার ধানুকি, দেবেন ডোম (দাস), লম্বোদর চক্রবর্তী, কমলাকান্ত মণ্ডল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। বাংলাদেশের রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, নকুলেশ্বর দত্ত, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'বাণীকণ্ঠ' অভিধায় ভূষিত করেন, সৈয়দ

মুজতবা আলী তাঁকে বিশেষিত করেন 'চারণসম্রাট' নামে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কবিগানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' খেতাব এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিবছর ২১শে ফাল্গুন কবির জন্মদিনে জিনদিঘি গ্রামে কবিয়াল মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ মোহাম্মদ (বিশ শতক)। চট্টগ্রামের কবিয়াল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মায়ানমারের রেঙ্গুন শহরে কবিগান করতেন।

শের আলী (বিশ শতক)। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিখ্যাত কবিয়াল। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার দেওহাটা গ্রামে জন্ম।

শৈলেন সরকার (বিশ শতক)। যশোর জেলায় জন্ম।

শ্যামসুন্দর তেওয়ারি (জ. ১৯১৭)। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর গ্রামে জন্ম। পিতা নরসিংহ প্রসাদ তেওয়ারি কবিগানের দলে বাঁধনদার ছিলেন। মাতার নাম রাজলক্ষ্মী দেবী। পিতাই তাঁর কবিগানের গুরু। খোদাবক্স, দেবেন চৌধুরী, চাঁদ মহম্মদ, গোপাল ব্যাধ (পাকড়ি), ইউসুফ আলী, কেদার সরকার (রাজশাহী), কার্তিকচন্দ্র পাল (বরিশাল), দেবেন্দ্রনাথ দাস, কিশোরী রায়, সৃষ্টিধর কোটাল, রমা বাগদি (বীরভূম), রমেশ শীল প্রমুখের বিপক্ষে গান করেছেন।

শ্যামল সরকার (জ. ১৯৬৪)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার হুড়কা গ্রামে জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। শ্যামল সরকার প্রথমে স্বরূপেন্দু সরকারের নিকটে কবিগান শেখেন, পরে অনাদিজ্ঞান সরকারকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (জ. ১৯৪৭)। বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘটি থানার শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। পিতা নন্দলাল ভট্টাচার্য, মাতা করুণাময়ী দেবী। কবিগানের গুরু মহাদেব পাল। মহাদেব পাল, নারায়ণচন্দ্র দাস, নিমাই মণ্ডল, মানিকচন্দ্র দাস প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

শ্যামাপদ সরকার (একুশ শতক)। বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানায় চরকাঠি গ্রামে সাহা পরিবারে জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

শ্রীনাথ দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বরিশাল জেলার কামারচিড়া গ্রামে জন্ম।

শ্রীনিবাস সরকার (জ. ১৯৩৭)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার কান্দি গ্রামে জন্ম। পিতা কাশীনাথ সরকার ওরফে ভাঙ্গা কাশী একজন কবিয়াল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সরকার খ্যাতিমান কবিয়াল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো প্রথম জীবনে তিনিও রামায়ণ গান পরিবেশন করতেন। ১৯৬৮ সালে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। সেখানে কলকাতার দমদমের নিকটবর্তী লক্ষ্মীনগরে স্থায়ীভাবে বাস করেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, নকুলেশ্বর সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমূল্য সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, রসিকলাল সরকার, নারায়ণ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, শুকদেব সরকার, কালাচাঁদ সরকার,

নিখিল সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন বাংলাভাষী অঞ্চলে তাঁর কবিগান পরিবেশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। তাঁর খ্যাতিমান শিষ্যদের মধ্যে হরলাল সরকার, সুরেশ রায়, ধীমান পাল, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবাস সরকার (১৯৫৪–২০০২)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপাড়া স্টেশনের নিকটে দেবীপুর গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু রসিকলাল সরকার। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান কবিয়াল ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীরাম দাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার ন্যায়মস্তি গ্রামে জন্ম।

ষষ্ঠীচরণ খরাতি (উনিশ-বিশ শতকের)। বরিশাল জেলার বানাড়িপাড়া থানার গাভা গ্রামে জন্ম। নাজিরপুর থানার বেতবাড়ি গ্রামের রূপচাঁদ সরকার তাঁর শিষ্য।

ষষ্ঠীচরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার দেবাসুর গ্রামে জন্ম।

ষষ্ঠীবর সরকার (উনিশ-বিশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার গোলাবাড়িয়া গ্রামে জন্ম।

সজল সরকার (জ. ১৯৭৪)। নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার হরিতলা কলোনিতে জন্ম। পিতার নাম যতীন্ত্রনাথ মিস্ত্রি। মাতার নাম রেণুবালা মিস্ত্রি। কবিগানের গুরু অসীম সরকার। অসীম সরকারের বিপক্ষে ভারতের বাংলাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশে এবং আরব আমিরাতে কবিগান পরিবেশনের অভিজ্ঞতা।

সঞ্জয় মল্লিক (জ. ১৯৬৪)। যশোর জেলার অভয়নগর থানার সুন্দলি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, মাতার নাম মন্দোদরী দেবী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস। যশোর জেলার মণিরামপুর থানার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের মুক্তেশ্বরী ডিগ্রি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। পিতা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক যাত্রাগানে, অষ্টক গানে ও কীর্তন গানে হারমোনিয়ম বাজাতেন, এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তিতে 'বালা' সেজেও গান গাইতেন। জ্যেঠতুতো ভাই দশরথ মল্লিক খুলনা বেতারের একজন নিয়মিত শিল্পী। নারায়ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। স্বরূপেন্দু সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নারায়ণ সরকার, নিখিল সরকার, কৃষ্ণ সরকার, ছোটো নিশিকান্ত সরকার, গোরাচাঁদ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, বিমল সরকার, শিব সরকার, ছোট সঞ্জয় মল্লিক, গৌর সরকার, প্রশান্ত সরকার, গৌতম সরকার শ্যামল সরকার, হরিবর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি সৎসঙ্গী ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী এবং একজন ঋত্বিক।

সঞ্জয় সরকার (বিশ-একুশ শতক)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার গজালিয়া গ্রামে জন্ম।

সঞ্জিত পাল (জ. আ. ১৯৬৫)। বাগেরহাট জেলার সদর থানার চাকশ্রী গ্রামে জন্ম। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবরা চোংদার মোড়ের নিকেট বসবাস করেন। অনাদিজ্ঞান সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

সতীশ সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার শাজানপুর গ্রামে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

সদানন্দ সরকার (জ. ১৯৬৫)। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার চক শৈলমারী গ্রামে জন্ম। পিতা বিরাজ সরকার, মাতা শ্যামেলা সরকার। কবিগানের গুরু নিখিল সরকার।

সনৎ পান (জ. ১৯৫৫)। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার শিওয়া গ্রামে জন্ম। পিতা ননীগোপাল পান, মাতা টুসুবালা। উচ্চমাধ্যমিক পাস। প্রথম জীবনে বোলান, ভাদু ইত্যাদি গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কবিগানের গুরু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী। চাঁদ মহম্মদ, কাশীকান্ত দেবনাথ, মধু ঘোষাল, শ্যাম তেওয়ারি, সুবল মাঝি, আফাজুদ্দিন, সনৎ বিশ্বাস, গৌতম হাজরা, হারাধন দে, নন্দ মাঝি প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেন।

সনৎ বিশ্বাস (জ. ১৯৫২)। বর্ধমান জেলার কেতুপুর থানার আমগড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা দুর্গাগতি বিশ্বাস, মাতা আশালতা বিশ্বাস। কবিগানে গুরু মধুসূদন ঘোষাল। চাঁদ মহম্মদ প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

সন্তোষকুমার দে (জ. ১৯৬২)। চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম। পিতা গৌরাঙ্গপ্রসাদ দে, মাতা গোলাপীরানী দে। কবিগানের গুরু চক্রপাণি ভট্টাচার্য এবং কল্পতরু ভট্টাচার্য।

সন্ধ্যা ঠাকুর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার চকরিয়া থানার কৈয়ারবিল অঞ্চলে জন্ম।

সন্ধ্যা সরকার (জ. ১৯৫৪)। বাগেরহাট জেলার সদর থানার বেড়গজালিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মণীন্দ্রনাথ হালদার, মাতার নাম সন্তোষকুমারী হালদার। পিতা মণীন্দ্রনাথ হালদার রামায়ণ ও কীর্তন গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাগেরহাট মহিলা কলেজে বিএ পড়ার সময়ে ১৯৭৬ সালে তিনি ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিগানের দলে যোগদান করেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকারই তাঁর কবিগানের গুরু। ১৯৮২ সালে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেখানে এবং ভারতের বাংলাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। কিছুকাল নদীয়া জেলার বড়োচাঁদঘর থেকে প্রকাশিত 'মতুয়া' পত্রিকার সহসম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতার 'বর্তমান', 'আনন্দবাজারপত্রিকা', 'সানন্দা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, নকুলেশ্বর সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, অমূল্য সরকার, নারায়ণ সরকার, অসীম সরকার, কালাচাঁদ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, তমাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। চিরকুমারী সন্ধ্যা সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান করছেন।

সফেসুদ্দিন (বিশ শতক)। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে জন্ম। তাঁর অন্যতম শিষ্য চরণ মণ্ডল। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর সফেসুদ্দিন বাংলাদেশে অভিবাসী হন।

সমীরণ সরকার (বিশ-একুশ শতক)। যশোর জেলার ইচলবাহা গ্রামে জন্ম।

সম্বিতী সরকার (জ. ১৯৬৩)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নিমতা গ্রামে জন্ম। পিতা খ্যাতিমান কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার। মাতার নাম সরযুবালা সরকার। পিতামহ কাশীনাথ সরকারও একজন কবিয়াল ছিলেন। কবিগানের গুরু রসিকলাল সরকার।

সরকার কমল দাশ (জ. ১৯৫৯)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে জন্ম। পিতা সুধাংশু দাস, মাতা রেণুবালা দাশ। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ভোলা, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগান করেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে কবিগান পরিবেশন করেন।

সরোজ সরকার (জ. আ. ১৯৫৫)। নড়াইল জেলার কালিয়া থানায় জন্ম। গদাই সাধু নামে পরিচিত।

সরোজিৎ সরকার (জ. ১৯৬২)। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার ঘোপেরখাল গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কিরণচন্দ্র বেপারী, মাতার নাম জয়ালক্ষ্মী বেপারী। কবিগানের গুরু স্বরূপেন্দু সরকার। মণিলাল সরকার, কালিপদ সরকার (শ্রীরামকাঠি), সঞ্জিত পাল, তিমির সরকার, নিখিল সরকার (তেতলা) প্রমুখের বিপক্ষে গান করেছেন।

সর্বানন্দ আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার সাধারচর গ্রামে জন্ম।

সর্বানন্দ পারিয়াল (উনিশ শতকের শেষ ভাগ)। হুগলি জেলার রাজহাটি-সেনহাটি গ্রামে জন্ম। মহিলা কবিয়াল মনোমোহিনী দাসী তাঁর শিষ্য ছিলেন।

সর্বেশ্বর আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম।

সহদেব সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

সাইফুল ইসলাম (একুশ শতক)। নড়াইলের জারিগায়ক।

সাতু রায় (১৭৯৩–১৮৬৬)। প্রকৃত নাম সাতকড়ি রায়। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ বৈঁচিগ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর রায়। প্রধানত বাঁধনদার ছিলেন, তবে কবিয়াল হিসেবেও তিনি ভোলা ময়রা, শিবচন্দ্র সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

সাধন আচার্য (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার পদুয়া গ্রামে জন্ম।

সাধন সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার কালিপুর গ্রামে জন্ম।

সাধু মিয়া সরকার (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার হাফানিয়া গ্রামে জন্ম।

সায়েদ আলী (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলার কবিয়াল।

সারদা বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রামে জন্ম। রমেশ শীলের সমসাময়িক।

সারদা ভাণ্ডারী (আঠারে-উনিশ শতক)। বীরভূম জেলার মল্লিকপুর গ্রামে জন্ম। কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক।

সারদা সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। লক্ষ্মীপুর জেলার দত্তপাড়া গ্রামে জন্ম।

সারোয়ার গায়েন। চুয়াডাঙা জেলার খাদিমপুর গ্রামে জন্ম।

সিদ্দিক তালুকদার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক।

সিদ্ধিশ্বর সরকার (জ. ১৯২৫)। পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার বাইশহাড়ি গ্রামে জন্ম, পরে মঠবাড়িয়া থানার ঠুটাখালী গ্রামে বসবাস। দ্বিজবর সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

সিদ্ধিশ্বর সরকার, ছোটো (জ. ১৯৫৩)। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেয়ারা গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু উমা সরকার।

সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (উনিশ শতক)। কলকাতা অঞ্চলের খ্যাতিমান কবিয়াল। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান করতেন। তাঁর নিজের কোনো দল ছিলো না। 'পাটনী' দলের সরকার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর কবিত্বশক্তি ও সৃজনশীলতা ছিলো অসাধারণ।

সুকুমার সরকার (একুশ শতক)। খুলনা জেলায় জন্ম। কবিগানের গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

সুজনবন্ধু ভট্টাচার্য (জ. ১৯৫১)। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানায় জন্ম। পিতা রোহিণীরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাতা লবঙ্গলতা দেবী। কবিগানের গুরু কল্পতরু ভট্টাচার্য, চক্রপাণি ভট্টাচার্য এবং মোহাম্মদ ইউসুফ। কৃষিবিভাগে চাকরি করার ফাঁকে ফাঁকে প্রচারণামূলক কবিগান করেন।

সুধন সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বেথুর গ্রামে জন্ম। প্রধানত বিচার গায়ক।

সুনীলকান্তি দাশ (জ. ১৯৩৮)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় জন্ম। পিতা হরিশচন্দ্র দাশ, মাতা যশোদাবালা দাশ। নিরঞ্জন দাশ ও এয়াকুব আলীর কবিগান শুনে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইয়াকুব আলী তাঁর কবিগানের গুরু। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন আসরে কবিগান পরিবেশন করেছেন।

সুবলচন্দ্র কোনাই (জ. ১৯৪০)। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার আদিত্যপুর গ্রামে জন্ম। পিতা অমূল্যরতন কোনাই, মাতা দাসীবালা কোনাই। শ্বশুর কিশোরীমোহন কোনাই একজন কবিয়াল। কিশোরীমোহনই তাঁর কবিগানের গুরু। শিবশঙ্কর পাল, চাঁদ মহম্মদ, মদনমোহন রায়, যশোদানন্দন রায়, কাশীকান্ত দেবনাথ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

সুবলচন্দ্র মাঝি (জ. ১৯৪৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার মোক্তারপুর গ্রামে জন্ম। পিতা বিষ্ণুপদ মাঝি, মাতা যশোদা মাঝি। প্রথম জীবনে ঝাপান গান গাইতেন।

জ্যেষ্ঠতাত অনুকূলচন্দ্র মাঝির নিকটে কবিগানের হাতেখড়ি হলেও কিশোরীমোহন রায় এবং শ্যাম তেওয়ারির নিকটেও কবিগান শেখেন।

সুবল চন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার বিন্নাফৈর গ্রামে জন্ম। অন্যতম শিষ্য ফরিদপুরের গৌরাঙ্গ সরকার ও টাঙ্গাইলের রসুল আলী।

সুবল নট্ট (উনিশ-বিশ শতক)। নোয়াখালী জেলার সুলতানপুর গ্রামে জন্ম। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগান করতেন।

সুবল শীল (জ. ১৯৬৩)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার কঞ্চুরী গ্রামে জন্ম। পিতা যুধিষ্ঠির শীল, মাতা ব্রজবালা শীল। জ্যেষ্ঠ ভগিনী খুকীরানী শীল এবং ভগিনীপতি মানিক শীল খ্যাতিমান কবিয়াল। কবিগানের গুরু মানিক শীল।

সুবল সরকার (বিশ শতক)। পিতার নাম ভক্ত সরকার। টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানার বালিআটা রতনপুর গ্রামে জন্ম। কবিগানের পাশাপাশি ওকালতি করেন।

সুবল সরকার, ডাঃ (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেউছিয়া গ্রামে জন্ম।

সুভাষচন্দ্র ঘোষ (জ. ১৯৪৫)। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার পাণ্ডুগ্রাম গ্রামে জন্ম। পিতা নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, মাতা বিমল দেবী। দিলীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিগানের গুরু। দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বিশ্বাস, সনৎ পান, মধুসূদন ঘোষাল, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

সুভাষচন্দ্র সরকার (জ. ১৯৭১)। পিরোজপুর জেলায় জন্ম। পিতার নাম রণজিৎ কুমার সরকার। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। টপ্পা গান রচনায় ও ধুয়া গান রচনায় বিশেষ পারদর্শী।

সুমন্ত সরকার (জ. ১৯৮১)। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার চাঁদকাঠি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সুমন্ত মণ্ডল। মাতার নাম সরযু মণ্ডল। কবিগানের গুরু মণিলাল সরকার। প্রথমে গুরুর দলে দোহার ছিলেন। মণিলাল সরকার, তিমির সরকার, সুভাষ সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

সুরঞ্জন সরকার (জ. আ. ১৯৬০)। খুলনা জেলার দাকোপ থানার চুনকুড়ি গ্রামে খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম। খ্রিস্টান মিশনারিতে চাকরি করেন। কবিগানের গুরু স্বরূপেন্দু সরকার।

সুরথ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নোয়াখালী জেলার দত্তপাড়া গ্রামে জন্ম।

সুরেন্দ্রনাথ পুরোহিত (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার উনসত্তর পাড়ায় জন্ম।

সুরেন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯২৫)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার কান্দি গ্রামে জন্ম। পিতা কাশীনাথ সরকার ওরফে ভাঙ্গা কাশী একজন কবিয়াল ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস সরকারও একজন কবিয়াল। দেশভাগের পরে বাঁকুড়া জেলার বাসুদেবপুরের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে সুবল সরকার ও বৃন্দাবন সরকারের কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল পরে নকুলেশ্বর সরকারের নিকটে যান এবং তাঁকে গুরু মনোনীত করেন। ১৯৫০-এর দশকে

কবিগানের দল গঠন করেন এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কবিগান গাইতে থাকেন। বাংলাদেশে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গে কিছুকাল জোট গঠন করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর 'লোকরঞ্জন কবিপার্টি' পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র এবং আকাশবাণী কলকাতা থেকে তাঁর পরিবেশিত কবিগান প্রচারিত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে ইউনেস্কো আয়োজিত সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠানে তাঁর নেতৃত্বে মোট চার জন কবিয়াল অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছাড়া বাকি তিন জন ছিলেন নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার এবং মনোরঞ্জন সরকার। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবগুলো জেলা, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এমনকি আন্দামান-নিকোবরের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় তিনি সমকালের খ্যাতিমান কবিয়ালদের বিপক্ষে কবিগান করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি 'বঙ্গীয় লোককবি সংস্থা' নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। স্ত্রীর নাম সরযূবালা সরকার। তাঁর কন্যা সম্বিতী সরকার একজন কবিয়াল।

সুরেশচন্দ্র সরকার (জ. ১৯৫০)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার ভাউধর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মনীন্দ্রনাথ সরকার, মাতার নাম মেনকা রানী সরকার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মাধ্যমিক পাস। কবিগানের গুরু রবীন্দ্রনাথ সরকার।

সুরেশ বড়ুয়া (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহিরা গ্রামে জন্ম।

সুরেশ রায় (জ. আ. ১৯৭১)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার দক্ষিণপাড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সতীয় রায়। মাতার নাম রত্না রায়। গুরু নিত্যানন্দ সরকার।

সুশীল কুমার সরকার (জ. ১৯৫২)। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার কারফা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সূর্যকুমার বৈদ্য, মাতার নাম বাতাসি বৈদ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিএ পাস। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিগানের দল গঠন করেন। কবিগানে তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথ সরকার।

সুশীল সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার আঁধারমানিক গ্রামে জন্ম।

সূর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী (উনিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলার চন্দনকান্দি গ্রামে জন্ম। প্রধানত বাঁধনদার এবং কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী (বিশ শতক)। খুলনা জেলার ফুলতলা থানার দেবীপুর গ্রামে জন্ম।

সৃষ্টিধর কোটাল (১৮৮৪–১৯৫৬)। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার শিশুয়া গ্রামে নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। পারিবারিক পদবি প্রধান। পূর্ণচন্দ্র সরকারের নিকটে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ। সুদর্শন মণ্ডল, হরিনারায়ণ প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন।

সৃষ্টিধর ঠাকুর (আ. ১৭৮০–১৮৭০)। ছিরু ঠাকুর নামেও পরিচিত। বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী কাঁকুটিয়া গ্রামে বৈদ্য পরিবারে জন্ম। বলহরি রায় তাঁর কবিগানের গুরু। কৈলাসচন্দ্র ঘটক, নিতাই দাস প্রমুখ কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেন।

সেখ আফাজুদ্দিন আহমেদ (জ. ১৯৩৯)। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার ফিরোজপুর গ্রামে জন্ম। পিতা সেখ আইনুদ্দিন গুনাই যাত্রার মাস্টার ছিলেন, ভাসান গানও করতেন। মাতার নাম খঞ্জন বেওয়া। কবিগানের গুরু জেকের উদ্দিন। সুরেন্দ্রনাথ সরকার, চাঁদ মহম্মদ, কাশীকান্ত দেবনাথ, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ দাস, যশোদা রায় প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

স্বপনকুমার দে (জ. ১৯৫০)। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে জন্ম। পিতা রেবতীমোহন দে, মাতা শিশুবালা দে। কবিগানের গুরু রাইগোপাল দাস।

স্বপন সরকার (জ. ১৯৬৫)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার তাড়াশি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বুদ্ধিমন্ত পাণ্ডে। মাতার নাম মলিনা পাণ্ডে। দুই মাতুল ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং কালীদাস সরকার খ্যাতিমান কবিয়াল। মাসতুতো ভাই মণিলাল সরকারও একজন কবিয়াল। কবিগানের গুরু নিখিল সরকার।

স্বরূপেন্দু সরকার (১৯৩৩–২০০৯)। বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার চরবানিয়ারি গ্রামে ১৯৩৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত সরকার ওরফে কেষ্ট গোঁসাই, মাতার নাম বিনোদিনী দেবী। কৃষ্ণকান্তের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল অশ্বিনী সরকার। স্বরূপেন্দু সরকারের কবিগানের গুরু নিশিকান্ত সরকার। ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আসরগুলোতে খ্যাতিমান কবিয়ালদের বিপক্ষে কবিগান পরিবেশন করেন। তাঁর রচিত ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি, ও ধুয়া পর্যায়ের অনেক গান রয়েছে। তাঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ কবিয়ালগণও এইসব গান ব্যবহার করে থাকেন। 'ভাটির নাইয়া' নামে তাঁর ধুয়া গানের একটি সংকলন ১৯৬৫ সালে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়, ২০০৪ সালে এর পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় রাজশাহী থেকে। বিখ্যাত মতুয়া শশী বানিয়ার নিকট মতুয়া ধর্মাদর্শে দীক্ষিত এবং এই ধর্মাদর্শের অন্যতম প্রচারক। তিনি মতুয়া আদর্শের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। এগুলো হলো: 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঁচালী' (১৯৬৫), 'ঠাকুর এলো মোদের ঘরে' (১৯৬৬), 'মহালক্ষ্মী শান্তিদেবীর পাঁচালী' (১৯৯৮), 'পতিতপাবন গুরুচাঁদ' (২০০০), 'সমাজসংস্কারে মতুয়া' (২০০১), 'ছোটদের ধর্মগ্রন্থ' (২০০২), 'পাগল হরিভজন' (২০০৩), 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকথা' (২০০৬), এবং 'পতিতের বান্ধব' (২০১০) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। গুরুর মতোই টপ্পা-পাঁচালিতে তিনি সমকালের কবিয়ালদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রমিত ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুলেশ্বর সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, রসময় সরকার, ছোটো রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীদাস সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গৌর সরকার, নারায়ণচন্দ্র বালা, কালোশশী চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সরকার, অমূল্য সরকার, সরোজ সরকার, নন্দলাল সরকার, দ্বিজবর সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার, সন্ধ্যা সরকার, মণিলাল

সরকার প্রমুখের বিপরীতে কবিগান করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অমূল্য সরকার, কৃষ্ণকান্ত সরকার, নিখিলচন্দ্র সরকার, সুরঞ্জন সরকার, হরিবর সরকার, হরিদাস সরকার, তিমির সরকার প্রমুখ অন্যতম। ১৯৭৯ সালে বাগেরহাটের রাজাপুর গ্রামের মতুয়া সম্মেলনে তাঁকে 'কবিসিন্ধু' এবং ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরেন্দ্র স্মৃতি সংসদ থেকে তাঁকে 'কবিসুরশ্রী', এবং ২০০৮ সালে ঢাকার মতুয়া সম্মেলনে তাঁকে 'মতুয়ারত্ন' উপাধি প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালের ১৯শে মে রাজশাহীতে তিনি পরলোকগমন করেন।

হযরত আলী (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার বাগুটিয়া গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক।

হরকুমার শীল (উনিশ-বিশ শতক)। কুমিল্লা জেলার হোসেনপুর গ্রামে জন্ম। মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতি গান রচনা না করেও টপ্পা ও পাঁচালিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিশেষত ছড়াকাটায় তাঁর সমকক্ষ কবিয়াল বিরল ছিলেন। হরিচরণ আচার্য, তারিণী সরকার, দেবেন্দ্র শীল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন।

হরগোবিন্দ সরকার (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানায় জন্ম।

হরচন্দ্র আচার্য (উনিশ-বিশ শতক)। ময়মনসিংহ জেলার বাহাদিয়া গ্রামে জন্ম। অল্প বয়সেই কবিয়াল হিসেবে নাম করেন। কিন্তু অকালে মারা যান।

হরপ্রসাদ চক্রবর্তী (জ. ১৯৩৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার খানসামাডাঙা গ্রামে জন্ম। পিতা রমারঞ্জন চক্রবর্তী। ১৯৫৫ সালে বীরভূম জেলার আধ্যাত্মিক সাধক পীর শাহ মহম্মদ আবদুল জব্বার আল চিশতি আল নিজামির নিকটে এলমে মারিফতের দীক্ষা নেন। এর কিছু কাল পরে মানিকডিহি গ্রামের হরিদাস গোস্বামীর উপদেশ অনুযায়ী কবিগান গাইতে শুরু করেন। তিনি বেশ কিছু ইসলামি বঁদ গান রচনা করেন।

হরবিলাস সরকার (জ. ১৯৫৩)। খুলনা জেলার রামপাল থানায় জন্ম। বর্তমানে উড়িষ্যা প্রদেশের অমরকোট জেলার ১৮ নং কারাগাঁয় বসবাস করেন এবং ঐ অঞ্চলে কবিগান করেন। রসিকলাল সরকার তাঁর কবিগানের গুরু।

হরলাল সরকার (বিশ শতক)। বরিশাল জেলায় জন্ম। পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী।

হরষিত ভট্টাচার্য (১৯১৫–১৯৬৯)। গোপালগঞ্জ জেলার ডালিনা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম জনার্দন ভট্টাচার্য, মাতার নাম বিনোদিনী দেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও একজন কবিয়াল। কবিগানের গুরু রাজেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৪০ সালের দিকে কবিগানের দল গঠন করেন। দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী এবং সেখানে কবিগান করেন।

হরি কাপালি (বিশ শতক)। ভোলা জেলায় জন্ম।

হরিকৃষ্ট ঠাকুর (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার নলুয়া গ্রামে জন্ম।

হরিচরণ আচার্য (১৮৬১–১৯৪১)। নরসিংদী জেলা সদরে জন্ম। পিতা বিষ্ণুমোহন আচার্য এবং মাতা বিষ্ণুশশীপ্রিয়া দেবী। প্রথম জীবনে রামায়ণ গাইতেন। কবিগানের গুরু রামকানাই আচার্য। প্রথম কবিগান করেন পারুলিয়ার জয়হরি

সরকারের বিপক্ষে। তিনি যাঁদের বিপক্ষে গান করেছেন, তাঁদের মধ্যে তারকচন্দ্র সরকার, চণ্ডী ঠাকুর, কানাই মালী, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, তারিণীচরণ সরকার, দেবেন্দ্র সরকার, পঞ্চানন আচার্য, রামাকানাই আচার্য, নীলমণি চক্রবর্তী, জয়কৃষ্ণ গোপ, মহিম নন্দী, হরকুমার শীল, জগবন্ধু দত্ত, রামচন্দ্র মাস্টার, ভগবান আচার্য, অর্জুন দেবনাথ, কালীকুমার দে, কাশীনাথ নট্ট, তারিণীচরণ নট্ট, ভগবতী সরকার, ঈশ্বর বালা, হরিচরণ সরকার, উমেশ সরকার, শরৎ বৈরাগী, কুঞ্জ দত্ত, নকুলেশ্বর সরকার, হরিহর আচার্য, বিজয়নারায়ণ আচার্য, হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, মহিম সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন প্রহ্লাদ সরকার, দ্বারিকা সরকার, অম্বিকা পাটনী, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সর্বানন্দ আচার্য, মধুসূদন সাহা, তারিণীচরণ সরকার, অর্জুন দেবনাথ, কালীকুমার মাস্টার (দে), বৈষ্ণবচরণ দাস, রমেশচন্দ্র আচার্য, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুলেশ্বর সরকার প্রমুখ। তাঁর কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়া গ্রামের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 'কবিগুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। হরিচরণের সমকালে পূর্ববঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি ঘরানার নাম ছিলো 'মা-দাদা' সম্প্রদায়। কুমিল্লা জেলার ত্রিশ গ্রামের বসন্ত সাধু এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কবিগানের দল গঠন করার পরে হরিচরণ আচার্য এই ধর্মাদর্শে দীক্ষিত হন। 'কবির ঝঙ্কার' (১৯২৯), 'অমিয় লহরী' (১৯৩১), 'বঙ্গের কবির লড়াই' (১৯৩১), 'শ্রীশ্রীবসন্তলীলামৃত', 'নবদ্বীপসুধা', 'নদীয়ামঙ্গল' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম।

হরিচরণ দে (জ. ১৮৮৫)। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার পোড়াডাঙা গ্রামে (চৌরিগাছা স্টেশনের নিকটে) জন্ম। তাঁর অন্য দুই ভ্রাতা হরিনারায়ণ দে ও হরিমাখন দে-ও কবিয়াল ছিলেন।

হরিচরণ নাথ (১৮৮৭–১৯৭৮)। বরিশাল জেলার হিজলতলা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নদীয়ারাম নাথ। প্রথম জীবনে ভুঁইয়াসারি গানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঁচালি বলার ক্ষমতা অর্জন করেন। পরে শরৎ বৈরাগীর নিকটে এবং আরো পরে কুঞ্জ দত্তের নিকটে কবিগান শেখেন। এক পর্যায়ে বড়ো মনোমোহিনীর দলে সরকার হিসেবে যোগদান করেন। কুঞ্জ দত্তের হারমোনিয়মবাদক যামিনীকান্দ নন্দী আলাদা কবির দল গঠন করলে, সেই দলের সরকার হিসেবেও হরিচরণ কাজ করেন। তিনি নানা ধরনের সখীসংবাদ ও কবি রচনা করে সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'মন্বন্তরের কবি' এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন এবং নদীয়া জেলার চাকদহে বসবাস শুরু করেন।

হরিচরণ সরকার (বিশ শতকের মাঝামাঝি)। মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার চর গোয়ালদা গ্রামে জন্ম। তাঁর অন্যতম শিষ্য ঝিনাইদহ জেলার টিকারবিলা গ্রামের গৌরপদ সরকার।

হরিচরণ সরকার (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ফরিদপুর জেলার কুমোরিয়ার নিকটবর্তী লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্ম।

হরিদাস সরকার (জ. আ. ১৯৫০)। বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার কালেখাঁরবেড় গ্রামে জন্ম। কবিগানের গুরু বিজয়কৃষ্ণ সরকার। স্বরূপেন্দু সরকারের নিকটেও কবিগানের তালিম নেন।

হরিনারায়ণ দে (১৮৭৭–আ. ১৯৫৭)। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার পোড়াডাঙা গ্রামে (চৌরিগাছা স্টেশনের নিকটে) জন্ম। তাঁর অন্য দুই ভ্রাতা হরিমাখন দে ও হরিচরণ দে-ও কবিয়াল ছিলেন।

হরিপদ দেয়ারী (জ. ১৯৫২)। চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানার উত্তর কাট্টলী গ্রামে জন্ম। পিতা তরণীসেন দেয়ারী, এবং অগ্রজ অখিলচন্দ্র দেয়ারী কবিয়াল। মাতার নাম মানদাবালা দেবী। পেশাগত জীবনে একজন পল্লিচিকিৎসক। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে গান করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও তিনি ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় এবং দিল্লিতে কবিগান পরিবেশন করেছেন। ১৯৯১ সালে আগরতলার রবীন্দ্রভবনে কবিগান পরিবেশন করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রশংসা পান। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের 'তথ্যসংস্কৃতি' নামক কবিয়াল-সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হরিপদ সরকার (উনিশ শতক)। পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল।

হরিপদ সাহা (বিশ শতক)। নরসিংদী শহরে জন্ম। প্রধানত বাঁধনদার।

হরি পাটনী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। সিলেট জেলায় জন্ম।

হরিবর সরকার, বড়ো (১৮৬৯–১৯৫১)। গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আনন্দ সরকার। তিনিও একজন কবিয়াল ছিলেন। মতুয়াচার্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হরিচরণ আচার্যের বিপরীতে গান করেছেন। তারকচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন' গ্রন্থে হরিবর সরকারের কয়েকটি গান মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া তারকচন্দ্র সরকারের অন্যতম কীর্তি 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'দ্বাদশ আজ্ঞা', 'অষ্টাধিক শতনাম', এবং 'মহাবারুণী' তাঁর লেখা তিনটি বইয়ের নাম। তারকচন্দ্র সরকার, হরিচরণ আচার্য, নদীয়ারচাঁদ সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। হরিবর সরকারের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর ভাগিনেয় রাজেন্দ্রনাথ সরকার অন্যতম।

হরিবর সরকার, ছোটো (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। বাগেরহাট জেলার মংলা থানার বুড়িরডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। তাঁর পুত্র দিগেন্দ্রনাথ সরকার বিশ শতকের শেষার্ধের একজন খ্যাতিমান কবিয়াল।

হরিবর সরকার (জ. ১৯৬৭)। সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার মেশারডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম নন্দীরাম সরকার, মাতার নাম বিমলাদেবী সরকার। পিতৃদত্ত নাম

হরিশ, কবিগান গাইতে শুরু করলে বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর নতুন নাম দেন হরিবর। প্রথমে রসিকলাল সরকার এবং পরে স্বরূপেন্দু সরকারের নিকটে কবিগান শেখেন। মানস বৈরাগী, মহাদেব সরকার প্রমুখের বিপক্ষে গান করেন। রামায়ণ গানও পরিবেশন করে থাকেন।

হরিভজন মিশ্র (বিশ শতক)। বাগেরহাট জেলার সদর থানার ভোজপাতিয়া গ্রামে জন্ম।

হরিমাখন দে (জ. ১৮৮১)। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার পোড়াডাঙা গ্রামে (চৌরিগাছা স্টেশনের নিকটে) জন্ম। তাঁর অন্য দুই ভ্রাতা হরিনারায়ণ দে ও হরিচরণ দে-ও কবিয়াল ছিলেন। প্রথম জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিনারায়ণ দে-র দলে দোহারি করতেন। শ্যামা বিষয়ক গানে তাঁর বেশ যশ ছিলো।

হরিমোহন আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। ঢাকা জেলায় জন্ম।

হরিমোহন আচার্য (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার বাজাপ্তি গ্রামে জন্ম।

হরিমোহন পাল (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার বাগুটিয়া গ্রামে জন্ম। বাঁধনদার।

হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী, মাস্টার (উনিশ শতকের মাঝামাঝি)। কিশোরগঞ্জ জেলার বিরুনিয়া গ্রামে জন্ম। কিশোরগঞ্জের ধলা জমিদারবাড়ি ও বাজিতপুর এবং নরসিংদীর রূপগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে গান করেন।

হরিহর আচার্য (উনিশ-বিশ শতক)। কিশোরগঞ্জ জেলার রণভাওয়াল বিরুনিয়া গ্রামে জন্ম।

হরু ঠাকুর (১৭৩৮–১৮২৪)। কলকাতার শিমুলিয়ায় জন্ম। পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ি (দীর্ঘাঙ্গী)। পিতা কালীচন্দ্র দীঘাড়ি ছিলেন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে হরু ঠাকুরই সর্বপ্রথম কবিগানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। হরু ঠাকুরের গুরু ছিলেন রঘুনাথ দাস। অল্প বয়স থেকেই হরু ঠাকুর রঘুনাথের কবিগানের দলে জিল দিতেন। নিজে আলাদা কবির দল গঠন করার পূর্বে হরু তাঁর গুরুর দলে দোহারি করতেন। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ছিলেন হরু ঠাকুরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বর্ধমান রাজসভা এবং কৃষ্ণনগর রাজসভায় তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিলো। হরু ঠাকুরের সখীসংবাদ ও বিরহ পর্যায়ের ৪৫টি গান সংগ্রহ করে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। ভোলা ময়রা ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য। ১৮২৪ সালের ৬ই আগস্ট মৃত্যু।

হরেকৃষ্ণ নাথ (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার ঘাটাইল গ্রামে জন্ম।

হরেন্দ্র আচার্য (বিশ শতক)। নেত্রকোনা জেলায় জন্ম।

হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নরসিংদী জেলার পলাশ থানার পারুলিয়া গ্রামে জন্ম। হরিচরণ আচার্য তাঁর কবিগানের গুরু। তাঁর অন্যতম শিষ্য কলাপাতুয়া গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

হরেন্দ্র সরকার (বিশ শতক)। মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম।

হাকিমচাঁদ বয়াতি (উনিশ শতক)। মাগুরা জেলার শালিখা থানার বাটাজোউড় গ্রামে জন্ম। ঈদু বিশ্বাস প্রমুখের বিপক্ষে জারিগান গাইতেন। তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন।

হারাইল বিশ্বাস (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। নেত্রকোনা জেলার চাইরগাতিয়া গ্রামে জন্ম। কবিগান ছাড়াও ঘাঁটুগান ও বাউলগান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

হিরণ্ময় মালাকার (জ. ১৯৭৪)। খুলনা জেলার রূপসা থানার শিয়ালী গ্রামে জন্ম। পিতা চিত্তরঞ্জন মালাকার। মাতা মমতা মালাকার। গুরু কৃষ্ণকান্ত সরকার।

হীরালাল সরকার (বিশ শতক)। রাজবাড়ি জেলায় জন্ম।

হেদায়েত ইসলাম খান (বিশ শতক)। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কাজীপাড়ায় জন্ম। রমেশ শীলের সঙ্গে একত্রে কবিয়ালদের সমিতি গঠন করেছিলেন।

হেমকুমার দত্ত (বিশ শতকের প্রথমার্ধ)। কুমিল্লা জেলার চালতাতলী গ্রামে জন্ম।

হেমন্ত সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইলের কবিয়াল।

হেলাল সরকার (বিশ শতক)। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার ভারই গ্রামে জন্ম। বিচার গায়ক। সুনীল, তোরাপ প্রমুখের বিপক্ষে বিচার গান পরিবেশন করেন।

হোসেন গায়েন। চুয়াডাঙা জেলার খাদিমপুর গ্রামে জন্ম।

হোসেন শেখ (উনিশ শতক)। মুরশিদাবাদ জেলায় জন্ম। মুরশিদাবাদ জেলার কোনো এক আসরে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি তাঁর বিপক্ষে গান করেছিলেন। হোসেন শেখ প্রথম দিকে কিছুকাল কবিগান করলেও অচিরেই তিনি তাঁর দলকে তরজার দলে পরিণত করেন। অনেকে তাঁকে তরজা গানের জনক মনে করেন। হোসেন শেখের নামের শেষ অংশ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে হোসেন শেখ হিসেবে উল্লেখ করলেও কেউ কেউ তাঁকে হোসেন খাঁ, এবং কেউ কেউ তাঁকে হোসেন মির্জা নামেও উল্লেখ করেন।

প্রমাণপঞ্জি

সাক্ষাৎকার

অমল মণ্ডল। দোহার। ভাটবিলা, অভয়নগর, যশোর। সুন্দলি : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

অশোক মণ্ডল। দোহার। টিকারবিলা, মাগুরা। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

অসীম সরকার। কবিয়াল। নয়া গোপালগঞ্জ, বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা। ঢাকা: ২৮ জুন ২০০৮।

অসীমচন্দ্র সরকার। কবিয়াল বিনয় সরকারের পুত্র। সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। সাতপাড়: ২১ ডিসেম্বর ২০০৭।

আশুতোষ বাছাড়। দোহার। বলটি, রূপসা, খুলনা। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

ইদ্রিস আলী বয়াতি। জারিগায়ক। কচুরিয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট। কালীগঞ্জ, ২০ মে ২০১০।

উমা সরকার। কবিয়াল। মুক্তিপাড়া, বামুনগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা। মুক্তিপাড়া: ২৬ মে ২০০৮।

কার্তিক পাগল। আয়োজক। রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম, সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। সাতপাড়: ২১ ডিসেম্বর ২০০৭।

কৃষ্ণকান্ত সরকার। কবিয়াল। ভূজনিয়া, তেরখাদা, খুলনা। চরবানিয়ারি: ২০ মে ২০১০।

গৌতম সরকার। কবিয়াল। হুড়কা, রামপাল, বাগেরহাট। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

গৌরাঙ্গ সরকার। কবিয়াল। কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর। নারিকেলবাড়ি (পিরোজপুর): ৮ অক্টোবর ২০০৮।

দীপঙ্কর মজুমদার। অশোকনগর, চিতলমারী, বাগেরহাট। পিঁপড়ারডাঙ্গা: ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

দীপ্তিশ্বর সরকার। শিক্ষার্থী কবিয়াল। ডোবা, রূপসা, খুলনা। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

নরোত্তম বাড়ই। শিক্ষার্থী কবিয়াল। কনেরভিটা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

নারায়ণ সরকার। কবিয়াল। ঠাকুরনগর, গাইহাটা, চব্বিশ পরগনা। গোবিন্দপুর, যশোর: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

নির্মলকান্তি হীরা। কবিয়াল। চরবানিয়ারি, চিতলমারী, বাগেরহাট। পিঁপড়ারডাঙ্গা: ১০ অক্টোবর ২০০৮।

নিশিকান্ত সরকার। কবিয়াল। আটটাকি, ফকিরহাট, বাগেরহাট। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

ভুবন মণ্ডল। বেহালাবাদক। সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

মণিশঙ্কর সরকার। কবিয়াল। ঝড়ভাঙ্গা, বটিয়াঘাটা, খুলনা। সাতপাড় (গোপালগঞ্জ): ২১ ডিসেম্বর ২০০৭।

রঞ্জিত মজুমদার। হারমোনিয়ম বাদক। মুক্তিপাড়া, বামুনগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা। নিমতা: ২৬ মে ২০০৮।

রবীন্দ্রনাথ সরকার। কবিয়াল। লালচন্দ্রপুর, ফকিরহাট, বাগেরহাট। সাতপাড় (গোপালগঞ্জ): ২১ ডিসেম্বর ২০০৭।

রুদ্র বাগচী। কাঁসিদার। সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

লতা চৌধুরী সরকার। কবিয়াল। নিজড়া, গোপালগঞ্জ। চরবানিয়ারি: ২০ মে ২০১০।

শঙ্কর বাগচী। দোহার। সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

শঙ্কর সরকার। কবিয়াল। মোল্লাহাট, বাগেরহাট। চরবানিয়ারি: ২০ মে ২০১০।

শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস। ঢুলি। গরিবপুর, চিতলমারী, বাগেরহাট। খাশেরহাট বাজার, চিতলমারী: ১৫ মে ২০১০।

শিশির মিস্ত্রি। দোহার। কাঁঠালিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর। কাঁঠালিয়া: ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭।

শ্যামল মজুমদার। দোহার। নিজড়া, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

সজল সরকার। কবিয়াল। হরিতলা কলোনি, রানাঘাট, নদীয়া। ঢাকা: ২৮ জুন ২০০৮।

সঞ্জয় মল্লিক। কবিয়াল। সুন্দলি, অভয়নগর, যশোর। সুন্দলি: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

সন্ধ্যা সরকার। কবিয়াল। বেড়গজালিয়া, বাগেরহাট। বাগেরহাট: ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭।

সম্বিতী সরকার। কবিয়াল। নিমতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা। নিমতা: ২৬ মে ২০০৮।

সরোজিৎ সরকার। কবিয়াল। ঘোপেরখাল, নাজিরপুর, পিরোজপুর। ঘোপেরখাল: ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭।

সুমন্ত মণ্ডল। কবিয়াল। চাঁদকাঠি, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর। নারিকেলবাড়ি (পিরোজপুর): ৮ অক্টোবর ২০০৮।

সুরেন্দ্রনাথ সরকার। কবিয়াল। পাইকপাড়া রোড, নিমতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা। নিমতা: ২৬ মে ২০০৮।
সুশীল ঘরামী। হারমোনিয়ম বাদক। বাগান উত্তরপাড়, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।
সুষেণ রায়। ঢুলি। গান্ধিয়াসুর, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।
স্বপন সরকার। কবিয়াল। তাড়াশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। কদমবাড়ি (মাদারীপুর): ২০ জানুয়ারি ২০০৮।
স্বরূপেন্দু সরকার। কবিয়াল। চরবানিয়ারি, চিতলমারী, বাগেরহাট। রাজশাহী: জানুয়ারি ২০০১–মে ২০০৯।

পত্র-পত্রিকা

অনির্বাণ, ১৯৭৯।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৩৯, ১৯৭৮, ১৯৮৪।
উৎসবভূমি, মার্চ-মে ২০০২।
কালান্তর, ১৯৮৪।
গৃহস্থ, ১৯১৩।
জন্মভূমি, ১৯৮৬।
দীপক, ১৯৮৩।
দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১৯৭৮–১৯৮০।
ধানসিড়ি নদী, ১৯৭৯।
নন্দন, ১৯৯৩।
নব্যভারত, ১৯০৪-৭।
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৯৫।
ভারতবর্ষ, ১৯১৪, ১৯৫৯, ১৯৬৪।
ময়মনসিংহবাসী, ১৯৩৭।
মাসিক বসুমতী, ১৯২৯, ১৯৫৮, ১৯৫৯।
মাসিক সরগম, ২০০৬।
রাজেন্দ্রমেলা, ১৯৭৯।
লেখা, ১৯৯৪-৯৫।
লোককবি বিজয় সরকার স্মারকপত্র, ২০০৫–১০।
লোকশ্রুতি, ১৯৮৯, ১৯৯০।
লৌকিক উদ্যান, ১৯৮৭।
সচিত্র বাংলাদেশ, ১৯৯১।
সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৩, ১৯৮৫।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯০৫, ১৯৫৬।
সাহিত্য সংহিতা, ১৩১১-১২।
সুরেন্দ্র স্মরণিকা, ২০১০
সৌরভ, ১৯১৪–১৯২৮।
স্থানীয় ইতিহাস, ২০০৯।

গ্রন্থ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩।

ইয়াকুব আলী। *কবিগান*। চট্টগ্রাম, ১৯৬৭।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। *কবিতা সংগ্রহ*। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পা.। কলকাতা: কেদারনাথ রায়, ১৮৮৫।

————। *কবিজীবনী*। ভবতোষ দত্ত সম্পা.। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাস। সম্পাদক। *বাংলার লোককবি সরকার বিজয় অধিকারীর গীতিমালা*। কলকাতা, ১৯৮৩।

এস. এম. নূর-উল-আলম। *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

এস এম লুৎফর রহমান। *বাংলাদেশী জারীগান* । ঢাকা, ১৯৮৬।

কল্যাণী ঘোষ। *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস। সম্পাদক। *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২।

কামালউদ্দিন কবির। *হাওর জনপদের গীতরঙ্গ: অন্তরঙ্গ আলোয়*। ঢাকা: আইইডি, ২০০৭।

কালীপ্রসন্ন সিংহ। *হুতোম প্যাঁচার নকশা*। কলকাতা: মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩। প্রথম প্রকাশ ১৮৬২।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ। *চৈতন্যচরিতামৃত*। সুকুমার সেন সম্পা.। নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৩।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪৫।

গোলাম মুরশিদ। *কালান্তরে বাংলা গদ্য*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। *রস-ভাণ্ডার*। কলকাতা: বসুমতী, ১৮৯৯।

জসীমউদ্‌দীন। *জীবনকথা*। পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ২০০৩।

————। *জারীগান*। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৮।

তারকচন্দ্র সরকার। *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*। ৭ম সং। ওড়াকান্দি, ১৯৭১।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। *কবি*। পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা: স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স লি., ১৯৬১।

দীনেশচন্দ্র সিংহ। *কবিয়াল কবিগান*। কলকাতা: সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭।

———। *পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত*। কলকাতা, ১৯৯০।
———। *পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।
———। *নকুলেশ্বর গীতিমাল্য*। কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৯৮৬।
দীপক বিশ্বাস। *কবিগান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০৪।
দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস ঠাকুর। *ঐতিহাসিক মহাকবি মহর্ষি তারক সরকার*। কলকাতা, তারিখবিহীন।
দেবেশ রায়। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। কলকাতা: দে'জ, ২০১০।
নগেন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক। *বিশ্বকোষ*। ২২ খণ্ড। কলকাতা, ১৯১১ (সর্বশেষ খণ্ড)।
নিরঞ্জন চক্রবর্তী। *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৮।
নূর মহম্মদ টেনা। *খুলনার লোককবি*। খুলনা: কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৮১।
পরাণচন্দ্র দাস। *ওস্তাদি তরজার লড়াই*। কলকাতা, ১৮৭৮।
পুলক চন্দ। *গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান*। কলকাতা: কথাশিল্প, ১৯৭৮।
পূর্ণেন্দু দস্তিদার। *কবিয়াল রমেশ শীল*। কলকাতা, ১৯৬৩।
———। *লোকগীতি : রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়ার সংকলন*। চট্টগ্রাম: মুসলিম ইনস্টিটিউট, ১৯৬৪।
প্রফুল্লচন্দ্র পাল। *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *বঙ্কিম রচনাবলী*। ২য় খণ্ড। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।
বাদল বরণ বড়ুয়া ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। সংকলক। *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া: জীবন ও রচনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।
বাসুদেব গোলদার। *শ্রীশ্রী গুরু পাগল বিজয়ামৃত*। বনগাঁ, ১৯৮৬।
বিরাট বৈরাগ্য। *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা*। নদীয়া: পরিমল বৈরাগ্য, ১৯৯৯।
বিষ্ণুপদ বাগচী। *তারকচন্দ্র সরকার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*। ১ম খণ্ড। পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯।
ভারতচন্দ্র রায়। *ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের গ্রন্থসঙ্কলনপুস্তিকা*। কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৭৮।
মযহারুল ইসলাম। *কবি পাগলা কানাই*। রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।
মহানন্দ হালদার। *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদচরিত*। খুলনা: মতুয়া মহাসংঘ, ১৯৪৪।
মহসিন হোসাইন। *কবিগান এবং চারণকবি আচার্য রাজেন্দ্রনাথ*। যশোর, ১৯৭৯।
———। *ভাটিয়ালী গানের রাজা পাগল বিজয়*। যশোর, ১৯৮০।

————————। *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

————————। *বিজয় সরকার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

————————। *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *মানিক গ্রন্থাবলী*। ৯ম খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৯৮০।

মামুন তরফদার। *টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য*। ঢাকা: ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬।

মাযহারুল ইসলাম তরু। *বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০০৯।

মাহবুবুল হক ও শিশির দত্ত। *সমকালের কবিয়াল*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, ২০০৭।

মীর মশাররফ হোসেন। *মশাররফ রচনাবলী*। ৩য় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা। *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। *হারামণি*। ৭ম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪।

————————। *হারামণি*। ১০ম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার। সম্পাদক। *বিশ শতকের বাংলা*। রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১০।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী। *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

যতীন সরকার। *বাংলাদেশের কবিগান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

————————। *হরিচরণ আচার্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪১।

————————। *রবীন্দ্র-রচনাবলি*। ১৩শ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১।

লোকেশ্বর বসু। *আমাদের পদবীর ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।

শফিকুর রহমান চৌধুরী। সম্পাদক। *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

শাহিদা খাতুন। সম্পাদক। *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা ১: কবিগান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০।

শিবনাথ শাস্ত্রী। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৯০৪।

সিরাজুল ইসলাম। প্রধান সম্পাদক। *বাংলাপিডিয়া*। দশ খণ্ড। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩।

সুকুমার সেন। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৪০।

শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন। সম্পাদক। *বাংলা একাডেমী চরিত অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। *রমেশ শীল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
————। সম্পাদক। *রমেশ শীল রচনাবলী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
স্বরূপেন্দু সরকার। *শ্রীশ্রী হরিচাঁদের জীবনকথা*। রাজশাহী: কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৬।
————। *ভাটির নাইয়া*। ২য় সংস্করণ। রাজশাহী: কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৪।
স্বরোচিষ সরকার। সম্পাদক। *বাংলা একাডেমী বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
হরিচরণ আচার্য। *বঙ্গের কবির লড়াই*। পুনর্মুদ্রণ। নরসিংদী: দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬। প্রথম প্রকাশ ১৯৩০।
————। *কবির ঝঙ্কার*। ১ম খণ্ড। নরসিংদী: জিতেন্দ্র কিশোর মৌলিক, ১৯২৯।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। *গৌরবঙ্গ-সংস্কৃতি*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭২।

Dinesh Chandra Sen. *Bengali Language and Literature.* Kolkata: Calcutta University, 1911.
Sushil Kumar De. *Bengali Literature in the Nineteenth Century.* 2nd ed. Kolkata: Firma KLM, 1962.
Mary Frances Dunhan. *Jarigan: Muslim Epic Songs of Bangladesh.* Dhaka: The University Press Limited, 1997.

নির্ঘণ্ট

কয়েকজন কবিয়ালের আলোকচিত্র



কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার



কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য



বিজয়নারায়ণ আচার্য



প্রেমিককবি অশ্বিনী গোঁসাই



হরিবর সরকার



হরিচরণ সরকার



নারায়ণচন্দ্র বালা



রমেশচন্দ্র শীল



রাজেন্দ্রনাথ সরকার



শেখ গোমানী দেওয়ান



বিজয়কৃষ্ণ সরকার



নিশিকান্ত সরকার



নকুলেশ্বর সরকার



রসিকলাল সরকার



ফণীভূষণ বড়ুয়া



সুরেন্দ্রনাথ সরকার


অনাদিজ্ঞান সরকার


অমূল্য সরকার


দ্বিজবর সরকার


কালোশশী চক্রবর্তী


মদন আচার্য


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য



স্বরূপেন্দু সরকার



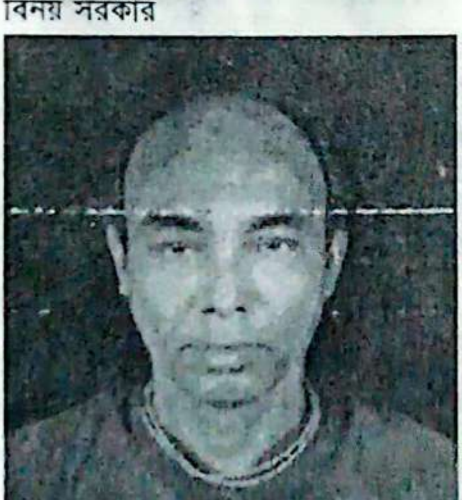
রবীন্দ্রনাথ সরকার



বিনয় সরকার



নারায়ণ চন্দ্র সরকার



গৌরাঙ্গ সরকার



সন্ধ্যা সরকার

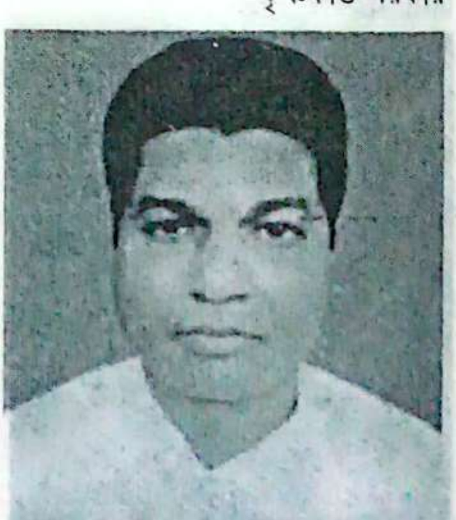

অসীম সরকার


তমাল সরকার


নিশিকান্ত সরকার, ছোটো


কৃষ্ণকান্ত সরকার


রবীন্দ্রনাথ সরকার, ছোটো


হরিবর সরকার, ছোটো



সরোজিৎ সরকার



স্বপন সরকার



মণিশঙ্কর সরকার



শ্যামল সরকার



গৌতম সরকার



মীরা সরকার



সঞ্জয় মল্লিক



তিমির সরকার



সুভাষ সরকার



নির্মল হীরা



দীপঙ্কর সরকার



শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস (ঢুলি)

স্বরোচিষ সরকার (জ. বাগেরহাট, ১৯৬০)। পড়াশুনা : চরবানিয়ারি, বাগেরহাট ও রাজশাহী। এমএ (১৯৮৩), পিএইচডি (১৯৯২)। বরগুনা মহিলা কলেজের প্রভাষক (১৯৮৪–১৯৮৯)। বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা (১৯৯২–২০০০)। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য বই : মুকুন্দদাস (১৯৮৭, ২য় সং ১৯৯৯), যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯৯৩), গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯৯৪), বাংলাদেশের ফসল (১৯৯৪), বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা: মুসলমান সমাজ, (১৯৯৫, ২য় সং ২০১০), মাহমুদ নূরুল হুদা (১৯৯৮), অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ (২০০৫), একাত্তরে বাগেরহাট : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (২০০৬), বিশ শতকের মুক্তচিন্তা (২০০৮), ভাবনা নিয়ে ভাবনা : জনপ্রিয় বইয়ের আলোচনা (২০১০), বাংলাদেশের কোষগ্রন্থ ও শব্দসন্ধান (২০১০), অকারণ ব্যাকরণ (২০১১)।

সম্পাদনা–বাংলা একাডেমী বৈশাখী লোক- উৎসব প্রবন্ধ (১৯৯৩), বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (সহযোগী সম্পাদক, ২০০০), পালি-বাংলা অভিধান (দুই খণ্ড: ২০01 ও ২০০৮), প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ (২০০৯), বিশ শতকের বাংলা (২০১০)।

অনুবাদ–পূর্ববাংলার ভূমিব্যবস্থা (২০০৪)।